إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ

আল্লাহর সাহায্য নিকটবর্তী

ড. মুহাম্মদ রেজাউল করিম

আল্লাহর সাহায্য নিকটবর্তী

ড. মুহাম্মদ রেজাউল করিম

প্রকাশনায়
দ্যা দাওয়াহ্ সেন্টার
গুলশান, ঢাকা।

www.pathagar.com

প্রকাশনায়

দ্যা দাওয়াহ্ সেন্টার

স্বত্ব

লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ

জুন – ২০১৬

হাদিয়া : ২৮০ টাকা মাত্র।

www.pathagar.com

ভূমিকা

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর, যার অশেষ রহমতে **'আল্লাহর সাহায্য নিকটবর্তী'** নামক বইটি প্রকাশিত হচ্ছে। দরূদ ও সালাম প্রেরণ করছি মানবতার মুক্তির দূত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি যিনি ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবনাদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছেন। মহান আল্লাহ তায়ালা মানবজাতিকে খিলাফতের দায়িত্ব দিয়ে এ পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। যুগে-যুগে আম্বিয়ায়ে আলাইহিমুসসালাম এ দায়িত্বের স্বার্থক প্রতিনিধিত্ব করেছেন। নবী-রাসুলগণ প্রত্যেকেই ছিলেন আল্লাহ তায়ালার মকবুল বান্দার অন্তর্ভুক্ত। তাঁরা ছিলেন স্ব-স্ব সমাজের সেরা মানুষ। শুধুমাত্র দ্বীনের কারনেই সমাজের সেরা মানুষগুলো বিরোধীতার সম্মুখীন হয়েছেন। প্রায় সকলেই দ্বীনের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি হয়েছেন। তবুও তাঁরা দমে যাননি, দূর্বলও হননি, আত্নসমর্পনও করেননি। কখনো কখনো তাদের জীবনও আল্লাহর রাহে সঁপে দিয়েছেন। কারণ সত্য ও মিথ্যার দ্বন্দ্ব চিরন্তন। দ্বীনের পথে পরীক্ষা অনিবার্য। আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ ﷺ সকলের নিকট আল-আমীন হিসেবে স্বীকৃত ছিলেন। কিন্তু দ্বীনের দাওয়াত শুরু করার সাথে সাথে কাফের-মুশরিকদের পক্ষ থেকে প্রবল বিরোধীতা, জুলুম-নির্যাতন, কারাবরণ, জীবননাশের সম্মুখীন, এমনকি হিজরত করতে বাধ্য হয়েছেন। সেই পথ ধরে খোলাফায়ে রাশেদীন, সাহাবায়ে আজমাঈনসহ সকল যুগেই সত্যপন্থীদের পরীক্ষা একই।

এ পরীক্ষায় তাঁরা অটল-অবিচল থেকে এগিয়েছেন মনজিলের দিকে। এর বিনিময়ে আল্লাহ তায়ালা তাঁদেরকে দুনিয়ার বিজয় এবং আখেরাতে মহাসাফল্যের সু-সংবাদ দিয়েছেন।

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ.

"নিশ্চয়ই যারা বলে, 'আল্লাহ আমার রব' অতঃপর অবিচল থাকে, ফেরেশতারা তাদের নিকট নাযিল হয় (এবং বলে), 'তোমরা ভয় পেয়ো না, দুশ্চিন্তা করো না এবং সেই জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ কর তোমাদেরকে যার ওয়াদা দেয়া হয়েছিল'। (সূরা হামিম আস-সিজদাহ : ৩০)

www.pathagar.com

যেহেতু এ দুনিয়ায় আর নবী-রাসুল আসবেন না। সুতরাং দ্বীনের এ কঠিন জিম্মাদারী উম্মতে মুহাম্মদীকে পালন করতে হবে। এ দায়িত্ব যারাই পালন করবে তাদেরকে একই পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে। পরীক্ষার ভিন্নতা যাই হোকনা কেন, বাতিলের বিরোধীতার কারণ এক ও অভিন্ন। স্থান-কাল যতই আলাদা হোকনা কেন বাতিলের জুলুম-নির্যাতন, অপপ্রচার আর কুট-কৌশল যেন একই কারখানায় তৈরী। আল্লাহর বলেন–

وَمَا نَقَمُوْا مِنْهُمْ اِلَّا اَنْ يُّؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ۔

"ওই ঈমানদারদের সাথে তাদের শত্রুতার এ ছাড়া আর কোন কারণ ছিল না যে তারা সেই আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছিল।" (৮৫:০৩)

একবিংশ শতাব্দীর নব্য জাহিলিয়াতের ধ্বজাধারী স্বৈরাচারী শাসক গোষ্ঠীর জেল-যুলুম, অ-মানবিক অত্যাচার-নির্যাতনে ইসলামী আন্দোলনের নেতা-কর্মীরা আজ একই পরীক্ষার সম্মুক্ষিণ। এই পরীক্ষা কোনো কারণে আসেনি; বরং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তা নির্ধারিত। এটিই চিরন্তন।

এই সত্য কুরআনে বর্ণিত হয়েছে এভাবে–

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَاْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ط مَسَّتْهُمُ الْبَاْسَآءُ وَالضَّرَّآءُ وَزُلْزِلُوْا حَتّٰى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ مَتٰى نَصْرُ اللّٰهِ ط اَلَآ اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ۔

"তোমাদের কি এই ধারণা যে, তোমরা জান্নাতে চলে যাবে, অথচ সে লোকদের অবস্থা অতিক্রম করনি যারা তোমাদের পূর্বে অতীত হয়েছে। তাদের ওপর এসেছে বিপদ ও কষ্ট। আর এমনিভাবে শিহরিত হতে হয়েছে যাতে নবী ও তাঁর প্রতি যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে পর্যন্ত একথা বলতে হয়েছে যে, কখন আসবে আল্লাহ্র সাহায্য! তোমরা শোনে নাও, আল্লাহ্র সাহায্য একান্তই নিকটবর্তী।" (সূরা আল-বাকারা, ২১৪)

হযরত সা'আদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! মানুষের মধ্যে সর্বাধিক কঠিন পরীক্ষার সম্মুখিন হবে কারা? জবাবে তিনি বলেন- "নবীগণ অত:পর তাদের অনুরূপগণ। অত:পর তাদের অনুরূপগণ (অর্থাৎ সম্মানিতগণ, অত:পর সম্মানিতগণ এবং পর্যায়ক্রমে উচ্চ পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিতগণ), বান্দা তার দ্বীনের পরিধি অনুযায়ী পরীক্ষিত

www.pathagar.com

হবে। অতএব যদি তারা দ্বীনের ব্যাপারে কঠিন মজবুত হয় তাহলে তার পরীক্ষাও কঠিন হবে, আর যদি সে দ্বীনের ব্যাপারে নরম হয় তাহলে তার দ্বীনের পরিধি অনুযায়ী তাকে পরীক্ষা করা হবে, এভাবে বান্দার নিকট বালা-মুছিবত আসতেই থাকবে (এবং ক্ষমা হতেও থাকবে) যেন সে পাপমুক্ত হয়ে পৃথিবীতে চলতে থাকে। শায়েখ সা'আদী (রহ) বলেন, "আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই স্বীয় বান্দাদের বিপদাপদ দিয়ে পরীক্ষা করবেন এ জন্য যে, যেন সত্যবাদী, মিথ্যাবাদী এবং ধৈর্যশীল ও ধৈর্যহারা ব্যক্তির মধ্যে সুস্পষ্ট প্রমাণ পরিলক্ষিত হয়। (ইমাম তিরমিযী ও ইমাম ইবনু মাজাহ)

আজ বিশ্বব্যাপী দ্বীনের দা'ঈদের ওপর চলছে জেল-যুলুম, নির্যাতন, অত্যাচার, নিষ্পাপ-নিরাপরাধ মানুষদেরকে ঝুলানো হচ্ছে ফাঁসির দড়িতে। কিন্তু কখনো কখনো আমাদের মতো দুর্বল ঈমানদারদেরও একথা মনে আসাটা অস্বাভাবিক নয়, এতো পরীক্ষা কেন? এমন প্রশ্ন আল্লাহর রাসুলের সাহাবীগণও করেছিলেন। রাসুল ﷺ সেই প্রশ্নের উত্তর ও দিয়েছেন এভাবে– "মক্কায় তখন ইসলাম গ্রহণ করলেই তার ওপর বিপদ-আপদ ও জুলুম-নিপীড়নের পাহাড় ভেঙ্গে পড়তো। কোন গোলাম বা গরীব মানুষ ইসলাম গ্রহণ করলে তাকে ভীষণভাবে মারপিট এবং কঠোর নির্যাতন-নিপীড়নের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত করা হতো। সে যদি কোন দোকানদার বা কারিগর হতো তাহলে তার রুজি-রোজগারের পথ বন্ধ করে দেয়া হতো। সে যদি কোন প্রভাবশালী পরিবারের কোন ব্যক্তি হতো তাহলে তার নিজের পরিবারের লোকেরা তাকে নানাভাবে বিরক্ত করতো ও কষ্ট দিতো এবং এভাবে তার জীবনকে দুর্বিসহ করে তুলতো। এ অবস্থায় মক্কায় এক মারাত্মক ভীতি ও আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। এ ধরনের অবস্থার একটা চিত্র পেশ করেন হযরত খাব্বাব ইবনে আরাত বর্ণিত একটি হাদীসে। একদিন আমি দেখলাম নবী ﷺ কা'বাঘরের দেয়ালের ছায়ায় বসে রয়েছেন। আমি সেখানে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলাম, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আপনি কি আমাদের জন্য দোয়া করেন না? একথা শুনে তার চেহারা আবেগে-উত্তেজনায় রক্তিম বর্ণ ধারণ করলো এবং তিনি বললেন, "তোমাদের পূর্বে যেসব মু'মিনদল অতিক্রান্ত হয়েছে তারা এর চাইতেও বেশি নিগৃহীত হয়েছে। তাদের কাউকে মাটিতে গর্ত করে তার মধ্যে বসিয়ে দেয়া হতো এবং তারপর তার মাথার উপর করাত চালিয়ে দুই টুকরা করে দেয়া হতো। কারো অঙ্গ-প্রতঙ্গের সন্ধিস্থলে

www.pathagar.com

লোহার চিরুনী দিয়ে আঁচড়ানো হতো, যাতে তারা ঈমান প্রত্যাহার করে। আল্লাহর কসম, এ কাজ সম্পন্ন হবেই, এমনকি এক ব্যক্তি সান'আ থেকে হাদ্বারামাউত পর্যন্ত নিশঙ্ক চিত্তে সফর করবে এবং আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো ভয় তার মনে থাকবে না।" (বুখারী , আবু দাউদ ও নাসাঈ)

মুলত: ঈমানের পরীক্ষা হয় দুঃখ-কষ্ট ও মুসিবতের সময়। তখন সে নিজে যেমন নিজের অবস্থাটা উপলব্ধি করতে পারে, তেমনি আন্দাজ করতে পারে যে, এ পথে সে কতোখানি অবিচল থাকতে সক্ষম। এর ভিত্তিতে নির্ধারিত হয় ঈমানের মানদণ্ড। সত্যপন্থীদেরকে আল্লাহ্ বিজয় দানের ওয়াদা করেছেন। কিন্তু ইসলামী আন্দোলনের বিজয় সংখ্যার ভিত্তিতে হয়নি; বরং আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় অর্জনের জন্য কতগুলো গুণাবলী অর্জনকে আল্লাহ্ বাধ্যতামূলক করে দিয়েছেন। যদি বান্দাহ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে শর্তগুলো পূরণে সক্ষম হয়, তাহলে আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে সাহায্য করার ওয়াদা তিনি নিজেই করেছেন। কুরআনের বাণী–

وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ.

বিজয় ও সাহায্য সবকিছুই আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে। তিনি প্রবল পরাক্রান্ত ও মহাজ্ঞানী। (৩:১২৬)

সুতরাং বাতিলের ষড়যন্ত্র আর চক্রান্ত দেখে মুমিনরা কখনো হতাশ হয় না। আল্লাহ বলেন,

وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ.

এ চক্রান্ত তো তারা করলো এবং তারপর আমি একটি কৌশল অবলম্বন করলাম, যার কোন খবর তারা রাখতো না। (২৭:৫০)

তাই মুমিনগণের উচিৎ আল্লাহর উপর তায়াক্কুল করে সাহায্য পাওয়ার উপর্যুক্ততা অর্জনে সচেষ্ট হওয়া। আত্মপর্যালোচনার মাধ্যমে নিজেদের ভুলত্রুটি সংশোধন ও দূর্বলতা দুরীকরণ এবং সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা নিয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হওয়া। কাজেই বাতিলের অমানবিকতা ও সমাজের বিকৃতি দেখে অশ্রুপাত নয়। পরিস্থির কাঠিন্যতায় দিকভ্রান্ত প্রতিকের মত শুধু হা-হুতাশ, হীনমন্যতা নয়। জটিল জটিল তত্ত্ব আর তথ্যের ফুলঝুরিও দিয়ে কি করা ঠিক হয়েছে, আর কি করা ঠিক হয়নি, এমন, সমালোচনা, দোষারোপ আর অতিকথনও নয়; বরং যারাই সমাজ গঠনের চূড়ান্ত আকাঙ্খা হৃদয়ে লালন করেন, ইকামতে দ্বীনের

www.pathagar.com

কাজকে ফরজ মনে করেন, তাদেরকে দৃঢ় কদমে সামনে অগ্রসর হতে হবে। কারণ ঈমানের দাবীদার সবাইকে এই কঠিন চুল্লী অতিক্রম করে জান্নাত লাভ করতে হবে। ঈমানদারদের জন্য এর কোন বিকল্প পথ রাখা হয়নি।

ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদেরকে কুরআন ও সুন্নাহের যথার্থ জ্ঞানের পাশাপাশি সমসাময়িক-আধুনিক, জ্ঞান-বিজ্ঞান, তথ্য-প্রযুক্তির ক্ষেত্রেও পারদর্শী হতে হবে। দ্বীনের প্রতি অবিচল বিশ্বাস, চরিত্র ও কর্মের মাধ্যমে নিজেদের ময়দানে পেশ করতে হবে। নিছক কোন আবেগ আর উত্তেজনা অথবা কামনা-বাসনার বশবর্তী হয়ে নয়; বরং সর্ববস্থায় দ্বীনকে জীবনোদ্দেশ্য হিসেবে যদি আমরা গ্রহণ করতে পারি, তাহলে দুনিয়া ও আখেরাতে আমরা কামিয়াবি হাসিল করতে পারব ইনশাল্লাহ। আর যে সকল সত্যপন্থী খোদার পথে প্রাণ উৎসর্গ করার জন্য লড়াই করতে থাকে আল্লাহ তায়ালা গায়েবী মদদে তাদেরকে সাহায্য করেন।

ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাসে জেল-জুলুম, নির্যাতন, হত্যা, ফাঁসি এগুলো নতুন নয়। আজো পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে মুসলমানদের সাথে চলছে একই অচরণ। আজ মিশর, ফিলিস্তিন, মায়ানমার, আফগানিস্তান, কাশ্মীর, চীন, প্রাচ্য, পাশ্চত্য, দক্ষিণ আফ্রিকাসহ পৃথিবীর অনেক স্থানে চলছে মুসলমানদের ওপর অমানবিক নির্যাতন। মুসলমানদের বঞ্চিত করা হচ্ছে ন্যায্য মৌলিক অধিকার থেকে।

এ সকল কঠিন পরিস্থিতিতেও যুগে-যুগে মর্দে মুজাহিদদের দ্বীনের পথে অটল, অবিচলতা, সাহসিকতা মুসলিম উম্মাহর কাছে প্রেরনার উৎস হয়ে থাকবে। ফাঁসির রশিকে যারা বরণ করে, শাহাদাতের অমিয় সুধা প্রাণ করেছেন তারা অমর। যারা জীবন বিলিয়ে দিয়েছেন কিন্তু অন্যায়ের সামনে মাথা নত করেনি তাঁরা জাতীয় বীর হিসেবে এদেশের মানুষের হৃদয়ে জাগরুক থাকবে অনন্তকাল। তাদের তেজদীপ্ত ঈমান দুনিয়াবাসীকে প্রেরণা যোগাতে থাকবে শতাব্দীর পর শতাব্দী। তাদের প্রতিফোঁটা রক্ত এ জমিনকে উর্বর করবে। শহীদদের জন্য পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে চোখের পানিতে বুক ভাসাতে থাকবে দুনিয়াবাসী আর খুনীদের দিতে থাকবে অভিশাপ। তাদের সম্পর্কে আল্লাহর ঘোষণা হচ্ছে–

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا ۚ بَلْ اَحْيَاۤءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ۔

"যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে মৃত মনে করো না। তারা আসলে জীবিত। নিজেদের রবের কাছ থেকে তারা জীবিকা লাভ করছে।" (৩ : ১৬৯)

www.pathagar.com

কুরআনী ঘোষণা আর ইসলামের স্বর্ণোজ্জ্বল ইতিহাস স্বাক্ষী অত্যাচারে পথ ধরেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে দীনের মজবুত ঘাঁটি। কারণ কোন ব্যাক্তিকে হত্যা করে আদর্শকে হত্যা করা যায় না; বরং আদর্শ নতুন উজ্জীবনী শক্তি নিয়ে এগিয়ে যায় দূর্বার গতিতে। হৃদয়ের শোক আর সঞ্চিত শক্তি রূপ নেয় অপ্রতিরোধ্যতায়। যে জমিন শহীদের রক্তে রঞ্জিত সেখানে ইসলামের বিজয় অনিবার্য সত্য।

আল্লাহ্ বলেন–

وَلَا تَهِنُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ۔

"আর তোমরা নিরাশ হয়ো না এবং দুঃখ করো না। যদি তোমরা মুমিন হও তবে, তোমরাই জয়ী হবে।" (সূরা আলে ইমরান, ১৩৯)

সুতরাং আমাদেরকে জানতে হবে দীনের পথে ত্যাগের ইতিহাস, আর এ সোনালী ইতিহাসই হবে আমাদের পথচলার পাথেয়। সুতরাং দীনের পথে অবিচল, ধৈর্য ও ন্যায়ের সাথে পথ চলার মাধ্যমেই প্রতিফলিত হবে কুরআনী ঘোষণার বাস্তবায়ন اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ "আল্লাহ্‌র সাহায্য নিকটবর্তী।"

বইটি রচনায় যাদের লেখনি, পরামর্শ এবং উৎসাহ আমাকে ঋণী করেছে, তাদের প্রতি রইলো স্বশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা। বইটি প্রকাশের সাথে জড়িত সকলের প্রতি রইলো আন্তরিক দু'আ ও কৃতজ্ঞতা।

জীবন চলার পথে নানা ব্যস্ততা, দ্বীনের কাজে আত্মনিয়োগের আপ্রাণ চেষ্টা, মানবিক দুর্বলতা ও নব্য জাহেলিয়াতের হিংস্র থাবা ইত্যাদিকে পাড়ি দিয়ে বইটি প্রকাশিত হলো। বইটিতে দৃশ্যমান সকল ভুলত্রুটির জন্য মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থী এবং আপনাদের সুপরামর্শের প্রত্যাশায়। আপনাদের মূল্যবান পরামর্শ পরবর্তী সংস্করণে প্রতিফলনের প্রতিশ্রুতি রইলো।

ড. মুহাম্মদ রেজাউল করিম

১৬ জুন ২০১৬

www.pathagar.com

সূচীপত্র

অধ্যায়-১

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জুলুম-নির্যাতন, কারাবরণ ও কষ্ট স্বীকার

- দ্বীন প্রচার ও অত্যাচারের সূত্রপাত.. ১৩
- রাজনৈতিক প্রতিহিংসায় মক্কায় কুরাইশদের নানামুখি নির্যাতন..... ১৯
- রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কারাবরণ.. ২২
- তায়েফে দীনের দাওয়াত, নির্যাতন ও অত্যাচারীদের প্রতি মর্মস্পর্শী দুআ ২৪
- রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে হত্যার ষড়যন্ত্র ও মদীনায় হিজরত ২৭
- রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুখমণ্ডল ক্ষতবিক্ষত এবং দানদান মুবারক শহীদ ৩০
- রাসূল ﷺ-এর বিরুদ্ধে নোংরা অপপ্রচার ৩১
- আন্দোলনের অভ্যন্তরে বিভ্রান্তি সৃষ্টি.. ৩৩
- ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান (রাসুল ﷺ)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র....... ৩৪

অধ্যায়-২

পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণের ওপর জুলুম-নির্যাতন, কারাবরণ ও কষ্ট স্বীকার

- হযরত আদম (আলাইহিস সালাম).. ৪১
- হযরত নূহ (আলাইহিস সালাম) ৪৪
- হযরত হূদ (আলাইহিস সালাম).. ৪৯
- হযরত ছালেহ (আলাইহিস সালাম).. ৫২
- হযরত ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম).. ৫৬
- হযরত লূত (আলাইহিস সালাম) ৫৯
- হযরত ইসমাঈল (আলাইহিস সালাম).. ৬২
- হযরত ইউসুফ (আলাইহিস সালাম) ৬৩
- হযরত আইয়ূব (আলাইহিস সালাম).. ৬৫
- হযরত শো'আয়েব (আলাইহিস সালাম).. ৬৭

www.pathagar.com

➢ হযরত মূসা ও হারূণ (আলাইহিস সালাম) ৭০
➢ হযরত ইউনুস (আলাইহিস সালাম) ৭৫
➢ হযরত দাঊদ (আলাইহিস সালাম) ৭৮
➢ হযরত ইলিয়াস (আলাইহিস সালাম) ৮০
➢ হযরত যুল-কিফল (আলাইহিস সালাম) ৮৩
➢ হযরত ঈসা (আলাইহিস সালাম) ৮৫

অধ্যায়-৩

সাহাবায়ে আজমাঈন-এর ওপর জুলুম নির্যাতন

পরিচ্ছেদ-১

খোলাফায়ে রাশেদীনের জুলুম-নির্যাতন ও কষ্ট স্বীকার

➢ হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর ওপর জুলুম-নির্যাতন ও কষ্ট স্বীকার৮৮
➢ হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর ওপর জুলুম-নির্যাতন ও কষ্ট স্বীকার ৯৬
➢ হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর ওপর জুলুম-নির্যাতন ও কষ্ট স্বীকার ১০২
➢ হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর ওপর জুলুম-নির্যাতন ও কষ্ট স্বীকার...১০৬

পরিচ্ছেদ-২

সাহাবায়ে কেরামের জুলুম-নির্যাতন ও কষ্ট স্বীকার

➢ ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর শাহাদাত ১১২
➢ হযরত হামজা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর শাহাদাত ১১৭
➢ হযরত মুসআব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর শাহাদাত ১২০
➢ হযরত হানযালা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর শাহাদাত ১২১
➢ হযরত বেলাল রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর ওপর অমানবিক নির্যাতন ১২২
➢ হযরত আমর ইবনে জমুহ্ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর শাহাদাত ১২৩
➢ হযরত আনাস বিন নযর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর শাহাদাত ১২৪
➢ ফাঁসির কাষ্ঠে হযরত খুবাইব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর শাহাদাত ১২৬
➢ হযরত বারা বিন মালিক আল আনসারী-এর শাহাদাত............. ১২৮
➢ হযরত আব্দুল্লাহ বিন জাহ্স-এর শাহাদাত ১৩২
➢ হযরত আব্দুল্লাহ বিন উম্মে মাকতুম রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর শাহাদাত ১৩৪
➢ হযরত জায়েদ বিন হারেসা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর শাহাদাত ১৩৭

www.pathagar.com

➢ হযরত জাফর বিন আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু-এর শাহাদাত ১৩৯
➢ হযরত জুল বিজাদাইন রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু-এর শাহাদাতের মর্যাদা লাভ......... ১৪১
➢ আ'সেম বিন সাবিত রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু-এর শাহাদাত.............................. ১৪৩
➢ হযরত খাব্বাব বিন আরাত রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এর উপর অমানবিক নির্যাতন ... ১৪৬
➢ হযরত ইয়াসিরের পরিবার, সুমাইয়া ও আম্মার-এর শাহাদাত..... ১৪৯

অধ্যায়-৪

দ্বীনের মুজাহিদদের জুলুম-নির্যাতন ও কষ্ট স্বীকার

➢ ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-কে কারাগারে নিক্ষেপ ১৫৩
➢ মালিক ইবনে আনাস (রহ.)-এর ওপর যুলুম ১৫৪
➢ আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর ওপর নির্যাতন ১৫৪
➢ ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.).. ১৫৬
➢ শায়েখ আবুল কারাকাত বাদরুদ্দীন আহমদ সরহিন্দি (রহ.)-এর ইসলাম প্রচার ও তাঁর ওপর নির্যাতন.................................. ১৫৭
➢ বালাকোটের রক্তস্নাত ময়দান ও সাইয়েদ বেরলভী (রহ.)-এর শাহাদাত.............................. ১৫৮
➢ হাজী শরীয়তুল্লাহ ও তিতুমীরের আন্দোলন ১৬১
➢ জয়নব আল গাজালী (রহ.)-এর কণ্ঠে নির্যাতনের কাহিনী.......... ১৬২
➢ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রহ.) ১৭০
➢ যালিমের কারাগারে মওদূরী ১৭৪
➢ হাসানুল বান্না (রহ.)-এর শাহাদাত.................................... ১৭৪
➢ সাইয়েদ কুতুব (রহ.)-এর শাহাদাত ১৭৮
➢ গ্রেফতার ও নির্যাতন ১৭৯
➢ আবার গ্রেফতার ও দন্ড ১৮০
➢ মিশরে ইখওয়ানুল মুসলেমীনের ওপর জুলুম-নির্যাতন ১৮১
➢ রাবায়া স্কয়ারে শহীদ আসমাকে বাবার লেখা হৃদয়স্পর্শী চিঠি..... ১৮৬
➢ আরাকানে মুসলমানদের ওপর জুলুম-নির্যাতন...................... ১৮৮
➢ আরাকানবাসীদের স্বাধীনতা সংগ্রাম.................................. ১৯২
➢ ব্রিটিশ শাসনকালে বার্মার কাঠামোগত পরিবর্তন..................... ১৯৩

www.pathagar.com

➢ আরাকানের নৃশংসতম গণহত্যা.. ১৯৪
➢ ফিলিস্তিনে মুসলমানদের ওপর জুলুম-নির্যাতন ১৯৬
➢ বাংলাদেশে ইসলাম আক্রান্ত... ২০৩
➢ ২৮ অক্টোবর : শহীদের রক্তে-রঞ্জিত রাজপথ........................ ২০৫
➢ শহীদ মুজাহিদের মায়ের অনুভূতি ২১১
➢ শহীদ ফয়সালের মায়ের অনুভূতি... ২১৩
➢ শহীদ মাসুমের মায়ের অনুভূতি ২১৫
➢ শহীদ হাফেজ গোলাম কিবরিয়া শিপনের মায়ের অনুভূতি.......... ২২০
➢ শহীদ রফিকুল ইসলামের মায়ের অনুভূতি............................... ২২২
➢ আব্দুল মালেক (রহ.)-এর শাহাদাত ২২৪
➢ অধ্যাপক গোলাম আযম (রহ.) ২৩১
➢ মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী (রহ.)-এর শাহাদাত ২৪০
➢ আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ (রহ.)-এর শাহাদাত........... ২৭১
➢ মুহাম্মদ কামারুজ্জামান (রহ.)-এর শাহাদাত......................... ২৯৯
➢ আব্দুল কাদের মোল্লা (রহ.)-এর শাহাদাত............................ ৩২৬

অধ্যায়-৫

ঈমানের অগ্নিপরীক্ষা ও আল্লাহর সাহায্য

➢ ঈমানের অগ্নিপরীক্ষা.. ৩৬৮
➢ সত্যের বিজয় ও আল্লাহর সাহায্য অবশ্যম্ভাবী........................ ৩৮৬
➢ ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো ৩৮৯
➢ চক্রান্তকারীদের চক্রান্ত সফল হবে না ৩৯৫

www.pathagar.com

অধ্যায়-১

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর জুলুম-নির্যাতন, কারাবরণ ও কষ্ট স্বীকার

দ্বীন প্রচার ও অত্যাচারের সূত্রপাত

সমগ্র মানবজাতি যখন নির্যাতন, নিপীড়ন, অন্যায়, নির্মমতা, পাপ আর কুসংস্কার থেকে মুক্তির জন্য আর্তনাদ করছিল। মানবতা যখন নিদারুণ মৃত্যুযন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিল, ঠিক সে সময়ই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে পাঠালেন একে উদ্ধার করার জন্য, অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে আসার জন্য। পবিত্র কুরআনের ভাষ্যে,

الٓرٰ ۚ كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۙ بِاِذْنِ رَبِّهِمْ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ۙ.

"আলিফ-লাম-রা; এই কিতাব, যা আমি তোমার প্রতি নাযিল করেছি, যাতে তুমি মানুষকে তাদের রবের অনুমতিক্রমে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আন, পরাক্রমশালী সর্বপ্রশংসিতের পথের দিকে।"[১]

রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কার অদূরে হেরা পাহাড়ে গিয়ে অন্ধকার যুগের মানবসমাজের মুক্তির চিন্তায় ধ্যানে বসে থাকতেন।[২] কখনো কখনো সম্পূর্ণ মাস, বিশেষত রমজান মাস সেখানে কাটাতেন। এই সময়ে তিনি ধ্যান করতেন, স্রষ্টা সম্বন্ধে চিন্তা ভাবনা করতেন এবং রহস্যময় জীবনের তাৎপর্য অন্বেষণ করতেন। নবী ﷺ এই সময়ে স্বপ্নও দেখতেন, যেগুলি বাস্তবজীবনে সত্য হিসেবে দেখা দিত।[৩]

মূর্তি পূজা এবং মানুষের অমানবিক কার্যকলাপ তাঁর অন্তরকে গভীরভাবে নাড়া দেয়। নবী ﷺ চল্লিশ বছরে পা রাখলেন, তাঁর অন্তরের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা

---

১ আল কুরআন, সূরা ইবরাহীম, ১।

২ সহীহ্ আল-বুখারী, ১ম খন্ডঃ পৃঃ ২; আল্লামা শিবলী নুমানী, "সীরাতুন্নবী আযমগড় (ভারত) ১৯৬২, ১ম খন্ডঃ পৃঃ ১৯৯; ইবনে খালদূন, "তারীখ", বৈরুত ১৯৬৬, ১ম খন্ডঃ পৃঃ ৭১৪।

৩ ইবনে সা'দ, "আল-তাবাকাতু'ল-কুবরা", বৈরুত ১৯৬০, ১৩৮০ হিঃ, ১ম খন্ডঃ পৃঃ ১৯৪; সহীহ আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২; মুহাম্মদ ইবনে জারীর আত্-তাবারী, "তারীকুর-রুসূল ওয়াল মুলূক", কায়রো ১৯৬০, পৃঃ ২৯৮।

www.pathagar.com

বাড়তেই থাকল। মূর্তি পূজা এবং মানুষের নৈতিক অবক্ষয় তাঁকে অত্যন্ত পীড়িত করতে থাকে, তিনি সত্য পথের অনুসন্ধানে নিমগ্ন থাকতেন। পরবর্তিতে কুরআনে এ ব্যাপারে আয়াত অবতীর্ণ হয়েছেঃ

وَوَجَدَكَ ضَآلًّا فَهَدٰى۔

"আর তিনি তোমাকে পেয়েছেন পথ না জানা অবস্থায়। অতঃপর তিনি পথনির্দেশ দিয়েছেন।"[৪]

সাত বছর যাবত নবী ﷺ হেরা গুহায় সত্যের সন্ধানে লেগে থাকলেন। সর্বশেষ ছয় মাস তিনি ঘন ঘন হেরা গুহায় যেতে থাকলেন এবং এ সময় তিনি ধারাবাহিকভাবে সুন্দর সুন্দর স্বপ্ন দেখতেন। ৬১০ খ্রিষ্টাব্দে রমজানের কোন একটি দিনে (ইবনে সা'দের মতে ১৭ রমজান সোমবার) হেরা গুহায় তিনি গভীর ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন। তিনি মহান ফেরেশতা জিবরাঈলকে দেখলেন যিনি তাঁকে পড়তে আদেশ করলেন।[৫] নাযিল হলো প্রথম ওহী–

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِیْ خَلَقَ ۚ۔ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۚ۔ اِقْرَاْ وَ رَبُّكَ الْاَكْرَمُ ۙ۔ الَّذِیْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۙ۔ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ یَعْلَمْ ؕ۔

"পাঠ কর তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, সৃষ্টি করেছেন মানুষকে 'আলাক' হতে। পাঠ কর, আর তোমার প্রতিপালক মহিমান্বিত, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন- শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে, যা সে জানতো না।"[৬]

শেষ নবী ﷺ এর প্রতি এটিই ছিল সর্বপ্রথম অবতীর্ণ ঐশ্বরিক বার্তা। হেরা গুহায় প্রথমবারের মত এই অভিজ্ঞতা লাভ করার পর, প্রায় ছয় মাস অহী অবতরণ বন্ধ থাকে।[৭] এই সময়টুকু তাঁর জন্য ছিল চরম উৎকণ্ঠার।[৮] এরপর একই ফেরেশতাকে তিনি আবার দেখলেন, যিনি হেরা গুহায় এসেছিলেন, আসমান এবং জমিন জুড়ে বিস্তীর্ণ এক চেয়ারে বসে আছেন। এটা দেখে পুনরায় নবী ﷺ প্রকম্পিত হলেন (কিন্তু প্রথমবারের অভিজ্ঞতার চেয়ে তীব্রতা ছিল

---

[৪] আল-কুরআন, ৯৩:৭।

[৫] ইবনে সা'দ, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৯২; ইবনে জারীরুত-তাবারী, প্রাগুক্ত, পৃ: ২৯৮-২৯৯;

[৬] আল কুরআন, ৯৬: ১-৫।

[৭] ওহী নাযিল হওয়া বন্ধ থাকার সময় নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। ১২ দিন, ১৫ দিন, ২০ দিন, ৪০ দিন এবং এমন কি আড়াই বছর বলেও কোথাও কোথাও উল্লেখিত হয়েছে। দেখুন: আবদুর রহমান সুহাইলি, *আল-রওয়াতুন-উননুফ* (মিশর : ১৩৩৩হি.), খ. ৮, পৃ: ১৬১

[৮] আব্দুল মালিক ইবনে হিশাম, *আস-সীরাতুন্নবিয়্যা* (কায়রো : ১৩৭৫হি.), খ. ৪ পৃ: ২৪১।

www.pathagar.com

কম)। উত্তেজিত হয়ে তিনি ঘরে ফিরে আসলেন এবং স্ত্রীকে বললেন, তাঁকে কিছু দ্বারা আবৃত করতে। অতঃপর নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হল[৯] এবং অহী অবতরণ ধারাবাহিকভাবে দীর্ঘ কোন বিরতি ব্যতিরেকে চলতে থাকল।

يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۔ قُمْ فَأَنْذِرْ ۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ۔

"১. হে বস্ত্রাবৃত! ২. উঠ, অতঃপর সতর্ক কর। ৩. আর তোমার রবের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর। ৪. আর তোমার পোশাক-পরিচ্ছদ পবিত্র কর। ৫. আর অপবিত্রতা বর্জন কর।"[১০]

ঐশী বার্তা প্রাপ্ত হয়ে প্রিয় নবী ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকেন। এ দাওয়াতের বাণী শুনে, স্ত্রী হযরত খাদিজা, হযরত আলী, যায়েদ বিন হারিছা, উম্মু আইমান, আবু বকর, আম্মার বিন ইয়াসির, খাব্বাব বিন আল আরত, উছমান বিন আফফান, আব্দুর রহমান বিন আউফ, সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস, তালহা, আরকাম, সাইদ বিন যাইদ, আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ, উছমান বিন মাযউন, উবাইদাহ, সুয়াইব আল রুমি (রাদিয়াল্লাহু আনহু) সহ প্রমুখ সাহাবী ইসলাম গ্রহণ করেন। এসময় চল্লিশজন ব্যক্তি ইসলামে প্রবেশ করে। নবুওয়াতের তৃতীয় বছরে, আল্লাহ্‌র আদেশ আসলো প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচারের জন্য।[১১]

প্রকাশ্যে দাওয়াতের অনুমতি পেয়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কুরাইশদেরকে সাফা পাহাড়ের পাদদেশে ডেকে সমবেত করে ইসলামের দাওয়াত দেন।[১২] এ দাওয়াতে কুরাইশদের সকল গোত্র, আবু জাহেল নিজে এবং কুরাইশরা সবাই উপস্থিত ছিলো। তারপর তিনি সবাইকে সম্বোধন করে বললেন, 'আমি যদি বলি, এ পাহাড়ের পাদদেশে অস্ত্র সজ্জিত এক বাহিনী তোমাদের ওপর আক্রমণের অপেক্ষায় আছে, তোমরা কি আমাকে বিশ্বাস করবে?' সকলে একবাক্যে বলল, 'অবশ্যই বিশ্বাস করব।' কারণ, আমরা কখনো তোমাকে মিথ্যা বলতে দেখিনি। তিনি বললেন, আমি তোমাদের সতর্ক করছি ভয়াবহ শাস্তি- আল্লাহর আজাব সম্পর্কে। এ কথা শুনে আবু লাহাব বলল, 'তোমার জন্য ধ্বংস! পুরো দিনটাই

---

৯ ইবনে তাবারী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩০৫-৩০৬; সহীহ আল-বুখারী, "বাদুল ওহী"; ইবনে আবদুল বারর, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৭; সহীহ মুসলিম।

১০ আল কুরআন, ৭৪: ১-৫।

১১ ইবনে হিশাম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৬২; ইবনে জারীরুত তাবারী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩১৮; শিবলী নুমানী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১০।

১২ ইবনে সা'দ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০০; ইবনে জারীরুত তাবারী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩১৯; ইবনে খালদুন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩১৯।

www.pathagar.com

তুমি আমাদের নষ্ট করলে। এ জন্যই কি আমাদের একত্রিত করেছ?' তার এ কথার উত্তরে আয়াত নাযিল হলো।

تَبَّتْ يَدَآ اَبِىْ لَهَبٍ وَّتَبَّ مَآ اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ –

"ধ্বংস হোক আবু লাহাবের দুই হাত এবং সে নিজেও ধ্বংস হোক। তার ধন সম্পদ এবং তার কোন উপার্জন কাজে আসেনি।"[১৩]

দাওয়াতের এ বাণী প্রচারের সাথে সাথে অত্যাচার ও নির্যাতনের সূত্রপাত হয়। পৃথিবীর সর্বশেষ শ্রেষ্ঠ মহামানব মুহাম্মদ ﷺ-এর ওপর অবর্ণনীয় জুলুম ও নির্যাতন হয়েছিল। সাথে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, গালিগালাজ ও অপপ্রচারাভিযানের সাথে সাথে কোরাইশদের উন্মত্ত বিরোধিতা ক্রমশঃ গুণ্ডামি, সন্ত্রাস ও সহিংসতার রূপ নিত। নেতিবাচক ষড়যন্ত্রের হোতারা যখন তাদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও কুৎসা রটনাকে ব্যর্থ হতে দেখে তখন সন্ত্রাসই হয়ে থাকে তাদের পরবর্তী পদক্ষেপ। মক্কাবাসী রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে উত্ত্যক্ত করার জন্য এমন হীন আচরণ করেছে যে, তিনি ছাড়া আর কোন প্রচারক হলে সে যতই সাহসী ও উদ্যমী হোক না কেন, তার উৎসাহ-উদ্দীপনা নষ্ট হয়ে যেত এবং হতাশ হয়ে বসে পড়তো; কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ভদ্রতা ও গাম্ভীর্য সকল সহিংসতা উপেক্ষা করে সামনে এগিয়ে যাচ্ছিল।

একদিন মহানবী ﷺ মাসজিদুল হারামের অভ্যন্তরে কাবায় গেলেন এবং ঘোষণা দিলেন,

اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি মুহাম্মদ আল্লাহ্র বান্দা এবং রাসূল।" এটি কুরাইশ রীতিনীতির চরম অবমাননা হিসেবে বিবেচিত হয়। ফলে একটি বড় হাঙ্গামা তৈরি হল এবং অবিশ্বাসীরা মহানবী ﷺ-কে মারতে শুরু করল। হারিছ বিন আবি হালা যিনি একজন মুসলমান ছিলেন, মহানবী ﷺ-কে বাঁচানোর জন্য তার বাসা থেকে বের হয়ে আসেন, কিন্তু তিনি শহীদ হয়ে যান। ইসলামের ইতিহাসে এটিই প্রথম শাহাদাত। [১৪]

মহানবী ﷺ সত্যের দিকে আহ্বান করতে থাকলেন এবং কুরাইশদের ভ্রুকুঞ্চন আর হুমকি-ধমকের প্রতি গুরুত্ব দিলেন না। যখনি কোন সজ্জন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করত তাকে বিচারের (নির্যাতনের) সম্মুখীন হতে হতো। অত্যাচারীরা

---

[১৩] ইমাম বুখারী, আস সহীহ, প্রাগুক্ত, হাদীস নং : ৪৭৭০; ইমাম মুসলিম, *আস সহীহ*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং : ২০৮।

[১৪] শিবলী নুমানী, প্রাগুক্ত, পৃ: ২১১

www.pathagar.com

মহানবী ﷺ এবং তাঁর মুষ্টিমেয় অনুসারীদের ওপর অত্যাচারের সকল পদ্ধতি প্রয়োগ করল। তারা তাঁর পথে কাঁটা এবং আবর্জনা ফেলে রাখত, যখন তিনি মামাজ পড়তেন তাকে নিয়ে ঠাট্টা করত, তাঁর ব্যাপারে কবি, যাদুকর, পাগল ইত্যাদি বলে গুজব রটাতো। সকল প্রকার অত্যাচারের মুখোমুখি হবার পরও তিনি তাঁর লক্ষ্যে পাহাড়ের ন্যায় অবিচল ছিলেন।

যখন মহানবী ﷺ তাঁর লক্ষ্য হতে নিরস্ত হলেন না, তাকে সত্য পথের দাওয়াত থেকে বিরত রাখার জন্য মক্কার কুরাইশ নেতারা তাঁর চাচার নিকট প্রস্তাব রাখল। নেতৃবৃন্দের একদল প্রতিনিধি আবু তালিবের সাথে সাক্ষাত করে তাকে কঠোরভাবে হুঁশিয়ার করল, হয় সে তার ভাতিজাকে নিবৃত করবে অথবা যেন তিনি শোকের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। মক্কার নেতৃবৃন্দের সম্মিলিত শক্তি দেখে আবু তালিব মহানবী ﷺ-কে বললেন তাকে কোন প্রকার বিপদে না ফেলার জন্য। কিন্তু আল্লাহ্‌র প্রতি তার অবিচল আস্থা ছিল এবং অন্য কোন সাহায্য তিনি পছন্দ করেননি। তিনি বললেন, "প্রিয় চাচা! আমি কখনোই বিরত হব না, আমার ডান হাতে সূর্য এবং বাম হাতে চন্দ্র দেয়া হলেও আমি আমার কর্তব্য পালন করে যাব। হয়ত আল্লাহ্ আমাকে সফলতা দান করবেন অথবা এর জন্য আমি নিজেকে উৎসর্গ করব"।[১৫] আবু তালিবের সামনে মহানবী ﷺ কাঁদলেন। মহানবী ﷺ-এর কান্নাকাটি এবং তাঁর কথার তীব্রতা আবু তালিবের অন্তরে আঘাত করল এবং তিনি তাঁকে আশ্বস্ত করলেন, "ভাতিজা! (কান্নাকাটি করো না) তোমার দায়িত্ব পালন কর এবং তোমার যা খুশী প্রচার কর, কেউ তোমার কোন ক্ষতি করবে না"।

তাদের পরিকল্পনা ব্যর্থ হতে দেখে কুরাইশরা নতুন আরেকটি পরিকল্পনার ছক আঁকল। আরবের প্রসিদ্ধ কূটনীতিক উতবাহ বিন রাবিয়াকে তারা মহানবী ﷺ কে কৌশলে বাগে আনার জন্য পাঠালো। সে তাঁকে বলল, "ও মোহাম্মাদ! এলাকার মানুষজনকে বিরক্ত করো না। কুরাইশকে তাদের প্রাচীন পথে চলতে দাও বিনিময়ে তুমি যা চাবে তাই পাবে। যদি টাকা চাও তবে তোমার যা প্রয়োজন নিয়ে নাও, যদি সুন্দর স্ত্রী চাও আরবের সবচেয়ে সুন্দরতম কন্যাকে বেছে নাও আর যদি ক্ষমতা চাও- আমরা তোমাকে আমাদের সর্দার বানাবো।

---

[১৫] ইবনে হিশাম, প্রাগুক্ত, পৃ: ২৯৩; ইবনে জারীরুত তাবারী, প্রাগুক্ত, পৃ: ২৩৪; শিবলী নুমানী, প্রাগুক্ত, পৃ: ৩২৬; ইবনে খালদুন, প্রাগুক্ত, পৃ: ৭১৯; টীকাঃ তাবারানী, বাইহাকী এবং ইমাম বুখারী তারীখ গ্রন্থে একই ধরনের বর্ণনার উল্লেখ করেছেন যা হায়াতুস সাহাবা গ্রন্থের ১ম খন্ডের ২৪৩-২৪৪ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হয়েছে।]

www.pathagar.com

তোমার যা খুশী গ্রহণ কর; কিন্তু খোদার উসিলায় তোমার লক্ষ্য থেকে সরে এসো"।[১৬] প্রত্যুত্তরে মহানবী ﷺ পবিত্র কুরআনের কিছু আয়াত তিলাওয়াত করলেন,

قُلْ اِنَّمَآ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰٓى اِلَيَّ اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَاسْتَقِيْمُوْٓا اِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوْهُ ۗ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِيْنَ ۙ

"বল, 'আমি কেবল তোমাদের মত একজন মানুষ। আমার কাছে ওহী পাঠানো হয় যে, তোমাদের ইলাহ কেবলমাত্র এক ইলাহ। অতএব তোমরা তাঁর পথে দৃঢ়ভাবে অটল থাক এবং তাঁর কাছে ক্ষমা চাও'। আর মুশরিকদের জন্য ধ্বংস।"[১৭]

আল্লাহ্‌র পবিত্র কালাম শ্রবণে উতবার অন্তরের অবস্থা পরিবর্তন হয়ে গেল, ফিরে এসে সে কুরাইশদের বলল, "আল্লাহ্‌র কসম, এই শব্দগুলি কবিতা নয়। তাঁকে তাঁর পথেই ছেড়ে দাও। সে যদি সফল হয় তবে তা তোমাদেরই সম্মান, অন্যথায় তাঁর ব্যর্থতাই তাকে তার কর্তব্য থেকে নিবৃত করবে"। কিন্তু কুরাইশরা এই প্রস্তাবের সাথে একমত পোষণ করল না। সব কিছুতে ব্যর্থ হয়ে, কুরাইশরা তার এবং অন্যান্য মুসলমানদের ওপর দ্বিগুণ নির্যাতন শুরু করল। দাসদের মধ্যে থেকে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল তারা সবচেয়ে বেশী নির্যাতিত হল। এসব দেখে আবু বকর رضي الله عنه তাদের কয়েকজনকে কিনে মুক্ত করে দিলেন। এমনকি অবস্থাসম্পন্ন মুসলিমরাও ব্যক্তিগত জখম থেকে নিরাপদ ও নিরুদ্বেগ ছিলেন না। মহানবী ﷺ নিজেও সকল প্রকার অত্যাচারের সম্মুখীন হয়েছিলেন। তাঁর দিকে পাথর ছুঁড়ে মারা হয়েছিল, রাস্তার দুষ্টু ছেলেদের বিদ্রূপের শিকার হতে হয়েছিল। মহানবী ﷺ-এর সবচেয়ে বড় দুশমন আবু জেহেল নামাজে সেজদায় থাকা অবস্থায় তাঁর ঘাড়ে উটের নোংরা নাড়িভুঁড়ি ঢেলে দেয়। উতবাহ বিন আবু মুইত একপ্রস্থ কাপড় দিয়ে তাঁর গলা পেঁচিয়ে ধরে তাকে শ্বাসরোধ করে হত্যার চেষ্টা করেছিল। আবু জেহেল, আবু লাহাব, ওয়ালিদ বিন মুগীরাহ, উমাইয়া বিন খালফ এবং আ'স বিন ওয়ালী ছিলো মুসলমান এবং মহানবী ﷺ-কে নির্যাতনের প্রধান ব্যক্তিবর্গ।[১৮]

---

১৬ ইবনে হিশাম, প্রাগুক্ত, পৃ: ২৯৩-২৯৪; শিবলী নুমানী, প্রাগুক্ত, পৃ: ২২২; মুহাম্মদ হুসাইন হাইকল, হায়াতু মুহাম্মাদ (লাহোর : ১৯৫৫), পৃ: ৩৪১-৩৪৩।

১৭ আল কুরআন, ৪৬:৬।

১৮ ইযদুদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবনুল আছীর, *আল-কামিল ফিত-তারীখ* (বৈরুত : ১৩৮৫ হি), খ. ১২, পৃ: ৭০-৭৬

www.pathagar.com

রাজনৈতিক প্রতিহিংসায় মক্কায় কুরাইশদের নানামুখি নির্যাতন

মহানবী ﷺ-এর সহিত কুরাইশদের শত্রুতাপূর্ণ আচরণের পিছনে ধর্মীয় এবং সামাজিক কারণ ছাড়া রাজনৈতিক কারণও ছিল। কুরাইশরা ছিল আরব উপদ্বীপের অলিখিত নেতৃত্ব। পবিত্র মসজিদুল হারাম এবং মক্কায় আল্লাহ্‌র ঘর কাবার অবস্থানের কারণে সকল আরব গোত্র এবং বংশের মাঝে তাদের কেন্দ্রীয় অবস্থানে নিয়ে আসে। তাদেরকে সম্মানিত বিবেচনা করা হত, তারাই ছিল আল্লাহ্‌র ঘরের রক্ষক। নতুন ধর্ম গ্রহণ করা মানেই পূর্বের সকল প্রথা বিলুপ্ত করা। ফলে শত শত বছর ধরে আঁকড়ে ধরে থাকা তাদের এই গুরুত্বপূর্ণ পদ ছাড়তে হতো।

এছাড়াও, কুরাইশদের একটি শাখা 'বনু হাশিম' মহানবী ﷺ যে পরিবারের অন্তর্গত, আব্দুল মুত্তালিবের মৃত্যুর পর তারা কুরাইশদের মধ্যে তাদের নেতৃত্ব হারায়। এরপর অপর একটি পরিবার 'বনু উমাইয়া' যখন ক্ষমতায় আসে ঠিক তখনই নবী ﷺ অহী প্রাপ্ত হন এবং নবুওয়াত ঘোষণা করেন। দীর্ঘদিন ধরেই বনু হাশিম এবং বনু উমাইয়ার মধ্যে বৈরিভাব চলে আসছিল। মহানবী ﷺ-এর নবওুয়াত বনু উমাইয়ারা স্বীকার করে নিলে তারা তাদের শ্রেষ্ঠত্ব হারাবে। বনু উমাইয়াই নয়, কুরাইশদের দপ্তর প্রাপ্ত অন্যান্য গোত্রগুলিও সেসময় মহানবী ﷺ এর বিরোধিতা করে। বনু মখযুমের অন্তর্গত ওয়ালিদ বিন মুগীরার ভাতিজা আবু জেহেলের মন্তব্য এ ব্যাপারে স্পষ্ট চিত্র তুলে ধরে। যখন আখনাস বিন সারিক আবু জেহেলকে মহানবী ﷺ-এর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করল তখন সে বলল, "আমরা (বনু মাখযুম) এবং বনু আবদে মানাফ দীর্ঘদিন ধরে পরস্পরের প্রতিযোগী। তারা যদি বড় কোন ভোঁজ উৎসবের আয়োজন করে, আমরাও তা করি। তারা যদি (যুদ্ধে) হত্যা করে, আমরাও হত্যা করি, তারা যদি উদার হয় আমরা তাদের চেয়ে আরো বেশী উদার। কোন ক্ষেত্রেই আমরা তাদের পিছনে ছিলাম না। এখন হাশেমিদের একজন নবুওয়াত ঘোষণা করেছে এবং বলছে সে অহী লাভ করেছে। আমরা তার বিপরীতে এরকম কিছু করতে অক্ষম। আল্লাহ্‌র কসম! আমরা কখনোই এই নবীর প্রতি ঈমান আনবো না।"[১৯]

ওয়ালীদ ইবন আল-মুগীরা, আবু সুফিয়ান ইবন আল-হারব, উৎবাহ ইবন রাবিআ, আস ইবন ওয়াইল, আবু জাহল, আবু লাহাব, উবায় ইবন খালফ, নাদার ইবন আল-হারিছ, আখনাস ইবন সারীক, হারিছ ইবন আমির, আসওয়াদ ইবন আবদ ইয়াগূছ, উকবা ইবন আবী মুহীত প্রমুখ কুরাইশ নেতৃবৃন্দ মহানবী ﷺ-এর বিরোধিতায় সর্বাগ্রে ছিলেন, কেননা তারা দেখেছিল তাঁকে নবী

---

[১৯] ইবনে হিশাম, প্রাগুক্ত, পৃ: ৩১৬; শিবলী নুমানী, প্রাগুক্ত, পৃ: ২১৭।

www.pathagar.com

হিসেবে স্বীকার করলে তাদের তথাকথিত ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব হারাবে। জোসেফ হেল বলেন, "মক্কার কর্তৃত্বশীল পরিবারগুলির বিরোধিতা ইসলামের নতুন শিক্ষাগুলির বিরুদ্ধে যতটুকু না ছিল তার চেয়ে অনেক বেশী ছিল সামাজিক ও রাজনৈতিক বিপ্লবের বিরুদ্ধে যার অঙ্কুরোদগম তাদের দৃষ্টিগোচর হয়েছিল।[২০]

তারা নবীজির পথে নিয়মিতভাবে কাঁটা বিছাতো, তাঁর নামাজ পড়ার সময় ঠাট্টা ও হইচই করতো, সিজদার সময় তাঁর পিঠের উপর জবাই করা পশুর নাড়িভুঁড়ি নিক্ষেপ করতো, চাদর পেঁচিয়ে গলায় ফাঁস দিত, মহল্লার বালক-বালিকাদেরকে হাতে তালি দেয়া ও হৈ-হল্লা করে বেড়ানোর জন্য লেলিয়ে দিত এবং কুরআন পড়ার সময় তাঁকে, কুরআনকে এবং আল্লাহকে গালি দিত।

মক্কার ক্ষমতাবান লোকেরা তার শুধু বিরোধিতা করেই ক্ষান্ত হয়নি বরং তাঁকে এবং তাঁর অনুসারীদেরকে মানসিক, শারীরিকসহ অমানবিক নির্যাতন-নিপীড়ন আরম্ভ করল। মক্কাবাসীদের মধ্যে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়লো। তারা কোনোভাবেই তাঁকে মেনে নিতে পারেনি এবং তাঁকে মেনে নিতে সম্পূর্ণ অস্বীকৃতি জানাল। তা সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ ﷺ থমকে যাননি, তার মিশন চালিয়ে যেতে লাগলেন এবং ইসলামে দীক্ষিত নও মুসলমানদের শিক্ষা-দীক্ষা চালিয়ে যেতে থাকেন। গোপনে কোন কোন পরিবারের বাড়িতে গিয়েও তাদের তালীম-তারবিয়ত, শিক্ষা-প্রশিক্ষণ দিতেন। তালীম-তরবিয়ত ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এমন একটি জামাত গঠনে সক্ষম হলেন, যারা তাঁর মিশনের ধারক-বাহক হিসেবে তাঁর এ গুরু দায়িত্ব পালনে শরীক হলেন। এদের মত একটি জামাত পেয়ে তাঁর মনে আশার সঞ্চার হলো। ধীরে ধীরে তাঁরা এমন একটি জামাতে পরিণত হল, তাঁরা তাদের জীবনের সর্বস্ব ত্যাগ করতে এবং সব কিছুর ওপর একমাত্র দ্বীনকে প্রাধান্য দিতে নিজেদের সম্পূর্ণ প্রস্তুত করে নিলেন। তারা দৃঢ় ঈমান এবং প্রগাঢ় বিশ্বাসের অধিকারী ছিলেন। তাঁরা ধৈর্য ও সহনশীলতার যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন, তা পৃথিবীর ইতিহাসে ছিল একেবারেই বিরল।

একবার আবু জেহেল রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে পদপৃষ্ঠ করার অপকৌশল গ্রহণ করলো। আবু হুরাইরা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু জাহেল তার সাথীদের জিজ্ঞেস করল; 'মুহাম্মাদ কি তোমাদের সম্মুখে চেহারা মাটিতে মেশায়?' বলা হল, 'অবশ্যই, 'সে আমাদের সম্মুখে মাথা মাটিতে ঝুঁকায়।' এ কথা শুনে সে বলল, 'লাত এবং উযযার কসম করে বলছি, আমি যদি তাকে মাটিতে মাথা ঝোঁকানো অবস্থায় দেখতে পাই, তার গর্দানকে পদপৃষ্ঠ করব অথবা তার চেহারাকে ধুলা বালিতে মিশিয়ে দেব।' তারপর একবার রাসূলুল্লাহ

[২০] অধ্যাপক কে. আলী, A Study of Islamic History.

www.pathagar.com

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাত আদায় করতে ছিলেন। দেখতে পেয়ে আবু জাহেল তার গর্দান পদপৃষ্ঠ করার জন্য তার দিকে অগ্রসর হল। যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকটে এল, হঠাৎ সে পিছু হঠতে আরম্ভ করল এবং দু-হাত দিয়ে নিজেকে আত্মরক্ষা করতে আরম্ভ করল। তাকে জিজ্ঞেস করা হল, 'তোমার কি হয়েছে, তুমি এমন করছো কেন?' তখন সে উত্তর দিল, 'আমি আমার এবং তার মাঝে আগুনের একটি পরিখা দেখতে পাই এবং তাতে অসংখ্য ডানা দেখতে পাই।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

لَوْ دَنَا مِنِّى لَاخْتَطَفَتْهُ الْمَلَائِكَةُ عُضْوًا عُضْوًا۔

'যদি সে আমার কাছে আসতো, তাহলে ফেরেশতারা তাকে টুকরা টুকরা করে ফেলতো।'[২১]

এই দুর্বৃত্তই একবার নামাজের সময় তাঁর পিঠের উপর নাড়িভুঁড়ি নিক্ষেপ করেছিল। আব্দুল্লাহ বিন মাসুদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বায়তুল্লাহর পাশে নামাজ আদায় করছিলেন। আবু জাহেল এবং তার সঙ্গীরা এক সাথে বসা ছিল। বিগত দিন একটি উট জবেহ করা হয়েছিল। আবু জাহেল বলল, 'কে উটের ভুঁড়িটি নিয়ে আসবে এবং মুহাম্মাদ যখন সেজদা করবে তার পিঠের উপর রেখে দেবে।' তারপর তার দলের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট যে ব্যক্তি, সে উষ্ট্রের ভুঁড়িটি নিয়ে আসল এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেজদা করলে তার দুই কাঁধের উপর রেখে তারা হাসাহাসি করতে আরম্ভ করে। তারা হাসতে হাসতে একে অপরের গায়ে ঢলে পড়তো। আমি পুরো বিষয়টি দেখতে পেলাম, যদি কোন ক্ষমতা থাকতো তা হলে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পৃষ্ঠ হতে তা সরিয়ে নিতাম! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেজদায় পড়ে রইলেন। কোনভাবে মাথা উঠাতে পারছিলেন না। এক লোক রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় এ দৃশ্য দেখে ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা-কে সংবাদ দেন। তিনি খবর শোনামাত্র দৌড়ে আসেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাথা থেকে উটের ভুঁড়ি নামালেন। তারপর তাদের গালিগালাজ করতে লাগলেন। নামাজ শেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উচ্চ আওয়াজে তাদের জন্য বদদুআ করতে আরম্ভ করেন। আর তাঁর অভ্যাস ছিল, যখন দুআ করতেন, তিনবার দুআ করতেন। আবার যদি কোন কিছু চাইতেন, তিনবার চাইতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

اَللّٰهُمَّ، عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ

"হে আল্লাহ! তুমি কুরাইশদের শাস্তি দাও।"

---

[২১] ইমাম মুসলিম, *আস সহীহ*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং : ২৭৯৭

www.pathagar.com

তিনবার বলেন। যখন তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বদদুআর আওয়াজ শুনতে পেল, তাদের হাসি বন্ধ হয়ে গেল এবং তারা তার দুআকে ভয় করতে আরম্ভ করে। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের নাম ধরে ধরে বদদুআ করে বললেন, 'হে আল্লাহ তুমি আবু জাহেল ইবনে হিশামকে ধ্বংস কর, উতবা বিন রাবিয়াকে ধ্বংস কর, শাইবা বিন রাবিয়া, ওয়ালিদ বিন উতবা, উমাইয়া বিন খালফ, উকবা বিন আবি মুয়িতকে ধ্বংস কর।' এভাবে তিনি সাত জন ব্যক্তির নাম উল্লেখ করেন আমি সপ্তম ব্যক্তির নাম ভুলে যাই। আল্লাহর কসম করে বলছি, যিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সত্যের পয়গাম নিয়ে দুনিয়াতে প্রেরণ করেন, তিনি যাদের নাম নেন, তাদের সবাইকে বদর যুদ্ধের দিন অধঃমুখে হয়ে পড়ে থাকতে দেখি। তারপর তাদের বদর গর্তে নিক্ষেপ করা হল।[২২]

উক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়, কুরাইশরা তার পিঠে উটের নাড়ি-ভুড়ি চাপিয়ে দিলেও তিনি ধৈর্য ধারণ করেন এবং মহান আল্লাহর কাছে এর বিচার প্রার্থনা করেন। দীনের পথে দাওয়াতের কাজে রাসূলুল্লাহ ﷺ ঠাট্টা-তামাশা, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, মিথ্যাবাদী, অবমাননাকর উক্তি, শারীরিক নির্যাতন, মানসিক নির্যাতন ইত্যাদি পর্বতসম অত্যাচার সহ্য করেছেন।

অবাক ব্যাপার হচ্ছে যারা এ পথের হিমালয় পর্বত অতিক্রম করতে নেমেছে তারা পাহাড় অথবা উঁচু-নিচু পথ দেখে কি ভীত? না নির্যাতন কিংবা কারাবরণ তাদের দমাতে পারেনি, পারবেও না। তাদের লক্ষ্য তো নিজের মুক্তি, আর পরবর্তী প্রজন্মের জন্য বাসযোগ্য সুন্দর এক পৃথিবী।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কারাবরণ

ঠাট্টা-বিদ্রূপ, অত্যাচার-নির্যাতন, হত্যার হুমকী স্বত্ত্বেও দীনের পথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অবিচলতা, হামযা-উমরসহ নেতৃস্থানীয় নেতাদের ইসলাম গ্রহণ এবং বনূ হাশিম-বনু মুত্তালিব গোত্রের পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে রক্ষার ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্তে মক্কার কুরাইশরা হতবিহ্বল হয়ে পড়লো। তাই তারা অত্যাচার-নির্যাতনের প্রচলিত পন্থা পরিহার করে উৎপীড়নের এমন এক নতুন কৌশল অবলম্বন করল (কারাবরণ/বয়কট), যা ছিল এ পর্যন্ত পরিচালিত নির্যাতনের মধ্যে সব চাইতে লোম-হর্ষক ও অমানবিক।

পরিকল্পনা মোতাবেক মুশরিকরা 'মুহাসসাব' নামক উপত্যকায় খাইফে বনী কিনানার ভেতরে একত্রিত হয়ে সর্বসম্মতভাবে অঙ্গীকারাবদ্ধ হল যে, বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিবের সাথে ক্রয়-বিক্রয়, সামাজিক কার্যকলাপ, অর্থনৈতিক লেন-দেন, কুশল

---

[২২] ইমাম মুসলিম, *আস সহীহ*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং : ১৭৯৪

www.pathagar.com

বিনিময় ইত্যাদি সবকিছুই বন্ধ রাখা হবে। কেউ তাঁদের কন্যা বিয়ে করতে কিংবা তাঁদেরকে কন্যা দান করতে পারবে না। তাদের সঙ্গে ওঠা-বসা, কথোপকথন, মেলামেশা, বাড়িতে যাতায়াত ইত্যাদি কোনকিছুই করা যাবে না। হত্যার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে যতদিন তাদের হাতে তুলে দেয়া না হবে, ততদিন পর্যন্ত এই নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকবে।

মুশরিকরা এ বর্জন বা বয়কটের দলীল স্বরূপ একটি অঙ্গীকারনামা লিখে। সেখানে লেখা হল- তারা কখনোই বনু হাশিমের পক্ষ হতে কোন সন্ধিচুক্তির প্রস্তাব গ্রহণ করবে না। তাদের প্রতি কোন প্রকার ভদ্রতা বা শিষ্টাচার প্রদর্শন করবে না। যে পর্যন্ত তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ কে হত্যার জন্য তাদের হাতে তুলে না দেবে সে পর্যন্ত এই অঙ্গীকার নামা বলবৎ থাকবে।

ইবনে কাইয়িমের বর্ণনা সূত্রে বলা হয়েছে যে, এ অঙ্গীকারপত্রটি লিখেছিল মানসুর বিন ইকরামা বিন আমের বিন হাশিম। কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন যে, এ অঙ্গীকারনামা লিখেছিল নাযর বিন হারিস। কিন্তু সঠিক কথা হচ্ছে এই যে, এ অঙ্গীকার নামার সঠিক লেখক ছিল বোগায়েয বিন আমের বিন হাশিম। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার জন্য বদ দু'আ করেছিলেন। যার ফলে তার হাত পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে গিয়েছিল।[২৩]

অবিলম্বে এ অঙ্গীকার কার্যকর করা হল। অঙ্গীকার নামাটি কা'বার দেয়ালে ঝুলিয়ে দেয়া হল। যার ফলে আবু লাহাব ব্যতীত বনু হাশিম এবং বনু মুত্তালিবের মুসলিম-অমুসলিম সকলেই আতঙ্কিত হয়ে "শি'য়াবে আবি তালিব"- গিরি সংকটে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এ ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল নবুওয়তের সপ্তম বর্ষের মুহররম মাসের প্রথম চাঁদ রাতে। এই আটকাবস্থার মেয়াদ প্রায় তিন বছর দীর্ঘ হয়। সমগ্র বনু হাশেম গোত্র একমাত্র ইসলামী আন্দোলনের নেতার কারণে এহেন বন্দিদশায় নিক্ষিপ্ত হলো।

বয়কটের ফলে বনু হাশিম বনু মুত্তালিবের লোকদের অবস্থা খুব কঠিন ও সঙ্গীন হয়ে পড়ল। খাদ্য-শস্য এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী আমদানি ও পানীয় সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেল। কেননা, খাদ্য-শস্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী যা মক্কায় আসত, মুশরিকরা তা তাড়াহুড়া করে ক্রয় করে নিত। এ কারণে, গিরি-সংকটে অবরুদ্ধদের অবস্থা খুব করুণ হয়ে পড়ল। খাদ্যাভাবে তাঁরা গাছের পাতা, চামড়া ইত্যাদি খেতে বাধ্য হল। কোন কোন সময় তাঁদের উপবাসেও থাকতে হত। উপবাসের অবস্থা এরূপ ছিল যে ক্ষুধার তাড়নায় আদরের শিশু-সন্তানগুলো এবং মহিলাগণ অস্থির হয়ে যখন মর্মবিধারক গলায় কান্না করতে থাকত, তখন গিরি-সংকটের বাইরে থেকেও সে কান্নায় আওয়াজ শুনতে পাওয়া যেত।

---

২৩ শামস উদ্দিন মুহাম্মাদ ইবন আবদূল মালিক ইবন কায়্যিম জাওযী, যা'দুল মায়াদ, (মিশর, তা.বি), খ. ২, পৃ. ৪৬।

www.pathagar.com

হযরত খাদীজা রাদিআল্লাহু আনহা-এর ভাতিজা হাকীম বিন হিযাম কখনো কখনো তাঁর ফুফুর জন্য গম পাঠিয়ে দিতেন। একদিন আবু জাহলের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে গেলে সে খাদ্যশস্য নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে বাধা দিতে উদ্যত হল, কিন্তু আবুল বুখতারী এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করল এবং তাঁর ফুফুর নিকট খাদ্য প্রেরণে সাহায্য করল।

এদিকে আবু তালিব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ব্যাপারে সব সময় চিন্তিত থাকতেন। তাঁর নিরাপত্তা বিধানের কারণে লোকেরা যখন নিজ নিজ শয্যায় শয়ন করত, তখন তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে নিজ শয্যায় শয়ন করার জন্য পরামর্শ দিতেন। উদ্দেশ্য ছিল এই যে, কেউ যদি তাঁকে হত্যা করতে চায়, তাহলে সে দেখে নিক যে তিনি কোথায় শয়ন করেন। অতঃপর যখন লোকজনেরা ঘুমিয়ে পড়ত, তিনি তাঁর শয্যাস্থল পরিবর্তন করে দিতেন। নিজ-পুত্র, ভাই কিংবা ভাতিজাদের মধ্য থেকে একজনকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শয্যায় শয়ন করার জন্য পরামর্শ দিতেন। তাঁর শয্যায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শয়নের ব্যবস্থা করতেন।

এ অবরুদ্ধ অবস্থা সত্ত্বেও হজ্জের সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং অন্যান্য মুসলমানগণ গিরি-সংকট থেকে বাইরে বেরিয়ে আসতেন। হজ্জব্রত পালনে আগত ব্যক্তিগণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তঁদের নিকট ইসলামের দাওয়াত পেশ করতেন।[২৪]

তায়েফে দীনের দাওয়াত, নির্যাতন ও অত্যাচারীদের প্রতি মর্মস্পর্শী দুআ

আবু তালিবের মৃত্যুর পর দিন দিন ইসলামের বিরোধিতা বাড়তেই থাকল এবং ইসলামের শত্রুরা দ্বিগুণ উৎসাহে তাদের নির্যাতন শুরু করল। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরবের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর তায়েফকে দাওয়াতের নতুন ক্ষেত্র হিসেবে বেছে নেন।[২৫] যায়েদ বিন হারেসাকে সাথে নিয়ে একদিন তিনি মক্কা থেকে পায়ে হেঁটে রওয়ানা হন। পথ চলাকালে পথিমধ্যে যে গোত্রের নিকট তিনি উপস্থিত হতেন, তাদের নিকটই ইসলামের দাওয়াত পেশ করতেন। কিন্তু তাঁর এই আহ্বানে তাদের পক্ষ থেকে কেউ সাড়া দেয়নি।[২৬]

বিশ্বমানবের পরম সুহৃদ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তায়েফ পৌঁছে সর্বপ্রথম সাকিফ গোত্রের সরদারদের সাথে সাক্ষাৎ করলেন। তারা ছিল তিন ভাই– আবদ ইয়ালিল, মাসউদ ও হাবিব। তাদের প্রত্যেকের ঘরে কোরাইশ বংশোদ্ভূত বনু জামাহ গোত্রের এক একজন স্ত্রী ছিল। সে হিসেবে তিনি আশা করেছিলেন যে, তারা কিছুটা সৌজন্যপূর্ণ আচরণ করতে পারে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের কাছে গিয়ে

---

[২৪] আল্লামা সফিউর রহমান মুবারকপুরী, *আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ১৫৭*

[২৫] টীকা : তাইফ মক্কা থেকে প্রায় ৫০ মাইল দূরে।

[২৬] মাওলানা আকবর শাহ খান নাজীবাবাদী, তারীখে ইসলাম, (করাচী, ১৯৭০ হি.), খ. ১, পৃ. ১২২।

www.pathagar.com

বসলেন, তাদেরকে সর্বোত্তম ভাষায় আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিলেন, দাওয়াতের বিশদ ব্যাখ্যা দিয়ে আলোচনা করলেন এবং আল্লাহর সত্য দ্বীন প্রতিষ্ঠায় তাদের সাহায্য ও সহযোগিতা কামনা করলেন; কিন্তু এই তিন ব্যক্তি কেমন জবাব দিল দেখুন :

উত্তরে একজন বলেন : সে কা'বার পর্দা (আবরণ) ফেঁড়ে দেখাক যদি আল্লাহ তাঁকে রাসূলুল্লাহ করেছেন। দ্বিতীয় জন বললেন: "নবী করার জন্য আল্লাহ কি তোমাকে ছাড়া আর কাউকেও পাননি?" তৃতীয়জন বললেন: "তোমার সঙ্গে আমি কোনক্রমেই কথা বলব না। প্রকৃতই যদি তুমি নবী হও, তবে তোমার কথা প্রত্যাখ্যান করা আমার জন্য বিপজ্জনক। আর যদি তুমি আল্লাহর নামে মিথ্যা প্রচারে লিপ্ত হও, তবে তোমার সঙ্গে আমার কথা বলা সমীচীন নয়।"

এর প্রতিটি কথা রাসূলের ﷺ বুকে বিষমাখা তীরের মতো বিদ্ধ হতে লাগলো। তিনি পরম ধৈর্যসহকারে মর্মঘাতী কথাগুলো শুনলেন এবং তাদের কাছে সর্বক্ষেত্রে অনুরোধ রাখলেন যে, তোমরা তোমাদের এ কথাগুলোকে নিজেদের মধ্যেই সীমিত রাখ এবং জনসাধারণকে এসব কথা বলে উসকে দিও না।

কিন্তু তারা ঠিক এর উল্টোটাই করলো। তারা তাদের শহরের সবচেয়ে নিকৃষ্ট বখাটে তরুণদেরকে, চাকর-নফর ও গোলামদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পেছনে লেলিয়ে দিল এবং বলে দিল যে, যাও, এই লোকটাকে লোকালয় থেকে তাড়িয়ে দিয়ে এসো।' বখাটে যুবকদের এক বিরাট দল আগে-পিছে গালি দিতে দিতে, হইচই করতে করতে ও পাথর ছুঁড়ে মারতে মারতে চলতে লাগলো তারা তাঁর হাঁটু লক্ষ্য করে করে পাথর মারতে লাগলো, যাতে তিনি বেশি ব্যথা পান। পাথরের আঘাতে আঘাতে এক একবার তিনি অচল হয়ে বসে পড়ছিলেন; কিন্তু তারা তার বাহু টেনে ধরে দাঁড় করাচ্ছিল এবং পুনরায় হাঁটুতে পাথর মেরে হাতে তালি দিয়ে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ছিল। তারা হাততালি, অশ্রাব্য-অশ্লীল কথাবার্তা বলে তাঁকে গাল মন্দ দিতে ও পাথর ছুঁড়ে আঘাত করতে থাকল। আঘাতের ফলে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পায়ের গোড়ালীতে ক্ষতের সৃষ্টি হয়ে জুতা রক্তাক্ত হয়ে গেল।

আঘাতে আঘাতে জর্জরিত রক্তাক্ত শরীর নিয়ে পথ চলতে গিয়ে নবী করীম ﷺ খুবই ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়েন। শেষ পর্যন্ত এক আঙ্গুর বাগানে আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য হন। বাগানটি ছিল রাবী'আর পুত্র উতবা ও শায়বার। তিনি বাগানে প্রবেশ করলে দুরাচার তায়েফবাসীরা ফিরে যায়।

এ বাগানটি তায়েফ থেকে তিন মাইল দূরে অবস্থিত। বাগানের ভেতরে প্রবেশ করে নবী করীম ﷺ আঙ্গুর গাছের ছায়ায় এক দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে পড়লেন।

www.pathagar.com

কিছুক্ষণ বিশ্রাম করার ফলে কিছুটা সুস্থতা লাভের পর নবী করীম ﷺ আল্লাহ তা'আলার দরবারে হাত তুলে দু'আ করলেন। তাঁর এই দু'আ দুর্বলদের দু'আ নামে প্রসিদ্ধ। তাঁর এক একটি কথা থেকে এটা সহজেই বোঝা করা যায় যে, তায়েফবাসীদের দুর্ব্যবহারে তিনি কতটা ক্ষুব্ধ এবং তারা ঈমান না আনার কারণে তিনি কতটা ব্যথিত হয়েছিলেন। তিনি দু'আ করলেন-

اَللّٰهُمَّ اِلَيْكَ اَشْكُو ضَعْفَ قُوَّتِي، وَقِلَّةَ حِيلَتِي، وَهَوَانِي عَلَى النَّاسِ اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، اَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اِلَى مَنْ تَكِلُنِي؟، اِلَى عَدُوٍّ يَتَجَهَّمُنِي، اَمْ اِلَى قَرِيبٍ مَلَّكْتَهُ اَمْرِي، اِنْ لَمْ تَكُنْ غَضْبَانًا عَلَيَّ، فَلَا اُبَالِي، اِنَّ عَافِيَتَكَ اَوْسَعُ لِي، اَعُوذُ بِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي اَشْرَقَتْ لَهُ الظُّلُمَاتُ، وَصَلَحَ عَلَيْهِ اَمْرُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اَنْ تُنْزِلَ بِي غَضَبَكَ، اَوْ تُحِلَّ عَلَيَّ سَخَطَكَ، لَكَ الْعُتْبَى حَتَّى تَرْضَى، لَا قُوَّةَ اِلَّا بِكَ۔

"হে আল্লাহ! আমি আমার দুর্বলতা, সম্বলহীনতা ও জনগণের সামনে অসহায়ত্ব সম্পর্কে কেবল তোমারই কাছে ফরিয়াদ জানাই। আপনি পরম করুণাময়, অতিশয় দয়ালু। আপনি আমাকে কার কাছে সঁপে দিতে চাইছেন? আমার প্রতি, বিদ্বেষপরায়ণ প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে, নাকি শক্রর কাছে? তবে তুমি যদি আমার ওপর অসন্তুষ্ট না থাক, তাহলে আমি কোন কিছুর পরোয়া করি না; কিন্তু তোমার পক্ষ থেকে শান্তি ও নিরাপত্তা পেলে সেটাই আমার জন্য অধিকতর প্রশান্তি। আমি তোমার কোপানলে অথবা আজাবে পতিত হওয়ার আশঙ্কা থেকে তোমার সেই জ্যোতি ও সৌন্দর্যের আশ্রয় কামনা করি, যার কল্যাণে সকল অন্ধকার দূরীভূত হয় এবং দুনিয়া ও আখেরাতের সকল সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। তোমার সন্তোষ ছাড়া আমি আর কিছু কামনা করি না। তোমার কাছ থেকে ছাড়া আর কোথাও থেকে কোন শক্তি পাওয়া সম্ভব নয়।"[২৭]

তায়েফে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যে দুরবস্থা হয়েছিল, ইতিহাসের ভাষা আমাদেরকে তার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দিতে পারেনি। একবার হযরত আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা জিজ্ঞেস করেছিলেন, "হে রাসূলুল্লাহ ﷺ, আপনি কি ওহুদের চেয়েও কঠিন দিনের সম্মুখীন কখনো হয়েছেন?" তিনি জবাব দিলেন : "তোমার জাতি আমাকে আর যত কষ্টই দিয়ে থাকুক, আমার জন্য সবচেয়ে কষ্টকর দিন ছিল তায়েফে যেদিন আমি আবদ ইয়ালিলের কাছে দাওয়াত দিলাম। সে তা

---

[২৭] মুজামূল কাবীর আত তাবারানী, হাদীস নং : ১৮১

www.pathagar.com

প্রত্যাখ্যান করলো এবং এত কষ্ট দিল যে, অতি কষ্টে কারনুস সায়ালেব নামক জায়গায় পৌঁছে কোন রকমে রক্ষা পেলাম।"[২৮]

এই সফরকালেই জিবরাইল (আ) এসে বলেন, পাহাড়সমূহের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতারা আপনার কাছে উপস্থিত। আপনি ইঙ্গিত করলেই তারা ঐ পাহাড় দুটিকে এক সাথে যুক্ত করে দেবে, যার মাঝখানে মক্কা ও তায়েফ অবস্থিত। এতে উভয় শহর পিষ্ট ও ধ্বংস হয়ে যাবে; কিন্তু মানবতার বন্ধু মহান নবী এতে সম্মত হননি।

এই ঘটনা মহানবী ﷺ এর মহান চরিত্র এবং ক্ষমাশীলতার স্বাক্ষরই শুধু নয়, ইসলাম প্রচারের প্রতি তাঁর আন্তরিক আকুতি এবং আল্লাহ্‌র প্রতি তাঁর অবিচল আস্থার সাক্ষ্য বহন করে। সকল বিরোধীদের বিপরীতে তিনি ছিলেন একজন; কিন্তু তারপরও তায়েফের অধিবাসীদের আল্লাহ্‌র পথে দাওয়াত দেয়ার দায়িত্ব থেকে তিনি পিছু হটেননি।[২৯]

রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে হত্যার ষড়যন্ত্র ও মদীনায় হিজরত

সাহাবা কিরাম (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম) নিজ নিজ ধন-সম্পদ ও স্ত্রী-পুত্র কন্যাদেরকে সঙ্গে নিয়ে যখন আউস ও খাযরাজ গোত্রের আবাসিক এলাকায় গিয়ে উপস্থিত হলেন, তখন মুশরিকদের মধ্যে একটা হৈচৈ পড়ে গেল। চরম দুশ্চিন্তা ও মানসিক যন্ত্রণায় তারা এতই অস্থির হয়ে পড়ল যে, ইতোপূর্বে কোন কারণেই তাদের মধ্যে এত বেশি অস্থিরতা দেখা যায়নি। হিজরতের এই ব্যাপারটি ছিল তাদের মূর্তিপূজা, সামাজিক ঐক্যবোধ এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্য এক বিরাট চ্যালেঞ্জ স্বরূপ। তারা বুঝতে পারলো যে, হিজরতকারী মুসলমানদের মদীনায় আগমনের ফলে ইসলামী দাওয়াতের ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হবে এবং মদীনাবাসীগণকে মক্কাবাসীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অংশগ্রহণ করাতে তাঁরা সক্ষম হবেন। আর তা হবে মক্কাবাসীদের জন্য একটি মহা বিপজ্জনক ব্যাপার। মুশরিকরা উদ্ভূত পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন ছিল। কাজেই তারা এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করার জন্য তৎপর হয়ে উঠল। এটাও তাদের জানা ছিল যে, এই বিপদের মূলসূত্র হচ্ছে ইসলামের দাওয়াত, যার পতাকাবাহী হচ্ছেন হযরত মুহাম্মদ ﷺ। তাই তারা 'মক্কার সংসদ' বলে পরিচিত 'দারুন নাদওয়াতে' কুরাইশ-মুশরিকগণ ইতিহাসের সবচাইতে ভয়াবহ নিকৃষ্ট অধিবেশন অনুষ্ঠিত করে। এতে সকল কুরাইশ গোত্রের নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহণ করে। এর আলোচ্য

---

২৮ মুহাম্মাদ ইবন আবদাল বাকী আল-যুরকানী, *শারহুল মাওয়াহিবুল লাদুননিয়া* (মিশর, ১৩২৭ হি), খ. ১, পৃ. ৫৬।

২৯ মুহাম্মদ আলহাজ্ব সালমিন, The Holy Prophet Muhammad, পৃ: ৮৮।

www.pathagar.com

বিষয় ছিল এমন এক অকাট্য পরিকল্পনা তৈরি করা যাতে যত শীঘ্র সম্ভব ইসলামী দাওয়াতের পতাকাবাহী নবী মুহাম্মদ ﷺ-কে হত্যার মাধ্যমে ইসলামের অস্তিত্বকে সম্পূর্ণ মুছে ফেলা। অবশেষে আবু জেহেল প্রস্তাব করলো– "প্রত্যেক গোত্র থেকে একজন করে সুঠাম দেহী ও শক্তিশালী যুবক নির্বাচন করা হোক এবং প্রত্যেককে একটি করে ধারালো তরবারি দেয়া হোক। অতঃপর সকলেই তার দিকে অগ্রসর হোক এবং সকলেই এক সঙ্গে তলোয়ার মেরে তাঁকে হত্যা করুক। (না'উযুবিল্লাহ) তাহলেই আমরা তাঁর হাত থেকে নিস্তার পেয়ে যাব। আর এভাবে হত্যা করার ফল হবে এই যে, রক্তপাতের দায়িত্বটা সকল গোত্রের ওপর সমানভাবে ছড়িয়ে পড়বে। এর একটি বিশেষ সুবিধা হবে এই যে, বনূ আবদে মানাফ সকলের সঙ্গে যুদ্ধ করতে সক্ষম হবে না। ফলে (একটি খুনের বদলে একশত উট প্রদান) দিয়াত গ্রহণে রাজী হয়ে যাবে এবং আমরা তা আদায় করে দেব।"[৩০]

মক্কার সংসদ এমনিভাবে এক কাপুরুষোচিত, ঘৃণ্য ও জঘন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণের মধ্য দিয়ে সেদিনের মত মূলতবি হয়ে গেল। আর সদস্যগণ এ সিদ্ধান্ত ত্বড়িৎ বাস্তবায়নে সংকল্পবদ্ধ হয়ে নিজ নিজ ঘরে ফিরে গেল।

যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে হত্যার পাপময়, ঘৃণ্য ও জঘন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ে গেল, তখন হযরত জিবরাঈল (আ) মহান প্রভুর তরফ থেকে বাণী নিয়ে তাঁর সামনে উপস্থিত হলেন। জিবরাঈল (আ) তাঁকে কুরাইশ-মুশরিকদের ষড়যন্ত্রের কথা জানালেন। তিনি বললেন: "আপনার প্রভু পরওয়ারদিগার মক্কা থেকে হিজরত করার অনুমতি প্রদান করেছেন। আপনি এ যাবৎ যে শয্যায় শয়ন করে এসেছেন আজ রাতে সে শয্যায় শয়ন করবেন না।" এ কথার মাধ্যমে হিজরত করার সময় নির্ধারণ করে দেয়া হল।[৩১]

যাহোক, জঘন্যতম এই পাপকর্ম অনুষ্ঠানের নির্ধারিত সময় ছিল রাত দুপুরের পরক্ষণ। এজন্য তারা রাত জেগে সময় কাটাচ্ছিল এবং নির্ধারিত সময়ের জন্য অতন্দ্র প্রহরীর ন্যায় পাহারায় রত ছিল। কিন্তু আল্লাহর ব্যবস্থাই হচ্ছে চূড়ান্ত এবং তাঁর বিজয়ই হচ্ছে প্রকৃত বিজয়। তারই একক ইখতিয়ার রয়েছে আসমান ও জমিনের একচ্ছত্র আধিপত্য। তিনি যা চান তা-ই করেন। তিনি যাঁকে বাঁচাতে চান কেউ তাঁর কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারে না। আবার তিনি যাকে পাকড়াও করতে চান পৃথিবীর কোন শক্তিই তাকে রক্ষা করতে পারে না। এ প্রসঙ্গে নিচের আয়াতে কারীমায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে-

---

৩০ ইবনে হিশাম, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড. ৪৮০-৪৮২ পৃ.।

৩১ যাদুল মা'আদ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড. ৫২ পৃ।

www.pathagar.com

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔

"ঐ সময়কে স্মরণ করুন, যখন কাফিররা আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছিল, এ জন্য যে, আপনাকে বন্দি করবে, অথবা হত্যা করবে অথবা বিতাড়িত করবে। আর তারা নিজেদের মধ্যে কৌশল করছিল এবং আল্লাহ তা'আলাও আপন কৌশল করছিলেন। আর আল্লাহ্ হচ্ছেন সর্বাধিক উত্তম কৌশলী।"[৩২]

কুরাইশ-মুশরিকগণ তাদের দুরভিসন্ধি বাস্তবায়নের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েও চরমভাবে ব্যর্থ হয়ে গেল। উন্মত্ত জিঘাংসু শত্রু পরিবেষ্টিত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে বললেন: "তুমি আমার এই সবুজ হাযরামী[৩৩] চাদর গায়ে দিয়ে আমার বিছানায় ঘুমিয়ে থাক। তারা তোমার ক্ষতি করতে পারবে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ এ চাদর গায়ে দিয়েই শুয়ে থাকতেন।"[৩৪]

অতঃপর নবী করীম ﷺ ঘরের বাইরে গমন করলেন এবং মুশরিকদের কাতার ফেড়ে এক মুষ্টি কংকরযুক্ত মাটি নিয়ে তাদের মাথার উপর ছড়িয়ে দিলেন। এর মাধ্যমে আল্লাহ তাদের দৃষ্টি ধরে রাখলেন, যার ফলে তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আর দেখতে পেল না। এ সময় তিনি এই আয়াতে করীমাটি পাঠ করছিলেন-

وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَّمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ

"আমি তাদের সামনে প্রতিবন্ধকতা দাঁড় করালাম এবং তাদের পিছনে প্রতিবন্ধকতা দাঁড় করালাম। অতঃপর আমি তাদের আচ্ছন্ন করে ফেললাম এবং তারা দেখতে পেল না।"[৩৫]

এ সময় এমন কোন মুশরিক বাকি ছিল না, যার মাথায় তিনি মাটি নিক্ষেপ করেননি। এরপর তিনি হযরত আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর ঘরে গমন করলেন এবং দ্রুততম সময়ের মধ্যেই তাকে সঙ্গে নিয়ে ইয়ামেন অভিমুখে যাত্রা করলেন। অতঃপর রাতের অন্ধকার থাকতেই তাঁরা মক্কা থেকে কয়েক মাইল দূরত্বে সাওর নামক পর্বত গুহায় গিয়ে পৌঁছলেন।[৩৬]

অবশেষে তিন দিন গুহায় থাকার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলেন এবং নিজ মাতৃভূমি ছেড়ে দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে মদীনায় হিজরত করেন।

---

৩২ আল-কুরআন ৮ : ৩০

৩৩ হাযমারাউতের (দক্ষিণ ইয়েমেনের) তৈরি চাদরকে হাযরামী চাদর বলা হয়।

৩৪ ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড. ৪৮২ ও ৪৮৩ পৃ.।

৩৫ আল-কুরআন ৩৬:৯

৩৬ ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড. ৪৮৩ পৃ.। যাদুল মা'আদ, ২য় খণ্ড. ৫২ পৃ.।

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুখমণ্ডল ক্ষতবিক্ষত এবং দাঁনদান মুবারক শহীদ

মক্কার মুশরিকদের বদর যুদ্ধে শোচনীয় পরাজয় ও অপমানের যে গ্লানি এবং তাদের অভিজাত ও নেতৃস্থানীয় লোকদের হত্যার যে দুঃখভার বহন করতে হয়েছিল, তারই কারণে তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্রোধ ও প্রতিহিংসার আগুনে পুড়ছিল। তাই তারা ইসলাম ও মহানবীকে নিশ্চিহ্ন করতে উহুদ প্রান্তরে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। উহুদের পথে অগ্রসর হওয়ার কালে মুনাফিকদের নেতা আব্দুল্লাহ ইবন উবাই মুসলমানদের বাহিনী থেকে সরে পড়ে এবং এর ফলে মুসলিম বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা মাত্র ৭০০-এ দাঁড়ায়।[৩৭] তবুও অল্প সংখ্যক সৈন্য নিয়ে মহান আল্লাহর উপর ভরসা করে তিনি দীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যুদ্ধে অগ্রসর হন। এ যুদ্ধে দ্বীন প্রতিষ্ঠার মহান সংগ্রামে রাসূলুল্লাহ ﷺ রক্ত ঝরালেন। তার মুখমণ্ডল ক্ষত-বিক্ষত হয় এবং তাঁর দাঁত শহীদ হয়। সাহল বিন সাআদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তাকে প্রশ্ন করা হল, উহুদ দিবসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আহত হওয়া সম্পর্কে। তিনি বললেন,

تَغْسِلُ الدَّمَ وَعَلِيٌّ يُمْسِكُ، فَلَمَّا رَأَتْ أَنَّ الدَّمَ لَا يَزِيدُ إِلَّا كَثْرَةً، أَخَذَتْ حَصِيرًا فَأَحْرَقَتْهُ حَتَّى صَارَ رَمَادًا، ثُمَّ أَلْزَقَتْهُ فَاسْتَمْسَكَ الدَّمُ.

'তার মুখমণ্ডল আহত হল এবং তার দাঁতগুলো ভেঙ্গে গেল। বর্মের ভাঙ্গা অংশ তার মাথায় প্রবেশ করল। ফাতেমা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) রক্ত পরিষ্কার করছিলেন এবং আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) রক্ত বন্ধ করার চেষ্টা করছিলেন। যখন দেখলেন রক্ত বন্ধ না হয়ে আরো বেশি পরিমাণে বের হচ্ছে তখন ফাতিমা চাটাইতে আগুন ধরিয়ে দিলেন, পুড়ে ছাই হয়ে গেল। অতঃপর তা ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দিলেন, তখনই রক্ত বন্ধ হয়ে গেল।[৩৮]

আর রাসূলুল্লাহ ﷺ এ কঠিন কষ্ট বরদাশত করছিলেন। তিনি এমন এক নবী, যিনি এ অবস্থায়ও তার জাতির বিরুদ্ধে বদ-দুআ করেননি বরং তাদের জন্য ক্ষমার দু'আ করেছেন। কেননা তারা বুঝে না। কারণ তিনি ছিলেন রাহমাতাল্লিল আলামীন।

---

[৩৭] ইবন সাদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯; ইবনুল জারীরুত-তাবারী, ঐ পৃ. ৫০৪; ইবন খালদূন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬২; মুহাম্মাদ যুরকানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬।

[৩৮] ইমাম বুখারী, আস সহীহ, প্রাগুক্ত, হাদীস নং : ২৯১১।

www.pathagar.com

রাসূল ﷺ-এর বিরুদ্ধে নোংরা অপপ্রচার

গোপন সলাপরামর্শ, গুজব রটনা, কানাঘুষা ও ফিসফিসানির এই পরিবেশে ইসলামী আন্দোলনের প্রধানতম নেতার ব্যক্তিত্ব শুরু থেকেই আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছিলেন এবং একের পর এক আক্রমণ চালানোও হচ্ছিল। সত্যের নিশানবাহী মাত্রেরই আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার ওপর একটা না একটা স্বার্থের কালিমা লেপনের জন্য বিরোধীরা প্রত্যেক যুগেই অপবাদ আরোপ করে থাকে যে, উনি একজন পদলোভী ব্যক্তি। উনি একটা বড় কিছু হতে চান। হযরত মূসা ও হারূনের বিরুদ্ধে এই অভিযোগই তোলা হয়েছিল যে, তাঁরা রাষ্ট্রীয় গদি দখল করতে চান। হযরত ঈসার বিরুদ্ধে কুৎসা রটানো হয় যে, উনি ইহুদিদের বাদশাহ হতে চান। নাজরানের প্রতিনিধি দল যখন এলো, তখন ইহুদিরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওপর অপবাদ আরোপ করলো যে, ঈসা (আ.)-এর যে মর্যাদা ছিল, সেটা দখল করার জন্যই উনি এত মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলছেন। উনি চান খ্রিস্টানরা ও অন্যরা তাঁর পূজা করতে লেগে যাক। লক্ষ্য করুন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো এ ধরনের কোন দাবীই করেননি। এ ধরনের কোন গদি বা পদ লাভের ইচ্ছার আভাসও দেননি। অথচ বিরোধীদের উর্বর মস্তিষ্ক থেকে এমন কাল্পনিক অভিযোগ গড়া হলো এবং আবিষ্কার করা হলো যে, মুহাম্মদ ﷺ-এর উদ্দেশ্য এটাই হবে যে, ঈসা (আ.)-এর মত নিজের পূজা করাবেন। মুখে দাবী করেননি, তাতে কী? তাঁর অন্তরে নিশ্চয়ই এই দাবী রয়েছে।

এক পর্যায়ে ক্ষমতার মোহ এবং স্বার্থপরতার জঘন্য অপবাদ আরোপ করা হয় রাসূল ﷺ-এর বিরুদ্ধে। এরপর অপপ্রচারণার এই ধারা আরো সামনে অগ্রর হয় এবং ইসলামী আন্দোলনের সর্বোচ্চ নেতার পরিবারকে লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা হয়। আর এই পরিবারের কেন্দ্রের ওপর আঘাত হানাই ছিল ঐ অবকাঠামোকে ধ্বংস করার সবচেয়ে কার্যকর উপায়। শেষ পর্যন্ত নাশকতাবাদী শক্তি এই শেষ আঘাতটা হানতেও দ্বিধা করলো না। এই বৈরী আঘাতের মর্মন্তুদ কাহিনী কোরআন, হাদীস, ইতিহাস ও সীরাতের গ্রন্থাবলীতে "ইফকের ঘটনা" তথা "হযরত আয়েশার বিরুদ্ধে অপবাদের কাহিনী" নামে শিক্ষা গ্রহণের জন্য সংরক্ষিত রয়েছে।

নৈতিক ব্যবস্থার এই নমনীয়তা ও উদারতা থেকে মোনাফেকরা পুরোপুরিভাবে উপকৃত হয়েছে এবং এর সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেছে; কিন্তু পরিণামে তারা এর প্রবল শক্তির পাকড়াও থেকে বাঁচতে পারেনি। কোরআনের ভাষায় তাদের সমগ্র কর্মকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত সার ছিল এই: "তারা যা চেয়েছিল, তা পায়নি।"

বনু মুস্তালিক অভিযান শেষে মদীনা ফেরার পথে এক জায়গায় তাবু স্থাপন করা

www.pathagar.com

হয়। তাবুতে থাকা অবস্থায় হযরত ‘আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা নিজ প্রাকৃতিক প্রয়োজনে তাবুর বাইরে গমন করেন। সেখানে তিনি তার হার হারিয়ে ফেলেন। হারানো হারটি পাওয়ার পর মা ‘আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা তাবুতে ফিরে এসে দেখলেন যে, পুরো বাহিনী ইতোমধ্যে সে স্থান পরিত্যাগ করে এগিয়ে গিয়েছেন। তাই তিনি সে স্থানে ঘুমিয়ে পড়েন। অতঃপর সাফওয়ান বিন মোয়াত্তাল-এর কণ্ঠস্বর শুনে তিনি জাগ্রত হন। তিনি বলছিলেন, “ইন্না-লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন- রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রী?” অতঃপর ‘ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না-ইলাইহি রাজিউন’ পাঠরত অবস্থায় তিনি আপন সাওয়ারীকে উম্মুল মু'মিনীনের রাদিআল্লাহু আনহা নিকট বসিয়ে দিলেন। হযরত ‘আয়েশা সাওয়ারীর ওপর আরোহণ করার পর তিনি তার লাগাম ধরে টানতে টানতে হাঁটতে থাকলেন। সর্বক্ষণ মুখে উচ্চারণ করতে থাকলেন ইন্না লিল্লাহি........। সাফওয়ান ইন্নালিল্লাহ ছাড়া অন্য কোন বাক্য উচ্চারণ করেননি।

অসৎ প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির লোকেরা এটাকে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে চিন্তা করতে থাকল নানাভাবে। বিশেষ করে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুশমন অপবিত্র খবিশ আব্দুল্লাহ বিন উবাই এটিকে পেয়ে বসল তার অপ প্রচারের একটি মোক্ষম হাতিয়ার হিসেবে। সে তার অন্তরে কপটতা, হিংসা ও বিদ্বেষের যে আগুন জ্বালিয়ে রেখেছিল এই ঘটনা তাকে ঘৃতাহুতির ন্যায় আরো বেশি প্রভাবিত ও প্রজ্বলিত করে তুলল। সে এই সামান্য ঘটনাটিকে তার স্বকপোলকল্পিত নানা আকারে প্রচার এবং রঙচঙে চিত্রিত ও রঞ্জিত করে ব্যাপকভাবে অপ প্রচার শুরু করে দিল।

অবশেষে এ ঘটনা সম্পর্কে রাসূলে কারীমের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওপর অহী নাযিল আরম্ভ হয়। যখন হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওপর অহী নাযিলের কঠিন অবস্থা অতিক্রান্ত হল, তখন তিনি মৃদু মৃদু হাসছিলেন। এ সময় তিনি প্রথম যে কথাটি বলেছিলেন তা হচ্ছে, “হে আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা! আল্লাহ তা'আলা তোমাকে অপবাদ থেকে মুক্তি দিয়েছেন।”

এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে মিথ্যা অপবাদ সম্পর্কিত যে আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়, তা ছিল সূরা নূরের দশটি আয়াত। যা إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ হতে আরম্ভ হয়েছে।

এরপর মিথ্যা অপবাদের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের অপরাধের দায়ে মিস্তাহ্ বিন আসাসা, হাস্‌সান বিন সাবিত এবং হানা বিনতে জাহশকে আশি (৮০) দোররা কার্যকর করা হয়।[৩৯] তবে দুরাচার খবিশ আব্দুল্লাহ বিন উবাই এ শাস্তি থেকে

[৩৯] ইসলামী শরী'আতে এরূপ বিধান আছে যে, কোন ব্যক্তি যদি অন্য কোন ব্যক্তিকে ব্যভিচারের অপবাদ দেয় অথচ প্রমাণ পেশ করতে সক্ষম না হয়, তাহলে তাকে আশি কোড়া মারতে হবে।

www.pathagar.com

রেহাই পেয়ে যায়। অথচ অপবাদ রটানোর কাজে জড়িত জঘন্য ব্যক্তিদের মধ্যে সেই ছিল প্রথম নম্বরে এবং এ ব্যাপারে সব চাইতে অগ্রগামী ভূমিকা ছিল তারই। তাকে শাস্তি না দেয়ার কারণ হয়তো এটাই ছিল যে, আল্লাহ তা'আলা পরকালে তাকে শাস্তি দেয়ার ঘোষণা দিয়েছিলেন।[৪০]

আন্দোলনের অভ্যন্তরে বিভ্রান্তি সৃষ্টি

দুর্ভাগ্যবশত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত আন্দোলনের ভেতরে ইহুদিদের নেতৃত্বে মোনাফেকরা এই ফিসফিসানি পরিবেশ সৃষ্টি করে এবং তা আন্দোলনের নেতা ও কর্মীদের অনবরতই বিব্রত করতে থাকে। যারা এই পরিবেশ সৃষ্টি করছিল, কোরআন তাদেরকেও সংশোধন করতে থাকে। আর ইসলামী সংগঠনের পরিচালকদেরকেও সতর্ক করতে থাকে। কোরআন বলে:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ ۚ

"তোমরা দেখতে পাওনা, যাদেরকে গোপন সলাপরামর্শ থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছিল, তারা আবারো সেই নিষিদ্ধ কাজের পুনরাবৃত্তি করছে। তারা পরস্পরে অপকর্ম, অহংকার ও রাসূলের বিরুদ্ধাচরণের ব্যাপারে গোপন পরামর্শে লিপ্ত থাকে।"[৪১]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ـ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখনই পৃথকভাবে পরস্পর পরামর্শ কর তখন অসৎ কাজ, অহংকার ও রাসূলের অবাধ্যতার পরিকল্পনা করো না; বরং সততা ও খোদাভীতির জন্য পরামর্শ কর।"[৪২]

إِنَّمَا النَّجْوَىٰ مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ـ

"ফিসফিসানি মুমিনদেরকে উত্যক্ত করার জন্য পরিচালিত শয়তানী কাজ। অবশ্য আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোন জিনিসই তাদের ক্ষতি করতে পারে না।"[৪৩]

---

৪০ সহীহ বুখারী, খ. ১, পৃ. ৩৬৪; যা'দুল মা'আদ, খ. ২, পৃ. ১১৩-১১৫; ইবনে হিশাম, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৯৭-৩০০।

৪১ সূরা মুজাদালা-৮

৪২ সূরা মুজাদালা-৯

www.pathagar.com

ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান (রাসুল ﷺ)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র

সত্যের আহ্বান যখন আন্দোলনে পরিণত হয়, তখন তার বৈরী শক্তিগুলো অন্যায় বিরোধিতা করতে গিয়ে ক্রমাগত হীনতা ও নীচতার দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। শেষ পর্যন্ত তারা যখন মূল দাওয়াতের বিরুদ্ধে যুক্তিতেও হেরে যায় এবং বিভ্রান্তি সৃষ্টি ও সহিংসতার অভিযান চালিয়েও ব্যর্থ হয়, তখন তাদের আজন্ম লালিত ঘৃণা-বিদ্বেষ তাদের মধ্যে অপরাধপ্রবণ খুনী ও ডাকাতসুলভ মানসিকতা সৃষ্টি করে দেয়। এই পর্যায়ে এসে তারা ইসলামী আন্দোলনের নেতা মদীনায় প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্র প্রধানকে হত্যা করতে উদ্যত হয়।

হিজরী চতুর্থ সালের কথা। আমর বিন উমাইয়া যামরী আমের গোত্রের দুই ব্যক্তিকে হত্যা করলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ এই হত্যাকাণ্ডের দিয়ত আদায় করা ও শান্তি চুক্তির দায়দায়িত্ব স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য বনু নাযীর গোত্রের লোকদের কাছে গেলেন। সেখানকার লোকেরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে একটা দেয়ালের ছায়ার নীচে বসালো। তারপর গোপনে সলাপরামর্শ করতে লাগলো যে, একজন উপরে গিয়ে তাঁর মাথার ওপর বিরাটকায় পাথর ফেলে দিয়ে হত্যা করবে। আমর বিন জাহ্হাশ বিন কা'ব এই দায়িত্বটা নিজের কাঁধে নিয়ে নিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের দুরভিসন্ধি টের পেয়ে আগে ভাগেই উঠে চলে এলেন।[৪৪]

যে সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ বনু কুরায়যার সাথে চুক্তি নবায়ন করেন, সে সময় বনু নাযীর রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে খবর পাঠায়, আপনি তিনজন লোক নিয়ে আসবেন। আমরাও তিনজন আলেম উপস্থিত করবো। আপনি এই বৈঠকের সামনে নিজের বক্তব্য পেশ করবেন। আমাদের আলেমরা যদি আপনার বক্তব্য সমর্থন করে, তাহলে আমরা সবাই আপনার প্রতি ঈমান আনবো। রাসূলুল্লাহ ﷺ রওয়ানা হলেন। কিন্তু পথিমধ্যে জানতে পারলেন, ইহুদিরা তাকে হত্যার প্রস্তুতি চালাচ্ছে। তাই তিনি ফিরে এলেন।"

এ থেকে প্রমাণিত যে, দীনের কাজে ইসলামী সংগঠনের নেতা, ক্ষমতাশীল ব্যক্তি এমনকি রাষ্ট্রপ্রধানকেও ষড়যন্ত্রের স্বীকার হতে হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওফাত

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওফাতের পূর্বাভাষ নিয়ে কুরআনের বাণী,

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ـ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ـ
فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ـ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ـ

---

৪৩ সূরা মুজাদালা-১০

৪৪ সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড; কাযী সুলায়মান মানসুরপুরী, রাহমাতুল্লিল আলামীন, ডক্টর মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ, রাসূলে আকরাম কী সিয়াসী জিন্দেগী।

www.pathagar.com

"যখন আল্লাহর সাহায্য এবং বিজয় এলো; এবং তুমি দেখবে মানুষ দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করছে। এখন তুমি আল্লাহর স্মরণে আত্মনিয়োগ কর এবং গোনাহের জন্য ক্ষমা চাও। নিশ্চয় তিনিই তওবা কবুল করেন।"[৪৫]

বিদায় হজ্বের প্রস্তুতি উপরোক্ত সূরা নাযিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানবতার নবী হযরত রাসূলে খোদা ﷺ অনুমান করতে পারলেন, শেষ বিদায়ের সময় ঘনিয়ে এসেছে। এ আয়াত থেকে এটাও প্রমাণিত হয় যে, এ পৃথিবীতে নানা-রকম অন্যায়-অত্যাচার ও জুলুম আসলেও সত্যের বিজয় অবসম্ভাবী।

অবশেষে তিনি হজ্জ করতে মক্কায় আসেন। উম্মতের উদ্দেশ্যে দেন শেষ ভাষণ। এ উম্মতের জন্য আল্লাহর রাসূলের শেষ যে অশ্রুবিন্দু প্রবাহিত হয়েছিল, তা বিদায় হজ্বের খুৎবায় পুঞ্জীভূত হয়ে রয়েছে। শেষ অসিয়ত করলেন- এ বাণী এবং শিক্ষা যেন পরবর্তী যুগের মানুষের নিকট প্রচার করার সুব্যবস্থা করা হয়।"

রাসূলুল্লাহ ﷺ খুৎবা সমাপ্ত করার সঙ্গে সঙ্গেই জিবরীল (আ) দ্বীন ইসলামের পূর্ণতার মুকুট নিয়ে আসলেন। কোরআনের আয়াত নাযিল হল–

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا۔

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের ওপর আমার নেয়ামত পূর্ণ করে দিলাম এবং দ্বীন ইসলামের ওপর আমার সন্তুষ্টির সীলমোহর দিয়ে দিলাম।"[৪৬]

বিদায় হজ্জ শেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনায় ফিরে আসেন। মদীনায় পৌঁছে আল্লাহর রাসূল ﷺ فسبح بحمد ربك وستغفره এ আয়াতের ওপর আমল করতে বিশেষভাবে আত্মনিয়োগ করলেন। আল্লাহর দরবারে হাজির হওয়ার ঔৎসুক্য যেন দিনদিনই প্রবলতর হয়ে উঠিতেছিল। সকাল-সন্ধা কেবল আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের স্মরণে কাটিয়ে দেয়ার অতৃপ্ত বাসনা যেন আরও তীব্র হয়ে উঠেছিল।

২৯ শে সফর সোমবার দিন কোন এক জানাযা হতে ফিরে আসার পথে মাথা ব্যাথার মধ্য দিয়ে রোগের সূচনা হয়।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাথায় একটি রুমাল বাঁধা ছিল। আমি এর উপর হাত রাখলাম; মাথা এত বেশি উত্তপ্ত হয়েছিল যে,

---

[৪৫] সূরা নাসর, ১-৩

[৪৬] সূরা মায়েদা, ০৩

www.pathagar.com

হাতে তা সহ্য হচ্ছিল না। দ্বিতীয় দিনেই রোগের তীব্রতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এ জন্য মুসলিম জননীগণ সকলে মিলে তাঁকে হযরত আয়েশার ঘরে অবস্থানের ব্যবস্থা করলেন; কিন্তু শরীর এত দুর্বল হয়ে গিয়েছিল যে, স্বয়ং হযরত আয়েশার ঘর পর্যন্ত যেতে সমর্থ হলেন না। হযরত আলী এবং হযরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মিলে দুই বাহু ধরে অত্যন্ত কষ্টের সাথে তাঁকে হযরত আয়েশার ঘর পর্যন্ত নিয়ে আসলেন। তীব্র ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েও রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীর্ঘ এগারো দিন পর্যন্ত মসজিদে রীতিমতই আগমন করেছিলেন। বৃহস্পতিবার দিন মাগরিবের নামাযও স্বয়ং পড়ালেন। এ নামাযে সূরা মুরসালাত তেলাওয়াত করেছিলেন।[৪৭]

কিন্তু ইশার নামাযের সময় অসুস্থতা এতই বেড়ে গেল যে, মসজিদে যাওয়ার মত শক্তি-সামর্থ আর তাঁর রইল না। হযরত 'আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন- 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, 'লোকেরা নামায আদায় করে নিয়েছে? আমি উত্তর দিলাম, 'না, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! তাঁরা আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আমার জন্য বড় পাত্রে পানি দাও।' তাঁর চাহিদা মুতাবিক পানি দেয়া হলে তিনি গোসল করলেন। অতঃপর দাঁড়াতে চাইলেন, কিন্তু পারলেন না, অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। জ্ঞান ফিরে পেলে তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, 'লোকেরা কি নামায পড়ে নিয়েছে'? উত্তর দিলাম, 'না, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তাঁরা আপনার জন্য অপেক্ষমান রয়েছেন।'

এরপর দ্বিতীয় ও তৃতীয় বারেও তিনি একই রূপ করলেন, যেমনটি প্রথমবার করেছিলেন। অর্থাৎ গোসল করলেন এবং দাঁড়াতে চাইলেন কিন্তু পারলেন না, অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। অবশেষে তিনি হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কে বলে পাঠালেন নামাযে ইমামতি করার জন্য। তখন হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ঐ দিনগুলোতে নামাযে ইমামতি করেন।[৪৮] নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র জীবদ্দশায় হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর ইমামতিতে নামাযের সংখ্যা ছিল সতের ওয়াক্ত।

হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু জোহরের নামায পড়াতেছিলেন। এ অবস্থায় আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে আসতে মনস্থ করলেন এবং হযরত আলী ও হযরত আব্বাসের রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কাঁধে হাত রেখে জামাতে তাশরীফ আনলেন। উপস্থিত নামাযীগণ অত্যন্ত অস্থিরতার সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আগমন লক্ষ্য করতে লাগলেন। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু পর্যন্ত ইমামের স্থান হতে পশ্চাতে সরে আসতে লাগলেন; কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাতে ইশারা করে তাঁকে সরে আসতে বারণ করলেন এবং স্বয়ং তাঁর পাশে বসে নামায আদায় করতে লাগলেন।

---

৪৭ সহীহ বুখারী, উম্মুল ফযল হতে নবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসুখ অধ্যায়, ২য় খ. ৬৩৭ পৃ.।

৪৮ বুখারী ও মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা, মিশকাত ১ম খ. ১০২ পৃ।

www.pathagar.com

এরপর আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নামাযের অনুকরণ করছিলেন এবং সাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কে তাকবীর শোনাচ্ছিলেন।[৪৯]

৯ই রবিউল আউয়াল সকাল হতেই আল্লাহর রাসূলের অবস্থা আশ্চর্য রকমভাবে পরিবর্তিত হচ্ছিল। ক্ষণে ক্ষণে বেহুশ হয়ে যাচ্ছিলেন আবার সঙ্গে সঙ্গেই হুশ ফিরে আসছিল। আবার বেহুশ হয়ে পড়ছিলেন। মানবতার নবীর অবস্থা ক্রমেই নাজুক হয়ে উঠছিল। একে একে তিনি ফাতেমা, হাসান-হোসেন এবং হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে নসিহত করলেন। সর্বশেষ আল্লাহর প্রতি মনোযোগ দিলেন এবং বললেন-

الصلاة الصلاة وما ملكت ايمانكم .

'নামায, নামায এবং তোমাদের অধীনস্থ (অর্থাৎ দাসদাসী)'। এই শব্দগুলো হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বার বার পুনরাবৃত্তি করেন।[৫০]

তখন হতেই মৃত্যুযন্ত্রণা শুরু হয়েছিল। হযরত রাহমাতুললিল আলামীন সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম অর্ধশায়িত অবস্থায় হযরত আয়েশার গায়ে হেলান দেয়া অবস্থায় ছিলেন। কাছেই পানির পেয়ালা রাখা ছিল। তাতে হাত রেখেছিলেন এবং পবিত্র চেহারা মুছে দিচ্ছিলেন। পবিত্র চেহারা কখনও লাল হয়ে উঠছিল, কখনও ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছিল। যবান মোবারক ধীরে ধীরে চলছিল। তিন উচ্চারণ করেছিলেন- "আল্লাহ ব্যতীত উপাস্য নেই, মৃত্যু সত্য কষ্টদায়ক।"[৫১]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাত অথবা আঙ্গুল উঠালেন এবং ছাদের দিকে দৃষ্টি তুলে ধরলেন। তাঁর ঠোঁট দুটো একটু নড়ে উঠল। হযরত 'আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা কান পেতে শোনলেন, তিনি বলছিলেন, 'হে আল্লাহ! নবীগণ, সিদ্দীকগণ, শহীদগণ এবং সৎ ব্যক্তিগণ, যাঁদের তুমি পুরস্কৃত করেছ আমাকে তাঁদের দলভুক্ত কর এবং আমাকে ক্ষমা করে দাও এবং আমার প্রতি তুমি অনুগ্রহ কর। হে আল্লাহ! আমাকে রফীকে 'আলায়' পৌঁছিয়ে দাও। হে আল্লাহ! রফীকে আ'লা।"[৫২]

শেষ কথাটি তিনি তিনবার পুনরাবৃত্তি করেন। সে সময় তাঁর হস্ত মুবারক অবস হয়ে যায় এবং তাঁর একান্ত আকাংখিত রফীকে আ'লার (সর্বশ্রেষ্ঠ প্রিয়তম বন্ধু আল্লাহর) সঙ্গে তিনি মিলিত হয়ে যান। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

---

[৪৯] সহীহ বুখারী, ১ম খ. ৯৮ ও ৯৯ পৃ.।

[৫০] সহীহ বুখারী, ২য় খ. ৬৩৭ পৃ.।

[৫১] অধিকাংশ ঐতিহাসিকদের মতে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ১২ ই রবিউল আউয়াল ইন্তেকাল করেন। তাবারী, প্রাগুক্ত, ২য় পৃ: ২০০; ইবনে সা'দ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড: পৃ: ২৭২; আবুল ফিদা হাফিজ ইবনে কাছীর, *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া* (মিশর, ১৩৫১ হি.) খ. ৫, পৃ. ২৫৪-২৫৬।

[৫২] সহীহ বুখারী, অধ্যায়, ২য় খ. ৬৩৮-৬৪১ পৃ.।

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাতের খবর শুনে মুসলমানদের যেন কলিজা ফেটে গেল, পা যেন ভেঙে পড়ল। চেহারার জ্যোতি নিভে গেল। চক্ষু রক্তাশ্রু বর্ষণ করতে লাগল। হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর বর্ণনা- তিনি বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেদিন আমাদের নিকট আগমন করেছিলেন সে দিনের মত উজ্জ্বলতম দিন আর কখনো দেখি নি এবং যে দিন তিনি ওফাত লাভ করলেন সে দিনের মত এত শোক এবং অন্ধকার দিন আর কখনো দেখি নি'।[৫৩]

হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়েব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেছেন যে, হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেছেন, "আল্লাহর কসম! আমি যখন হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কে এ (আলে ইমরানের ১৪৪ নং) আয়াত পাঠ করতে শুনলাম, তখন আমি খুবই লজ্জিত বোধ করলাম। (অথবা আমার পিঠ ভেঙে পড়ল) এমনকি আমার দ্বারা আমার পা উঠানো সম্ভব হচ্ছিল না। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এ আয়াত পাঠ করতে শুনে আমি মাটির দিকে গড়িয়ে পড়লাম। কারণ, আমি তখন বুঝতে সক্ষম হলাম যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রকৃতই ইনতিকাল করেছেন।"[৫৪]

মঙ্গলবার দিন দাফন-কাফনের প্রস্তুতি চলল। ফজল বিন আব্বাস, উসামা ইবনে যায়েদ পর্দা উঠালেন। আনসারগণের একদল দরজার নিকট এসে বলতে লাগলেন, আমরা হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শেষ সেবায় অংশ দাবী করছি। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আওস ইবনে খাওলা আনসারীকে ভিতরে ডেকে নিলেন। তিনি পাত্র ভরে পানি এনে দিতে লাগলেন। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু লাশ মোবারক বুকে জড়িয়ে পড়ে ছিলেন। হযরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এবং আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু লাশ মোবারকের পার্শ্ব পরিবর্তন করেছিলেন, হযরত উসামা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু উপর হতে পানি ঢেলে দিচ্ছিলেন। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু গোসল দিচ্ছিলেন এবং বলছিলেন, "আমার পিতামাতা কোরবান হউন, আপনার মৃত্যুতে এমন সম্পদ হারিয়েছি যা আর কোন মৃত্যুতেই হয়নি।"

গোসল শেষে তিন খণ্ড সূতির সাদা কাপড় দ্বারা কাফন দেয়া হল। হযরত আয়েশার হুজরায়- যেখানে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন, সেখানে কবর তৈরি করা হল। প্রস্তুতি সমাপ্ত হলে পরপর মুসলিম জনতা জানাযায় দলে দলে সমবেত হলেন। লাশ মোবারক হুজরার ভিতর রক্ষিত ছিল। এ জন্য মুসলমানগণ ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জানাযা আদায় করতে যাচ্ছিলেন এবং জানাযা সমাপ্ত করে ফিরছিলেন। এ জানাযার নামাযে কেউ ইমাম ছিলেন না! প্রথম নবী পরিবারের লোকগণ জানাযা পড়লেন।

---

[৫৩] দারিমী, মিশকাত, ২য় খ. ৫৪৭ পৃ.।

[৫৪] সহীহ বুখারী, ২য় খ. ৬৪০ পৃ.।

www.pathagar.com

অতঃপর মোহাজেরীন এবং আনসারগণ; স্ত্রী, পুরুষ ও শিশুগণ পৃথক পৃথকভাবে জানাযা পড়লেন।

নামাযে জানাযা আদায় করতে মঙ্গলবার দিবস পুরোটাই লেগে যায়। মঙ্গলবার দিবস অতিবাহিত হওয়ার পর বুধবারের রাতে নবী করীমের ﷺ দেহ মুবারককে সমাহিত করা হয়। হযরত 'আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেছেন যে, পুরো দিবসটাই নামাযে জানাযা চলার কারণে প্রিয়তম রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দাফন সম্পর্কে আমাদের জানা ছিল না। এভাবে সময় অতিবাহিত হতে থাকার পর বুধবার রাতের মধ্যভাগে দাফন-কাফনের শব্দ কর্ণগোচর হয়।"[৫৫]

আল্লাহর প্রিয় হাবীব মুহাম্মদ ﷺ-এর উপর জুলুম-নির্যাতন, অপ্রপচার, দেশান্ত র, কারাবরণ এমন কি হত্যার ষড়যন্ত্র সব কিছু মোকাবেলায় তিনি এবং তাঁর সাহাবীরা কালেমার পতাকা নিয়ে সামনের দিকে ছুটেছেন দূর্বার গতিতে। কোন নিন্দুকের নিন্দা, আর পরাশক্তির বাধাকে তাঁরা তোয়াক্কা করেননি। নবী মুহাম্মদ ﷺ-এর শরীরের রক্তকে দ্বীনের বিজয়ের জন্য ঝরাতে হয়েছে। এতে প্রতিয়মান যে, আল্লাহ্ তায়ালার নিকট এই জমিনে দ্বীনের বিজয়ই ছিল মূখ্য। আল্লাহ্ বলেন-

وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔

"এর আগে এমন অনেক নবী চলে গেছে যাদের সাথে মিলে বহু আল্লাহ্ ওয়ালা লড়াই করেছে। আল্লাহর পথে তাদের ওপর যেসব বিপদ এসেছে তাতে তারা মনমরা ও হতাশ হয়নি, তারা দুর্বলতা দেখায়নি এবং তারা বাতিলের সামনে মাথা নত করে দেয়নি। এ ধরনের সবরকারীদেরকে আল্লাহ্ ভালবাসেন।"[৫৬]

এ জন্য উহুদ যুদ্ধের সময় নবী ﷺ-এর শাহাদাতের খবর ছড়িয়ে পড়ার পর অধিকাংশ সাহাবী সাহস হারিয়ে ফেলেন। এ অবস্থায় মুনাফিকরা বলতে থাকে– চলো আমরা আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের কাছে যাই। সে আমাদের জন্য আবু সুফিয়ানের কাছ থেকে নিরাপত্তা এনে দেবে। আবার কেউকেউ এমন কথাও

---

৫৫ শাইখ আব্দুল্লাহ রচিত মুখতাসরুস সীরাতে রাসূল ﷺ, পৃ. ৪৭১। মৃত্যু বিবরণ বিস্তারিত অবগতির জন্য দ্রষ্টব্য সহীহ বুখারী-নবীর ﷺ অসুস্থতা অধ্যায় এবং এর পরের কয়েকটি অধ্যায়, ফতহুল বারী সহ সহীহ মুসলিম ও মিশকাতুল মাসাবীহ, নবীর মৃত্যু অধ্যায় দ্রঃ। ইবনে হিশাম ২য় খ. ৬৪৯-৬৬৫ পৃ.। তালকিহুফোহুমি আহলির আসার, পৃ. ৩৮ ও ৩৯। রাহমাতুললিল আলামীন, ১ম খ. ২৭৭-২৮৬ পৃ.। সময়ের নির্দিষ্টতা সাধারণভাবে রাহমাতুললিল আলামীন হতে গৃহীত।

৫৬ সূরা আলে ইমরান, ১৪৬

www.pathagar.com

বলে ফেলে যদি মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রাসূলই হতেন, তাহলে নিহত হলেন কেমন করে? চলো, আমাদের বাপ-দাদাদের ধর্মের দিকে ফিরে যাই। এ সমস্ত কথার জবাবে বলা হচ্ছে, তোমাদের 'সতপ্রীতি' যদি কেবল মুহাম্মাদের ﷺ ব্যক্তিত্বের সাথে সম্পর্কিত হয়ে থাকে এবং তোমাদের ইসলাম যদি এতই দুর্বল ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে যে, মুহাম্মাদ ﷺ-এর দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার সাথে সাথে তোমরা আবার সেই কুফরীর দিকে ফিরে যাবে, যা থেকে তোমরা বের হয়ে এসেছিলে। আল্লাহ্ বলেন-

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۚ اَفَاِن مَّاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰٓى اَعْقَابِكُمْ ۚ وَمَن يَنقَلِبْ عَلٰى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللّٰهَ شَيْئًا ۗ وَسَيَجْزِي اللّٰهُ الشّٰكِرِيْنَ.

"মুহাম্মাদ একজন রাসূল বৈ তো আর কিছুই নয়। তার আগে আরো অনেক রাসূলও চলে গেছে। যদি সে মারা যায় বা নিহত হয়, তাহলে কি পেছনের দিকে ফিরে যাবে? মনে রেখো, যে পেছনের দিকে ফিরে যাবে সে আল্লাহর কোন ক্ষতি করবে না, তবে যারা আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দা হয়ে থাকবে তাদরেকে তিনি পুরস্কৃত করবেন।"[৫৭]

মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ যেহেতু খাতামুন নাবিয়্যিন সুতরাং সেই দ্বীনের দায়িত্ব আজ উম্মতে মুহাম্মদীকে পালন করতে হবে। আর এ দায়িত্ব যারা পালন করবে তাদেরকেও একই পরিস্থিতি মোকাবেলা করে সামনের দিকে এগুতে হবে। এক্ষেত্রে দ্বীনের মুজাহিদরা যদি আল্লাহর উপর তায়াক্কুল করে জুলুম-নির্যাতনের পথ মাড়িয়ে অগ্রসর হতে পারে, তাহলে ইসলামের বিজয় অনিবার্য, ইনশাআল্লাহ।

রাসূল ﷺ বলেছেন, যখন তোমরা কোন বিপদ মুসিবতে পড়বে তখন স্মরণ কর সবচেয়ে বড় মুসিবতের কথা। সেটা হবে আমাকে হারানোর মুসিবত। (ইবনে মাজাহ)। রাসূল ﷺ-এর উম্মতরা তাকে হারানোর যে কষ্ট সহ্য করেছে। কিন্তু তাঁর রেখে যাওয়া দ্বীনের মধ্যে রাসুলের অনুসারীরা প্রতি মুহূর্তে প্রিয় রাসুল ﷺ-কে খুঁজে পাবে। আল্লাহ্ বলেন-

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ.

"তোমাদের জন্য রাসুলের জীবন চরিত্রের মধ্যেই রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ।"[৫৮]

---

[৫৭] সূরা আল-ইমরান, ১৪৩-১৪৪

[৫৮] সূরা আহযাব, ২১।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণের ওপর জুলুম-নির্যাতন, কারাবরণ ও কষ্ট স্বীকার

১. হযরত আদম (আলাইহিস সালাম)

বিশ্ব ইতিহাসের প্রথম মানুষ ও প্রথম নবী হিসেবে আল্লাহপাক আদম (আলাইহিস সালাম)-কে নিজ দু'হাত দ্বারা সরাসরি সৃষ্টি করেন (ছোয়াদ ৩৮/৭৫)। অতঃপর আদমের পাঁজর থেকে তাঁর স্ত্রী হাওয়াকে সৃষ্টি করেন।[৫৯] অতঃপর স্বামী-স্ত্রীর মাধ্যমে যুগ যুগ ধরে একই নিয়মে মানববংশ বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রয়েছে। কুরআন-এর বর্ণনা অনুযায়ী প্রথম দিন থেকেই মানুষ পূর্ণ চেতনা ও জ্ঞান সম্পন্ন সভ্য মানুষ হিসেবেই যাত্রারম্ভ করেছে এবং আজও সেভাবেই তা অব্যাহত রয়েছে। প্রথম মানুষ আদিপিতা আদম (আ.)-কে আল্লাহ সর্ববিষয়ের জ্ঞান ও যোগ্যতা দান করেন এবং বিশ্বে আল্লাহর খেলাফত পরিচালনার মর্যাদায় অভিষিক্ত করেন। কুরআনের বাণী, "আল্লাহ একদা ফেরেশতাদের ডেকে বললেন, আমি পৃথিবীতে 'খলীফা' অর্থাৎ প্রতিনিধি সৃষ্টি করতে চাই। বল, এ বিষয়ে তোমাদের বক্তব্য কি? তারা (সম্ভবতঃ ইতিপূর্বে সৃষ্ট জিন জাতির তিক্ত অভিজ্ঞতার আলোকে) বলল, হে আল্লাহ! আপনি কি পৃথিবীতে এমন কাউকে আবাদ করতে চান, যারা গিয়ে সেখানে ফাসাদ সৃষ্টি করবে ও রক্তপাত ঘটাবে? অথচ আমরা সর্বদা আপনার হুকুম পালনে এবং আপনার গুণগান ও পবিত্রতা বর্ণনায় রত আছি। এখানে ফেরেশতাদের উক্ত বক্তব্য আপত্তির জন্য ছিল না, বরং জানার জন্য ছিল। আল্লাহ বললেন, আমি যা জানি, তোমরা তা জানো না (বাক্বারাহ ২/৩০)। অর্থাৎ আল্লাহ চান এ পৃথিবীতে এমন একটা সৃষ্টির আবাদ করতে, যারা হবে জ্ঞান ও ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন এবং নিজস্ব বিচার-বুদ্ধি ও চিন্তা-গবেষণাসহকারে স্বেচ্ছায়-সজ্ঞানে আল্লাহর বিধানসমূহের আনুগত্য করবে ও তাঁর ইবাদত করবে। ফেরেশতাদের মত কেবল হুকুম তামিলকারী জাতি নয়। আদম সৃষ্টির সাথে সাথে সকল সৃষ্ট বস্তুকে করে দেন মানুষের অনুগত (লোকমান ৩১/২০) ও সবকিছুর উপরে দেন মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব (ইসরা ১৭/৭০)।

---

[৫৯] নিসা ৪/১; বাক্বারাহ ৩৫; মুত্তাফাক্ব আলাইহি, মিশকাত হা/৩২৩৮ 'বিবাহ' অধ্যায় 'নারীদের সাথে সদ্ব্যবহার' অনুচ্ছেদ। ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, তাবি), খ. ১, পৃ. ৬২।

www.pathagar.com

আর সে কারণেই জিন-ফিরিশতা সবাইকে মানুষের মর্যাদার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য আদমকে সিজদা করার আদেশ দেন। সবাই সে নির্দেশ মেনে নিয়েছিল। কিন্তু ইবলীস অহংকার বশে সে নির্দেশ অমান্য করায় চিরকালের মত অভিশপ্ত হয়ে যায় (বাক্বারাহ ২/৩৪)। অথচ সে ছিল বড় আলেম ও ইবাদতগুযার। সে কারণে জিন জাতির হওয়া সত্ত্বেও সে ফিরিশতাদের সঙ্গে বসবাস করার অনুমতি পেয়েছিল ও তাদের নেতা হয়েছিল।[৬০] কিন্তু আদমের উচ্চ মর্যাদা দেখে সে ঈর্ষাকাতর হয়ে পড়ে। ফলে অহংকার বশে আদমকে সিজদা না করায় এবং আল্লাহ ভীতি না থাকায় সে আল্লাহর গযবে পতিত হয়।

শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু ও আদমের পরীক্ষা

আদমকে সৃষ্টি করার আগেই আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে আদমের প্রতি সিজদা করার কথা বলে দিয়েছিলেন (হা-মীম সাজদাহ/ফুছছিলাত ৪১/১১)। তাছাড়া কুরআনের বর্ণনাসমূহ থেকে একথা স্পষ্ট হয় যে, আদমকে সিজদা করার জন্য আল্লাহর নির্দেশ ব্যক্তি আদম হিসেবে ছিল না; বরং ভবিষ্যৎ মানব জাতির প্রতিনিধিত্বকারী হিসেবে তাঁর প্রতি সম্মান জানানোর জন্য জিন ও ফিরিশতাদের সিজদা করতে বলা হয়েছিল। এই সিজদা কখনোই আদমের প্রতি ইবাদত পর্যায়ের ছিল না; বরং তা ছিল মানবজাতির প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন ও তাদেরকে সকল কাজে সহায়তা করার প্রতিশ্রুতি দানের প্রতীকী ও সম্মানসূচক সিজদা মাত্র। ওদিকে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হলেও ইবলীস কিন্তু আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা হিসেবে অস্বীকার করেনি; বরং আল্লাহ যখন তাকে 'অভিসম্পাৎ' করে জান্নাত থেকে চিরদিনের মত বিতাড়িত করলেন, তখন সে আল্লাহ্কে 'রব' হিসেবেই সম্বোধন করে প্রার্থনা করল,

قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ-

"হে আমার প্রভু! আমাকে আপনি ক্বিয়ামত পর্যন্ত অবকাশ দিন'। (হিজর ১৫/৩৬, ছোয়াদ ৩৮/৭৯)

আল্লাহ তার প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন। অতঃপর সে বলল, "হে আমার পালনকর্তা! আপনি যেমন আমাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, আমিও তেমনি তাদের সবাইকে পৃথিবীতে নানারূপ সৌন্দর্যে প্রলুব্ধ করব এবং তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে দেব। তবে যারা আপনার একনিষ্ঠ বান্দা, তাদের ব্যতীত' (হিজর ১৫/৩৪-৪০; ছোয়াদ ৩৮/৭৯-৮৩)। আল্লাহ তাকে বললেন, তুমি নেমে যাও এবং এখান থেকে বেরিয়ে যাও। তুমি নীচুতমদের অন্তর্ভুক্ত। এখানে তোমার অহংকার করার অধিকার নেই' (আ'রাফ ৭/১৩)। উল্লেখ্য যে, ইবলীস জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত

---

[৬০] ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, তাবি) ১/৬৭।

www.pathagar.com

হলেও মানুষের রগ-রেশায় ঢুকে ধোঁকা দেওয়ার ও বিভ্রান্ত করার ক্ষমতা আল্লাহ তাকে দিয়েছিলেন।[৬১] আর এটা ছিল মানুষের পরীক্ষার জন্য। শয়তানের ধোঁকার বিরুদ্ধে জিততে পারলেই মানুষ তার শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখতে পারবে এবং আখেরাতে জান্নাত লাভে ধন্য হবে। নইলে ইহকাল ও পরকালে ব্যর্থ হবে।

দুনিয়াবী ব্যবস্থাপনায় আদম (আ.) :

হাফেয শামসুদ্দীন যাহাবী (রহঃ) الطب النبوى কেতাবে বলেন, মানুষের দুনিয়াবী জীবনে প্রয়োজনীয় সর্বপ্রকার শিল্পকর্ম অহীর মাধ্যমে কোন না কোন নবীর হাতে শুরু হয়েছে। অতঃপর যুগে যুগে তার উন্নতি ও উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে। সর্বপ্রথম আদম (আ.)-এর উপরে যেসব অহী নাযিল করা হয়েছিল, তার অধিকাংশ ছিল ভূমি আবাদ করা, কৃষিকাজ ও শিল্প সংক্রান্ত। যাতায়াত ও পরিবহনের জন্য চাকা চালিত গাড়ী সর্বপ্রথম আদম (আ.) আবিষ্কার করেন। কালের বিবর্তনে নানাবিধ মডেলের গাড়ী এখন চালু হয়েছে; কিন্তু সব গাড়ীর ভিত্তি হল চাকার উপরে। বলা চলে যে, সভ্যতা এগিয়ে চলেছে চাকার উপরে ভিত্তি করে। অতএব যিনি প্রথম এটা চালু করেন, তিনিই বড় আবিষ্কারক। আর তিনি ছিলেন আমাদের আদিপিতা প্রথম মানুষ ও প্রথম নবী হযরত আদম (আলাইহিস সালাম)। যা তিনি অহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত হয়েছিলেন।[৬২] আদমের যুগে পৃথিবীর প্রথম কৃষিপণ্য ছিল 'তীন' ফল। ফিলিস্তীন ভূখণ্ড থেকে সম্প্রতি প্রাপ্ত সে যুগের একটি আস্ত তীন ফলের শুষ্ক ফসিল পরীক্ষা করে একথা প্রমাণিত হয়েছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ 'তীন' ফলের শপথ করেছেন। আল্লাহ আমাদের আদিপিতার উপরে শান্তি বর্ষণ করুন- আমীন!

মৃত্যু ও বয়স

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "তোমাদের দিনগুলোর মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম দিন হল জুম'আর দিন। এ দিনেই আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে, এ দিনেই তার মৃত্যু হয়েছে এবং এ দিনেই ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে...'। আদম (আ.)-কে এক হাযার বছর বয়স দেওয়া হয়েছিল। রূহের জগতে দাঊদ (আ.)-এর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তিনি নিজের বয়স থেকে ৪০ বছর তাকে দান করেন। ফলে অবশিষ্ট ৯৬০ বছর তিনি জীবিত ছিলেন।

---

[৬১] মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৬৮ 'ঈমান' অধ্যায় 'ওয়াসওয়াসা' অনুচ্ছেদ।

[৬২] তাসফীর মা'আরেফুল কুরআন পৃঃ ৬২৯।

www.pathagar.com

আদমের পরীক্ষা ও আমাদের জন্য শিক্ষণীয়

এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, ইবলীসের ক্ষেত্রে আল্লাহ বললেন,

قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ-

'তুমি জান্নাত থেকে বেরিয়ে যাও। নিশ্চয়ই তুমি অভিশপ্ত' (হিজর ১৫/৩৪; আ'রাফ ৭/১৮)। অন্যদিকে আদম ও হাওয়ার ক্ষেত্রে বললেন,

قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا-

'তোমরা নেমে যাও' (বাক্বারাহ ২/৩৬, ৩৮; আ'রাফ ৭/২৪)। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ইবলীস কখনোই আর জান্নাতে ফিরে আসতে পারবে না। কিন্তু বনু আদমের ঈমানদারগণ পুনরায় **জান্নাতে** ফিরে আসতে পারবে ইনশাআল্লাহ। সুতরাং যুগে যুগে হযরত আদম (আ.)-এর ন্যায় বনু আদমও পরীক্ষায় পতিত হবে। আর এ পরীক্ষায় উন্নীত হয়েই জান্নাতে পথে যাত্রা শুরু করতে হবে। এটিই হলো সৃষ্টির শুরু থেকে বর্তমান পর্যন্ত ইলাহী নীতি। কারণ শয়তান প্রতিনিয়ত তোমাকে ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করবে, আর কুরআন-সুন্নাহ তথা ইসলাম তোমাকে সে ধোঁকা থেকে বিরত রাখবে। আদমের মধ্যে মানবত্ব ও নবুওয়াতের নিষ্পাপত্ব উভয় গুণ ছিল। তিনি শয়তানের প্ররোচনায় আল্লাহর নিষেধাজ্ঞার কথা সাময়িকভাবে ভুলে গিয়ে নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খেয়ে অনুতপ্ত হন ও তওবা করেন। তওবা কবুল হবার পরে তিনি নবুওয়াত প্রাপ্ত হন। অতএব নিঃসন্দেহে তিনি নিষ্পাপ ছিলেন। একইভাবে আদমের আওলাদগণ পাপ করে তওবা করলে আল্লাহ তা মাফ করে থাকেন; কিন্তু শর্ত হচ্ছে মানুষ তওবা করার পর স্ব-জ্ঞানে যেমনি সে অপরাধে নিমজ্জিত হবে না, তেমনি মনের সকল আকুলতা দিয়েই মহান পরওয়ারদিগারের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। আর হযরত আদম (আ.)–এর অনুসারীদের জন্যও পরীক্ষা অবধারিত।

২. হযরত নূহ (আলাইহিস সালাম)

'আবুল বাশার ছানী' (ابو البشر الثانى) বা মানবজাতির দ্বিতীয় পিতা বলে খ্যাত নূহ (আলাইহিস সালাম) ছিলেন পিতা আদম (আলাইহিস সালাম)-এর দশম অথবা অষ্টম অধঃস্তন পুরুষ। তিনি ছিলেন দুনিয়াতে ১ম রাসূল।[৬৩] আদম (আ.) থেকে নূহ (আ.) পর্যন্ত দশ শতাব্দীর ব্যবধান ছিল। যার শেষদিকে ক্রমবর্ধমান মানবকূলে শিরক ও কুসংস্কারের আবির্ভাব ঘটে এবং তা বিস্তৃতি লাভ করে। ফলে তাদের সংশোধনের জন্য আল্লাহ নূহ (আ.)-কে নবী ও রাসূল করে পাঠান। তিনি সাড়ে নয়শত বছরের দীর্ঘ বয়স লাভ করেছিলেন এবং সারা জীবন

---

[৬৩] মুসলিম হা/৩২৭ 'ঈমান' অধ্যায় ৮৪ অনুচ্ছেদ। রাবী আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)।

www.pathagar.com

পথভোলা মানুষকে পথে আনার জন্য দাওয়াতে অতিবাহিত করেন; কিন্তু তাঁর কওম তাঁকে প্রত্যাখ্যান করে। ফলে আল্লাহ্‌র গযবে তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

নূহ (আ.)-এর দাওয়াত ও তাঁর ওপর নির্যাতন

নূহ (আ.) স্বীয় কওমকে দিন-রাত দাওয়াত দিতে থাকেন। তিনি তাদেরকে প্রকাশ্যে ও গোপনে বিভিন্ন পন্থায় ও পদ্ধতিতে দাওয়াত দেন। শতাব্দীর পর শতাব্দী অক্লান্তভাবে দাওয়াত দেওয়া সত্ত্বেও তারা ঈমান আনেনি। কিন্তু ফলাফল হয় নিতান্ত নৈরাশ্যজনক। তাঁর দাওয়াতে অতিষ্ট হয়ে তারা তাঁকে দেখলেই পালিয়ে যেত। কখনো কানে আঙ্গুল দিত। কখনো তাদের চেহারা কাপড় দিয়ে ঢেকে ফেলতো। তারা তাদের হঠকারিতা ও যিদে অটল থাকত এবং চরম ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করত' (নূহ ৭১/৬-৯)। এক সময় কওমের সর্দাররা লোকদের ডেকে বলল,

وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا (نوح)

(খবরদার!) "তোমরা তোমাদের পূর্বপুরুষদের পূজিত উপাস্য ওয়াদ, সুওয়া', ইয়াগূছ, ইয়াঊক্ব, নাস্র-কে কখনোই পরিত্যাগ করবে না'। (এভাবে) 'তারা বহু লোককে পথভ্রষ্ট করে এবং (তাদের ধনবল ও জনবল দিয়ে) নূহ-এর বিরুদ্ধে ভয়ানক সব চক্রান্ত শুরু করে' (নূহ ৭১/২১-২৩)।

তারা নূহ (আ.)-এর দাওয়াতকে তাচ্ছিল্য ভরে প্রত্যাখ্যান করেছিল। নূহ (আ.) তাদেরকে দিবারাত্রি দাওয়াত দেন। কখনো গোপনে কখনো প্রকাশ্যে অর্থাৎ সকল পন্থা অবলম্বন করে তিনি নিজ কওমকে দ্বীনের পথে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করেন (নূহ ৭১/৫-৯)। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, এই সুদীর্ঘ দাওয়াতী যিন্দেগীতে তিনি যেমন কখনো চেষ্টায় ক্ষান্ত হননি, তেমনি কখনো নিরাশও হননি। সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে নানাবিধ নির্যাতনের সম্মুখীন হয়েও তিনি ছবর করেন। কওমের নেতারা বলল,

قَالُوا لَئِن لَّمْ تَنتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ (الشعراء)

"হে নূহ! যদি তুমি বিরত না হও, তবে পাথর মেরে তোমার মস্তক চূর্ণ করে দেওয়া হবে' (শো'আরা ২৬/১১৬)। তবুও বারবার আশাবাদী হয়ে তিনি সবাইকে দাওয়াত দিতে থাকেন। আর তাদের জন্য দো'আ করে বলতে থাকেন, رَبِّ اغْفِرْ لِقَوْمِي أَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ- "হে আমার পালনকর্তা! তুমি আমার কওমকে ক্ষমা কর। কেননা তারা জানে না' (তাফসীর কুরতুবী, সূরা নূহ)।

www.pathagar.com

ওদিকে তাঁর সম্প্রদায়ের অনীহা, অবজ্ঞা, তাচ্ছিল্য এবং ঔদ্ধত্য ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে। মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক্ব বলেন, ولم يلق نبى من قومه من الأذى مثل نوح إلا نبى قُتل 'নিহত কোন নবী ব্যতীত অন্য কোন নবী তার কওমের নিকট থেকে নূহের মত নির্যাতন ভোগ করেননি' (ইবনু কাছীর, সূরা আ'রাফ ৫৯-৬২)। বলা চলে যে, তাদের অহংকার ও অত্যাচার চরম সীমায় পৌঁছে গিয়েছিল। ফলে এক পর্যায়ে নূহ (আ.) স্বীয় কওমকে ডেকে বললেন,

يَا قَوْمِ اِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَّقَامِيْ وَتَذْكِيْرِيْ بِآيَاتِ اللهِ فَعَلَى اللهِ تَوَكَّلْتُ فَاَجْمِعُوْا اَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لاَ يَكُنْ اَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوْا اِلَيَّ وَلاَ تُنْظِرُوْنِ، فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَاَلْتُكُمْ مِّنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِيَ اِلاَّ عَلَى اللهِ وَاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ. فَكَذَّبُوْهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلاَئِفَ وَاَغْرَقْنَا الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِآيَاتِنَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِيْنَ.

"হে আমার কওম! যদি তোমাদের মাঝে আমার অবস্থিতি ও আল্লাহর আয়াতসমূহের মাধ্যমে তোমাদের উপদেশ দেওয়া ভারি বলে মনে হয়, তবে আমি আল্লাহর ওপরে ভরসা করছি। এখন তোমরা তোমাদের যাবতীয় শক্তি একত্রিত কর ও তোমাদের শরীকদের সমবেত কর, যাতে তোমাদের মধ্যে কোনরূপ দ্বিধা-সংকোচ না থাকে। অতঃপর আমার ব্যাপারে একটা ফায়ছালা করে ফেল এবং আমাকে মোটেও অবকাশ দিয়ো না'। 'এরপরেও যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও। তবে জেনে রেখ, আমি তোমাদের কাছে কোনরূপ বিনিময় কামনা করি না। আমার বিনিময় কেবলমাত্র আল্লাহর নিকটেই রয়েছে। আর আমার প্রতি নির্দেশ রয়েছে যেন আমি আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হই'; 'কিন্তু তারপরও তারা তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল...' (ইউনুস ১০/৭১-৭৩)।

এ সময় আল্লাহপাক অহী নাযিল করে বলেন,

اَنَّهُ لَن يُّؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ اِلاَّ مَنْ قَدْ آمَنَ فَلاَ تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ.

"তোমার কওমের যারা ইতিমধ্যে ঈমান এনেছে, তারা ব্যতীত আর কেউ ঈমান আনবে না। অতএব তুমি ওদের কার্যকলাপে বিমর্ষ হয়ো না' (হূদ ১১/৩৬)। এভাবে আল্লাহর অহী মারফত তিনি যখন জেনে নিলেন যে, এরা কেউ আর

www.pathagar.com

ঈমান আনবে না। বরং কুফর, শিরক ও পথভ্রষ্টতার ওপরেই ওরা যিদ করে থাকবে, তখন নিরাশ হয়ে তিনি প্রার্থনা করলেন,

قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُوْنِ.

"হে আমার পালনকর্তা! আমাকে সাহায্য কর। কেননা ওরা আমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করেছে' (মুমিনূন ২৩/২৬)।

فَافْتَحْ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِيْ وَمَن مَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ.

'অতএব তুমি আমার ও তাদের মাঝে চূড়ান্ত ফয়ছালা করে দাও এবং আমাকে ও আমার সাথী মুমিনদেরকে তুমি (ওদের হাত থেকে) মুক্ত কর' (শো'আরা ২৬/১১৮)। তিনি স্বীয় প্রভুকে আহ্বান করে বললেন,

فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّيْ مَغْلُوْبٌ فَانْتَصِرْ.

'আমি অপারগ হয়ে গেছি। এক্ষণে তুমি ওদের বদলা নাও' (ক্বামার ৫৪/১০)। তিনি অতঃপর চূড়ান্তভাবে বদ দো'আ করে বললেন,

وَقَالَ نُوْحٌ رَّبِّ لاَ تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِيْنَ دَيَّارًا. إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلاَ يَلِدُوْا إِلاَّ فَاجِرًا كَفَّارًا.

"হে প্রভু! পৃথিবীতে একজন কাফের গৃহবাসীকেও তুমি ছেড়ে দিয়ো না'। 'যদি তুমি ওদের রেহাই দাও, তাহলে ওরা তোমার বান্দাদের পথভ্রষ্ট করবে এবং ওরা কোন সন্তান জন্ম দিবে না পাপাচারী ও কাফের ব্যতীত' (নূহ ৭১/২৬-২৭)।

নূহ (আ.)-এর এই দো'আ আল্লাহ সাথে সাথে কবুল করেন। যার ফলে তারা ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন হল এবং কেবলমাত্র মুষ্টিমেয় মুমিন নর-নারী মুক্তি পেলেন। বর্তমান পৃথিবীর সবাই তাদের বংশধর। আল্লাহ বলেন,

ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُوْرًا -

"তোমরা তাদের বংশধর, যাদেরকে আমরা নূহের সাথে (নৌকায়) সওয়ার করিয়েছিলাম। বস্তুতঃ সে ছিল একজন কৃতজ্ঞ বান্দা' (ইসরা ১৭/৩; ছাফফাত ৩৭/৭৭)।

ঈমানদারগণ আল্লাহর গযব থেকে নিষ্কৃতি পেল

তুফানের আলামত প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে নূহ (আ.)-কে হুকুম দেওয়া হ'ল,

قُلْنَا احْمِلْ فِيْهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ

"জোড় বিশিষ্ট প্রত্যেক প্রাণীর এক এক জোড়া করে নৌকায় তুলে নাও' (হূদ ১১/৪০; মুমিনূন ২৩/২৭)। এর দ্বারা কেবল ঐসব প্রাণী বুঝানো হয়েছে, যা নর

www.pathagar.com

ও মাদীর মিলনে জন্মলাভ করে এবং যা মানুষের দৈনন্দিন জীবনে অতীব প্রয়োজনীয়। যেমন গরু-ছাগল, ঘোড়া-গাধা ও হাঁস-মুরগী ইত্যাদি পশু-পক্ষী।

এরপর নূহ (আ.)-কে নির্দেশ দেওয়া হয় কেবল তাঁর পরিবারসহ ঈমানদার নর-নারীকে নৌকায় তুলে নিতে। যাদের সংখ্যা অতীব নগণ্য ছিল (হূদ ৪০)। কিন্তু সঠিক সংখ্যা কুরআন বা হাদীছে উল্লেখিত হয়নি। তবে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত হয়েছে যে, তাদের সংখ্যা ছিল চল্লিশ জন করে পুরুষ ও নারী মোট আশি জন। প্লাবনের পর তারা ইরাকের মূছেল নগরীর যে স্থানটিতে বসতি স্থাপন করেন, তা 'ছামানূন' বা আশি নামে খ্যাত হয়ে যায়।[৬৪] 'জূদী' (جودى) পাহাড়ে গিয়ে নৌকা নোঙর করে (হূদ ১১/৪৪)।

শিক্ষণীয় বিষয়

১. নূহ (আ.) যেমন দীর্ঘকাল যাবত নিজ জাতির পক্ষ হতে অবর্ণনীয় নির্যাতন ভোগ করা সত্ত্বেও তাদের হেদায়াতের ব্যাপারে নিরাশ হননি, বর্তমান সময়েও যারা দা'য়ী ইলাল্লার কাজ করছেন তাদেরও তেমনি নিরাশ হওয়া উচিত নয়; বরং সবরের সাথে নিরলসভাবে কাজ করতে হবে আর আল্লাহর তায়ালার নিকট দোআ করতে হবে। কারণ হেদায়াতের মালিক আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নিজেই।

২. নবী পরিবারের সদস্য হওয়া সত্ত্বেও ঈমান না থাকার কারণে নূহের স্ত্রী ও পুত্র যেমন নাজাত লাভে ব্যর্থ হয়েছে, তেমনি এ যুগেও হওয়া সম্ভব। কাফির ও মুশরিক সন্তান বা কোন নিকটাত্মীয়ের মাগফেরাতের জন্য আল্লাহর নিকটে দো'আ করা জায়েয নয়।

৩. শাসকগোষ্ঠীর অপকর্ম ও পথভ্রষ্টতার কারণেই দেশে আল্লাহর গযব নেমে আসে। অতএব তাদেরকেই সবার আগে হুঁশিয়ার হওয়া কর্তব্য। যেমনি যুগেযুগে নবী রাসূলগণের দাওয়াতের প্রধান বিরোধী শক্তি ছিল সে সময়ের পথভ্রষ্ট শাসক ও সমাজপতিরা।

৪. দুনিয়াবী ক্ষমতা, জৌলুস থাকা সত্ত্বেও যালেমরা সময়ের ব্যবধানে সর্বযুগেই নিন্দিত ও ধিকৃত এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। যেমনি ফেরাউন, নমরুদ আবু জেহেল, আবু লাহাবকে আল্লাহ তায়ালা ধ্বংস করেছেন। আর যুগেযুগে নবী রাসূল এবং তাদের উত্তরসূরীরা শাহাদাত, জুলুম-নির্যাতন, কারাবরণ এবং দেশান্তরিত হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে সর্বযুগে বিজয়, নন্দিত ও প্রশংসিত করেছেন। সুতরাং আজকের সময়েও সত্যপন্থীদের বাতিলের মোকাবিলায় বিজয় অবধারিত। কিন্তু শর্ত হচ্ছে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন

---

[৬৪] কুরতুবী, ইবনু কাছীর; হূদ ৪০ আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

মুমিনদের জন্য যে গুণাবলি অর্জনের কথা মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে বলেছেন তা রপ্ত করা।

৫. নবী-রাসূল ও তাঁদের অনুসারীরা সমাজের জুলুম-নির্যাতন, অপপ্রচার গালমন্দ খেয়েও সমাজ ত্যাগ করেন না। আল্লাহ স্বীয় নেককার বান্দাদেরকে তাদের শত্রুদের মোকবিলায় সাহায্য করেন, তাদের শত্রুদের থেকে প্রতিশোধ নিয়ে থাকেন এবং তাদেরকে বিজয় দান করেন। এ বিজয়ের মাধ্যমে মুমিনদের হৃদয় প্রশান্তি দিয়ে ভরে দেন।

৩. হযরত হূদ (আলাইহিস সালাম)

হযরত হূদ (আ.) দুর্ধর্ষ ও শক্তিশালী 'আদ জাতির প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন। আল্লাহর গযবে ধ্বংসপ্রাপ্ত বিশ্বের প্রধান ছয়টি জাতির মধ্যে কওমে নূহ-এর পরে কওমে 'আদ ছিল দ্বিতীয় জাতি। 'আদ সম্প্রদায়ের ১৩টি পরিবার বা গোত্র ছিল। আম্মান হতে শুরু করে হাযারামাউত ও ইয়ামন পর্যন্ত তাদের বসতি ছিল।[৬৫] তাদের ক্ষেত-খামারগুলো ছিল অত্যন্ত সজীব ও শস্যশ্যামল। তাদের প্রায় সব ধরনের বাগ-বাগিচা ছিল। তারা ছিল সুঠামদেহী ও বিরাট বপু সম্পন্ন। আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি অনুগ্রহের দুয়ার খুলে দিয়েছিলেন; কিন্তু বক্রবুদ্ধির কারণে এসব নেমতই তাদের কাল হয়ে দাঁড়ালো। তারা নিজেরা পথভ্রষ্ট হয়েছিল ও অন্যকে পথভ্রষ্ট করেছিল। তারা শক্তি-মদমত্ত হয়ে 'আমাদের চেয়ে শক্তিশালী আর কে আছে' (ফুছছিলাত/হামীম সাজদাহ ১৫) বলে ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করতে শুরু করেছিল। তারা আল্লাহর ইবাদত পরিত্যাগ করে নূহ (আ.)-এর আমলে ফেলে আসা মূর্তিপূজার শিরকের পুনরায় প্রচলন ঘটালো। মাত্র কয়েক পুরুষ আগে ঘটে যাওয়া নূহের সর্বগ্রাসী প্লাবনের কথা তারা বেমালুম ভুলে গেল। ফলে আল্লাহপাক তাদের হেদায়াতের জন্য তাদেরই মধ্য হতে হূদ (আ.)-কে নবী হিসেবে প্রেরণ করলেন।

হূদ (আ.)-এর দাওয়াত ও অস্বীকারকারীদের ওপর আল্লাহর গযব

হযরত হূদ (আ.)-এর দাওয়াত সম্পর্কে কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। হযরত হূদ (আ.)-এর দাওয়াতের সারকথাগুলি হলো– তাওহীদ, তাবলীগ ও ইস্তেগফার। উপরোক্ত তিনটি বিষয়ে সকল নবীই দাওয়াত দিয়েছেন।

হযরত হূদ (আ.) স্বীয় কওমে 'আদকে শিরক পরিত্যাগ করে সার্বিক জীবনে তাওহীদ প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানান। তিনি তাদেরকে মূর্তিপূজা ত্যাগ করার এবং

---

[৬৫] কুরতুবী, আ'রাফ ৬৫।

www.pathagar.com

যুলুম ও অত্যাচার পরিহার করে ন্যায় ও সুবিচারের পথে চলার উদাত্ত আহ্বান জানান। কিন্তু নিজেদের ধনৈশ্বর্যের মোহে এবং দুনিয়াবী শক্তির অহংকারে মদমত্ত হয়ে তারা নবীর দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করে। তারা বলল, তোমার ঘোষিত আযাব কিংবা তোমার কোন মুজেযা না দেখে কেবল তোমার মুখের কথায় আমরা আমাদের বাপ-দাদার আমল থেকে চলে আসা উপাস্য দেব-দেবীদের বর্জন করতে পারি না। বরং আমরা সন্দেহ করছি যে, আমাদের দেবতাদের নিন্দাবাদ করার কারণে তাদের অভিশাপে তোমাকে ভুতে ধরেছে ও মস্তিষ্ক বিকৃত হয়ে তুমি উন্মাদের মত কথাবার্তা বলছ। তাদের এসব কথার উত্তরে হযরত হূদ (আ.) পয়গম্বরসুলভ নির্ভীক কণ্ঠে জবাব দেন যে, তোমরা যদি আমার কথা না মানো, তবে তোমরা সাক্ষী থাক যে, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া তোমাদের ঐসব অলীক উপাস্যদের আমি মানি না। তোমরা ও তোমাদের দেবতারা সবাই মিলে আমার অনিষ্ট সাধনের চেষ্টা কর। তাতে আমার কিছুই হবে না আল্লাহর হুকুম ছাড়া। তিনিই আমার পালনকর্তা। তাঁর ওপরেই আমি ভরসা রাখি। যারা সরল পথে চলে, আল্লাহ তাদের সাহায্য করেন।

অহংকারী ও শক্তি-মদমত্ত জাতির বিরুদ্ধে একাকী এমন নির্ভীক ঘোষণা দেওয়া সত্ত্বেও তারা তাঁর কেশাগ্র স্পর্শ করার সাহস করেনি। বস্তুতঃ এটা ছিল তাঁর একটি মুজেযা বিশেষ। এর দ্বারা তিনি দেখিয়ে দিলেন যে, তাদের কল্পিত দেব-দেবীদের কোন ক্ষমতা নেই। অতঃপর তিনি বললেন, আমাকে যে সত্য পৌঁছানোর দায়িত্ব আল্লাহপাক দিয়েছেন, সে সত্য আমি তোমাদের নিকটে পৌঁছে দিয়েছি। এক্ষণে যদি তোমরা তা প্রত্যাখ্যান করতেই থাক এবং হঠকারিতার উপরে যিদ করতে থাক, তাহলে জেনে রেখ এর অনিবার্য পরিণতি হিসেবে তোমাদের ওপরে আল্লাহর সেই কঠিন শাস্তি নেমে আসবে, যার আবেদন তোমরা আমার নিকটে বারবার করেছ। অতএব তোমরা সাবধান হও। এখনো তওবা করে আল্লাহর পথে ফিরে এসো।

কিন্তু হতভাগার দল হযরত হূদ (আ.)-এর কোন কথায় কর্ণপাত করল না। তারা বরং অহংকারে স্ফীত হয়ে বলে উঠলো, 'আমাদের চেয়ে বড় শক্তিধর (এ পৃথিবীতে) আর কে আছে'? (হা-মীম সাজদাহ ৪১/১৫)। ফলে তাদের ওপরে এলাহী গযব অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠলো। কওমে 'আদ-এর অমার্জনীয় হঠকারিতার ফলে প্রাথমিক গযব হিসেবে উপর্যুপরি তিন বছর বৃষ্টিপাত বন্ধ থাকে। তাদের শস্যক্ষেতসমূহ শুষ্ক বালুকাময় মরুভূমিতে পরিণত হয়। বাগ-বাগিচা জ্বলে-পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। এতদসত্ত্বেও তারা শিরক ও মূর্তিপূজা ত্যাগ করেনি। কিন্তু অবশেষে তারা বাধ্য হয়ে আল্লাহর কাছে বৃষ্টি প্রার্থনা করে। তখন আসমানে সাদা, কালো ও লাল মেঘ দেখা দেয় এবং গায়েবী আওয়ায আসে যে, তোমরা

www.pathagar.com

কোনটি পছন্দ করো? লোকেরা কালো মেঘ কামনা করল। তখন কালো মেঘ এলো। লোকেরা তাকে স্বাগত জানিয়ে বলল, هَذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا 'এটি আমাদের বৃষ্টি দেবে'। জবাবে তাদের নবী হূদ (আ.) বললেন,

بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيْحٌ فِيْهَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ، تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِاَمْرِرَبِّهَا....

'বরং এটা সেই বস্তু যা তোমরা তাড়াতাড়ি চেয়েছিলে। এটা এমন বায়ু যার মধ্যে রয়েছে মর্মন্তুদ আযাব'। "সে তার প্রভুর আদেশে সবাইকে ধ্বংস করে দেবে...' ।[8] ফলে অবশেষে পরদিন ভোরে আল্লাহর চূড়ান্ত গযব নেমে আসে। সাত রাত্রি ও আট দিন ব্যাপী অনবরত ঝড়-তুফান বইতে থাকে। মেঘের বিকট গর্জন ও বজ্রাঘাতে বাড়ী-ঘর সব ধ্বসে যায়, প্রবল ঘুর্ণিঝড়ে গাছ-পালা সব উপড়ে যায়, মানুষ ও জীবজন্তু শূন্যে উত্থিত হয়ে সজোরে যমীনে পতিত হয় (ক্বামার ৫৪/২০; হাক্বক্বাহ ৬৯/৬-৮) এবং এভাবেই শক্তিশালী ও সুঠাম দেহের অধিকারী বিশালবপু 'আদ জাতি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। আল্লাহ বলেন, এছাড়াও তাদের জন্য রয়েছে চিরস্থায়ী অভিসম্পাৎ দুনিয়া ও আখেরাতে (হূদ ১১/৬০)।

গযব নাযিলের প্রাক্কালেই আল্লাহ স্বীয় নবী হূদ ও তাঁর ঈমানদার সাথীদের উক্ত এলাকা ছেড়ে চলে যাবার নির্দেশ দেন ও তাঁরা উক্ত আযাব থেকে রক্ষা পান (হূদ ১১/৫৮)। অতঃপর তিনি মক্কায় চলে যান ও সেখানেই ওফাত পান।[৬৬]

শিক্ষণীয় বিষয়

১. অহির বিধানকে অস্বীকার করা এবং অন্যায়ের উপর যিদ ও অহংকার প্রদর্শন করাই হল পৃথিবীতে আল্লাহর গযব নাযিলের প্রধান কারণ।

২. আল্লাহ প্রেরিত গযবের ধরন বিভিন্ন রূপ হতে পারে। কিন্তু সেই গযবকে ঠেকানোর ক্ষমতা মানুষের থাকে না। আল্লাহর বিধান লংঘনকারী ব্যক্তি বা সম্প্রদায় চূড়ান্ত বিচারে দুনিয়াতেই আল্লাহর গযবের শিকার হয় এবং এই প্রক্রিয়া কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।

৩. বিলাসী, অপচয়কারী ও অত্যাচারী নেতাদের কারণেই জাতি আল্লাহর গযবের শিকার হয়ে থাকে। তাই এমন অপকর্ম থেকে সমাজ এবং রাষ্ট্রকে মুক্ত করার জন্য কিয়ামত পর্যন্ত লড়াই অব্যাহত রাখতে হবে।

৪. আল্লাহর গযব যাদের ওপর আপতিত হয়, তারা সকল যুগে নিন্দিত হয় এবং কখনোই তারা আর মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে না। যুগেযুগে এটি প্রমাণিত হয়ে আসছে।

[৬৬] তাফসীর কুরতুবী, আ'রাফ ৬৫।

www.pathagar.com

৪. হযরত ছালেহ (আলাইহিস সালাম)

‘আদ জাতির ধ্বংসের প্রায় ৫০০ বছর পরে হযরত ছালেহ (আ.) কওমে ছামূদ-এর প্রতি নবী হিসেবে প্রেরিত হন।[৬৭] কওমে ‘আদ ও কওমে ছামূদ ‘ইরাম’-এর দু’টি বংশধারার নাম। কওমে ছামূদ আরবের উত্তর-পশ্চিম এলাকায় বসবাস করত। তাদের প্রধান শহরের নাম ছিল ‘হিজ্র’ যা শামদেশ অর্থাৎ সিরিয়ার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ‘আদ জাতির ধ্বংসের পর ছামূদ জাতি তাদের স্থলাভিষিক্ত হয়। তারাও ‘আদ জাতির মত শক্তিশালী ও বীরের জাতি ছিল। তারা প্রস্তর খোদাই ও স্থাপত্য বিদ্যায় খুবই পারদর্শী ছিল। সমতল ভূমিতে বিশালকায় অট্টালিকা নির্মাণ ছাড়াও পর্বতগাত্র খোদাই করে তারা নানা রূপ প্রকোষ্ঠ নির্মাণ করত। পার্থিব বিত্ত-বৈভব ও ধনৈশ্বর্যের পরিণতি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অশুভ হয়ে থাকে। বিত্তশালীরা আল্লাহ ও আখেরাতকে ভুলে গিয়ে ভ্রান্ত পথে পা বাড়ায়। ছামূদ জাতির বেলায়ও তাই হয়েছিল। তারা ‘আদ জাতির মত অহংকারী কার্যকলাপ শুরু করে দিল। তারা শিরক ও মূর্তিপূজায় লিপ্ত হল। এমতাবস্থায় তাদের হেদায়াতের জন্য তাদেরই বংশের মধ্য হতে ছালেহ (আ.)-কে আল্লাহ নবী মনোনীত করে পাঠালেন।

হযরত ছালেহ (আ.)-এর দাওয়াত ও অস্বীকারকারীদের ওপর আল্লাহর গযব

পথভোলা জাতিকে হযরত ছালেহ (আ.) সর্বপ্রথম তাওহীদের দাওয়াত দিলেন। তিনি তাদেরকে মূর্তিপূজাসহ যাবতীয় শিরক ও কুসংস্কার ত্যাগ করে এক আল্লাহর ইবাদত ও তাঁর প্রেরিত বিধানসমূহের প্রতি আনুগত্যের আহবান জানালেন। তিনি যৌবনকালে নবুওয়াপ্রাপ্ত হন। তখন থেকে বার্ধক্যকাল অবধি তিনি স্বীয় কওমকে নিরন্তর দাওয়াত দিতে থাকেন। কওমের দুর্বল শ্রেণির লোকেরা তাঁর ওপরে ঈমান আনলেও শক্তিশালী ও নেতৃস্থানীয় লোকেরা তাঁকে অস্বীকার করে। ইতিপূর্বেকার ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিগুলোর ন্যায় কওমে ছামূদও তাদের নবী হযরত ছালেহ (আ.)-কে অমান্য করে। তারা বিগত ‘আদ জাতির ন্যায় পৃথিবীতে অনর্থক ফাসাদ সৃষ্টি করতে থাকে। নবী তাদেরকে যতই দাওয়াত দিতে থাকেন, তাদের অবাধ্যতা ততই সীমা লংঘন করতে থাকে। ‘তারা বলল,

قَالُوْا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِيْنَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هٰذَا اَتَنْهَانَا اَنْ نَّعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَاِنَّنَا لَفِيْ شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُوْنَا اِلَيْهِ مُرِيْبٍ.

---

[৬৭] তারীখুল আম্বিয়া ১/৪৯ পৃঃ।

www.pathagar.com

হে ছালেহ! ইতিপূর্বে আপনি আমাদের কাছে আকাঙ্ক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন। আপনি কি বাপ-দাদার আমল থেকে চলে আসা উপাস্যদের পূজা করা থেকে আমাদের নিষেধ করছেন? অথচ আমরা আপনার দাওয়াতের বিষয়ে যথেষ্ট সন্দিহান' (হূদ ১১/৬২)। তারা কওমের দুর্বল ও দরিদ্র শ্রেণির লোকদের হযরত ছালেহ (আ.)-এর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে নানাভাবে প্ররোচনা দিতে থাকে। এভাবে সমাজের শক্তিশালী শ্রেণি তাদের নবীকে অমান্য করল এবং মূর্তিপূজাসহ নানাবিধ শিরক ও কুসংস্কারে লিপ্ত হল এবং সমাজে অনর্থ সৃষ্টি করতে থাকল। আল্লাহর ভাষায়,

فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُوْنِ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ -

'তারা হেদায়াতের চাইতে অন্ধত্বকেই পছন্দ করে নিল। অতঃপর তাদের কৃতকর্মের ফলে অবমাননাকর শাস্তির গর্জন এসে তাদের পাকড়াও করল' (ফুছছিলাত/হামীম সাজদাহ ৪১/১৭)।

ইবনু কাছীর বর্ণনা করেন যে, হযরত ছালেহ (আ.)-এর নিরন্তর দাওয়াতে অতিষ্ঠ হয়ে সম্প্রদায়ের নেতারা স্থির করল যে, তাঁর কাছে এমন একটা বিষয় দাবী করতে হবে, যা পূরণ করতে তিনি ব্যর্থ হবেন এবং এর ফলে তাঁর দাওয়াতও বন্ধ হয়ে যাবে। তারা দাবী করল যে, আপনি যদি আল্লাহর সত্যিকারের নবী হন, তাহলে আমাদেরকে নিকটবর্তী 'কাতেবা' পাহাড়ের ভিতর থেকে একটি দশ মাসের গর্ভবতী সবল ও স্বাস্থ্যবতী উষ্ট্রী বের করে এনে দেখান।

এ দাবী শুনে হযরত ছালেহ (আ.) তাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিলেন যে, যদি তোমাদের দাবী পূরণ করা হয়, তবে তোমরা আমার নবুওয়াতের প্রতি ও আমার দাওয়াতের প্রতি ঈমান আনবে কি-না। জেনে রেখ, উক্ত মুজেযা প্রদর্শনের পরেও যদি তোমরা ঈমান না আনো, তাহলে আল্লাহর গযবে তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে'। এতে সবাই স্বীকৃত হল ও উক্ত মর্মে অঙ্গীকার করল। তখন ছালেহ (আ.) ছালাতে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং আল্লাহর নিকটে প্রার্থনা করলেন। আল্লাহপাক তার দোআ কবুল করলেন এবং বললেন,

إِنَّا مُرْسِلُو النَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ-

'আমরা তাদের পরীক্ষার জন্য একটি উষ্ট্রী প্রেরণ করব। তুমি তাদের প্রতি লক্ষ্য রাখ এবং ধৈর্য ধারণ কর' (ক্বামার ৫৪/২৭)। কিছুক্ষণের মধ্যেই পাহাড়ের গায়ে কম্পন দেখা দিল এবং একটি বিরাট প্রস্তর খণ্ড বিস্ফোরিত হয়ে তার ভিতর থেকে কওমের নেতাদের দাবীর অনুরূপ একটি গর্ভবতী ও লাবণ্যবতী তরতাযা উষ্ট্রী বেরিয়ে এল।

www.pathagar.com

ছালেহ (আ.)-এর এই বিস্ময়কর মুজেযা দেখে গোত্রের নেতাসহ তার সমর্থক লোকেরা সাথে সাথে মুসলমান হয়ে গেল। অবশিষ্টরাও হওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করল; কিন্তু প্রধান ধর্মনেতা ও অন্যান্য সমাজ-নেতাদের বাধার কারণে হতে পারল না। তারা উল্টা বলল, قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ ...- 'আমরা তোমাকে ও তোমার সাথে যারা আছে তাদেরকে অকল্যাণের প্রতীক মনে করি...' (নামল ২৭/৪৭)। হযরত ছালেহ (আ.) কওমের নেতাদের এভাবে অঙ্গীকার ভঙ্গ করতে দেখে এবং পাল্টা তাঁকেই দায়ী করতে দেখে দারুণভাবে শঙ্কিত হলেন যে, যেকোন সময়ে এরা আল্লাহর গযবে ধ্বংস হয়ে যাবে। তিনি তাদেরকে সাবধান করে বললেন,

قَالَ طَائِرُكُمْ عِندَ اللهِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ-

"দেখ, তোমাদের মঙ্গলামঙ্গল আল্লাহর নিকটে রয়েছে। বরং তোমরা এমন সম্প্রদায়, যাদেরকে পরীক্ষা করা হচ্ছে' (নামল ২৭/৪৭)।

অতঃপর পয়গম্বরসুলভ দয়া প্রকাশ করে বললেন,

هَٰذِهِ نَاقَةُ اللهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللهِ وَلاَ تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ-

'এটি আল্লাহর উষ্ট্রী। তোমাদের জন্য নিদর্শন স্বরূপ। একে আল্লাহর যমীনে স্বাধীনভাবে চরে বেড়াতে দাও। সাবধান! একে অসৎ উদ্দেশ্যে স্পর্শ করো না। তাহলে তোমাদেরকে সত্বর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি পাকড়াও করবে' (হূদ ১১/৬৪)।

অতঃপর তাদের মধ্যকার দুই যুবক ঐ উষ্ট্রীকে হত্যা করলো। উষ্ট্রী হত্যার ঘটনার পর ছালেহ (আ.) স্বীয় কওমকে আল্লাহর নির্দেশ জানিয়ে দিলেন যে,

تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ ذَٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ-

'এখন থেকে তিন দিন তোমরা তোমাদের ঘরে আরাম করে নাও (এর পরেই আযাব নেমে আসবে)। এ ওয়াদার (অর্থাৎ এ সময়সীমার) কোন ব্যতিক্রম হবে না' (হূদ ১১/৬৫)। কিন্তু এই হতভাগারা এরূপ কঠোর হুঁশিয়ারির কোন গুরুত্ব না দিয়ে বরং তাচ্ছিল্যভরে বলল,

يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ-

"হে ছালেহ! তুমি যার ভয় দেখাচ্ছ, তা নিয়ে আস দেখি, যদি তুমি সত্যিকারের নবী হয়ে থাক।' (আ'রাফ ৭/৭৭)। তারা বলল, আমরা জানতে চাই, এ শাস্তি কিভাবে আসবে, কোত্থেকে আসবে, এর লক্ষণ কি হবে? ছালেহ (আ.) বললেন, আগামীকাল বৃহস্পতিবার তোমাদের সকলের মুখমণ্ডল হলুদ হয়ে যাবে। পরের

www.pathagar.com

দিন শুক্রবার তোমাদের সবার মুখমণ্ডল লালবর্ণ ধারণ করবে। অতঃপর শনিবার দিন সবার মুখমণ্ডল ঘোর কৃষ্ণবর্ণ হয়ে যাবে। এটাই হবে তোমাদের জীবনের শেষ দিন।[৬৮]

একথা শোনার পর হঠকারী জাতি আল্লাহর নিকটে তওবা করে ক্ষমা প্রার্থনার পরিবর্তে স্বয়ং ছালেহ (আ.)-কেই হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেয়। কওমের নয় জন নেতা এ নিকৃষ্ট ষড়যন্ত্রের নেতৃত্ব দেয়। তারা রাতে ছালেহ (আ.)-কে হত্যা করার জন্য তাঁর বাড়ীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হল। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা পথিমধ্যেই তাদেরকে প্রস্তর বর্ষণে ধ্বংস করে দিলেন। নির্ধারিত দিনে গযব নাযিল হওয়ার প্রাক্কালেই আল্লাহর হুকুমে হযরত ছালেহ (আ.) স্বীয় ঈমানদার সাথীগণকে নিয়ে এলাকা ত্যাগ করেন। যাওয়ার সময় তিনি স্বীয় কওমকে উদ্দেশ্য করে বলেন,

يَا قَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّيْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِن لاَ تُحِبُّوْنَ النَّاصِحِيْنَ-

“হে আমার জাতি! আমি তোমাদের কাছে স্বীয় পালনকর্তার পয়গাম পৌঁছে দিয়েছি এবং সর্বদা তোমাদের কল্যাণ কামনা করেছি; কিন্তু তোমরা তোমাদের কল্যাণকামীদের ভালবাসো না' (আ'রাফ ৭/৭৯)।

হযরত ছালেহ (আ.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী বৃহস্পতিবার ভোরে অবিশ্বাসী কওমের সকলের মুখমণ্ডল গভীর হলুদ বর্ণ ধারণ করল; কিন্তু তারা ঈমান আনল না বা তওবা করল না। বরং উল্টা হযরত ছালেহ (আ.)-এর ওপর চটে গেল ও তাঁকে হত্যা করার জন্য খুঁজতে লাগল। দ্বিতীয় দিন সবার মুখমণ্ডল লাল বর্ণ ও তৃতীয় দিন ঘোর কৃষ্ণবর্ণ হয়ে গেল। তখন সবই নিরাশ হয়ে গযবের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। চতুর্থ দিন রবিবার সকালে সবাই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি নিয়ে সুগন্ধি মেখে অপেক্ষা করতে থাকে।[৬৯] এমতাবস্থায় ভীষণ ভূমিকম্প শুরু হল এবং উপর থেকে বিকট ও ভয়াবহ এক গর্জন শোনা গেল। ফলে সবাই যার যার স্থানে একযোগে অধোমুখী হয়ে ভূতলশায়ী হল।

শিক্ষণীয় বিষয়

১. সমাজের মুষ্টিমেয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ও এলিট শ্রেণি সবার আগে শয়তানের পাতানো ফাঁদে পা দেয় ও সমাজকে বিপদগামিতার পথে আহ্বান করে এবং তাদেরকে ধ্বংসের পথে পরিচালনা করে জাহান্নামের

[৬৮] তাফসীর ইবনু কাছীর, সূরা আ'রাফ ৭৭-৭৮।

[৬৯] ইবনু কাছীর, সূরা আ'রাফ ৭৩-৭৮।

www.pathagar.com

দিকে নিয়ে যায়। আজকের সময়েও এই শ্রেণির ব্যক্তিবর্গরাই সমাজের মানুষকে সবচেয়ে বিপদগামি করছে। তাদের হাত থেকে দেশ, জাতি ও সমাজকে রক্ষা করার জন্য প্রচেষ্টা চালানো প্রত্যেক ঈমানদারের ওপর ফরজ।

২. অবিশ্বাসীরা মূলতঃ দুনিয়াবী স্বার্থে আল্লাহ প্রেরিত শরী'আতে বিশ্বাস ও তদনুযায়ী আমল প্রত্যাখ্যান করে এবং নিজেদের কল্পিত শিরকী আক্বীদায় বিশ্বাস ও তদনুযায়ী আমলে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে এবং তারা সর্বদা তাদের বাপ-দাদা ও প্রচলিত প্রথার দোহাই দেয়। তারা কুরআন ও সুন্নাহ বিরোধী বিভিন্ন কল্পকাহিনী চালু করার চেষ্টা চালায়।

৩. নবী ও সংস্কারকদের বিরুদ্ধে শাসক ও সমাজ নেতাগণ যুলুম করলে সরাসরি আল্লাহর গযব নেমে আসা অবশ্যম্ভাবী। যুগে-যুগে সত্যপন্থীরা যেমনি এই পথে পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছে তেমনি আল্লাহর সাহায্যও তারা লাভ করেছেন।

৪. মানুষকে বিপথে নেয়ার জন্য শয়তানের সবচাইতে বড় হাতিয়ার হল নারী ও অর্থ-সম্পদ। এক্ষেত্রে মুমিনদের সর্বাবস্থায় সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

৫. কখনো মাত্র একজন বা দু'জনের কারণে গোটা সমাজ ধ্বংস হয়ে যায়।

৬. সত্য ও মিথ্যার দ্বন্দ্বে অবশেষে সত্যসেবীরাই বিজয় লাভ করে।

৫. হযরত ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)

ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) ছিলেন হযরত নূহ (আ.)-এর সম্ভবত: এগারোতম অধঃস্তন পুরুষ। নূহ থেকে ইবরাহীম পর্যন্ত প্রায় ২০০০ বছরের ব্যবধান ছিল। হযরত ছালেহ (আ.)-এর প্রায় ২০০ বছর পরে ইবরাহীমের আগমন ঘটে। ঈসা থেকে ব্যবধান ছিল ১৭০০ বছর অথবা প্রায় ২০০০ বছরের। তিনি ছিলেন 'আবুল আম্বিয়া' বা নবীগণের পিতা এবং তাঁর স্ত্রী 'সারা' ছিলেন 'উম্মুল আম্বিয়া' বা নবীগণের মাতা। কেননা আদম (আ.) হতে ইবরাহীম (আ.) পর্যন্ত ১০/১২ জন নবী বাদে শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) পর্যন্ত ১ লাখ ২৪ হাজার পয়গম্বরের প্রায় সকলেই ছিলেন ইবরাহীম (আ.)-এর বংশধর। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে,

إِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى آدَمَ وَنُوْحًا وَآلَ إِبْرَاهِيْمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِيْنَ -

'নিশ্চয়ই আল্লাহ আদম, নূহ, আলে ইবরাহীম ও আলে ইমরানকে বিশ্ববাসীর উপরে নির্বাচিত করেছেন' (আলে ইমরান ৩/৩৩)। এই নির্বাচন ছিল বিশ্ব

www.pathagar.com

সমাজে আল্লাহর তাওহীদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য। তাঁর স্ত্রী সারার পুত্র হযরত ইসহাক্ব-এর পুত্র ইয়াকূব (আ.)-এর বংশধর 'বনু ইসরাঈল' নামে পরিচিত এবং অপর স্ত্রী হাজেরার পুত্র হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর বংশে জন্ম নেন বিশ্বনবী ও শেষনবী হযরত মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)। যাঁর অনুসারীগণ 'উম্মতে মুহাম্মাদী' বা 'মুসলিম উম্মাহ' বলে পরিচিত। তিনি ৪০ বছর বয়সে নবুওয়াত লাভ করেন। উম্মতে মুসলিমার পিতা হযরত ইবরাহীম (আ.) পশ্চিম ইরাকের বছরার নিকটবর্তী 'বাবেল' শহরে জন্মগ্রহণ করেন।

ইবরাহীম (আ.)-এর দাওয়াত ও ঈমানের অগ্নি পরীক্ষা

সকল নবীর ন্যায় ইবরাহীম (আ.) স্বীয় কওমকে প্রথমে তাওহীদের দাওয়াত দেন। তিনি প্রথমে তার পিতাকে ইসলামের দাওয়াত দেন; কিন্তু ইবরাহীমের এই প্রাণভরা আবেদন পিতা আযরের হৃদয় স্পর্শ করল না। পুত্রের আকুতিপূর্ণ দাওয়াতের উত্তরে পিতা বলল,

قَالَ اَرَاغِبٌ اَنْتَ عَنْ آلِهَتِيْ يَا اِبْرَاهِيْمُ لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَاَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِيْ مَلِيًّا.

"হে ইবরাহীম! তুমি কি আমার উপাস্যদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ? যদি তুমি বিরত না হও, তবে আমি অবশ্যই পাথর মেরে তোমার মাথা চূর্ণ করে দেব। তুমি আমার সম্মুখ হতে চিরতরের জন্য দূর হয়ে যাও' (মারিয়াম ১৯/৪৬)। পিতার এই কঠোর ধমকি শুনে পুত্র ইবরাহীম বললেন,

قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَاَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّيْ اِنَّهُ كَانَ بِيْ حَفِيًّا. وَاَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ وَاَدْعُوْ رَبِّيْ عَسَى اَلَّا اَكُوْنَ بِدُعَاءِ رَبِّيْ شَقِيًّا.

"তোমার উপরে শান্তি বর্ষিত হোক! আমি আমার পালনকর্তার নিকটে তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব। নিশ্চয়ই তিনি আমার প্রতি মেহেরবান'। 'আমি পরিত্যাগ করছি তোমাদেরকে এবং আল্লাহ ব্যতীত যাদের তোমরা পূজা কর তাদেরকে। আমি আমার পালনকর্তাকে আহ্বান করব। আশা করি আমার পালনকর্তাকে আহ্বান করে আমি বঞ্চিত হব না' (মারিয়াম ১৯/৪৭-৪৮)।

অতঃপর ইব্রাহিম (আ.) সমাজের লোকদের কাছে ইসলামে দাওয়াত প্রদান করেন। ইবরাহীম (আ.) তাদেরকে এক আল্লাহর ইবাদতের দিকে দাওয়াত দেন। তিনি মূর্তিপূজার অসারতার বিষয়টি তাদের সামনে বলে দেন। মূর্তিপূজারীদের কোন সঙ্গত জবাব ছিল না। তারা কেবল একটা কথাই বলেছিল

www.pathagar.com

যে, এটা আমাদের বাপ-দাদাদের আমল থেকে চলে আসা প্রথা। অবশেষে তার পিতা তাকে ঘর থেকে বের করে দিল; কিন্তু তিনি সমাজের লোকদের কাছে তার দাওয়াত অব্যাহত রাখেন। যদিও তার ফলশ্রুতি ছিল পূর্বের ন্যায় শূন্য। একইভাবে তিনি তারকাপূজারীদের কাছে দাওয়াত দিলেও তারা তা প্রত্যাখ্যান করে।

একদিন হযরত ইব্রাহিম (আ.) মূর্তিপূজারীদের মূর্তি ভাঙেন এবং মূর্তির অপারগতা সম্পর্কে তাদেরকে শিক্ষা দেয়ার চেষ্টা করেন। অবশেষে তারা হিদায়াত গ্রহণ না করে তাকে শাস্তি দেয়ার পরিকল্পনা করে। তারা সিদ্ধান্ত নিল যে, একে আর বাঁচতে দেওয়া যাবে না। শুধু তাই নয়, একে এমন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়ে মারতে হবে, যেন কেউ এর দলে যেতে সাহস না করে। তারা তাঁকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার প্রস্তাব গ্রহণ করল এবং সেটা বাদশাহ নমরূদের কাছে পেশ করল। সম্রাটের মন্ত্রী ও দেশের প্রধান পুরোহিতের ছেলে ইবরাহীম। অতএব তাকে সরাসরি সম্রাটের দরবারে আনা হল। অবশেষে বাদশাহ নমরূদের দরবারে তাকে নিয়ে আসা হলো এবং তাকে আগুনে পুড়িয়ে মারার সিদ্ধান্ত নেয়া হলো; কিন্তু জালিমের সামনে মাথা নত করেননি হযরত ইবরাহীম (আ.); বরং সর্বদা ছিলেন তাওহীদের চেতনায় বলিয়ান। বস্তুতঃ এই কঠিন মুহূর্তের পরীক্ষায় জয়লাভ করার পুরস্কার স্বরূপ সাথে সাথে আল্লাহর নির্দেশ এল–

قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَّسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ.

"হে আগুন! ঠাণ্ডা হয়ে যাও এবং ইবরাহীমের উপরে শান্তিদায়ক হয়ে যাও' (আম্বিয়া ২১/৬৯)। অতঃপর ইবরাহীম মুক্তি পেলেন।

অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ইবরাহীম (আ.) ফিরে আসেন এবং এভাবে আল্লাহ কাফিরদের সমস্ত কৌশল বরবাদ করে দেন। এরপর শুরু হল জীবনের আরেক অধ্যায়। তিনি মিসর ও সিরিয়া, কিনান এবং সবশেষে মক্কায় ইসলাম প্রচার করেন। এসময় তিনি দুর্ভিক্ষ, স্ত্রীর হাজেরার নির্বাসন, ইসমাইলকে কুরবানী ইত্যাদি নানবিধ পরীক্ষার মুখোমুখি হন।

বায়তুল্লাহ নির্মাণ : বায়তুল্লাহ প্রথমে ফেরেশতাগণ নির্মাণ করেন। অতঃপর হযরত আদম (আ.) পুনর্নিমাণ করেন জিব্রীলের ইঙ্গিত মতে। তারপর নূহের তুফানের সময় বায়তুল্লাহর প্রাচীর বিনষ্ট হলেও ভিত্তি আগের মতই থেকে যায়। পরবর্তীতে আল্লাহর হুকুমে একই ভিত্তিভূমিতে ইবরাহীম তা পুননির্মাণ করেন। আল্লাহর ইচ্ছায় তখন থেকে অদ্যাবধি কা'বা গৃহে অবিরত ধারায় হজ্জ ও ত্বাওয়াফ চালু আছে এবং হরম ও তার অধিবাসীগণ পূর্ণ শান্তি, নিরাপত্তা ও মর্যাদাসহকারে সেখানে বসবাস করে আসছেন। এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন,

www.pathagar.com

وَاِذْ بَوَّأْنَا لِاِبْرَاهِيْمَ مَكَانَ الْبَيْتِ اَن لاَ تُشْرِكْ بِيْ شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِيْنَ وَالْقَائِمِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ-

'আর যখন আমরা ইবরাহীমকে বায়তুল্লাহর স্থান ঠিক করে দিয়ে বলেছিলাম যে, আমার সাথে কাউকে শরীক করো না এবং আমার গৃহকে পবিত্র রাখো তাওয়াফকারীদের জন্য, ছালাতে দণ্ডায়মানদের জন্য ও রুকূ-সিজদাকারীদের জন্য' (হজ্জ ২২/২৬)।

শিক্ষণীয় বিষয়

১. হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর জীবন থেকে প্রধান শিক্ষণীয় বিষয় হল সর্বাবস্থায় আল্লাহর নিকটে আত্মসমর্পণ। যাকে বলা হয় 'ইসলাম'।

২. আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তাঁর নির্দেশে সবচেয়ে প্রিয় জিনিস কুরবানী করার জন্য প্রতিটি মুমিন বান্দাকে প্রস্তুত থাকতে হবে। যেমনি হযরত ইব্রাহীম (আ.) নিজ সন্তানকে কুরবানী দেয়ার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন।

৩. চোখে দেখা বিপদ-মুসিবত যতই কঠিন হোক না কেন আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের তার ওপর তাওয়াক্কুল করে অগ্রসর হওয়া। এতে আল্লাহর সাহায্য অনিবার্য। যেমনি হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর জন্য আল্লাহ তায়ালা আগুনকেও ঠাণ্ডায় রূপান্তরিত করেছেন।

৪. আল্লাহর পক্ষ থেকে যতরকম পরীক্ষাই আসুক না কেন তা সাহসিকতার সাথে মোকাবিলা করতে হয়। কোন ধরনের ভয়ভীতি ও শয়তানী প্ররোচনায় না পড়ে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এগিয়ে গেলে আল্লাহর সাহায্য অনিবার্য। কেননা এসকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার মধ্যেই থাকে ইহকালীন ও পরকালীন সফলতা।

৬. হযরত লূত (আলাইহিস সালাম)

হযরত লূত (আ.) ছিলেন হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ভাতিজা। চাচার সাথে তিনিও জন্মভূমি 'বাবেল' শহর থেকে হিজরত করে বায়তুল মুক্বাদ্দাসের অদূরে কেন'আনে চলে আসেন। আল্লাহ লূত (আ.)-কে নবুওয়াত দান করেন এবং কেন'আন থেকে অল্প দূরে জর্ডান ও বায়তুল মুক্বাদ্দাসের মধ্যবর্তী 'সাদূম' অঞ্চলের অধিবাসীদের পথ প্রদর্শনের জন্য প্রেরণ করেন। হযরত লূত (আ.) সামূদ শহরে বসবাস করতেন।

লূত (আ.)-এর দাওয়াত ও অস্বীকারকারীদের ওপর আল্লাহর আযাব

লূত (আ.)-এর কওম আল্লাহর ইবাদত ছেড়ে শিরক ও কুফরীতে লিপ্ত হয়েছিল। দুনিয়াবী উন্নতির চরম শিখরে উন্নীত হওয়ার কারণে তারা সীমা লঙ্ঘনকারী জাতিতে পরিণত হয়েছিল। ন্যায়-অনাচার ও নানাবিধ দুষ্কর্ম তাদের মজ্জাগত

www.pathagar.com

অভ্যাসে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। এমনকি পুংমৈথুন বা সমকামিতার মত নোংরামিতে তারা লিপ্ত হয়েছিল, যা ইতিপূর্বেকার কোন জাতির মধ্যে পরিদৃষ্ট হয়নি। জন্তু-জানোয়ারের চেয়ে নিকৃষ্ট ও হঠকারী এই কওমের হেদায়াতের জন্য আল্লাহ লূত (আ.)-কে প্রেরণ করলেন। তিনি এসে পূর্বেকার নবীগণের ন্যায় প্রথমে তাদেরকে তাওহীদের দাওয়াত দিয়ে বললেন,

إِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ أَمِيْنٌ، فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِيْعُوْنِ، وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِيْنَ-

'আমি তোমাদের জন্য বিশ্বস্ত রাসূল। অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। আমি এর জন্য তোমাদের নিকটে কোনরূপ প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান তো বিশ্বপ্রভু আল্লাহ দিবেন' (শো'আরা ২৬/১৬২-১৬৫)। অতঃপর তিনি তাদের বদভ্যাসের প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন,

أَتَأْتُوْنَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِيْنَ-

'বিশ্ববাসীর মধ্যে কেন তোমরাই কেবল পুরুষদের নিকটে (কুকর্মের উদ্দেশ্যে) এসে থাক'? (আ'রাফ ৭/৮১) 'আর তোমাদের স্ত্রীগণকে বর্জন কর, যাদেরকে তোমাদের জন্য তোমাদের পালনকর্তা সৃষ্টি করেছেন? নিঃসন্দেহে তোমরা সীমা লঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়' (শো'আরা ২৬/১৬৫-১৬৬)। নিজ কওমের প্রতি হযরত লূত (আ.)-এর দাওয়াতের ফলশ্রুতি মর্মান্তিক রূপে প্রতিভাত হয়। তারা এতই হঠকারী ও নিজেদের পাপকর্মে অন্ধ ও নির্লজ্জ ছিল যে, তাদের কেবল একটাই জবাব ছিল, তুমি যে গযবের ভয় দেখাচ্ছ, তা নিয়ে আস দেখি? কিন্তু কোন নবীই স্বীয় কওমের ধ্বংস চান না। তাই তিনি ছবর করেন ও তাদেরকে বারবার উপদেশ দিতে থাকেন। তারা আল্লাহভীতি থেকে বেপরওয়া হয়ে অসংখ্য পাপকর্মে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে। কুরআন তাদের তিনটি প্রধান পাপ কর্মের উল্লেখ করেছে। (১) পুংমৈথুন, (২) রাহাজানি এবং (৩) প্রকাশ্য মজলিসে কুকর্ম করা (আনকাবূত ২৯/২৯)।

তারা এমন বদ্ধ নেশায় মত্ত হয় যে, লূত (আ.)-এর উপদেশবাণী ও আল্লাহর গযবের ভীতি প্রদর্শন তাদের হৃদয়ে কোন রেখাপাত করেনি। উল্টা তারা তাদের নবীকেই শহর থেকে বের করে দেবার হুমকি দেয় এবং বলে যে, "তোমার প্রতিশ্রুত আযাব এনে দেখাও, যদি তুমি সত্যবাদী হও' (আনকাবূত ২৯/২৯)। তখন লূত (আ.) বিফল মনোরথ হয়ে আল্লাহর সাহায্য কামনা করলেন। ফলে যথারীতি গযব নেমে এল।

আল্লাহর হুকুমে কয়েকজন ফেরেশতা মানুষের রূপ ধারণ করে প্রথমে হযরত ইবরাহীমের বাড়ীতে পদার্পণ করলেন। ফেরেশতাগণ নবীকে অভয় দিয়ে

www.pathagar.com

নিজেদের পরিচয় দিয়ে বললেন, 'আমরা এসেছি অমুক শহরগুলি ধ্বংস করে দিতে। ইবরাহীম একথা শুনে বললেন, "সেখানে যে লূত আছে। তারা বললেন, সেখানে কারা আছে, আমরা তা ভালভাবেই জানি। আমরা অবশ্যই তাকে ও তার পরিবারকে রক্ষা করব, তবে তাঁর স্ত্রী ব্যতীত। সে ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে' (আনকাবূত ২৯/৩১-৩২)।

কেন'আনে ইবরাহীম (আ.)-এর কাছ থেকে বিদায় হয়ে ফেরেশতাগণ সাদূম নগরীতে 'লূত (আ.)-এর গৃহে উপস্থিত হ'লেন' (হিজর ১৫/৬১)। কিন্তু সামূদ জাতিরা সুদর্শন পুরুষরূপে আগত ফেরেশতাদের সাথেও কুকর্ম করতে উদ্যত হলো। অবশেষে জিবরীল তাদের দিকে পাখার ঝাপটা মারতেই বীর পুরুষেরা সব অন্ধ হয়ে ভেগে গেল। অতঃপর ফেরেশতাগণ হযরত লূত (আ.)-কে স্বীয় পরিবারবর্গসহ (তার বৃদ্ধা স্ত্রী ব্যতীত) শহর ছেড়ে চলে যেতে নির্দেশ দেন। অতঃপর আল্লাহর হুকুমে অতি প্রত্যুষে গযব কার্যকর হয়। লূত ও তাঁর সাথীগণ যখন নিরাপদ দূরত্বে পৌঁছেন, তখন জিবরীল (আ.) আল্লাহর নির্দেশ পাওয়া মাত্র ছুবহে ছাদিক-এর সময় একটি প্রচণ্ড নিনাদের মাধ্যমে তাদের শহরগুলোকে উপরে উঠিয়ে উপুড় করে ফেলে দিলেন এবং সাথে সাথে প্রবলবেগে ঘূর্ণিবায়ুর সাথে প্রস্তর বর্ষণ শুরু হয়। যেমন– মহান আল্লাহ বলেন,

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ-

'অবশেষে যখন আমাদের হুকুম এসে পৌঁছল, তখন আমরা উক্ত জনপদের উপরকে নীচে করে দিলাম এবং তার উপরে ক্রমাগত ধারায় মেটেল প্রস্তর বর্ষণ করলাম'। 'যার প্রতিটি তোমার প্রভুর নিকটে চিহ্নিত ছিল। আর ঐ ধ্বংসস্থলটি (বর্তমান আরবীয়) যালেমদের থেকে বেশি দূরে নয়' (হূদ ১১/৮২-৮৩)।

এ গযবে লূতের স্ত্রীও ধ্বংস হয়েছিলো।

শিক্ষণীয় বিষয়

১. বান্দার প্রতিটি ভাল কিংবা মন্দ কাজ আল্লাহর সরাসরি দৃষ্টিতে রয়েছে। বান্দার সৎকাজে তিনি খুশী হন ও মন্দকাজে নাখোশ হন।

২. নবী কিংবা কোন সংস্কারক না পাঠিয়ে, তাদের নিকট আল্লাহর বাণী না পৌঁছানো পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালা কোন অবাধ্য কওমকে ধ্বংসকারী আযাবে নিপতিত করেন না।

৩. কওমের নেতারা ও ধনিক শ্রেণি প্রথমে পথভ্রষ্ট হয় ও সমাজকে বিপথে নিয়ে যায়। তারা সর্বদা পূর্বেকার রীতি-নীতির দোহাই দেয় এবং তাদের হঠকারিতা ও অহংকারী কার্যকলাপের ফলেই আল্লাহর চূড়ান্ত গযব নেমে

www.pathagar.com

আসে (ইসরা ১৭/১৬; যুখরুফ ৪৩/২৩)। অতএব নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সর্বদা দূরদর্শী ও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করা আবশ্যক।

৪. সমকামীতা ইসলামে ঘৃণিত অপরাধ ও পাপাচরের শামিল। আজকের সময়েও এক শ্রেণির পথভ্রষ্টরা অধিকারের নামে সমকামিতা এবং সমকামিদের বিবাহের কথা বলছে। তাহলে অতীতের জাতিগুলোর মত আজকেও সামাজিক বিপর্যয় এবং আল্লাহর গযব নেমে আসবে এবং সমাজে মানব বংশবৃদ্ধির বিস্তার রুদ্ধ হয়ে পড়বে। যে অপরাধের কারণে পশ্চিমা সমাজ আজ সঙ্কুচিত হয়ে আসছে।

৫. ঈমান না থাকলে কেবল বংশ বা আত্মীয়তার সম্পর্ক মানুষকে আল্লাহর গযব থেকে মুক্তি দিতে পারে না।

৭. হযরত ইসমাঈল (আলাইহিস সালাম)

হযরত ইসমাঈল (আ.) ছিলেন পিতা ইবরাহীম (আ.)-এর জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং মা হাজেরার গর্ভজাত একমাত্র সন্তান। ঐ সময়ে ইবরাহীমের বয়স ছিল ৮৬ বছর।[৭৩] শিশু বয়সে তাঁকে ও তাঁর মাকে পিতা ইবরাহীম (আ.) আল্লাহর নির্দেশে মক্কার বিজন ভূমিতে রেখে আসেন। সেখানে ইবরাহীমের দো'আর বরকতে আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহে যমযম কূপের সৃষ্টি হয়। অতঃপর ইয়ামনের ব্যবসায়ী কাফেলা বনু জুরহুম গোত্র কর্তৃক মা হাজেরার আবেদনক্রমে সেখানে আবাদী শুরু হয়।

আল্লাহর রাহে জীবন কুরবানী

১৪ বছর বয়সে আল্লাহর হুকুমে মক্কার অনতিদূরে মিনা প্রান্তরে সংঘটিত হয় বিশ্ব ইতিহাসের বিস্ময়কর ত্যাগ ও কুরবানীর ঘটনা। পিতা ইবরাহীম কর্তৃক পুত্র ইসমাঈলকে স্বহস্তে কুরবানীর উক্ত ঘটনায় শতবর্ষীয় পিতা ইবরাহীমের ভূমিকা যাই-ই থাকুক না কেন চৌদ্দ বছরের তরুণ ইসমাঈলের ঈমান ও আত্মত্যাগের একমাত্র নমুনা ছিলেন তিনি নিজেই। তিনি স্বেচ্ছায় নিজেকে সমর্পণ না করলে পিতার পক্ষে পুত্র কুরবানীর ঘটনা সম্ভব হত কি-না সন্দেহ। তাই ঐ সময় নবী না হলেও নবীপুত্র ইসমাঈলের আল্লাহভক্তি ও দৃঢ় ঈমানের পরিচয় ফুটে উঠেছিল তাঁর কথায় ও কাজে। আল্লাহ তাঁর প্রশংসায় সূরা মারিয়ামের ৫৪ আয়াতে বলেন, তিনি ছিলেন ওয়াদা রক্ষায় সত্যাশ্রয়ী যা তিনি যবহের পূর্বে পিতাকে আশ্বস্ত করে বলেছিলেন,

يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ.

[৭৩] আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ ১/১৭৯ পৃঃ।

www.pathagar.com

"হে পিতা! আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে, তা কার্যকর করুন। আল্লাহ চাহেন তো আপনি আমাকে ছবরকারীদের অন্তর্ভুক্ত পাবেন'। (ছাফফাত ৩৭/১০২)

শিক্ষণীয় বিষয়

১. আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে জেনে-শুনে নিজের জীবনকে কুরবান করার ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

২. আল্লাহর হুকুম পালনের জন্য নিজে যেমনি প্রস্তুত ছিলেন, তেমনি স্বীয় পিতা হযরত ইবরাহীম (আ.)-কেও আল্লাহর হুকুম পালনের ক্ষেত্রে শক্তি ও সাহস যুগিয়েছেন।

৮. হযরত ইউসুফ (আলাইহিস সালাম)

ইউসুফ (আ.)-এর পিতা ছিলেন ইয়াকূব ইবনে ইসহাক্ব ইবনে ইবরাহীম (আ.)। তাঁরা সবাই কেন'আন বা ফিলিস্তীনের হেবরন এলাকার বাসিন্দা ছিলেন। ইয়াকূব (আ.)-এর দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন ইউসুফ ও বেনিয়ামীন। নবীগণের মধ্যে হযরত ইউসুফ (আ.) হ'লেন একমাত্র নবী, যাঁর পুরা কাহিনী একটিমাত্র সূরায় ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত হয়েছে।

যৌবনের মহাপরীক্ষায় হযরত ইউসুফ (আ.)

ইউসুফ শৈশবকালে স্বপ্ন দেখেন যে, ১১টি নক্ষত্র এবং সূর্য ও চন্দ্র তাকে সিজদা করছে। তিনি এই স্বপ্ন পিতা হযরত ইয়াকূবকে বললে তিনি তাকে সেটা গোপন রাখতে বলেন; কিন্তু তা ফাঁস হয়ে যায়। ফলে এটা তার সুন্দর ভবিষ্যতের হাতছানি ভেবে সৎ ভাইয়েরা তাকে জঙ্গলের একটি পরিত্যক্ত অন্ধকূপে নিক্ষেপ করে। সেখান থেকে একদল ব্যবসায়ী তাকে মিসরের রাজধানীতে বিক্রি করে দেয়। ভাগ্যক্রমে মিসরের অর্থ ও রাজস্ব মন্ত্রী ক্বিৎফীর (قطفير) তাকে খরিদ করে বাড়ীতে নিয়ে যান ক্রীতদাস হিসেবে। কয়েক বছরের মধ্যে যৌবনে পদার্পণকারী অনিন্দ্য সুন্দর ইউসুফের প্রতি মন্ত্রীর নিঃসন্তান স্ত্রী যুলায়খার আসক্তি জন্মে। একদিন যুলায়খা ইউসুফকে তার ঘরে ডেকে নিয়ে কুপ্রস্তাব দেয়। তাতে ইউসুফ সম্মত না হয়ে বেরিয়ে আসতে চাইলে পিছন থেকে যুলায়খা তার জামা টেনে ধরলে তা ছিঁড়ে যায়। দরজা খুলে বেরিয়ে আসতেই দু'জনে ধরা পড়ে যায় বাড়ীর মালিক ক্বিৎফীরের কাছে। ইউসুফ যে এ ব্যাপারে শতভাগ নিষ্পাপ ছিলেন। ইউসুফ দৃঢ়ভাবে নিজের নির্দোষিতা ঘোষণা করেন। যেমন গৃহস্বামীর কাছে তিনি বলেন,

هِيَ رَاوَدَتْنِيْ عَنْ نَفْسِيْ.

'উক্ত মহিলাই আমাকে প্ররোচিত করেছিল' (ইউসুফ ২৬)।

www.pathagar.com

তার আগে তিনি মহিলার কুপ্রস্তাবের জওয়াবে বলেছিলেন,

مَعَاذَ اللّٰهِ إِنَّهُ رَبِّيْ أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُوْنَ.

'আল্লাহ আমাকে রক্ষা করুন! তিনি (অর্থাৎ গৃহস্বামী) আমার মনিব। তিনি আমার উত্তম বসবাসের ব্যবস্থা করেছেন। নিশ্চয়ই সীমা লংঘনকারীগণ সফলকাম হয় না' (ইউসুফ ২৩)। নগরীর মহিলাদের সমাবেশে গৃহকর্ত্রী যখন ইউসুফকে তার কুপ্রস্তাবে রাযী না হ'লে জেলে পাঠানোর হুমকি দেন, তখন ইউসুফ তার জওয়াবে বলেছিলেন,

رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُوْنَنِيْ إِلَيْهِ.

"হে আমার পালনকর্তা! এরা আমাকে যে কাজের দিকে আহ্বান জানাচ্ছে, তার চাইতে কারাগারই আমার নিকটে অধিক পছন্দনীয়' (ইউসুফ ৩৩)। এখানে তিনি তাদের চক্রান্ত থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর আশ্রয় ভিক্ষা করেন।

পরে যুলায়খার সাজানো কথামতে নির্দোষ ইউসুফের জেল হয়।[৭১] জেলে থাকা অবস্থায় মহান আল্লাহ তাকে নবুওয়াত দান করেন। তিনি জেলে থেকেই কয়েদিদের কাছে ইসলামের দাওয়াত দিতে তাকেন। মহান আল্লাহ বলেন,

يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُوْنَ خَيْرٌ أَمِ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ إِلاَّ أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوْهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَّا أَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ، إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّٰهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوْا إِلاَّ إِيَّاهُ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُوْنَ.

"হে কারাগারের সাথীদ্বয়! পৃথক পৃথক অনেক উপাস্য ভাল, না পরাক্রমশালী এক আল্লাহ'? "তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে নিছক কতগুলো নামের পূজা করে থাক। যেগুলো তোমরা এবং তোমাদের বাপ-দাদারা সাব্যস্ত করে নিয়েছ। এদের পক্ষে আল্লাহ কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি। আল্লাহ ব্যতীত কারো বিধান দেবার ক্ষমতা নেই। তিনি আদেশ দিয়েছেন যে, তাঁকে ব্যতীত তোমরা অন্য কারো ইবাদত করো না। এটাই সরল পথ; কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না' (ইউসুফ ১২/৩৯-৪০)।

অন্যূন সাত বছর জেল খাটার পর বাদশাহর এক স্বপ্নের ব্যাখ্যা দানের পুরস্কারস্বরূপ তাঁর মুক্তি হয়। পরে তিনি বাদশাহর অর্থ ও রাজস্ব মন্ত্রী নিযুক্ত হন এবং বাদশাহর আনুকূল্যে তিনিই হন সমগ্র মিসরের একচ্ছত্র শাসক। ইতিমধ্যে ক্বিৎফীরের মৃত্যু হলে বাদশাহর উদ্যোগে বিধবা যুলায়খার সাথে তাঁর বিবাহ হয়।[৭২]

[৭১] ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়াল নিহায়াহ ১/১৯০।
[৭২] আল-বিদায়াহ ১/১৯৬-১৯৭।

www.pathagar.com

শিক্ষণীয় বিষয়

১. সর্বাবস্থায় আল্লাহর ওপরে ভরসা করা এবং ধৈর্য ধারণ করাই হ'ল আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের বৈশিষ্ট্য।

২. হযরত ইউসুফ (আ.)-কে সুন্দরী রমণী বিপদগামী করার যে প্রচেষ্টা চালিয়েছে তার মোকাবেলায় তিনি আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করার মাধ্যমে সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। এটি ছিল আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি বড় মেহেরবাণী। সুতরাং আজকের সময়েও কেউ যদি পথভ্রষ্টতার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আল্লাহর আশ্রয় কামনা করে আল্লাহ অবশ্যই বান্দাকে সাহায্য করবেন। বরং বিপদে ও সম্পদে সর্বাবস্থায় আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা ও তাঁর ওপরে একান্ত নির্ভরতার এক বাস্তব দলীল।

৩. বিপদ-মুসিবতে ধৈর্য ধারণ করলে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে অনেক বড় মর্যাদায় আসীন করেন।

৪. ইউসুফ (আ.)-এর ঘটনার সারনির্যাস হল 'তাওহীদ' অর্থাৎ 'তাওহীদে ইবাদত'। কারণ এখানে বাস্তব ঘটনাবলি দিয়ে প্রমাণ করে দেওয়া হয়েছে যে, কেবল আল্লাহর স্বীকৃতিই যথেষ্ট নয়, বরং জীবনের সকল ক্ষেত্রে তাঁর দাসত্ব করা ও তাঁর বিধান মেনে চলার মধ্যেই বান্দার প্রকৃত মঙ্গল ও সার্বিক কল্যাণ নির্ভর করে। যেমন ইউসুফের সৎ ভাইয়েরা আল্লাহকে মানতো; কিন্তু তাঁর.বিধান মানেনি বলেই তারা চূড়ান্তভাবে পরাজিত ও লজ্জিত হয়েছিল। অথচ ইউসুফ অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও আল্লাহর দাসত্বে ও তাঁর বিধান মানায় অটল থাকায় আল্লাহ তাঁকে অনন্য পুরস্কারে ভূষিত করেন ও মহা সম্মানে সম্মানিত করেন।

৯. হযরত আইয়ূব (আলাইহিস সালাম)

হযরত আইয়ূব (আ.) ছবরকারী নবীগণের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় এবং অনন্য দৃষ্টান্ত ছিলেন। ইবনু কাছীরের বর্ণনা অনুযায়ী তিনি ইসহাক (আ.)-এর দুই যমজ পুত্র ঈছা ও ইয়াকূবের মধ্যেকার প্রথম পুত্র ঈছা-এর প্রপৌত্র ছিলেন। আর তাঁর স্ত্রী ছিলেন ইয়াকূব-পুত্র ইউসুফ (আ.)-এর পৌত্রী 'লাইয়া' বিনতে ইফরাঈম বিন ইউসুফ।

বিপদে ধৈর্যধারণকারী হযরত আইয়ূব

আল্লাহ আইয়ূব (আ.)-কে কঠিন পরীক্ষায় ফেলেছিলেন। সে পরীক্ষায় আইয়ূব উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। যার পুরস্কারস্বরূপ আল্লাহ তাকে হারানো নেয়ামত সমূহের দ্বিগুণ ফেরৎ দিয়েছিলেন। বিপদে ধৈর্য ধারণ করায় এবং আল্লাহর পরীক্ষাকে হাসিমুখে বরণ করে নেওয়ায় আল্লাহ আইয়ূবকে 'ছবরকারী' হিসেবে ও 'সুন্দর

www.pathagar.com

বান্দা' হিসাবে প্রশংসা করেছেন (ছোয়াদ ৪৪)। প্রত্যেক নবীকেই কঠিন পরীক্ষাসমূহ দিতে হয়েছে। তারা সকলেই সেসব পরীক্ষায় ধৈর্য ধারণ করেছেন ও উত্তীর্ণ হয়েছেন; কিন্তু আইয়ূবের আলোচনায় বিশেষ ভাবে إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا 'আমরা তাকে ধৈর্যশীল হিসেবে পেলাম' (ছোয়াদ ৪৪) বলার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, আল্লাহ তাঁকে কঠিনতম কোন পরীক্ষায় ফেলেছিলেন। সূরা আম্বিয়া ও সূরা ছোয়াদের দুই স্থানেই আইয়ূবের আলোচনার শুরুতে আল্লাহর কাছে আইয়ূবের আহ্বানের (إِذْ نَادَى) কথা আনা হয়েছে। তাতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, আইয়ূব নিঃসন্দেহে কঠিন বিপদে পড়েছিলেন। যেজন্য তিনি আকুতিভরে আল্লাহকে ডেকেছিলেন। তিনি বিপদে ধৈর্য হারিয়ে এটা করেননি, বরং বিপদ দূর করে দেবার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছিলেন। কষ্টে পড়ার বিষয়টিকে তিনি শয়তানের দিকে সম্বন্ধ করেছেন (مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ) (ছোয়াদ ৪১), কেননা শয়তান নবীদের ওপর কোন ক্ষমতা রাখে না। এমনকি কোন নেককার বান্দাকেও শয়তান পথভ্রষ্ট করতে পারে না। তবে সে ধোঁকা দিতে পারে, বিপদে ফেলতে পারে, যা আল্লাহর হুকুম ব্যতীত কার্যকর হয় না। শয়তানের ধোঁকার কারণে আইয়ূব তাকেই দায়ী করেছেন; কিন্তু ঐ ধোঁকা কার্যকর করা এবং তা থেকে মুক্তি দানের ক্ষমতা যেহেতু আল্লাহর হাতে, সে কারণ তিনি আল্লাহর কাছেই প্রার্থনা করেছেন। আল্লাহ বলেন, 'আমরা তার দো'আ কবুল করেছিলাম এবং তার দুঃখ-কষ্ট দূর করে দিয়েছিলাম' (আম্বিয়া ৮৪)। কীভাবে দূর করা হয়েছিল, সে বিষয়ে আল্লাহ বলেন যে, তিনি তাকে ভূমিতে পদাঘাত করতে বলেন। অতঃপর সেখান থেকে স্বচ্ছ পানির ঝর্ণা ধারা বেরিয়ে আসে। যাতে গোসল করায় তার দেহের উপরের কষ্ট দূর হয় এবং উক্ত পানি পান করায় তার ভিতরের কষ্ট দূর হয়ে যায় (ছোয়াদ ৪২)। এটি অলৌকিক মনে হলেও বিস্ময়কর নয়। আল্লাহ বলেন, 'আমরা তার পরিবারবর্গকে ফিরিয়ে দিলাম এবং তাদের সাথে সমপরিমাণ আরও দিলাম আমাদের পক্ষ হ'তে দয়া পরবশে (আম্বিয়া ৮৪; ছোয়াদ ৪৩)। এখানে পরিষ্কারভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি তার বিপদে ধৈর্য ধারণের পুরস্কার দ্বিগুণভাবে পেয়েছিলেন দুনিয়াতে এবং আখেরাতে। বিপদে পড়ে যা কিছু তিনি হারিয়েছিলেন, সবকিছুই তিনি বিপুলভাবে ফেরত পেয়েছিলেন। অন্যত্র আল্লাহ বলেছেন,

وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ.

'এভাবেই আমরা আমাদের সৎকর্মশীল বান্দাদের পুরস্কৃত করে থাকি'। (আন'আম ৮৪)

www.pathagar.com

এক্ষণে এতটুকুই বিশ্বাস রাখা যথেষ্ট যে, তিনি তাঁর ধৈর্য ধারণের পুরস্কার ইহকালে ও পরকালে বহুগুণ বেশি পরিমাণে পেয়েছিলেন। যুগে যুগে সকল ধৈর্যশীল ঈমানদার নর-নারীকে আল্লাহ এভাবে পুরস্কৃত করে থাকেন। তাঁর রহমতের দরিয়া কখনো খালি হয় না। আইয়ূব (আ.) ৭০ বছর বয়সে পরীক্ষায় পতিত হন। পরীক্ষা থেকে মুক্ত হবার অনেক পরে ৯৩ বছর বা তার কিছু বেশি বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাবেঈ বিদ্বান মুজাহিদ হতে বর্ণিত হয়েছে যে, ক্বিয়ামতের দিন ধনীদের সম্মুখে প্রমাণস্বরূপ পেশ করা হবে হযরত সুলায়মান (আ.)-কে, (২) ক্রীতদাসদের সামনে পেশ করা হবে হযরত ইউসুফ (আ.)-কে এবং (৩) বিপদগ্রস্তদের সামনে পেশ করা হবে হযরত আইয়ূব (আ.)-কে।[৭৩]

শিক্ষণীয় বিষয়

১. বড় পরীক্ষায় বড় পুরস্কার লাভ হয়। ধন-সম্পদ ও পুত্র-কন্যা হারিয়ে অবশেষে রোগ জর্জরিত দেহে পতিত হয়েও আইয়ূব (আ.) আল্লাহর স্মরণ থেকে বিচ্যুত হননি এবং আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হননি। এরূপ কঠিন পরীক্ষা বিশ্ব ইতিহাসে আর কারো হয়েছে বলে জানা যায় না।

২. প্রকৃত মুমিনগণ আনন্দে ও বিষাদে সর্বাবস্থায় আল্লাহর রহমতের আকাঙ্ক্ষী থাকেন এবং বিপদে পড়লে তারা আরও বেশি আল্লাহর নিকটবর্তী হন। কোন অবস্থাতেই নিরাশ হন না।

৪. প্রকৃত ছবরকারীর জন্যই দুনিয়া ও আখেরাতের সফলতা। আইয়ূব (আ.) দম্পতি ছিলেন তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। জীবনের সর্বক্ষেত্রে ধৈর্য ধারণের জন্য হযরত আইয়ুব (আ.)-এর ঘটনা আমাদের জন্য অনুকরণীয়।

১০. হযরত শো'আয়েব (আলাইহিস সালাম)

হযরত শোয়াইব ছিলেন হাজেরা ও সারাহর মৃত্যুর পরে হযরত ইবরাহীমের আরব বংশোদ্ভূত কেন'আনী স্ত্রী ক্বানতূরা বিনতে ইয়াক্বত্বিন (قنطورا بنت يقطن) -এর ৬টি পুত্র সন্তানের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র।[৭৪] ইনি হযরত মূসা (আ.)-এর শ্বশুর ছিলেন। কওমে লূত-এর ধ্বংসের অনতিকাল পরে কওমে মাদইয়ানের প্রতি তিনি প্রেরিত হন (হূদ ১১/৮৯)। চমৎকার বাগ্মিতার কারণে তিনি (خطيب الأنبياء) 'খাত্বীবুল আম্বিয়া' (নবীগণের মধ্যে সেরা বাগ্মী) নামে খ্যাত ছিলেন।[৭৫] আল্লাহর গযবে ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রধান ৬টি প্রাচীন জাতির মধ্যে পঞ্চম জাতি হ'ল 'আহলে মাদইয়ান'। 'মাদইয়ান' হল লূত সাগরের নিকটবর্তী

---

[৭৩] আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১/২০৭, ২১০ পৃঃ।
[৭৪] ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ ১/১৬৪ পৃঃ।
[৭৫] আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১/১৭৩।

www.pathagar.com

সিরিয়া ও হিজাযের সীমান্তবর্তী একটি জনপদের নাম। কুফরী করা ছাড়াও এই জনপদের লোকেরা ব্যবসায়ের ওজন ও মাপে কম দিত, রাহাজানি ও লুটপাট করত। অন্যায় পথে জনগণের মাল-সম্পদ ভক্ষণ করত।[৭৬]

হযরত শো'আয়েব (আ.)-এর দাওয়াত ও অস্বীকারকারীদের ওপর আযাব

ধ্বংসপ্রাপ্ত বিগত কওমগুলোর বড় বড় কিছু অন্যায় কাজ ছিল। যার জন্য বিশেষভাবে সেখানে নবী প্রেরিত হয়েছিলেন। শো'আয়েব-এর কওমেরও তেমনি মারাত্মক কয়েকটি অন্যায় কাজ ছিল, যেজন্য খাছ করে তাদের মধ্য থেকে তাদের নিকটে শো'আয়েব (আ.)-কে প্রেরণ করা হয়। তিনি তাঁর কওমকে যে দাওয়াত দেন, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– প্রথমত: তাদেরকে শিরক ত্যাগ করে তাওহীদ গ্রহণের দাওয়াত দেন। দ্বিতীয়ত: তারা মাপ ও ওজনে কম দিয়ে বান্দার হক নষ্ট করত। সেদিকে ইঙ্গিত করে শো'আয়েব (আ.) বলেন, "তোমরা মাপ ও ওজন পূর্ণ কর এবং মানুষের দ্রব্যাদিতে কম দিয়ে তাদের ক্ষতি করো না' (আ'রাফ ৭/৮৫)। তৃতীয়ত : ব্যক্তির ইযযত-আবরূ নষ্ট করা, পদমর্যাদা অনুযায়ী তাকে সম্মান না করা, যাদের আনুগত্য করা জরুরী তাদের আনুগত্যে ত্রুটি করা অথবা যাকে সম্মান করা ওয়াজিব তার সম্মানে ত্রুটি করা ইত্যাদি অপরাধ না করতে তিনি লোকদেরকে আদেশ দেন। চতুর্থত: তোমরা মানুষকে ভীতি প্রদর্শন ও আল্লাহর পথে বাধা দানের উদ্দেশ্যে পথে-ঘাটে ওঁৎ পেতে থেকো না (আ'রাফ ৭/৮৬)।

হযরত শো'আয়েব (আ.)-এর নিঃস্বার্থ ও আন্তরিকতাপূর্ণ দাওয়াত তাঁর উদ্ধত কওমের নেতাদের হৃদয়ে রেখাপাত করল না। তারা বরং আরও উদ্ধত হয়ে তাঁর দরদভরা সুললিত বয়ান ও অপূর্ব চিত্তহারী বাগ্মীতার জবাবে পূর্ববর্তী ধ্বংসপ্রাপ্ত কওমের পাপিষ্ঠ নেতাদের ন্যায় নবীকে প্রত্যাখ্যান করল এবং ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও তাচ্ছিল্য করে বলল,

أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ -

"তোমার ছালাত কি তোমাকে একথা শিখায় যে, আমরা আমাদের ঐসব উপাস্যের পূজা ছেড়ে দিই, আমাদের পূর্বপুরুষেরা যুগ যুগ ধরে যেসবের পূজা করে আসছে? আর আমাদের ধন-সম্পদে ইচ্ছামত আমরা যা কিছু করে থাকি, তা পরিত্যাগ করি? তুমি তো একজন সহনশীল ও সৎ ব্যক্তি' (হূদ ১১/৮৭)। কওমের লোকদের এসব বিদ্রূপবান ও রূঢ় মন্তব্যসমূহে বিচলিত না হয়ে অতীব

---

[৭৬] আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১/১৭৩।

www.pathagar.com

ধৈর্য ও দরদের সাথে তাদের তাওহীদ ও মানুষের হক বিনষ্ট না করার আহ্বান জানান। জবাবে 'তাদের দাম্ভিক নেতারা চূড়ান্তভাবে ঈমান গ্রহণ না করা ও শক্তি থাকলে তাদের ওপর আযাব বর্ষণ করতে বললে, শো'আয়েব (আ.) তখন নিরাশ হয়ে প্রথমে কওমকে বললেন,

قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللهِ كَذِبًا اِنْ عُدْنَا فِيْ مِلَّتِكُم بَعْدَ اِذْ نَجَّانَا اللهُ مِنْهَا وَمَا يَكُوْنُ لَنَا اَنْ نَعُوْدَ فِيهَا اِلاَّ اَن يَّشَآءَ اللهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللهِ تَوَكَّلْنَا۔

'আমরা আল্লাহর ওপরে মিথ্যারোপকারী হয়ে যাব যদি আমরা তোমাদের ধর্মে ফিরে যাই। অথচ আল্লাহ্ আমাদেরকে তা থেকে মুক্তি দিয়েছেন। ঐ ধর্মে ফিরে যাওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, তবে যদি আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্ সেটা চান। আমাদের পালনকর্তা স্বীয় জ্ঞান দ্বারা প্রত্যেক বস্তুকে বেষ্টন করে আছেন। (অতএব) আল্লাহর ওপরেই আমরা ভরসা করলাম।'

অতঃপর তিনি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে বললেন,

رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَاَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِيْنَ-

"হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের ও আমাদের কওমের মধ্যে তুমি যথার্থ ফায়ছালা করে দাও। আর তুমিই তো শ্রেষ্ঠ ফায়ছালাকারী' (৮৯)।

আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় চিরন্তন বিধান অনুযায়ী শো'আয়েব (আ.) ও তাঁর ঈমানদার সাথীগণকে উক্ত জনপদ হতে অন্যত্র নিরাপদে সরিয়ে নিলেন। অতঃপর জিবরীলের এক গগণবিদারী নিনাদে অবাধ্য কওমের সকলে নিমেষে ধ্বংস হয়ে গেল। এ বিষয়ে আল্লাহ্ বলেন,

وَلَمَّا جَاءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَاَخَذَتِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا الصَّيْحَةُ فَاَصْبَحُوْا فِيْ دِيَارِهِمْ جَاثِمِيْنَ كَاَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا اَلاَ بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُوْدُ۔

'অতঃপর যখন আমার আদেশ এসে গেল, তখন আমি শো'আয়েব ও তার ঈমানদার সাথীদের নিজ অনুগ্রহে রক্ষা করলাম। আর পাপিষ্ঠদের উপর বিকট গর্জন আপতিত হল। ফলে তারা নিজেদের ঘরে উপুড় হয়ে মরে পড়ে রইল'। '(তারা এমনভাবে নিশ্চিহ্ন হল) যেন তারা কখনোই সেখানে বসবাস করেনি। সাবধান! ছামূদ জাতির ওপর অভিসম্পাতের ন্যায় মাদইয়ানবাসীর ওপরেও অভিসম্পাত' (হূদ ১১/৯৪-৯৫)। যদিও তারা দুনিয়াতে মজবুত ও নিরাপদ অট্টালিকায় বসবাস করত।

www.pathagar.com

আছহাবে মাদইয়ানের ওপরে গজবের ব্যাপারে কুরআনে ظُلَّةٌ (শো'আরা ১৮৯), رَجْفَةٌ (হূদ ৯৪), صَيْحَةٌ (আ'রাফ ৮৮) তিন ধরনের শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যার অর্থ মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, বিকট নিনাদ, ভূমিকম্প। আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, আহলে মাদইয়ানের ওপরে প্রথমে সাতদিন এমন ভীষণ গরম চাপিয়ে দেওয়া হয় যে, তারা দহন জ্বালায় ছটফট করতে থাকে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা একটি ঘন কালো মেঘমালা পাঠিয়ে দিলেন, যার নীচ দিয়ে শীতল বায়ু প্রবাহিত হচ্ছিল। তখন কওমের লোকেরা ঊর্ধ্বশ্বাসে সেখানে দৌড়ে এল। এভাবে সবাই জমা হবার পর হঠাৎ ভূমিকম্প শুরু হল এবং মেঘমালা হতে শুরু হল অগ্নিবৃষ্টি। তাতে মানুষ সব পোকা-মাকড়ের মত পুড়ে ছাই হতে লাগল। ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও মুহাম্মাদ বিন কা'ব আল-কুরাযী বলেন, অতঃপর তাদের ওপর নেমে আসে এক বজ্রনিনাদ। যাতে সব মরে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল'।[৭৭] এভাবে কোনরূপ গ্রেফতারী পরোয়ানা ও সিপাই-সান্ত্রীর প্রহরা ছাড়াই আল্লাহদ্রোহীরা সবাই পায়ে হেঁটে স্বেচ্ছায় বধ্যভূমিতে উপস্থিত হয় এবং চোখের পলকে সবাই নাস্তানাবুদ হয়ে যায়।

১১. হযরত মূসা ও হারূণ (আলাইহিস সালাম)

মূসা ইবনে ইমরান বিন ক্বাহেছ বিন 'আযের বিন লাভী বিন ইয়াকূব বিন ইসহাক্ব বিন ইবরাহীম (আ.)।[৭৮] অর্থাৎ মূসা হ'লেন ইবরাহীম (আ.)-এর ৮ম অধঃস্তন পুরুষ। মূসা (আ.)-এর পিতার নাম 'ইমরান' ও মাতার নাম 'ইউহানিব'। মূসা (আ.)-এর জন্ম হয় মিসরে এবং লালিত-পালিত হন মিসর সম্রাট ফেরাউনের ঘরে। তাঁর সহোদর ভাই হারূণ (আ.) ছিলেন তাঁর চেয়ে তিন বছরের বড় এবং তিনি মূসা (আ.)-এর তিন বছর পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেন। উভয়ের মৃত্যু হয় মিসর ও শাম-এর মধ্যবর্তী তীহ্ প্রান্তরে বনু ইসরাঈলের ৪০ বছর আটক থাকেন। মাওলানা মওদূদী বলেন, মূসা (আ.) পঞ্চাশ বছর বয়সে নবী হয়ে ফেরাউনের দরবারে পৌঁছেন। অতঃপর তেইশ বছর দ্বন্দ্ব-সংগ্রামের পর ফেরাউন ডুবে মরে এবং বনু ইসরাঈল মিসর থেকে বেরিয়ে যায়।

ফেরাউনের নিকটে মূসা (আ.)-এর দাওয়াত :

আল্লাহর নির্দেশমত মূসা ও হারূণ ফেরাউন ও তার সভাসদবর্গের নিকটে পৌঁছে গেলেন। অতঃপর মূসা ফেরাউনকে বললেন,

---

[৭৭] তাফসীর ইবনে কাছীর, শো'আরা ১৮৯।

[৭৮] ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১/২২২।

www.pathagar.com

وَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَوْنُ إِنِّيْ رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِيْنَ حَقِيقٌ عَلَى أَن لاَ أَقُوْلَ عَلَى اللهِ إِلاَ الْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِيْ إِسْرَائِيلَ-

"হে ফেরাঊন! আমি বিশ্বপ্রভুর পক্ষ হতে প্রেরিত রাসূল'। 'আল্লাহর পক্ষ থেকে যে সত্য এসেছে, তার ব্যতিক্রম কিছু না বলার ব্যাপারে আমি দৃঢ়চিত্ত। আমি তোমাদের নিকটে তোমাদের পালনকর্তার নিদর্শন নিয়ে আগমন করেছি। অতএব তুমি বনু ইস্রাঈলগণকে আমার সাথে পাঠিয়ে দাও।' (আ'রাফ ৭/১০৪-১০৫)

একথা শুনে ফেরাঊন তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল, 'মূসা! তোমার পালনকর্তা কে'? 'মূসা বললেন, আমার পালনকর্তা তিনি, যিনি প্রত্যেক বস্তুকে তার যোগ্য আকৃতি দান করেছেন। অতঃপর পথ প্রদর্শন করেছেন'। ফেরাঊনের অহংকারী হৃদয়ে মূসার দাওয়াত ও উপদেশবাণী কোনরূপ রেখাপাত করল না; সে সভাসদদের কাছ থেকে নিজের উপাস্যের স্বীকৃতি নিল। তখন ফেরাঊন তাচ্ছিল্যভরে বলল, হে মূসা! 'যদি তুমি কোন নিদর্শন নিয়ে এসে থাক, তাহলে তা উপস্থিত কর, যদি তুমি সত্যবাদী হয়ে থাক' (৩১)। 'মূসা তখন নিজের হাতের লাঠি মাটিতে নিক্ষেপ করলেন। ফলে তৎক্ষণাৎ তা একটা জ্বলজ্যান্ত অজগর সাপে পরিণত হয়ে গেল' (৩২)। 'তারপর (বগল থেকে) নিজের হাত বের করলেন এবং তা সঙ্গে সঙ্গে দর্শকদের চোখে ধবধবে আলোকোজ্জ্বল দেখাতে লাগল' (শো'আরা ২৬/৩১-৩৩; আ'রাফ ৭/১০৬-১০৮)।

মূসার মোজেযা দেখে ফেরাঊন ও তার পারিষদবর্গ দারুণভাবে ভীত হয়ে পড়েছিল। তাই মূসার বিরুদ্ধে তার সম্মুখে আর টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করেনি; কিন্তু রাজনৈতিক স্বার্থ বিবেচনা করে তারা তাদের লোকদের বলতে লাগল যে, "লোকটা বিজ্ঞ জাদুকর'। মূসা (আ.) ও ফেরাঊনের মাঝে জাদু প্রতিযোগিতার দিন ধার্য হবার পর মূসা (আ.) পয়গম্বরসুলভ দয়া প্রকাশে নেতাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন,

وَيْلَكُمْ لاَ تَفْتَرُوا عَلَى اللهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى-

'দুর্ভোগ তোমাদের! তোমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করো না। তাহলে তিনি তোমাদেরকে আযাব দ্বারা ধ্বংস করে দেবেন। যারাই মিথ্যারোপ করে, তারাই বিফল মনোরথ হয়' (ত্বোয়াহা ২০/৬১)। কিন্তু এতে কোন ফলোদয় হল না। ফেরাঊন উঠে গিয়ে 'তার সকল কলা-কৌশল জমা করল, অতঃপর উপস্থিত

www.pathagar.com

হ'ল' (ত্বোয়াহা ২০/৬০)। অতঃপর তাদের জাদুর সাপগুলোকে মূসা (আ.)-এর মুজিজার সাপ ভক্ষণ করে ফেললো। এ দৃশ্য দেখে যুগশ্রেষ্ঠ জাদুকরগণ বুঝে নিল যে, মূসার এ জাদু আসলে জাদু নয়। নিশ্চয়ই এর মধ্যে অলৌকিক কোন সত্তার নিদর্শন রয়েছে, যা আয়ত্ত করা মানুষের ক্ষমতার বাইরে। এ সময় মূসার দেওয়া তাওহীদের দাওয়াত ও আল্লাহর গযবের ভীতি তাদের অন্তরে প্রভাব বিস্তার করল। অতঃপর তারা ইসলাম গ্রহণ করলো। পরাজয়ের এ দৃশ্য দেখে ভীত-বিহ্বল হয়ে পড়লো এবং নতুন কূটকৌশল শুরু করলো। সে জনগণকে মূসার বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুললো। ফেরাউনের ভাষণে উত্তেজিত জনগণের পক্ষে নেতারা সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো, হে সম্রাট!

أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ ـ

'আপনি কি মূসা ও তার সম্প্রদায়কে এমনিই ছেড়ে দেবেন দেশময় ফাসাদ সৃষ্টি করার জন্য এবং আপনাকে ও আপনার উপাস্যদেরকে বাতিল করে দেবার জন্য' (আ'রাফ ৭/১২৭)।

সত্য গ্রহণকারীদের নির্যাতন ভোগ

ধূর্ত ও কূটবুদ্ধি ফেরাউন জাদুকরদের হাত-পা বিপরীতভাবে কেটে অতঃপর খেজুর গাছের সাথে শূলে চড়িয়ে হত্যা করার আদেশ দিল। সে ভেবেছিল, এতে জাদুকররা ভীত হয়ে তার কাছে প্রাণভিক্ষা চাইবে; কিন্তু ফল উল্টা হল। তারা একবাক্যে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলে দিল,

لَن نُّؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ـ

'আমরা তোমাকে ঐসব সুস্পষ্ট নিদর্শন (ও মুজেযার) ওপরে প্রাধান্য দিতে পারি না, যেগুলো (মূসার মাধ্যমে) আমাদের কাছে পৌঁছেছে এবং প্রধান্য দিতে পারি না তোমাকে সেই সত্তার ওপরে যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। অতএব তুমি যা ইচ্ছা তাই করতে পার। তুমি তো কেবল এই পার্থিব জীবনেই যা করার করবে' (৭২)। 'আমরা আমাদের পালনকর্তার ওপরে বিশ্বাস স্থাপন করেছি, যাতে তিনি আমাদের পাপসমূহ এবং তুমি আমাদেরকে যে জাদু করতে বাধ্য করেছ, (তার পাপসমূহ) তা মার্জনা করেন। আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ ও চিরস্থায়ী' (ত্বোয়াহা ২০/৭২-৭৩)।

জাদুকরদের সঙ্গে মোকাবিলা তথা সত্য ও মিথ্যার এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার সময় ফেরাউনের নেককার স্ত্রী ও মূসার পালক মাতা (أمه البديلة) 'আসিয়া' উক্ত

www.pathagar.com

মোকাবিলার শুভ ফলাফলের জন্য সদা উদগ্রীব ছিলেন। যখন তাঁকে মূসা ও হারূণের বিজয়ের সংবাদ শোনানো হল, তখন তিনি কালবিলম্ব না করে বলে ওঠেন, آمَنْتُ بِرَبِّ مُوْسَى وَ هَارُوْنَ 'আমি মূসা ও হারূণের পালনকর্তার ওপরে ঈমান আনলাম'। নিজ স্ত্রীর ঈমানের এ খবর শুনে রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে ফেরাঊন তাকে মর্মান্তিকভাবে নির্যাতনের মাধ্যমে হত্যা করে।[৭৯]

জাদুর পরীক্ষায় পরাজিত ফেরাঊনের যাবতীয় আক্রোশ গিয়ে পড়ল এবার নিরীহ বনু ইস্রাঈলগণের ওপর। নিষ্ঠুর দমন নীতির মাধ্যমে এবং অত্যন্ত নোংরা কূটচাল ও মিথ্যা অপবাদসমূহের মাধ্যমে মূসার ঈমানী আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেওয়ার চক্রান্ত করেছিল ফেরাঊন; কিন্তু এর ফলে জনগণের মধ্যে মূসার দাওয়াত দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল। সে বনু ইস্রাঈলের নবজাতক পুত্রসন্তানদের হত্যার নির্দেশ জারি করলো।

ঈমানের চূড়ান্ত পরীক্ষা ও ফিরআউনের সলিল সমাধি

মূসার নবুওয়াতী জীবনে এটি ছিল একটি চূড়ান্ত পরীক্ষা। পিছনে ফেরাঊনের হিংস্র বাহিনী, সম্মুখে অথৈ সাগর। এই কঠিন সময়ে বনু ইস্রাঈলের আতংক ও হাহাকারের মধ্যেও মূসা ছিলেন স্থির ও নিষ্কম্প। দৃঢ় হিমাদ্রির ন্যায় তিনি আল্লাহর ওপরে বিশ্বাসে অটল থাকেন এবং সাথীদের সান্ত্বনা দিয়ে আল্লাহর রহমত কামনা করেন। যাই হোক ফেরাঊন খবর জানতে পেরে তার সেনাবাহিনীকে বনু ইস্রাঈলদের পশ্চাদ্ধাবনের নির্দেশ দিল। আল্লাহ বলেন,

فَأَتْبَعُوهُم مُّشْرِقِينَ فَلَمَّا تَرَاءى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ وَأَنجَيْنَا مُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ-

'সূর্যোদয়ের সময় তারা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করল' (শো'আরা ২৬/৬০)। 'অতঃপর যখন উভয় দল পরস্পরকে দেখল, তখন মূসার সঙ্গীরা (ভীত হয়ে) বলল, إِنَّا لَمُدْرَكُونَ 'আমরা তো এবার নিশ্চিত ধরা পড়ে গেলাম' (৬১)। 'তখন মূসা বললেন, কখনই নয়, আমার সাথে আছেন আমার পালনকর্তা। তিনি আমাকে সত্বর পথ প্রদর্শন করবেন' (৬২)। 'অতঃপর আমরা মূসাকে আদেশ করলাম, তোমার লাঠি দ্বারা সমুদ্রকে আঘাত কর। ফলে তা বিদীর্ণ হয়ে গেল

---

[৭৯] কুরতুবী, ত্বোয়াহা ২০/৭২-৭৬; তাহরীম ৬৬/১১।

www.pathagar.com

এবং প্রত্যেক ভাগ বিশাল পাহাড় সদৃশ হয়ে গেল' (৬৩)। 'ইতিমধ্যে আমরা সেখানে অপর দলকে (অর্থাৎ ফেরাঊন ও তার সেনাবাহিনীকে) পৌঁছে দিলাম' (৬৪)। 'এবং মূসা ও তার সঙ্গীদের সবাইকে বাঁচিয়ে দিলাম' (৬৫)। 'অতঃপর অপর দলটিকে ডুবিয়ে দিলাম' (শো'আরা ২৬/৬০-৬৬)।

মূসা ও বনু ইস্রাঈলকে সাগর পাড়ি দিয়ে ওপারে চলে যেতে দেখে ফেরাঊন সরোষে ঘোড়া দাবড়িয়ে সর্বাগ্রে শুষ্ক সাগর বক্ষে ঝাঁপিয়ে পড়ল। পিছনে তার বিশাল বাহিনীর সবাই সাগরের মধ্যে নেমে এলো। যখন তারা সাগরের মধ্যস্থলে পৌঁছে গেল, তখন আল্লাহর হুকুমে দু'দিক থেকে বিপুল পানি রাশি ধেয়ে এসে তাদেরকে নিমেষে গ্রাস করে ফেলল। আল্লাহ বলেন,

فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ -

'অতঃপর ফেরাঊন তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করল; কিন্তু সমুদ্র তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করে ফেলল' (ত্বোয়াহা ২০/৭৮)।

সাগরডুবির দৃশ্য স্বচক্ষে দেখার পরেও ভীত-সন্ত্রস্ত বনু ইস্রাঈলীরা ফেরাঊন মরেছে কি-না বিশ্বাস করতে পারছিল না। ফলে মূসা (আ.) আল্লাহর কাছে দো'আ করলেন। তখন আল্লাহ তার প্রাণহীন দেহ বের করে দিলেন। অতঃপর মূসার সাথীরা নিশ্চিন্ত হ'ল।[৮০]

চিরস্থায়ী গযবে পতিত হওয়া

নবী মূসা (আ.)-এর সঙ্গে বারবার বেআদবী ও অবাধ্যতার পরিণামে এবং আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার ও পরবর্তীতে নবীগণকে অন্যায় ভাবে হত্যার কারণে আল্লাহ তাদের ওপরে চিরস্থায়ী গযব ও অভিসম্পাৎ নাযিল করলেন। আল্লাহ বলেন,

وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَآؤُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ -

'আর তাদের উপরে লাঞ্ছনা ও পরমুখাপেক্ষিতা আরোপিত হ'ল এবং তারা আল্লাহর রোষানলে পতিত হ'ল' (বাক্বারাহ ২/৬১)। ইহুদিদের অভিশপ্ত হওয়ার ১০টি কারণ সূরা নিসা ১৫৫-৬১ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে–

(১) তাদের ব্যাপক পাপাচার, (২) আল্লাহর পথে বাধা দান, (৩) সূদী লেনদেন, (৪) অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ, (৫) অঙ্গীকার ভঙ্গ করা, (৬) নবীগণকে হত্যা করা, (৭) আল্লাহর পথে আগ্রহী না হওয়া এবং অজুহাত দেওয়া যে, আমাদের হৃদয় আচ্ছন্ন, (৮) কুফরী করা, (৯) মারিয়ামের প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেওয়া, (১০) ঈসাকে শূলে বিদ্ধ করে হত্যার মিথ্যা দাবী করা।

---

[৮০] হাদীছুল ফুতূন, তাফসীর ইবনু কাছীর, ত্বোয়াহা ৩৯।

www.pathagar.com

ইবনু কাছীর বলেন, এ লাঞ্ছনা ও অবমাননার প্রকৃতি হল, ইহুদিরা সর্বদা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অপরের দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ থাকবে। এ মর্মে সূরা আলে ইমরানে আল্লাহ বলেন,

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ اَيْنَ مَا ثُقِفُوْا اِلاَّ بِحَبْلٍ مِّنَ اللهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ -

'তাদের ওপরে লাঞ্ছনা আরোপিত হল যেখানেই তারা অবস্থান করুক না কেন। তবে আল্লাহ প্রদত্ত ও মানব প্রদত্ত মাধ্যম ব্যতীত' (আলে ইমরান ৩/১১২)। 'আল্লাহ প্রদত্ত মাধ্যম' বলতে বুঝানো হয়েছে, যাদেরকে আল্লাহ নিজ চিরন্তন বিধান অনুযায়ী আশ্রয় ও অভয় দিয়েছেন। যেমন শিশু ও রমণীকূল এবং এমন সাধক ও উপাসকগণ, যারা যুদ্ধ-বিগ্রহ থেকে দূরে থাকেন। এরা নিরাপদে থাকবে। অতঃপর 'মানব প্রদত্ত মাধ্যম' হল, অন্যের সাথে শান্তিচুক্তির মাধ্যমে নিরাপত্তা লাভ করা, যা মুসলমান বা অন্য যেকোন জাতির সাথে হতে পারে। যেমন বর্তমানে তারা আমেরিকা ও পাশ্চাত্য শক্তি বলয়ের সাথে গাটছড়া বেঁধে টিকে আছে।

উপরোক্ত আয়াত সমূহের আলোকে আমরা ইহুদিদের ওপরে বিগত ও বর্তমান যুগের লাঞ্ছনা ও অবমাননার দীর্ঘ ইতিহাস পর্যালোচনা করতে পারি। তবে এখানে এতটুকু বলা আবশ্যক যে, হাজার বছর ধরে বসবাসকারী ফিলিস্তীনের স্থায়ী মুসলিম নাগরিকদের তাড়িয়ে দিয়ে ১৯৪৮ সাল থেকে বৃটেন, আমেরিকা, রাশিয়া প্রমুখ অশুভ শক্তি বলয়ের মাধ্যমে যবরদস্তিমূলক প্রতিষ্ঠিত তথাকথিত 'ইস্রাঈল' নামক রাষ্ট্র মূলতঃ কোন রাষ্ট্রই নয়। বরং মধ্যপ্রাচ্যের তেলভাণ্ডার নিজেদের করায়ত্তে রাখার জন্য বৃহৎ শক্তিবর্গের বিশেষ করে আমেরিকা ও বৃটেনের ঘাঁটি বা অস্ত্রগুদাম মাত্র। বৃহৎ শক্তিগুলো হাত গুটিয়ে নিলে তারা একমাসও নিজের শক্তিতে টিকতে পারবে কি-না সন্দেহ। ইনশাআল্লাহ অচিরেই তাদেরকে এই পবিত্র ভূমি মুসলমানদের হাতে ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র চলে যেতে হবে অথবা ইসলাম কবুল করে শান্তিতে বসবাস করতে হবে।

১২. হযরত ইউনুস (আলাইহিস সালাম)

হযরত ইউনুস বিন মাত্তা (আ.) সূরা ইউনুস ৯৮ আয়াতে তাঁর নাম ইউনুস, সূরা আম্বিয়া ৮৭ আয়াতে 'যুন-নূন' (ذو النون) এবং সূরা ক্বলম ৪৮ আয়াতে তাঁকে 'ছাহেবুল হূত' (صاحب الحوت) বলা হয়েছে। 'নূন' ও 'হূত' উভয়ের অর্থ মাছ। যুন-নূন ও ছাহেবুল হূত অর্থ মাছওয়ালা।

ইউনুস (আ.)-এর কওম-এর তাওবা

ইউনুস (আ.) বর্তমান ইরাকের মূছেল নগরীর নিকটবর্তী 'নীনাওয়া' (نينوى) জনপদের অধিবাসীদের প্রতি প্রেরিত হন। তিনি তাদেরকে তাওহীদের দাওয়াত

www.pathagar.com

দেন এবং ঈমান ও সৎকর্মের প্রতি আহ্বান জানান। কিন্তু তারা তাঁর প্রতি অবাধ্যতা প্রদর্শন করে। বারবার দাওয়াত দিয়ে প্রত্যাখ্যাত হলে আল্লাহর হুকুমে তিনি এলাকা ত্যাগ করে চলে যান। ইতিমধ্যে তার কওমের ওপরে আযাব নাযিল হওয়ার পূর্বাভাস দেখা দিল। জনপদ ত্যাগ করার সময় তিনি বলে গিয়েছিলেন যে, তিন দিন পর সেখানে গযব নাযিল হতে পারে। তারা ভাবল, নবী কখনো মিথ্যা বলেন না। ফলে ইউনুসের কওম ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে দ্রুত কুফর ও শিরক হতে তওবা করে এবং জনপদের সকল আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা এবং গবাদিপশু সব নিয়ে জঙ্গলে পালিয়ে যায়। সেখানে গিয়ে আল্লাহর দরবারে কায়মনোচিত্তে কান্নাকাটি শুরু করে দেয়। তারা সর্বান্ত:করণে তওবা করে এবং আসন্ন গযব হতে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করে। ফলে আল্লাহ তাদের তওবা কবুল করেন এবং তাদের ওপর থেকে আযাব উঠিয়ে নেন। এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন,

فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ -

'অতএব কোন জনপদ কেন এমন হল না যে, তারা এমন সময় ঈমান নিয়ে আসত, যখন ঈমান আনলে তাদের উপকারে আসত? কেবল ইউনুসের কওম ব্যতীত। যখন তারা ঈমান আনল, তখন আমরা তাদের ওপর থেকে পার্থিব জীবনের অপমানজনক আযাব তুলে নিলাম এবং তাদেরকে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত জীবনোপকরণ ভোগ করার অবকাশ দিলাম' (ইউনুস ১০/৯৮)।

হযরত ইউনুস আ.-এর পরীক্ষা

ইউনুস (আ.) ভেবেছিলেন যে, তাঁর কওম আল্লাহর গযবে ধ্বংস হয়ে গেছে; কিন্তু পরে যখন তিনি জানতে পারলেন যে, আদৌ গযব নাযিল হয়নি, তখন তিনি চিন্তায় পড়লেন যে, এখন তার কওম তাকে মিথ্যাবাদী ভাববে এবং মিথ্যাবাদীর শাস্তি হিসেবে প্রথা অনুযায়ী তাকে হত্যা করবে। তখন তিনি জনপদে ফিরে না গিয়ে অন্যত্র হিজরতের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লেন। এ সময় আল্লাহর হুকুমের অপেক্ষা করাটাই যুক্তিযুক্ত ছিল; কিন্তু তিনি তা করেননি। হিজরতকালে নদী পার হওয়ার সময় মাঝ নদীতে হঠাৎ নৌকা ডুবে যাবার উপক্রম হলে মাঝি বলল, একজনকে নদীতে ফেলে দিতে হবে। নইলে সবাইকে ডুবে মরতে হবে। এজন্য লটারী হলে পরপর তিনবার তাঁর নাম আসে। ফলে তিনি নদীতে নিক্ষিপ্ত হন। সাথে সাথে আল্লাহর হুকুমে বিরাটকায় এক মাছ এসে তাঁকে গিলে ফেলে। কিন্তু মাছের পেটে তিনি হযম হয়ে যাননি। বরং এটা ছিল তাঁর জন্য নিরাপদ কয়েদখানা (ইবনে কাছীর, আম্বিয়া ৮৭-৮৮)। মাওয়ার্দী

www.pathagar.com

বলেন, মাছের পেটে অবস্থান করাটা তাঁকে শাস্তি দানের উদ্দেশ্যে ছিল না; বরং আদব শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে ছিল। যেমন পিতা তার শিশু সন্তানকে শাসন করে শিক্ষা দিয়ে থাকেন' (কুরতুবী, আম্বিয়া ৮৭)। আল্লাহ বলেন,

وَاِنَّ يُوْنُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ اِذْ اَبَقَ اِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِيْنَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوْتُ وَهُوَ مُلِيْمٌ۔

'আর ইউনুস ছিল পয়গম্বরগণের একজন'। 'যখন সে পালিয়ে যাত্রী বোঝাই নৌকায় গিয়ে পৌঁছল'। 'অতঃপর লটারীতে সে অকৃতকার্য হল'। 'অতঃপর একটি মাছ তাকে গিলে ফেলল। এমতাবস্থায় সে ছিল নিজেকে ধিক্কার দানকারী' (ছাফফাত ৩৭/১৩৯-১৪২)।

আল্লাহর হুকুমের অপেক্ষা না করে নিজস্ব ইজতিহাদের ভিত্তিতে ইউনুস (আ.) নিজ কওমকে ছেড়ে এই হিজরতে বেরিয়েছিলেন বলেই অত্র আয়াতে তাকে মনিবের নিকট থেকে পলায়নকারী বলা হয়েছে। যদিও বাহ্যত এটা কোন অপরাধ ছিল না; কিন্তু পয়গম্বর ও নৈকট্যশীলগণের মর্তবা অনেক উর্ধ্বে। তাই আল্লাহ তাদের ছোট-খাট ত্রুটির জন্যও পাকড়াও করেন। ফলে তিনি আল্লাহর পরীক্ষায় পতিত হন। এবং তিনি তাওবা করে মহান আল্লাহর ক্ষমা লাভ করেন। আল্লাহ বলেন,

وَذَا النُّوْنِ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ اَن لَّنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ اَن لَا اِلَهَ اِلاَّ اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِيْنَ۔

'এবং মাছওয়ালা (ইউনুস)-এর কথা স্মরণ কর, যখন সে (আল্লাহর অবাধ্যতার কারণে লোকদের উপর) ক্রুদ্ধ হয়ে চলে গিয়েছিল এবং বিশ্বাসী ছিল যে, আমরা তার ওপরে কোনরূপ কষ্ট দানের সিদ্ধান্ত নেব না'। 'অতঃপর সে (মাছের পেটে) ঘন অন্ধকারের মধ্যে আহ্বান করল (হে আল্লাহ!) তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তুমি পবিত্র। আমি সীমা লংঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত'। 'অতঃপর আমরা তার আহ্বানে সাড়া দিলাম এবং তাকে দুশ্চিন্তা হতে মুক্ত করলাম। আর এভাবেই আমরা বিশ্বাসীদের মুক্তি দিয়ে থাকি' (আম্বিয়া ২১/৮৭-৮৮)।

'যদি আল্লাহর অনুগ্রহ তাকে সামাল না দিত, তাহলে সে নিন্দিত অবস্থায় জনশূন্য প্রান্তরে পড়ে থাকত' এর অর্থ আল্লাহ যদি তাকে তওবা করার তাওফীক্ব না দিতেন এবং তার দোআ কবুল না করতেন, তাহলে তাকে জীবিত অবস্থায় নদী তীরে মাটির উপর ফেলতেন না। যেখানে গাছের পাতা খেয়ে তিনি পুষ্টি ও

www.pathagar.com

শক্তি লাভ করেন; বরং তাকে মৃত অবস্থায় নদীর কোন বালুচরে ফেলে রাখা হত, যা তার জন্য লজ্জাষ্কর হত।

শিক্ষণীয় বিষয়

১. বিভ্রান্ত কওমের দুর্ব্যবহারে অতিষ্ট হয়ে তাদেরকে ছেড়ে চলে যাওয়া কোন দায়ী ইলাল্লার উচিত নয়।

২. আল্লাহর পরীক্ষা কিরূপ হবে, তা পরীক্ষা আগমনের এক সেকেন্ড পূর্বেও জানা যায় না। কঠিনতম কষ্টের মুহূর্তে কেবলমাত্র আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাইতে হবে।

৩. খালেছ তওবা ও আকুল প্রার্থনার ফলে অনেক সময় আল্লাহ গযব উঠিয়ে নিয়ে থাকেন। যেমন ইউনুসের কওমের ওপর থেকে আল্লাহ গযব ফিরিয়ে নিয়েছিলেন। তাই পবিত্র মনে সর্বদা আল্লাহর নিকট দোয়া করতে হবে।

৪. আল্লাহর প্রতি আনুগত্য ব্যতীত দোআ কবুল হয় না। যেমন গভীর সংকটে নিপতিত হবার আগে ও পরে ইউনুস (আ.) আল্লাহর প্রতি আনুগত্যশীল ছিলেন। ফলে আল্লাহ তাঁর দোআ কবুল করেন।

১৩. হযরত দাঊদ (আলাইহিস সালাম)

দাঊদ হলেন আল্লাহর একমাত্র বান্দা, যাকে খুশী হয়ে পিতা আদম স্বীয় বয়স থেকে ৪০ বছর কেটে তাকে দান করার জন্য আল্লাহর নিকটে সুপারিশ করেছিলেন এবং সেমতে দাঊদের বয়স ৬০ হতে ১০০ বছরে বৃদ্ধি পায়।[৮১] তিনি ছিলেন শেষনবী (ছাঃ)-এর আগমনের প্রায় দেড় হাযার বছরের পূর্বেকার নবী।[৮২] অন্যান্য নবীদের ন্যায় তিনি চল্লিশ বছর বয়সে নবুওয়াত লাভ করেন বলে আমরা ধরে নিতে পার। তিনি শতায়ু ব্যক্তি ছিলেন এবং তাঁর পুত্রসন্তানের সংখ্যা ছিল ১৯ জন।

দাঊদ (আ.)-এর উম্মতের শাস্তি

বনু ইস্রাঈলদের জন্য শনিবার ছিল সাপ্তাহিক ছুটির দিন এবং ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট ও পবিত্র দিন। এ দিন তাদের জন্য মৎস্য শিকার নিষিদ্ধ ছিল। তারা সমুদ্রোপকূলের বাসিন্দা ছিল এবং মৎস্য শিকার ছিল তাদের পেশা। ফলে দাঊদ (আ.)-এর নিষেধাজ্ঞা অমান্য করেই তারা ঐদিন মৎস্য শিকার করতে থাকে। এতে তাদের ওপরে আল্লাহর পক্ষ হতে আকৃতি পরিবর্তনের শাস্তি নেমে আসে এবং তিনদিনের মধ্যেই তারা সবাই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ঘটনাটি পবিত্র

---

[৮১] তিরমিযী, হাসান ছহীহ, মিশকাত হা/১১৮, 'ঈমান' অধ্যায় 'তাক্বদীরে বিশ্বাস' অনুচ্ছেদ-৩।

[৮২] তাফসীর মা'আরেফুল কুরআন পৃঃ ৯৯০।

www.pathagar.com

কুরআনে নিম্নরূপে বর্ণিত হয়েছে। যেমন আল্লাহ মদিনার ইহুদিদের উদ্দেশ্যে বলেন,

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِيْنَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُوْنُوْا قِرَدَةً خَاسِئِيْنَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ-

'আর তোমরা তো তাদেরকে ভালভাবে জানো, যারা শনিবারের ব্যাপারে সীমা লংঘন করেছিল। আমরা তাদের বলেছিলাম, তোমরা নিকৃষ্ট বানর হয়ে যাও'। 'অতঃপর আমরা এ ঘটনাকে তাদের সমসাময়িক ও পরবর্তীদের জন্য দৃষ্টান্ত হিসেবে এবং আল্লাহভীরুদের জন্য উপদেশ হিসাবে রেখে দিলাম' (বাক্বারাহ ২/৬৫-৬৬)।

তাফসীরে কুরতুবীতে বলা হয়েছে যে, ইহুদিরা প্রথমে গোপনে ও বিভিন্ন কৌশলে এবং পরে ব্যাপকভাবে নিষিদ্ধ দিনে মৎস্য শিকার করতে থাকে। এতে তারা দু'দলে বিভক্ত হয়ে যায়। সৎ ও বিজ্ঞ লোকেরা একাজে বাধা দেন। অপরদল বাধা অমান্য করে মাছ ধরতে থাকে। ফলে প্রথম দলের লোকেরা শেষোক্তদের থেকে পৃথক হয়ে যান। তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। এমনকি তাদের বাসস্থানও পৃথক করে নেন। একদিন তারা অবাধ্যদের এলাকায় চরম নীরবতা লক্ষ্য করেন। অতঃপর তারা সেখানে পৌঁছে দেখলেন যে, সবাই বানর ও শূকরে পরিণত হয়ে গেছে। ক্বাতাদাহ বলেন যে, বৃদ্ধরা শূকরে এবং যুবকেরা বানরে পরিণত হয়েছিল। রূপান্তরিত বানরেরা নিজ নিজ আত্মীয়-স্বজনকে চিনতে পেরেছিল এবং তাদের কাছে গিয়ে অঝোর নয়নে অশ্রু বিসর্জন করেছিল।

উক্ত বিষয়ে সূরা আ'রাফের ১৬৪-৬৫ আয়াতের বর্ণনায় প্রতীয়মান হয় যে, সেখানে তৃতীয় আরেকটি দল ছিল, যারা উপদেশ দানকারীদের উপদেশ দানে বিরত রাখার চেষ্টা করত। বাহ্যতঃ এরা ছিল শান্তিবাদী এবং অলস ও সুবিধাবাদী। এরাও ফাসেকদের সাথে শূকর-বানরে পরিণত হয় ও ধ্বংস হয়ে যায়। যেমন আল্লাহ বলেন,

وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا. قَالُوْا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوْا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ-

www.pathagar.com

'আর যখন তাদের মধ্যকার একদল বলল, কেন আপনারা ঐ লোকদের উপদেশ দিচ্ছেন, যাদেরকে আল্লাহ ধ্বংস করে দিতে চান কিংবা তাদের আযাব দিতে চান কঠিন আযাব? ঈমানদারগণ বলল, তোমাদের পালনকর্তার নিকট ওযর পেশ করার জন্য এবং এজন্য যাতে ওরা সতর্ক হয়'। 'অতঃপর তারা যখন উপদেশ ভুলে গেল, যা তাদেরকে দেওয়া হয়েছিল, তখন আমরা সেসব লোকদের মুক্তি দিলাম, যারা মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করত এবং পাকড়াও করলাম যালেমদেরকে নিকৃষ্ট আযাবের মাধ্যমে তাদের পাপাচারের কারণে' (আ'রাফ ৭/১৬৪-৬৫)।

এতে স্পষ্ট বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধকারীদের পক্ষাবলম্বন না করে নিরপেক্ষতা অবলম্বনকারী ব্যক্তিগণ যালেম ও ফাসেকদের সাথেই আল্লাহর গযবে ধ্বংস হবে। অতএব হকপন্থীদের জন্য জীবনের সর্বক্ষেত্রে আমর বিল মা'রূফ ও নাহি 'আনিল মুনকার ব্যতীত অন্য কোন পথ খোলা নেই।

১৪. হযরত ইলিয়াস (আলাইহিস সালাম)

হযরত ইলিয়াস (আ.) ফিলিস্তীনের পার্শ্ববর্তী জর্ডানের আল'আদ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। আল্লাহ পাক তাঁকে নবী হিসেবে মনোনীত করেন এবং ফিলিস্তীন অঞ্চলে তাওহীদের প্রচার ও প্রসারের নির্দেশ দান করেন। তিনি হযরত হিয্‌ক্বীল (আ.)-এর পর এবং হযরত আল-ইয়াসা' (আ.)-এর পূর্বে দামেস্কের পশ্চিমে বা'লা বাক্কা (بعلبك) অঞ্চলের বনু ইস্রাঈলগণের প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন।

ইলিয়াসের দাওয়াত ও অস্বীকারকারীদের আযাব

শিরকে আচ্ছন্ন ফিলিস্তীনবাসীকে হযরত ইলিয়াস (আ.) তাওহীদের দাওয়াত দেন এবং শিরক পরিত্যাগ করার আহ্বান জানান। কেননা শিরক ও তাওহীদের একত্র সহাবস্থান কখনোই সম্ভব নয়। ইলিয়াস ও তাঁর দাওয়াত সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلاَ تَتَّقُوْنَ أَتَدْعُوْنَ بَعْلًا وَتَذَرُوْنَ أَحْسَنَ الْخَالِقِيْنَ اللهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِيْنَ فَكَذَّبُوْهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُوْنَ إِلاَّ عِبَادَ اللهِ الْمُخْلَصِيْنَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِيْنَ سَلاَمٌ عَلَى إِلْ يَاسِيْنَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ۔

www.pathagar.com

'নিশ্চয়ই ইলিয়াস ছিল প্রেরিত রাসূলগণের অন্যতম' (ছাফফাত ১২৩)। 'যখন সে তার সম্প্রদায়কে বলল, তোমরা কি ভয় কর না'? (১২৪) "তোমরা কি বা'ল দেবতার পূজা করবে আর সর্বোত্তম স্রষ্টাকে পরিত্যাগ করবে'? (১২৫) 'যিনি আল্লাহ, তোমাদের পালনকর্তা ও তোমাদের পূর্বপুরুষদের পালনকর্তা' (১২৬)। 'অতঃপর তারা তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল। অতএব তারা অবশ্যই গ্রেফতার হয়ে আসবে' (১২৭)। 'কিন্তু আল্লাহর খাঁটি বান্দাগণ ব্যতীত' (১২৮)। আমরা এই নিয়মের ওপরে পরবর্তীদেরকেও রেখে দিয়েছি' (১২৯)। 'ইলিয়াস-এর ওপরে শান্তি বর্ষিত হোক' (১৩০)। 'এভাবেই আমরা সৎকর্মীদের প্রতিদান দিয়ে থাকি' (১৩১)। 'নিশ্চয়ই ইলিয়াস ছিল আমাদের বিশ্বাসী বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত' (ছাফফাত ৩৭/১২৩-১৩২)।

তিনি ইস্রাঈলের শাসক আখিয়াব ও তার প্রজাবৃন্দকে বা'ল দেবমূর্তির পূজা করতে নিষেধ করলেন এবং এক আল্লাহর প্রতি ইবাদতের আহ্বান জানালেন। কিন্তু দু'একজন হকপন্থী ব্যক্তি ছাড়া কেউ তাঁর কথায় কর্ণপাত করল না। তারা ইলিয়াস (আ.)-এর বিরুদ্ধে নানা অপপ্রচারে লিপ্ত হল। তাকে যত্রতত্র অপমান-অপদস্থ করা শুরু করল। এমনকি দৈহিক নির্যাতনও শুরু হয়ে গেল। কিন্তু ইলিয়াস (আ.) তাঁর দাওয়াত চালিয়ে যেতে থাকেন। অবশেষে রাজা ও রানী তাঁকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেন। ফলে তিনি রাজধানী ছেড়ে অনেক দূরে এক পাহাড়ের গুহায় আত্মগোপন করলেন এবং দুর্ভিক্ষ নাযিলের জন্য আল্লাহর নিকটে প্রার্থনা করলেন। ফলে সারা দেশে ব্যাপক দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। ইলিয়াস (আ.) মনে করলেন দুর্ভিক্ষ দূর করার জন্য তিনি যদি তাদেরকে মোজেযা প্রদর্শন করেন, তাহলে হয়ত তারা শিরক বর্জন করে তাওহীদ কবুল করবে এবং এক আল্লাহর ইবাদতে ফিরে আসবে। আল্লাহর হুকুমে হযরত ইলিয়াস (আ.) তাওহীদের দাওয়াত নিয়ে সরাসরি ইস্রাঈলের বাদশাহ আখিয়াবের দরবারে হাযির হলেন। তিনি বললেন, দেশব্যাপী এই দুর্ভিক্ষের কারণ হল আল্লাহর নাফরমানী। তোমরা নাফরমানী থেকে বিরত হলে এ আযাব দূর হতে পারে। তোমরা বলে থাক যে, তোমাদের বা'ল দেবতার নাকি সাড়ে চারশ' নবী (!) আছে। তাই যদি হয়, তাহলে তুমি তাদের সবাইকে একত্রিত কর। তারা এই দুর্ভিক্ষ দূর করার জন্য বা'ল দেবতার নামে কুরবানী করুক। আর আমি একই উদ্দেশ্যে আল্লাহর নামে কুরবানী পেশ করি। যার কুরবানী আসমান থেকে আগুন এসে ভস্ম করে দেবে, তার ধর্মই সত্য বলে গণ্য হবে। ইলিয়াস (আ.)-এর এ প্রস্তাব সবাই সানন্দে মেনে নিল। পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী "কোহে কারমাল' নামক পাহাড়ী উপত্যকায় সকলে সমবেত হল। বা'ল দেবতার নামে তার মিথ্যা নবীরা কুরবানী পেশ করল। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত বা'ল দেবতার উদ্দেশ্যে আকুতি-

www.pathagar.com

মিনতি ও কান্নাকাটি করে প্রার্থনা করা হল; কিন্তু দেবতার কোন সাড়া পাওয়া গেল না। আসমান থেকে কোন আগুন নাযিল হল না। অতঃপর হযরত ইলিয়াস (আ.) আল্লাহর নামে কুরবানী করলেন এবং যথাসময়ে আসমান থেকে আগুন এসে তা খেয়ে গেল। বস্তুতঃ এটাই ছিল কুরবানী কবুল হওয়ার নিদর্শন। এভাবেই কবুল হয়েছিল আদমপুত্র হাবীলের কুরবানী। তখনকার সময় মুশরিকদের মধ্যেও এ রীতি গ্রহণযোগ্য ছিল, যা ইলিয়াসের বর্তমান ঘটনায় প্রমাণিত হয়। আসমান থেকে আগুন এসে কুরবানী কবুলের এই অভাবনীয় দৃশ্য দেখে অনেকে সাথে সাথে সিজদায় পড়ে গেল এবং ইলিয়াসের দ্বীন কবুল করে নিল। সকলের নিকটে ইলিয়াস (আ.)-এর সত্যতা স্পষ্ট হয়ে গেল; কিন্তু বা'ল পূজারী কথিত ধর্মনেতারা তাদের যিদের ওপরে অটল রইল। এইসব মিথ্যা নবীরা ও তাদের স্বার্থান্ধ অনুসারীরা ঈমান আনল না। ওদিকে আখিয়াবের স্ত্রী ইখবীল হযরত ইলিয়াস (আ.)-কে পুনরায় হত্যার চক্রান্ত শুরু করে দিল। ফলে তিনি রাজধানী সামেরাহ (নাবলুস) ছেড়ে চলে গেলেন এবং কিছুদিন পর বনু ইস্রাঈলের অপর রাজ্য পার্শ্ববর্তী ইয়াহূদিয়াহতে উপস্থিত হলেন। ঐসময় বা'ল পূজার ঢেউ এখানেও লেগেছিল। হযরত ইলিয়াস (আ.) সেখানে পৌঁছে তাওহীদের দাওয়াত শুরু করলেন। সেখানকার সম্রাট 'ইহুরাম'-এর কাছেও তিনি দাওয়াত দিলেন; কিন্তু নিরাশ হলেন। অবশেষে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হল। কয়েক বছর পর ইলিয়াস (আ.) পুনরায় 'ইস্রাঈলে' ফিরে এলেন এবং 'আখিয়াব' ও তার পুত্র 'আখযিয়া'-কে সত্যপথে আনার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তারা তাদের শিরকী ধ্যান-ধারণায় অটল রইল। অবশেষে তাদের ওপরে বৈদেশিক আক্রমণ ও মারাত্মক রোগ-ব্যধির গযব নাযিল হল। অতঃপর আল্লাহ পাক তাঁর নবীকে উঠিয়ে নিলেন।

শিক্ষণীয় বিষয়

১. শিরকের প্রবর্তন রাষ্ট্র ও সমাজনেতাদের মাধ্যমে হলে তা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং স্থায়িত্ব লাভ করে।

২. সমাজ সংস্কারক ব্যক্তিকে আপোষহীনভাবে আল্লাহর ওপরে ভরসা করে তাওহীদ বিরোধী কাজের সংস্কারে নামতে হয়। যেভাবে ইলিয়াস (আ.) একাকী উক্ত কাজে নেমেছিলেন।

৩. সর্বদা সমাজের কিছু ন্যায়নিষ্ঠ মানুষকে তাওহীদের প্রচার ও প্রসারে আত্মনিয়োগ করতে হয়। সবাইকে দিয়ে এ কাজ সম্ভব নয়। যেমন ইসরাঈলে যোগ্য লোক না থাকায় আল্লাহপাক জর্ডান থেকে ইলিয়াসকে পাঠান তাদের হেদায়াতের জন্য।

www.pathagar.com

১৫. হযরত যুল-কিফল (আলাইহিস সালাম)

হযরত যুল-কিফল আল-ইয়াসা'-এর পরে নবী হন এবং ফিলিস্তীন অঞ্চলে বনু ইস্রাঈলগণের মধ্যে তাওহীদের দাওয়াত দেন। আল্লাহ বলেন,

وَإِسْمَاعِيْلَ وَإِدْرِيْسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِيْنَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِيْ رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِيْنَ-

'আর তুমি স্মরণ কর ইসমাঈল, ইদরীস ও যুল-কিফলের কথা। তারা প্রত্যেকেই ছিল ছবরকারী'। 'আমরা তাদেরকে আমাদের রহমতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করেছিলাম। তারা ছিল সৎকর্মশীলগণের অন্তর্ভুক্ত' (আম্বিয়া ২১/৮৫-৮৬)। অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيْلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ-

'আর তুমি বর্ণনা কর ইসমাঈল, আল-ইয়াসা' ও যুল-কিফলের কথা। তারা সকলেই ছিল শ্রেষ্ঠগণের অন্তর্ভুক্ত' (ছোয়াদ ৩৮/৪৮)।

যুল-কিফলের পরীক্ষা

'যুল-কিফল' উক্ত মর্যাদাপূর্ণ দায়িত্বে অধিষ্ঠিত হয়েছেন দেখে ইবলীস হিংসায় জ্বলে উঠল। সে তার বাহিনীকে বলল, যেকোন মূল্যে তার পদস্খলন ঘটাতেই হবে; কিন্তু সাঙ্গ-পাঙ্গরা বলল, আমরা ইতিপূর্বে বহুবার তাকে ধোঁকা দিতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছি। অতএব আমাদের পক্ষে একাজ সম্ভব নয়। তখন ইবলীস স্বয়ং এ দায়িত্ব নিল। যুল-কিফল সারা রাতি ছালাতের মধ্যে অতিবাহিত করার কারণে কেবলমাত্র দুপুরে কিছুক্ষণ নিদ্রা যেতেন। ইবলীস তাকে রাগানোর জন্য ঐ সময়টাকেই বেছে নিল। একদিন সে ঠিক দুপুরে তার নিদ্রার সময় এসে দরজার কড়া নাড়লো। কাঁচা ঘুম থেকে উঠে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কে? উত্তর এল, আমি একজন বৃদ্ধ মযলূম। তিনি দরজা খুলে দিলে সে ভিতরে এসে বসলো এবং তার ওপরে যুলুমের দীর্ঘ ফিরিস্তি বর্ণনা শুরু করল। এভাবে দুপুরে নিদ্রার সময়টা পার করে দিল। যুল-কিফল তাকে বললেন, আমি যখন বাইরে যাব, তখন এসো। আমি তোমার ওপরে যুলুমের বিচার করে দেব'। যুল-কিফল বাইরে এলেন এবং আদালত কক্ষে বসে লোকটির জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন; কিন্তু সে এলো না। পরের দিন সকালেও তিনি তার জন্য অপেক্ষা করলেন; কিন্তু সে এলো না। কিন্তু দুপুরে যখন তিনি কেবল নিদ্রা গেছেন, ঠিক তখনই এসে কড়া নাড়ল। তিনি উঠে দরজা খুলে দিয়ে তাকে বললেন, আমি কি

www.pathagar.com

তোমাকে বলিনি যে, আদালত কক্ষে মজলিস বসার পর এসো। কিন্তু তুমি কালও আসনি, আজও সকালে আসলে না। তখন লোকটি ইনিয়ে-বিনিয়ে চোখের পানি ফেলে বিরাট কৈফিয়তের এক দীর্ঘ ফিরিস্তি পেশ করল। সে বলল, হুযুর! আমার বিবাদী খুবই ধূর্ত প্রকৃতির লোক। আপনাকে আদালতে বসতে দেখলেই সে আমার প্রাপ্য পরিশোধ করবে বলে কথা দেয়। কিন্তু আপনি চলে গেলেই সে তা প্রত্যাহার করে নেয়'। এইসব কথাবার্তার মধ্যে ঐদিন দুপুরের ঘুম মাটি হ'ল। তৃতীয় দিন দুপুরে তিনি ঢুলতে ঢুলতে পরিবারের সবাইকে বললেন, আমি ঘুমিয়ে গেলে কেউ যেন দরজার কড়া না নাড়ে। বৃদ্ধ এদিন এলো এবং কড়া নাড়তে চাইল। কিন্তু বাড়ীর লোকেরা তাকে বাধা দিল। তখন সে সবার অলক্ষ্যে জানালা দিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল এবং দরজায় ধাক্কা-ধাক্কি শুরু করল। এতে যুল-কিফলের ঘুম ভেঙ্গে গেল। দেখলেন সেই বৃদ্ধ ঘরের মধ্যে অথচ ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। তিনি বুঝে ফেললেন যে, এটা শয়তান ছাড়া কেউ নয়। তখন তিনি বললেন, তুমি তাহলে আল্লাহর দুশমন ইবলীস? সে মাথা নেড়ে বলল, হ্যাঁ। আমি আজ আপনার কাছে ব্যর্থ হলাম। আপনাকে রাগানোর জন্যই গত তিনদিন যাবত আপনাকে ঘুমানোর সময় এসে জ্বালাতন করছি; কিন্তু আপনি রাগান্বিত হলেন না। ফলে আপনাকে আমার জালে আটকাতে পারলাম না। ইতিপূর্বে আমার শিষ্যরা বারবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে। আজ আমি ব্যর্থ হলাম। আমি চেয়েছিলাম, যাতে আল-ইয়াসা' নবীর সাথে আপনার কৃত ওয়াদা ভঙ্গ হয়। আর সে উদ্দেশ্যেই আমি এতসব কাণ্ড ঘটিয়েছি; কিন্তু অবশেষে আপনিই বিজয়ী হলেন'। উক্ত ঘটনার কারণেই তাঁকে 'যুল-কিফল' (ذو الكفل)। উপাধি দেওয়া হয়। যার অর্থ, দায়িত্ব পূর্ণকারী ব্যক্তি।

শিক্ষণীয় বিষয়

১. নবীদের প্রতিনিধি হওয়ার জন্য রক্ত, বর্ণ ও গোত্রীয় মর্যাদা শর্ত নয়। বরং মৌলিক শর্ত হল- তাক্বওয়া ও আনুগত্যশীলতা।

২. শয়তান বিশেষ করে পরহেযগার মুমিনের প্রকাশ্য দুশমন। কিন্তু ঈমানী দৃঢ়তার কাছে সে পরাজিত হয়।

৩. ধৈর্যগুণ হল সফলতার মাপকাঠি। তাক্বওয়া ও ছবর একত্রিত হলে মুমিন সর্বদা বিজয়ী থাকে।

৪. শুধু নিজস্ব ইবাদতই যথেষ্ট নয়। বরং জনগণের খেদমতে সময় ব্যয় করাই হল প্রকৃত মুমিনের কর্তব্য।

www.pathagar.com

১৬. হযরত ঈসা (আলাইহিস সালাম)

হযরত ঈসা (আ.) ছিলেন বনু ইসরাঈল বংশের সর্বশেষ নবী ও কিতাবধারী রাসূল। তিনি ‘ইনজীল’ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তাঁর পর থেকে শেষনবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর আবির্ভাব পর্যন্ত আর কোন নবী আগমন করেননি। ক্বিয়ামত সংঘটিত হওয়ার অব্যবহিত কাল পূর্বে হযরত ঈসা (আ.) আল্লাহর হুকুমে পুনরায় পৃথিবীতে অবতরণ করবেন এবং মুহাম্মাদী শরী‘আত অনুসরণে ইমাম মাহ্দীর নেতৃত্বে সারা পৃথিবীতে শান্তির রাজ্য কায়েম করবেন। তিনি উম্মতে মুহাম্মাদীর সাথে বিশ্ব সংস্কারে ব্রতী হবেন।

ঈসা (আ.)-এর দাওয়াত

ঈসা (আ.) নবুওয়াত লাভ করার পর স্বীয় কওমকে প্রধানত নিম্নোক্ত ৭টি বিষয়ে দাওয়াত দিতেন। কুরআনের বাণী,

وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ۔

‘আমার আনীত এ কিতাব (ইনজীল) পূর্ববর্তী কিতাব তাওরাতকে সত্যায়ন করে এবং এজন্য যে, (৫) আমি তোমাদের জন্য হালাল করে দেব কোন কোন বস্তু, যা তোমাদের জন্য হারাম ছিল। আর (৬) আমি তোমাদের নিকটে এসেছি তোমাদের পালনকর্তার নিদর্শনসহ। অতএব (৭) তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।’ (আলে ইমরান ৩/৫০)

তাওহীদ ও রিসালাতের ওপরে ঈমান আনার দাওয়াত দেওয়ার পরে তিনি বনু ইসরাঈলকে তাঁর আনীত ৫টি নিদর্শন (মোজেজা) বর্ণনা করেন। তিনি বলেন,

وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔

‘নিশ্চয়ই আমি তোমাদের নিকটে তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে এসেছি নিদর্শনসমূহ নিয়ে। (যেমন-) (১) আমি তোমাদের জন্য মাটি দ্বারা পাখির আকৃতি তৈরি করে দেই। তারপর তাতে যখন ফুঁক দেই, তখন তা উড়ন্ত পাখিতে পরিণত হয়ে যায় আল্লাহর হুকুমে। (২) আর আমি সুস্থ করে তুলি জন্মান্ধকে এবং (৩) ধবল-কুষ্ঠ রোগীকে। (৪) আর আমি জীবিত করে দেই মৃতকে আল্লাহর হুকুমে। (৫) আমি তোমাদেরকে বলে দেই যা তোমরা খেয়ে

www.pathagar.com

আস এবং যা তোমরা ঘরে রেখে আস। এতে প্রকৃষ্ট নিদর্শন রয়েছে যদি তোমরা বিশ্বাসী হও' (আলে ইমরান ৩/৪৯)।

উল্লেখ্য যে, যখন যে দেশে যে বিষয়ের আধিক্য ও উৎকর্ষ থাকে, তখন সেই দেশে সেই বিষয়ে সর্বোচ্চ ব্যুৎপত্তিসহ নবী প্রেরণ করা হয়। ঈসার সময়ে শাম বা সিরিয়া এলাকা ছিল চিকিৎসা বিদ্যায় সেরা। সে কারণ ঈসাকে আল্লাহ উপরে বর্ণিত অলৌকিক ক্ষমতা ও মোজেযাসমূহ দিয়ে পাঠান। ঈসা (আ.)-এর মোজেযাসমূহ দেখে এবং তাঁর মুখনিঃসৃত তাওহীদের বাণী শুনে গরীব শ্রেণির কিছু লোক তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হলেও দুনিয়াদার সমাজ নেতারা তাঁর প্রতি বিরূপ হয়ে ওঠে। কারণ তাওহীদের সাম্য বাণী সমাজের কায়েমী স্বার্থবাদী নেতাদের স্বার্থেই প্রথম আঘাত হেনে থাকে। শয়তান তাদেরকে কুমন্ত্রণা দেয়। ফলে তারা ঈসা (আ.)-এর বিরোধিতায় লিপ্ত হয়।

বিগত নবীগণের ন্যায় বনু ইসরাঈলগণ তাদের বংশের শেষ নবী ঈসা (আ.)-এর বিরুদ্ধে নানাবিধ চক্রান্ত শুরু করে। তারা প্রথমেই ঈসা (আ.)-কে 'জাদুকর' বলে আখ্যায়িত করে। উক্ত অপবাদে ঈসা (আ.) ক্ষান্ত না হয়ে বরং আরও দ্বিগুণ বেগে দ্বীনের দাওয়াত দিয়ে যেতে থাকেন। তখন বিরোধীরা বেছে নেয় অতীব নোংরা পথ। তারা তাঁর মায়ের নামে অপবাদ রটাতে শুরু করে। যাতে ঈসা (আ.) অত্যন্ত ব্যথা পেলেও নবুওয়াতের গুরুদায়িত্ব পালন করতে গিয়ে সবকিছু নীরবে সহ্য করতে থাকেন। ফলে ঈসা (আ.)-এর সমর্থক সংখ্যা যতই বাড়তে থাকে, অবিশ্বাসী সমাজ নেতাদের চক্রান্ত ততই বৃদ্ধি পেতে থাকে। এবার তারা তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র করল এবং সেজন্য দেশের বাদশাহকে তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে দেবার ষড়যন্ত্র করল। তারা অনবরত বাদশাহর কান ভারি করতে থাকে এই মর্মে যে, লোকটি আল্লাহদ্রোহী। সে তাওরাত পরিবর্তন করে সবাইকে বিধর্মী করতে সচেষ্ট। এসব অভিযোগ শুনে অবশেষে বাদশাহ তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করেন। তখন ইহুদিদের এসব ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করার জন্য আল্লাহ স্বীয় কৌশল প্রেরণ করেন। ঈসা (আ.) যখন বনু ইসরাঈলের স্বার্থবাদী নেতাদের বিরোধিতা ও চক্রান্ত বুঝতে পারলেন, তখন নিজের একনিষ্ঠ সাথীদের বাছাই করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করলেন এবং সবাইকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে আমার সত্যিকারের ভক্ত ও অনুসারী কারা? একথাটিই কুরআনে বর্ণিত হয়েছে নিম্নোক্তভাবে-

فَلَمَّا اَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ اَنْصَارِيْ إِلَى اللهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللهِ آمَنَّا بِاللهِ وَاشْهَدْ بِاَنَّا مُسْلِمُونَ رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا اَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِيْنَ.

www.pathagar.com

'যখন ঈসা বনু ইসরাঈলের কুফরী অনুধাবন করলেন, তখন বললেন, কারা আছ আল্লাহর পথে আমাকে সাহায্যকারী? তখন হাওয়ারীগণ বলল, আমরাই আল্লাহর পথে আপনার সাহায্যকারী। আমরা আল্লাহর ওপরে ঈমান এনেছি। আপনি সাক্ষ্য থাকুন যে, আমরা সবাই আত্মসমর্পণকারী'। "হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা সেই সব বিষয়ের ওপরে বিশ্বাস স্থাপন করেছি, যা তুমি নাযিল করেছ এবং আমরা রাসূলের অনুসারী হয়েছি। অতএব তুমি আমাদেরকে মান্যকারীদের তালিকাভুক্ত করে নাও' (আলে ইমরান ৩/৫২-৫৩)

বস্তুতঃ শত্রুদের উৎপীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে ঈসা (আ.) তাঁর অনুসারীগণের প্রতি উপরোক্ত আহ্বান জানাতে বাধ্য হয়েছিলেন। সাথে সাথে বারজন ভক্ত অনুসারী তাঁর ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন এবং আনুগত্যের শপথ নিয়েছিলেন। অতঃপর তারাই ঈসা (আ.)-এর ঊর্ধ্বারোহণের পরে ঈসায়ী ধর্ম প্রচারে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। যদিও পরবর্তী কালে তাদের মধ্যে বহু ভেজাল ঢুকে পড়ে এবং তারা বহু দলে বিভক্ত হয়ে যায়। আজও বিশ্ব খ্রিস্টান সমাজ রোমান ক্যাথলিক ও প্রটেস্ট্যান্ট নামে প্রধান দু'দলে বিভক্ত। যাদের রয়েছে অসংখ্য উপদল। আর এরা সব দলই ভ্রান্ত।

অবশেষে মহান আল্লাহ হযরত ঈসা (আ.)-কে আসমান উঠিয়ে নিয়ে যান। ঘটনাটি হলো– তারা জনৈক নরাধমকে ঈসা (আ.)-কে হত্যা করার জন্য পাঠায়; কিন্তু ইতিপূর্বে আল্লাহ ঈসা (আ.)-কে উঠিয়ে নেওয়ায় সে বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে যায়; কিন্তু এরিমধ্যে আল্লাহর হুকুমে তার চেহারা ঈসা (আ.)-এর সদৃশ হয়ে যায়। ফলে ইহুদিরা তাকেই ঈসা ভেবে শূলে বিদ্ধ করে হত্যা করে। ইহুদি-নাছারারা কেবল সন্দেহের বশবর্তী হয়েই নানা কথা বলে এবং ঈসাকে হত্যা করার মিথ্যা দাবী করে। আল্লাহ বলেন, 'এ বিষয়ে তাদের কোনই জ্ঞান নেই। তারা কেবলই সন্দেহের মধ্যে পড়ে আছে। এটা নিশ্চিত যে, তারা তাকে হত্যা করতে পারেনি' (নিসা ৪/১৫৭)। বরং তার মত কাউকে তারা হত্যা করেছিল।

শিক্ষণীয় বিষয়

১. যারা নিঃস্বার্থভাবে সমাজের কাজ করেন ও পরকালীন মঙ্গলের পথ প্রদর্শন করেন, স্বার্থপর ও দুনিয়া পূজারী সমাজনেতারা তাদের শত্রু হয় এবং পদে পদে বাধা দেয়; কিন্তু সাথে সাথে একদল নিঃস্বার্থ সহযোগীও তারা পেয়ে থাকেন।

২. দুনিয়াবী সংঘাতে দুনিয়াদারদের পার্থিব বিজয় হলেও চূড়ান্ত বিচারে তাদের পরাজয় হয় এবং তারা ইতিহাসে সর্বাধিক নিন্দিত ব্যক্তিতে পরিণত হয়। পক্ষান্তরে নবী ও তাদের অনুসারীগণ নির্যাতিত হলেও চূড়ান্ত বিচারে তারাই বিজয়ী হন এবং সারা বিশ্ব তাদেরই ভক্ত ও অনুসারী হয়।

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়

সাহাবায়ে আজমাঈন-এর ওপর জুলুম নির্যাতন

পরিচ্ছেদ-১

খোলাফায়ে রাশেদীনের জুলুম-নির্যাতন ও কষ্ট স্বীকার

১. হযরত আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর ওপর জুলুম-নির্যাতন ও কষ্ট স্বীকার

হযরত আবু বরক সিদ্দিক (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ইন্তেকালের পর মাত্র দুই বছর তিন মাস জীবিত ছিলেন। হযরত ইবনে ওমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, "রাসূলুলাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বিরহ-ব্যথা তিনি সহ্য করতে পারেননি। এভাবেই তিনি দুনিয়া হতে শেষ বিদায় গ্রহণ করেন।" রাসূলুলাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ইন্তেকালের পর তিনিই সকলকে সান্ত্বনার বাণী শুনিয়েছিলেন; কিন্তু তাঁর নিজ অন্তরের দাহ একটুও শান্ত হয়নি। একদিন গাছে একটি পাখীকে নাচতে দেখে একটু উত্তপ্ত দীর্ঘ নিঃশ্বাসসহকারে বলতে লাগলেন, "হে পাখী, কত ভাগ্যবান তুমি। গাছের ফল খাও আর শীতল ছায়ায় আনন্দে কালাতিপাত কর। মৃত্যুর পরও তুমি এমন স্থানে যাবে, যেখানে কোন প্রকার জবাবাদিহির দায়িত্ব নেই। পরিতাপ! আবু বরকও যদি এমন ভাগ্যবান হতো!" কখনও কখনও বলতেন "আফসোস! আমি যদি তৃণ হতাম আর চতুষ্পদ জন্তু আমাকে খেয়ে ফেলত।" এ সমস্ত দুঃখ ভারাক্রান্ত উক্তি হতে অনুমান করা যায়, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর চির-বিদায়ের পর হযরত আবু বকরের হৃদয়ের ব্যথা কতটুকু প্রকট হয়ে উঠেছিল।

ইসলামের বাণী প্রচারে কষ্ট স্বীকার

একদিন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) 'দারুল আরকাম' থেকে বেরিয়ে মসজিদে হারামে যান। সেখানে হঠাৎ আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) দাঁড়িয়ে বক্তৃতা শুরু করেন। তিনি লোকদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দিকে আহ্বান জানান। এভাবে ঘোষণা দিয়ে মসজিদে হারামে ইসলামী দাওয়াত দেয়ার এ ছিল প্রথম ঘটনা। মুশরিকগণ এ বক্তৃতা শুনার সাথে সাথে তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং তাঁকে মাটিতে ফেলে পদদলিত করে। ওতবা বিন রাবিয়া তাঁর মুখে জুতা দিয়ে এমন আঘাতের ওপর আঘাত করে যে, সমস্ত মুখমণ্ডল ফুলে ওঠে এবং রক্তে নাক ডুবে যায়। এ অবস্থা দেখার পর তাঁর গোত্রীয় লোকজন (বনি তায়েম) সামনে অগ্রসর হয়ে তাঁকে উদ্ধার করে তাঁর বাড়ি পৌঁছিয়ে দেয়।

www.pathagar.com

তাদের এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না যে, তিনি এখন মারা যাবেন। এজন্য পুনরায় তারা মসজিদে গেল এবং বললো, আল্লাহর কসম! যদি আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মারা যান, তাহলে আমরা ওৎবাকে জীবিত ছেড়ে দেব না। সন্ধ্যা পর্যন্ত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়ে রইলেন। জ্ঞান লাভের পর তাঁর প্রথম প্রশ্ন ছিল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অবস্থা কী? এ কথায় বনি তায়েম তাঁকে গালিগালাজ করলো, ভর্ৎসনা করলো। তারপর তারা চলে গেল। যাবার আগে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর মা উম্মুল খায়েরকে তারা বলে গেল যেন তাকে পানাহার করানো হয়। মাতা ও পুত্র ব্যতীত আর যখন কেউ ছিল না, তখন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু পুনরায় সেই প্রশ্নই করলেন। তখন উম্মে জামিলকে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর মা বললেন, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিন আবদুল্লাহর অবস্থা জানতে চাইছে, তখন তিনি বললেন, আমি তো মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিন আবদুল্লাহকেও চিনি না, আবু বকরকেও চিনি না। তবে যদি আপনি চান তো আমি আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর নিকটে যাব। তিনি বললেন, আচ্ছা চল। তিনি এসে দেখলেন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু খুব আশঙ্কাজনক অবস্থায় পড়ে আছেন। দেখামাত্র তিনি আর্তনাদ করে বললেন, আল্লাহর কসম, যারা আপনার সাথে এ আচরণ করেছে তারা কাফির ও ফাসিক। আশাকরি আল্লাহ তাদের প্রতিশোধ নেবেন। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অবস্থা কী? তিনি চুপে চুপে বললেন, আপনার মা শুনছেন। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, তাঁর জন্য ভয়ের কোনো কারণ নেই। তখন উম্মে জামিল বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পূর্ণ সুস্থ আছেন। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, কোথায় আছেন? তিনি বললেন, দারুল আরকামে আছেন। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে না যাওয়া পর্যন্ত আমি পানাহার করব না। উম্মে জামিল বলেন, একটু সবর করুন। অপঃপর যখন শহরের অবস্থা শান্ত হলো, তখন তিনি এবং উম্মুল খায়ের উভয়ে মিলে তাঁকে ধরাধরি করে দারুল আরকামে নিয়ে গেলেন।

তাঁর অবস্থা দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্নেহ বিহবল হয়ে পড়েন। তিনি তাঁর দিকে ঝুঁকে পড়ে তাঁর অবস্থা দেখলেন। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, আমার মা-বাপ আপনার জন্য কুরবান হোক, আমার বিশেষ কষ্ট হয়নি। তবে ঐ পাপাচারী আমার মুখে তার জুতার আঘাত করে যে কষ্ট দিয়েছে, তাছাড়া আর কোনো কষ্ট নেই। এ আমার মা তার পুত্রসহ এখানে হাযির। আপনি পরম শুভানুধ্যায়ী। তাঁকে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিন এবং দু'আ করুন যেন, আল্লাহ তাঁকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করেন। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জন্য দু'আ করেন, তাঁকে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেন এবং তিনি মুসলমান হয়ে যান।

www.pathagar.com

দাসত্ব মুক্তিতে অর্থনৈতিক কুরবানী

ইসলাম প্রচারের প্রাথমিক স্তরে যাঁরা তাওহীদের বাণীতে সাড়া দিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন দাস-দাসী। অনেকেই তাঁদের মুশরিক মনিবদের নির্যাতনের শিকারে পরিণত হয়ে অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট ভোগ করছিলেন। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু দাসদের মধ্যে যারা মুসলমান হয়েছেন তাদেরকে মুক্ত করতে প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন। তিনি বেলাল রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে ক্রয় করেন এবং তাকে মুক্ত করে দেন। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু আমের বিন ফাহীরা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে মুক্ত করেন, যিনি বদর ও উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

তিনি উম্মে উবাইস, নাজিরা, লাহদীয়া বিনতে নাহদীয়া প্রমুখ দাস-দাসীকে মুক্ত করেন। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু দুর্বলদের জন্য দয়া ও করুণা করতেন। তিনি মনে করতেন মুসলিম দাস-দাসীরা তার ভাই এবং স্বাধীন ব্যক্তির ন্যায় সমান মর্যাদাসম্পন্ন।

হিজরতের উদ্দেশ্যে আবিসিনিয়া যাত্রা

দাওয়াতে ইসলামীর প্রথমদিকে কুরাইশ বংশের মুশরিকেরা নগণ্য সংখ্যক মুসলমানদের উপেক্ষা করেছিল; কিন্তু ক্রমশ মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি ও তাদের সমর্থক চক্রের পরিধি বাড়তে দেখে তারা আল্লাহর দীনের মূলোচ্ছেদ করতে সংকল্পবদ্ধ হলো এবং মুসলমানদের প্রতি অকথ্য নির্যাতন শুরু করে দিল। অবস্থা দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিপদগ্রস্ত মুসলমানদের আবিসিনিয়ায় হিজরত করার অনুমতি দিলেন এবং অনেক মুসলমান সেখানে হিজরত করলেন। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু যদিও ব্যক্তিগতভাবে সকলের কাছে সম্মানিত এবং সম্ভ্রান্ত ঘরের সন্তান হিসেবে যথেষ্ট মর্যাদার অধিকারী ছিলেন, তথাপি অন্যায়-অত্যাচার থেকে নিরাপদ ছিলেন না। হযরত তালহা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বিন আব্দুল্লাহ তাঁরই দাওয়াত ও তাবলীগের দরুন ইসলাম গ্রহণ করেন। এ কথা শুনে তাঁর চাচা নাওফেল বিন খাওলিদ দু'জনকেই একত্রে বেঁধে নির্দয়ভাবে প্রহার করে। অথচ হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বংশের কোনো লোকই তাঁকে কোনো সাহায্য করতে এগিয়ে আসেনি। নিরুপায় হয়েই তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুমতি নিয়ে আবিসিনিয়ায় হিজরত করার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যান।

বরকুল গামাদ নামক জায়গায় পৌঁছার পর গোত্র-সরদার ইবনে দাজনার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। সে জিজ্ঞাসা করল, "কোথায় যাচ্ছ আবু বকর?" তিনি জবাবে বলেন, "দেশবাসী আমাকে বহিষ্কার করে দিয়েছে। এখন অন্য কোনো দেশে গিয়ে স্বাধীনভাবে আল্লাহ তা'আলার বন্দেগী করবো।" ইবনে দাজনা বলল, "তোমার মতো মানুষকে দেশ থেকে বহিষ্কার করা যেতে পারে না। তুমি গরীব ও অসহায়দের সাহায্য কর। আত্মীয়-স্বজনের প্রতি নজর রাখ, মেহমানদের

www.pathagar.com

সেবা কর এবং বিপদগ্রস্তদের উদ্ধার কর। আমার সঙ্গে ফিরে চল এবং নিজের জন্মস্থানেই আল্লাহর বন্দেগী কর।" তিনি ইবনে দাগনার সাথে মক্কায় ফিরে এলেন। ইবনে দাজনা চারদিকে ঘোষণা করে দিলেন, "আজ থেকে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু আমার জিম্মাদারীতে থাকবে। যে ব্যক্তি অভাবগ্রস্তদের খবরাখবর নেয়, আত্মীয়-স্বজনের প্রতি খেয়াল রাখে, মেহমানদের যত্ন করে এবং বিপদের সময় মানুষের উপকারে আসে তাঁকে কিছুতেই দেশত্যাগ করতে দেওয়া যায় না।" কুরাইশরা ইবনে দাগনার জিম্মাদারি মেনে নিলো; কিন্তু তারা বললো, "আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে জানিয়ে দাও, সে যেন নিজের ঘরেই নামায পড়ে ও কুরআন তিলাওয়াত করে। ঘরের বাইরে গিয়ে তার নামায পড়ার অনুমতি নেই।"

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু নিজের বাড়ির আঙিনায় একটি ছোট মসজিদ তৈরি করেছিলেন। কাফিরেরা এটির প্রতিও আপত্তি উত্থাপন করল। তারা ইবনে দাগনাকে বলল, "তোমার জিম্মাদারীতে আমরা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে এ শর্তে নিরাপত্তা দান করেছিলাম যে, সে নিজের ঘরে গোপনে ইবাদত-বন্দেগী করবে; কিন্তু এখন সে আঙিনায় মসজিদ বানিয়ে উচ্চৈস্বরে নামায পড়ে। আমাদের ভয় হয় যে, তার স্বর শুনে স্ত্রীলোক ও ছোট ছেলে-মেয়েরা পূর্বপুরুষদের ধর্ম ছেড়ে দিবে। তুমি তাকে বল, সে এ ধরনের কাজ থেকে বিরত হোক, অন্যথায় তোমার জিম্মাদারী বাতিল করে দেয়া হবে।"

ইবনে দাজনা হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বাড়িতে গিয়ে তাঁকে বললেন, আমি কোন কোন শর্তাধীনে তোমার নিরাপত্তার জিম্মাদারী নিয়েছিলাম তা তুমি নিশ্চয়ই অবগত আছ। তাই, তুমি হয় ঐ শর্ত মতো কাজ কর অন্যথায় আমাকে এ জিম্মাদারী থেকে অব্যাহতি দাও। আরববাসীর কাছে আমি ওয়াদা লঙ্ঘনকারী হিসেবে পরিচিত হতে চাই না। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু খুবই স্বাভাবিক স্বরে বললেন, তোমার জিম্মাদারীর কোনোই প্রয়োজন নেই। আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জিম্মাদারীই আমার জন্য যথেষ্ট।

মদিনার পথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে কষ্ট স্বীকার

কুরাইশদের অত্যাচারের মাত্রা বেড়ে গেলে মুসলমানরা দুই দুইবার ইথিওপিয়া হিজরত করে, বাকী যারা মদিনায় ছিলো তারাও কুরাইশদের হাতে নির্মমভাবে অত্যাচারিত হতে থাকে। এ অবস্থায় মদিনার কিছু লোক ইসলাম গ্রহণ করে। তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে অনুসরণ করা শুরু করে। তখন সাহাবীদের একটি ছোট দল মদিনায় হিজরত করেন।

মক্কাবাসী আবু তালিবের ইন্তিকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবীদের ওপর অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়ে দিলো; কিন্তু যখন অত্যাচারের মাত্রা চরমে উঠলো এবং সকল পথ বন্ধ হয়ে গেলো তখনই মদিনায় হিজরতের অনুমতি আসলো।

www.pathagar.com

যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, আবু তালিব, যারা কুরাইশদের হাতে বন্দি ও যারা মক্কায় বিভিন্ন কারণে থাকতে বাধ্য তারা ব্যতীত আর কেউ মক্কায় বাকী রইল না। তখন কুরাইশরা ভাবল সকল মুসলমান মদিনায় একত্রিত হয়ে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিবে। তাই মক্কার কুরাইশরা তাদের সম্মেলন কক্ষ দারুল নদওয়ায় একটি বৈঠকে বসল। এ বৈঠকে ইসলামকে নির্মূল করতে তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে হত্যার সিদ্ধান্ত নিল। তখন মহান আল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে হিজরতের অনুমতি দিলের। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মহান আল্লাহ আমাকে একজন সাথী দিয়েছেন। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বললেন, আমি দু'টি উট কিনেছি এবং হিজরতের জন্য এগুলো তৈরি করেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জন্য আনা উটটির মূল্য পরিশোধ করেন, এর মাধ্যমে প্রমাণিত হয় ইসলাম প্রচার ও দ্বীনের কাজে সকলে তাদের ব্যক্তিগত খরচ নিজে বহন করবে।

যখন প্রস্তুতি সম্পন্ন হলো, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হিজরত শুরু করলেন। তারা মদিনার প্রচলিত রাস্তা ত্যাগ করে দুর্গম-অপরিচিত পথে যাত্রা শুরু করলেন যাতে কুরাইশরা তাদের পিছু নিতে না পারে। কুরাইশরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে না পেয়ে মদিনার উত্তরের রাস্তায় খোঁজ করবে তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দক্ষিণ দিকের ইয়েমেনের পথ ধরে যাত্রা শুরু করলেন। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভালো করে জানতেন তাঁর খোঁজকারীরা মদিনার দিকের উত্তরের পথেই তাঁকে খুঁজবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিলো মক্কার সামান্য দক্ষিণে সওর গুহা। এ পরিকল্পনা অনুযায়ী তারা নিরাপদে গুহায় আসলেন। তিনি সওর গুহায় তিন দিন অপেক্ষা করলেন। এটা ছিলো অনুসরণকারীদের চোখ এড়ানোর জন্য যথেষ্ট সময়।

যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু গুহায় লুকিয়ে ছিলেন, তখন কিছু খোঁজকারী গুহার প্রায় কাছে চলে এলো। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েন; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, হে আবু বকর! চিন্তা করো না, আমরা কেবল দু'জন নই! আল্লাহ আমাদের মধ্যে তৃতীয়জন। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে দুই বন্ধুর এই কথোপকথন বর্ণিত হয়েছে, যখন মূর্তিপূজারীরা গুহার পাশে এসে দাঁড়ালো। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বললেন, যদি তারা তাদের পায়ের দিকে তাকায়, তবে তারা আমাদেরকে দেখে ফেলবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, চিন্তা করো না আল্লাহ আমাদের সাথেই আছেন।

গুহা থেকে ৪ রবিউল আউয়াল বের হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ৮ দিন পর ১২ রবিউল আউয়াল মদিনায় পৌঁছেন। এভাবে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হিজরতের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সকল কষ্টস্বীকার করেছেন।

www.pathagar.com

জিহাদে ও সংগ্রামে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু

মদিনায় হিজরত করার পরে ইসলামের অসহায়ত্ব ও নির্যাতিত হওয়ার যুগের অবসান হয়। এখন স্বাধীনভাবে পবিত্র দীনের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার সুযোগ এসে যায়; কিন্তু আরবের যুদ্ধবাজ গোত্রগুলো তীর-ধনুক ও তরবারির তীক্ষ্ণ অগ্রভাগের সাহায্যে দ্বীনী বিষয়েও চূড়ান্ত মীমাংসা করতে চাইছিল। তাই তারা দ্বীনের পতাকাবাহীদের শান্তিপূর্ণ ও নিয়মতান্ত্রিক প্রচার-প্রচেষ্টা মুলতবি করে যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে বাধ্য করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হিজরতের পর থেকে মক্কা বিজয় পর্যন্ত যুদ্ধবিগ্রহ চলতে থাকে। আর এসব যুদ্ধে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু একজন উপদেষ্টা ও সুকৌশলী উজীর হিসেবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গী ছিলেন।

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সকল যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে অংশগ্রহণ করেন। তিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। উহুদ যুদ্ধে যখন অনেকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালায়ন করছিলো, তখন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু দৃঢ়ভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে থেকে শত্রুদের মোকাবিলা করেন। তাবুক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হাতে পতাকা তুলে দেন।

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর ইন্তেকাল

ইবনে হিশাম বলেন, হযরত সিদ্দিকে আকবরের কাছে কিছু গোশ্ত উপহার এসেছিল। তিনি হাঁরেস ইবনে কালদাসহ তা খেতেছিলেন। এমতাবস্থায় হপরেস বললেন- "আমীরুল মোমেনীন, আর খাবেন না। আমার মনে হয় তাতে বিষ মিশ্রিত রয়েছে।" সঙ্গে সঙ্গেই তিনি খাওয়া বন্ধ করে দিলেন; কিন্তু এ দিন হতেই তাঁরা উভয়ে পীড়া অনুভব করতে শুরু করেন। হিজরী ১৩ সালের ৭ই জুমাদাল উখরা সোমবার দিন তিনি গোসল করেছিলেন। এতেই জ্বর শুরু হল। এ জ্বর আর সারল না। শরীরে যে পর্যন্ত শক্তি ছিল রীতিমত মসজিদে এসে নামায পড়িয়েছেন, কিন্তু রোগ যখন তীব্র হয়ে উঠল, তখন হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে ডেকে বললেন, "এখন হতে আপনি নামায পড়াতে থাকবেন।"

তিনি হযরত ওসমানকে ডেকে বললেন, "খেলাফতের অসিয়তনামা লিখে ফেলুন।" অল্পকিছু লেখা হওয়ার পরই হযরত সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বেহুঁশ হয়ে পড়লেন। এ অবস্থা দেখে হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু নিজ তরফ হতেই লিখে দিলেন, "আমি ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে খলিফা নিযুক্ত করে যাচ্ছি।" কিছুক্ষণ পর হুঁশ হলে হযরত ওসমানকে বললেন, যে পর্যন্ত লেখা হয়েছে আমাকে পড়ে শোনান। হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সবটুকু পাঠ করে শুনালে তিনি আলাহু আকবার বলে উঠলেন এবং বলতে লাগলেন, "আল্লাহ তোমাদেরকে শুভ পরিণাম দান করুন।" −(আল-ফারুক্)

অতঃপর অসিয়তনামা হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এবং একজন আনসারীর হাতে দিয়ে দিলেন যেন মসজিদে নববীতে মুসলমানদের শুনিয়ে দেয়া হয়। অতঃপর স্বয়ং অত্যধিক দুর্বলতার সত্ত্বেও ঘরের বারান্দার দিকে চলে আসলেন। তাঁর বিবি হযরত উম্মে রুম্মান তাঁর দুই হাত ধরে রেখেছিলেন, নীচে লোক সমবেত হয়েছিল। তাঁদের উদ্দেশ করে বলতে লাগলেন, "যাকে আমি খলিফা নির্বাচিত করব, তাঁকে কি তোমরা গ্রহণ করবে? আল্লাহর শপথ, আমি চিন্তা করে দেখেছ বিন্দুমাত্রও ত্রুটি করিনি। তাছাড়া আমি আমার কোন নিকট-আত্মীয়কেও নির্বাচিত করিনি। আমি ওমর ইবনে খাত্তবকে আমার স্থলাভিষিক্ত নির্বাচিত করছি। আমি যা করেছি তা মেনে লও।"

মৃত্যুর কিছুক্ষণ পূর্বে বললেন, "বাইতুলমাল হতে আমি এ পর্যন্ত যে পরিমাণ বৃত্তি গ্রহণ করেছি, তার হিসাব কর।" হিসাব করার পর জানা গেল, গোটা খেলাফত আমলে মোট ছয় হাজার দেরহাম বা পনের শত টাকা গ্রহণ করেছেন। বললেন, "আমার ভূমি বিক্রয় করে এখনই এ অর্থ পরিশোধ করে দাও।" সাথে সাথে ভূমি বিক্রয় করে : বাইতুলমালের টাকা পরিশোধ করে দেয়া হল। এভাবেই আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হিজরতের বন্ধুর এক-একটি পশম বাইতুলমালের দায়িত্ব হতে মুক্ত করা হল। বাইতুলমালের টাকা পরিশোধ করার পর বললেন, "অনুসন্ধান করে দেখ, খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করার পর আমর সম্পত্তি কোন প্রকার বৃদ্ধি পেয়েছে কি-না? অনুসন্ধান করে জানা গেল, খলিফা হওয়ার পর তাঁর একটি হাবশী ক্রীতদাস, যে শিশুদের দেখাশোনা এবং মুসলিম জাগণের তরবারি পরিষ্কার করার কাজ করত, পানি আনার একটি উষ্ট্রী এবং এক টাকা চার আনা মূল্যের একটি চাদর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে। হিসাব শুনে নির্দেশ দিলেন, আমার মুত্যুর পর এগুলো পরবর্তী খলিফার নিতট পৌঁছে দিও।

ইন্তেকালের পর উপরোক্ত বস্তুগুলো হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-এর নিকট উপস্থিত করা হলে তিনি কাঁদে ফেললেন এবং বলতে লাগলেন "হে আবু বকর, আপনি আপনার স্থলাভিষিক্তদের দায়িত্ব অত্যন্ত কঠিন করে গেলেন।"

ইন্তেকালের সময় হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু জিজ্ঞাসা করলেন, "হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন দিন ইন্তেকাল করেছিলেন?" বলা হল, সোমবার দিন। তখন তিনি বললেন, আমার আকাঙ্ক্ষা যেন আজই আমি বিদায় হই। যদি আল্লাহ্ আমার এ আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেন, তবে আমাকেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র কবরের কাছে সমাহিত করো।

ধীরে ধীরে শেষ নিঃশ্বাসের সময় নিকটবর্তী হতেছিলেন। হযরত আয়েশাকে জিজ্ঞাসা করলেন, হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে কয়টি কাপড়ে কাফন দেয়া হয়েছিল? আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা বললেন, তিন কাপড়ে। তিনি বললেন, আমাকেও তিন

www.pathagar.com

কাপড়ে কাফন দিও। এখন আমার শরীরে যে দুইটি চাদর আছে এগুলো ধুয়ে দিও, আর একটি কাপড় বের হতে ব্যবস্থা করো। হযরত আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা সমবেদনার সুরে নিবেদন করলেন,- "আব্বাজান! আমরা এত দরিদ্র নই যে, নতুন কাফন কিনতে সমর্থ হব না।"

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বললেন, "কন্যা, মৃতদের চাইতে জীবিতদের কাপড়ের বেশি প্রয়োজন। আমার জন্য এ পুরাতন কাপড়ই যথেষ্ট হবে।"

হযরত আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা বলেন, মৃত্যুর সময় আমি আমার পিতার শিয়রে বসে নিম্নের মর্ম সম্বলিত কবিতাটি আবৃত্তি করেছিলাম-

"যার অশ্রু সর্বদা, বদ্ধ রয়েছে একদিন তাও প্রবাহিত হবে। প্রত্যেক আরোহীর কোন না কোন গন্তব্যস্থান রয়েছে। প্রত্যেক পরিধানকারীকেই কাপড় দেয়া হয়ে থাকে।!"

এগুলো শুনে আমর পিতা বলতে লাগলেন, কন্যা, এ ভাবে নয়, সত্য কথা এরূপ যেরূপ আল্লাহ্ বলেছেন :

وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ

মৃত্যু যন্ত্রণার সময় উপস্থিত হয়েছে, তা ঐ নিদারুণ সময় যা হতে তোমরা পলায়ন করতে।[৮৩]

অবশেষে মৃত্যুর পূর্বক্ষণে এ কথা বলতে বলতে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-এর পবিত্র জীবনের সমাপ্তি হয়েছিল- "হে আল্লাহ, আমাকে মুসলমান হিসেবে মৃত্যু দাও এবং তোমার সৎ বান্দাদের সাথে মিলিত করো।"

হিজরী ১৩ সনের ২৩ জুমাদাল আখের সোমবার দিন এশা ও মাগরেবের মধ্যবর্তী সময়ে তিনি ইন্তেকাল করেন। এ সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর। তাঁর খেলাফত ছিল দুই বছর তিন মাস এগার দিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্কন্ধ বরাবর মাথা রেখে হযরত আবু বরক রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-এর কবর রচনা করা হয়। হযরত ওমর, হযরত তালহা, হযরত ওসমান এবং জযরক আবদুর রহমান ইবনে আউফ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু পবিত্র লাশ কবরে নামালেন। এভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পর উম্মতের সবচাইতে জনপ্রিয়, সর্বজন মান্য ব্যক্তিকে দুনিয়ার আকাশ হতে চিরতরে ডুবিয়ে দেয়া হল। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন।

---

[৮৩] আল কুরআন, সূরা কাহাফ, ৫০ : ১৯।

www.pathagar.com

২. হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-এর ওপর জুলুম-নির্যাতন ও কষ্ট স্বীকার

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শেষ বিদায়ের পর ইসলাম ও মুসলিম জাতির রক্ষণাবেক্ষণের কাজ ছিল এক পর্বতপ্রমাণ দায়িত্ব। এ সহ্যাতীত বোঝা ইসলামের দুই জন নিষ্ঠাবান সন্তান মিলিতভাবে গ্রহণ করেছিলেন। তাদের প্রথম ব্যক্তি হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ও দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু। হযরত সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু একাধারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিচ্ছেদ-ব্যথায় তিলে তিলে নিঃশেষিত হয়ে আসছিলেন, অপরদিকে ইসলাম ও মুসলিম জাতির দায়িত্বের গুরুভার তাঁর মস্তক বিগলিত করে দিয়েছিল। এর ফল হল, রাসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পর তিনি মাত্র দুই বছরকাল জীবিত ছিলেন। তারপর এ দায়িত্বের বোঝা সম্পূর্ণরূপে হযরত ওমরের কাঁধে এসে পতিত হয়।

কুরাইশদের অত্যাচার থেকে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ও রক্ষা পাননি

ইমাম ইবনে জাওযী হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা উদ্ধৃত করে বলেছেন যে, যখনই কোন ব্যক্তি মুসলমান হয়ে যেত; তখনই লোক তাঁর পিছু ধাওয়া করত, তাকে মারধর করত, সেও তাদের পাল্টা জবাব দিত। এজন্য যখন আমি মুসলমান হয়ে গেলাম, তখন আমার মামা আসী বিন হাশিমের কাছে গেলাম। তাঁকে আমার মুসলমান হয়ে যাওয়ার খবর জানালাম। আমার কথা শোনামাত্রই সে ঘরের ভেতর চলে গেল। তারপর কুরাইশদের একজন বড় নেতার বাড়িতে গেলাম (সম্ভবত আবু জাহলের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে) এবং তাকে বিষয়টি সম্পর্কে জানালাম; কিন্তু সেও গিয়ে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করল[৮৪]।

ইবনে হিশাম ও ইবনে জাওযী বর্ণনা করেছেন যে, যখন হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু মুসলমান হলেন, তখন তিনি জামীল বিন মা'মার জুমাহির কাছে গেলেন। কোন কথা বা তথ্য প্রচার করা কিংবা ঢোল-শোহরত করার ব্যাপারে সে কুরাইশদের মধ্যে বিখ্যাত ছিল। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তাকে বললেন– তিনি মুসলমান হয়ে গিয়েছেন। একথা শোনামাত্র খুব উচ্চকণ্ঠে সে ঘোষণা করতে থাকল– খাত্তাবের পুত্র ওমর বেদ্বীন হয়ে গিয়েছে। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তার পেছনেই ছিলেন। সাথে সাথে তিনি এ বলে উত্তর দিলেন যে, "সে মিথ্যা বলছে, আমি বেদ্বীন হইনি বরং মুসলমান হয়েছি।"

সবাই তাঁর ওপর চড়াও হল এবং মারপিট শুরু হয়ে গেল। এক পক্ষে জনতা এবং অন্য পক্ষে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু মারপিট চলতে থাকল। এত সময় ধরে মারপিট চলতে থাকল যে, সে অবস্থায় সূর্য প্রায় মাথার উপর এসে পড়ল।

---

[৮৪] তারীখ ওমর বিন খাত্তাব পৃ. ৮।

www.pathagar.com

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ক্লান্ত হয়ে বসে পড়লেন। লোকজন তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বললেন: "যা খুশী করো। আল্লাহর শপথ! আমরা যদি সংখ্যায় তিনশত হতাম, তাহলে মক্কায় তোমরা অবস্থান করতে, না আমরা অবস্থান করতাম একটা সিদ্ধান্ত হয়ে যেত।"[85]

এই ঘটনার পর মুশরিকগণ আরও রাগান্বিত ও সংঘবদ্ধ হয়ে উঠল এবং হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বাড়ি আক্রমণ করে তাঁকে হত্যা করার এক গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হল। যেমনটি সহীহ বুখারী শরীফের মধ্যে হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন যে, মক্কার পৌত্তলিকদের আক্রমণের আশঙ্কায় হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় ঘরের মধ্যেই অবস্থান করছিলেন। এমন সময় আবু আমর আস বিন ওয়ায়েল সাহমী সেখানে আসলেন। সে ইয়েমেন দেশের তৈরি নকশাদার জোড়া চাদর ও রেশম দ্বারা সুসজ্জিত চমকদার জামা পরিহিত অবস্থায় ছিল। তাঁর সম্পর্ক ছিল সাহম গোত্রের সঙ্গে। জাহিলিয়াত যুগে এই গোত্র বিপদ-আপদে আমাদের সাহায্য করবে বলে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল।

সে জিজ্ঞেস করল, 'কী ব্যাপার'? হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বললেন– "আমি মুসলমান হয়ে গিয়েছি এবং এজন্যই আপনার জাতি আমাকে হত্যা করতে চাচ্ছে। আস বলল– "তা সম্ভব নয়"। আস-এর এই কথা শুনে আমি মনে কিছুটা আশ্বস্ত হলাম, কিছুটা স্বস্তি অনুভব করলাম। তারপর আস সেখান থেকে ফিরে গিয়ে লোকজনদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করার উদ্যোগ গ্রহণ করল। তখন জনতার ভিড়ে সমস্ত উপত্যকা ভরে গিয়েছিল।

সাধারণ মানুষের সামনে অবস্থিত লোকজনকে জিজ্ঞেস করল– "তোমরা কোথায় চলেছ?" উত্তরে তারা বলল– "আমরা চলেছি খাত্তাবের ছেলেকে শায়েস্তা করতে। কারণ সে বেদ্বীন (বিধর্মী) হয়ে গিয়েছে।" আস বলল– "না সেদিকে যাবার কোন পথ নেই।" একথা শোনা মাত্রই জনতা আর অগ্রসর না হয়ে, তাদের আগের স্থানের দিকে ফিরে গেল।[86] ইবনে ইস্হাক রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এক বর্ণনায় বলা হয়েছে- "আল্লাহর শপথ, তাদের দেখে মনে হচ্ছিল, যেন তারা সমস্ত লোকজন একখানা কাপড় ছিল, যাকে ওপর হতে প্রচণ্ড বেগে টান দিয়ে নিক্ষেপ করা হয়েছে।[87]

সত্য প্রকাশে দ্বিধাহীন

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ইসলাম গ্রহণের কারণে কাফিরদের এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল যা ইতোপূর্বে আলোচনা হয়েছে। অপরপক্ষে মুসলমানদের অবস্থা

[85] তারীখ ওমর বিন খাত্তাব পৃ. ৮ ও ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড. পৃ. ৩৪৮ ও ৩৪৯।
[86] সহীহ বোখারী, ওমর বিন খাত্তারের ইসলাম গ্রহণ অধ্যায়, প্রথম খ. ৫৪৫ পৃ.।
[87] ইবনে হিশাম, প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড ৩৪০ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

সম্পর্কে জানা যাবে পরের ঘটনা থেকে। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে মুজাহিদ বর্ণনা করেছেন- "আমি ওমর বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে জিজ্ঞেস করলাম: কী কারণে আপনার উপাধি 'ফারুক' হয়েছে? তখন তিনি আমাকে বললেন– "আমার তিনদিন আগে হযরত হামযা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু মুসলমান হয়েছিলেন"। অতপর তিনি তাঁর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা বর্ণনা করে শেষে বললেন যে, "আমি যখন মুসলমান হলাম তখন আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমরা কী সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত নই, যদিও জীবিত থাকি কিংবা মরে যাই?"

হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন : "অবশ্যই! সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার জীবন, তোমরা যদিও জীবিত থাক কিংবা মৃত্যুমুখে পতিত হও- তোমরা হক বা সত্যের ওপরই রয়েছে।"

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বললেন, "তখন আমি সকলকে উদ্দেশ্য করে বললাম গোপনীয়তার আর কী প্রয়োজন? সেই সত্তার শপথ, যিনি আপনাকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন, আমরা অবশ্যই গোপনীয়তা পরিহার করে বাইরে যাব। অতপর আমরা দুট সারি বেঁধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দুই সারির মধ্যে নিয়ে বাইরে এলাম। এক সারির সামনে ছিলেন হযরত হামযা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু আর অন্য সারির সামনে ছিলাম আমি। আমাদের চলার কারণে রাস্তায় চাক্কীর আটার মত হালকা হালকা ধূলিকণা উড়ে যাচ্ছিল। এভাবে যেতে যেতে আমরা মসজিদুল হারামে গিয়ে প্রবেশ করলাম। "কুরাইশগণ যখন আমাকে এবং হামযা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে মুসলমানদের সাথে দেখল, তখন মনে মনে তারা এত আঘাত পেল যে, এমন আঘাত ইতোপূর্বে আর কখনও পায়নি। সেদিনই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার উপাধি দিয়েছিলেন ফারুক।"[৪৪]

"হযরত ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেছেন যে, যতদিন পর্যন্ত হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ইসলাম গ্রহণ করেননি; ততদিন পর্যন্ত আমরা কা'বাগৃহের নিকটে নামায আদায় করতে সাহস করিনি। হযরত সুহাইব বিন সিনান রুমী বর্ণনা করেছেন যে, হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু যেদিন ইসলাম গ্রহণ করলেন সেদিন থেকে ইসলাম তার গোপন কক্ষ থেকে বেরিয়ে এল বাইরের জগতে। সেদিন থেকে প্রকাশ্যে প্রচার এবং মানুষকে প্রকাশ্যে দ্বীনের প্রতি আহ্বান জানানো সম্ভব হল।

আমরা গোলাকার হয়ে আল্লাহর ঘরের পাশে বৈঠক করলাম, আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করলাম। যারা আমাদের ওপর অন্যায়-অত্যাচার করল আমরা তার প্রতিশোধ গ্রহণ করলাম এবং তাদের কোন কোন অন্যায়ের প্রতিবাদও

---

[৪৪]ইবনে জাওযী-তারীখে ওমর বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ৬-৭ পৃ.।

www.pathagar.com

করলাম।[৮৯] হযরত ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু আরও বলেন, "যখন হতে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু মুসলমান হয়েছিলেন, তখন থেকে আমরা সমানভাবে শক্তিশালী হয়েছিলাম এবং মান-সম্মানের সঙ্গে বসবাস করতে পেরেছিলাম।"[৯০]

ইসলামের জন্য স্বদেশ ছেড়ে মদিনায় হিজরত

যখন হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু মদিনায় হিজরত করার সিদ্ধান্ত নিলেন, তিনি সেটা প্রকাশ্যেই করলেন। প্রত্যেকেই গোপনে চলে গিয়েছিলেন; কিন্তু যখন হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হিজরত করার সিদ্ধান্ত নিলেন, তিনি এক হাতে খোলা তরবারি ও অন্য হাতে তীর নিয়েছিলেন। তিনি তাঁর কাঁধে ধনুক রাখলেন এবং কা'বার দিকে রওনা করলেন। তিনি সেখানে সাত বার তাওয়াফ করেন এবং মাকামে ইবরাহীমে নামায আদায় করলেন। তারপর তিনি কোরাইশদের একটি দলের সরদারের কাছে আসেন এবং তাদের প্রতি হুমকি প্রদান করে বলেন, "যে তার মাতাকে সন্তান হারা করতে চায় এবং স্ত্রীকে বিধবা করতে চায়, সে যেন তার মুখোমুখি হয়! যাহোক কেউ তাদের স্থান হতে নড়লো না এবং হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু মুখোমুখি হতে সাহস করলো না।

তারপর তিনি সাহসিকতার সাথে মদিনা হিজরত করেন। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু মদিনায় স্থায়ী বসবাসের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিচক্ষণ পরামর্শদাতা হন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাতে শিক্ষাগ্রহণ করেন এবং নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাত ও কুরআন মাজীদ শিক্ষাগ্রহণ করেন। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু সুন্নাতের প্রতি গভীর মনোযোগী ছিলেন, যা তাকে ইসলামের বোধগম্যতায় পূর্ণতা দান করে। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে যখন কোনো মজলিসে বসতেন তখন তিনি মজলিস শেষ না হওয়া পর্যন্ত মজলিস ত্যাগ করতেন না। যেকোনো বিষয়ে কোনো সমস্যার সম্মুখীন হলে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করতেন। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে গভীরভাবে ভালোবাসতেন। তিনি তাঁর নিজ জীবনকে তাঁর প্রতি উৎসর্গ করার জন্য সর্বদা তৈরি ছিলেন।

জিহাদের ময়দানে কষ্টস্বীকার

হযরত ওমর ইবন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে প্রত্যেক রণক্ষেত্রেই অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে বদর, উহুদ ও এবং অন্যান্য সকল যুদ্ধে যোগদান করেছিলেন। তিনি একমুহূর্তের জন্যও সেগুলো থেকে বিরত থাকেননি।

---

[৮৯] ইবনে জওযী, তারীখে ওমর বিন খাত্তাব পৃ. ১৩।

[৯০] সহীহ বুখারী, ওমর বিন খাত্তাবের ইসলাম গ্রহণ অধ্যায় ১ম খণ্ড. ৫৪৫ পৃ.।

www.pathagar.com

হযরত ওমর রাসূলুল্লাহ -এর একান্ত সহচর, জীবদ্দশায় জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত ১০ জন সাহাবির অন্তর্ভুক্ত। খোলাফায়ে রাশেদার অন্তর্ভুক্ত দ্বিতীয় মহান এই খলিফা নিঃস্বার্থ কর্মবীর ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী রণকৌশলী ছিলেন। বিশ্ববিখ্যাত একজন দক্ষ সৈনিক হিসেবেও তিনি পরিচিত। রাসূলুল্লাহ -এর জীবদ্দশায় তিনি প্রায় সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি কোনো কোনো যুদ্ধে সেনাপতি হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। বদর, উহুদ, খন্দকসহ সকল যুদ্ধেই রাসূলুল্লাহ -এর সাথে ছিলেন। ছাড়াও বেশকিছু 'সারিয়া-তে হযরত ওমর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

হযরত ওমর -এর শাহাদাত

একদিন কা'ব আল-আহ্বার খলিফাকে বললেন, আমি তাওরাতে দেখেছি, আপনি শহীদ হবেন। খলিফা বললেন, এ কি করে সম্ভব, আরবে থেকেই আমি শহীদ হব? সঙ্গে সঙ্গে দোয়া করলেন, "হে আল্লাহ, আমাকে তোমার পথে শহীদ কর এবং তোমার প্রিয় রাসূল -এর মদিনায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার সুযোগ দাও।"

একদিন জুমার খুৎবায় বলতে লাগলেন- আমি স্বপ্নে দেখেছি, একটি পাখি এসে আমার মাথার উপর ঠোকর মেরেছে। এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা হচ্ছে আমার মৃত্যু নিকটবর্তী। আমার জাতি দাবী করছে, আমি যেন আমার স্থলাভিষিক্ত নির্বাচিত করে যাই। স্মরণ রেখো, আমি মৃত্যু বা খেলাফত কোনটিরই মালিক নই। আল্লাহ স্বয়ং তাঁর দ্বীন ও খেলাফতের রক্ষক। তিনি তা কখনও বিনষ্ট করবেন না।

যুহরী বলেন, হযরত ওমর নির্দেশ দিয়েছিলেন, কোন প্রাপ্তবয়স্ক মোশরেক মদিনায় প্রবেশ করতে পারবে না। এ ব্যাপারে কুফার শাসনকর্তা হযরত মুগীরা ইবন শো'বা তাঁকে লিখে জানালেন, এখানে ফিরোজ নামক এক বিচক্ষণ যুবক রয়েছে। সে সূত্রধর ও লৌহ শিল্পের খুব ভাল কাজ জানে। আপনি যদি তাকে মদিনায় প্রবেশের অনুমতি দেন, তবে সে মুসলমানদের অনেক কাজে লাগতে পারে। হযরত ওমর তাকে মদিনায় প্রবেশের অনুমতি দিলেন। ফিরোজ মদিনায় প্রবেশ করেই খলিফার নিকট অভিযোগ করল, হযরত মুগীরা আমার ওপর অযথা কর ধার্য করে রেখেছেন, আপনি তা হ্রাস করে দিন।

হযরত ওমর জিজ্ঞাসা করলেন, কত কর ধার্য করা হয়েছে? ফিরোজ জবাব দিল দৈনিক দুই দেরহাম। হযরত ওমর বললেন, তোমার পেশা কি? ফিরোজ বলল, -কাষ্ঠ চিত্র ও লৌহ শিল্প। ওমর বললেন, পেশার তুলনায় এ পরিমাণ কর মোটেই অধিক নয়। ফিরোজের পক্ষে এ উত্তর সহ্যাতীত ছিল।

www.pathagar.com

সে ক্রোধে অধীর হয়ে বাহির হয়ে গেল এবং বলতে লাগল- আমীরুল মোমেনীন আমি ব্যতীত আর সকলের প্রতি ন্যায়বিচার করেন। কিছুদিন পর হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ফিরোজকে পুনরায় ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন- আমি শুনতে পেলাম, তুমি এমন এক প্রকার চক্র তৈরি করতে পার যা বায়ুর সাহায্যে চলতে পারে। ফিরোজ একটু ব্যঙ্গ করে জওয়াব দিল- আমি আপনার জন্য এমন চক্র তৈয়ার করব যা এখানকার লোক কখনও ভুলবে না। ফিরোজ চলে গেলে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন- এ যুবক আমাকে হত্যার হুমকি দিয়ে গেল।

দ্বিতীয় দিন ফিরোজ একটি দুইধারী খঞ্জর আস্তিনে লুকিয়ে সকালে মসজিদে উপস্থিত হল। মসজিদের কিছু লোক নামাযের কাতার ঠিক করতে নিযুক্ত ছিলেন। নামাযের কাতার যখন ঠিক হয়ে যেত তখনই সাধারণত হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তশরীফ আনতেন এবং ইমামতি করতেন। এ দিনও সেরূপ হল। কাতার ঠিক হয়ে যাওয়ার পরই ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ইমামতের জন্য অগ্রসর হলেন। নামায শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে ফিরোজ এসে উপর্যুপরি ছুরি দ্বারা ছয়টি আঘাত করলো।

দুনিয়া এ মারাত্মক মুহূর্তেও খোদাভীতির এক নূতন দৃশ্য দেখল। আহত হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু যখন ঢলে পড়ছিলেন, তখন তিনি হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফকে হাতে ধরে ইমামের স্থানে দাঁড় করিয়ে দিলেন এবং স্বয়ং সেই স্থানে পড়ে কাতরাতে লাগলেন। আবদুর রহমান ইবনে আউফ এ অবস্থায়ই নামায পড়ালেন। আমীরুল মোমেনীন হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সম্মুখে পড়ে কাতরাতে ছিলেন। ফিরোজ আরো কয়েকজনকে আহত করে শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ল এবং সঙ্গে সঙ্গেই আত্মহত্যা করে ফেলল।

আহত হযরত ওমর ফারুককে ঘরে আনা হল। সর্বপ্রথম তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁর আততায়ী কে? লোকেরা বলল, ফিরোজ! এ কথা শুনে পবিত্র চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে মুখে বলতে লাগলেন, আল্লাহর শোকর আমি কোন মুসলমানের হাতে নিহত হচ্ছি না। লোকেরা ধারণা করছিল, আঘাত তত মারাত্মক নয়, হয়ত সহজেই আরোগ্য হয়ে যাবেন। সঙ্গে সঙ্গে একজন চিকিৎসকও ডাকা হল। চিকিৎসক খেজুরের রস এবং দুধ পান করালেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তা আঘাতের স্থান দিয়ে বের হয়ে এলো।

শেষ মুহূর্তে তিনি পুত্র আবদুল্লাহকে ডেকে বললেন, আবদুল্লাহ, হিসাব করে দেখ আমার ওপর কি পরিমাণ ঋণ রয়েছে। হিসাব করে বলা হল, ৮৬ হাজার দেরহাম। বললেন, এ ঋণ আমার পরিবারের সম্পত্তি দ্বারা পরিশোধ করে দিও। যদি তাতেও না হয় তবে কোরায়শে গোত্র হতে সাহায্য নিও। এটা ২৩ হিজরীর যিলহাজ্জ মাসের শেষ দিকের ঘটনা। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর। হযরত সোয়াওয়াব জানাযার নামায পড়ান। হযরত আবদুর রহমান, ওসমান,

www.pathagar.com

হযরত তালহা, হযরত সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস এবং হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু মুসলিম জাহানের এ উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ককে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পাশে চিরনিদ্রায় শুইয়ে দেন। হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-এর শাহাদাত মুসলমানদের হৃদয়ে যে বেদনার সৃষ্টি করেছিল, তা ভাষায় প্রকাশ করা দুষ্কর। হযরত আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, "হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ও হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু যেন ইসলামের পিতামাতা ছিলেন, তাঁদের বিদায় হয়ে যাওয়ার পর ইসলাম যেন এতীম হয়ে গেল। আল্লাহ বলেন, তাঁরা মরে যাননি, বরং জীবিত আছেন এবং সর্বদা জীবিত থাকবেন।"

৩. হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-এর ওপর জুলুম-নির্যাতন ও কষ্ট স্বীকার

মানবতার নবীর বিদায়ের পর হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু খলিফা নির্বাচিত হন। এ সময়টা বিশেষ শান্তির সাথে অতিবাহিত হয়। অতঃপর হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু খলিফা নির্বাচিত হন। তাঁর যমানাও সাফল্যের সাথে সমাপ্ত হয়। হিজরী ২৩ সনে যিলহজ্জ মাসের একেবারে শেষের দিকে হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ইন্তেকাল করেন এবং অসিয়ত করে যান, হযরত আলী, হযরত ওসমান, হযরত যুবাইর, হযরত তালহা, হযরত সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস এবং আবদুর রহমান ইবনে আউফ- এ ছয় ব্যক্তি তিন দিনের মধ্যে একজনকে খলিফা নির্বাচিত করবেন। এক পর্যায়ে হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু সাহাবীগণকে মসজিদে সমবেত করে সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দিলেন এবং খেলাফতের জন্য হযরত ওসমানের নাম প্রস্তাব করলেন। সর্বপ্রথম তিনিই হযরত ওসমনের হাতে বায়আত করলেন। অতঃপর হযরত আলীও বায়আত করে ফেললেন। এরপর জনসাধারণ বায়আতের জন্য এগিয়ে এলো। এভাবে বনী উমাইয়ারই একজন সম্মানিত ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খলিফা নির্বাচিত হলেন। এটি ২৪ হিজরী সনের ৪ঠা মহররমের ঘটনা।

কুরাইশদের হাতে কষ্টস্বীকার

মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম তাইমী (রহ.) বলেন, ইসলাম গ্রহণের ফলে হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কেও তাঁর চাচা আল হাকাম ইবনে আবি আস ইবনে উমাইয়্যার হাতে নির্যাতন ও যন্ত্রণাভোগের স্বীকার হতে হয়। তাঁর চাচা তাকে বেঁধে রেখে বলল- "তুমি কি নতুন একটা ধর্মের কারণে তোমার পূর্বপুরুষদের ধর্ম পরিত্যাগ করতে চাও? তুমি নতুন এ ধর্ম ত্যাগ না করা পর্যন্ত আমি তোমাকে ছাড়বো না।" উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলল- "আল্লাহ যদি চান, আমি কখনও এটি ত্যাগ করবো না।" যখন তার চাচা তাঁর এ ধর্মের প্রতি অটল বিশ্বাস দেখতে পেল, সে তখন বাধ্য হয়ে তাকে ছেড়ে দিল। (হায়াতুস সাহাবা)

www.pathagar.com

ইসলামের জন্য স্বদেশ ত্যাগ করে আবিসিনিয়ায় হিজরত

মক্কায় ইসলামের দৈনন্দিন উন্নতিতে কুরায়শ মুশরিকদের ক্রোধের আগুন উত্তরোত্তর তীব্রতর হচ্ছিল। হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে নিজের বংশগত মর্যদাা ও সম্ভ্রম সত্ত্বেও অন্যান্য নির্যাতনভোগী মুসলমানদের ন্যায় জুলুম-নিষ্পেষণের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত হতে হলো। অবশেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইঙ্গিতে তিনি স্ত্রী রুকাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর খাতিরে দেশ ও দেশবাসীকে ত্যাগকারী এটিই প্রথম কাফেলা। অন্য বর্ণনায় এসেছে–

হিজরতের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের অবস্থা কিছুই জানতে পারলেন না। তাই তিনি অত্যন্ত চিন্তান্বিত ছিলেন। একদিন জনৈকা মহিলা তাঁদের দু'জনকে দেখেছেন বলে খবর পাঠালেন। তাঁদের সম্পর্কে এতটুকু জানার পর রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন :

ان عثمان اول من هاجر باهله من هذه الامة.

অর্থাৎ, আমার উম্মতের মধ্যে সর্বপ্রথম উসমানই সস্ত্রীক হিজরত করলেন।

হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আবিসিনিয়ায় কয়েক বছর অবস্থান করলেন। অতঃপর কুরায়শদের ইসলাম গ্রহণের ভুল খবর পেয়ে অপর কতিপয় সাহবা যখন মক্কায় ফিরে আসলেন তখন হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-ও তাঁদের সঙ্গে ফিরে এলেন। তবে এখানে এসে খবরটি মিথ্যা জানতে পেরে অনেক সাহাবা পুনরায় আবিসিনিয়ায় চলে গেলেন। কিন্তু হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আর গেলেন না।

হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও রোকাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর হাবশার এই নির্বাসনের জীবন খুব সুখের ছিল না। কেননা হাবশা দরিদ্র দেশ। হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সেখানে ব্যবসাবাণিজ্যে সুবিধা করতে পারেননি। নতুন জায়গার আবহাওয়ায় হযরত রোকাইয়া রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর স্বাস্থ্যেরও যথেষ্ট অবনতি ঘটে। আর্থিক অভাবঅনটনও তাঁদের লেগেই থাকত। ইতিমধ্যে একদিন তাঁরা সংবাদ পেলেন, হযরত খাদীজাতুল কোবরা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ইন্তেকাল করেছেন। মাতার ইন্তেকালের সংবাদে হযরত রোকাইয়া রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু শোকে ও দুঃখে মুহ্যমান হয়ে পড়েন। এই সংবাদে হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-ও কম শোকাহত হননি।

স্বদেশ ত্যাগ করে মদিনায় হিজরত

ইতিমধ্যে মদিনায় হিজরতের পরিবেশ সৃষ্টি হলো এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল সাহাবাকে মদিনায় হিজরত করার ইঙ্গিত দিলেন। এ সময় হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-ও নিজের পরিবার-পরিজনসহ মদিনায় চলে গেলেন। তিনি সেখানে হযরত আওস ইবনে সাবেত রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর মেহমান হলেন। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ও হযরত আওস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর মধ্যে ভ্রাতৃত্ব কায়েম করে দিলেন।

www.pathagar.com

ইসলামের জন্য আর্থিক কুরবানী

নবম হিজরিতে রোমান শাসক হিরাক্লিয়াস আরব ভূখণ্ডের দিকে অভিযানের উদ্দেশ্যে মনোনিবেশ করে। সে আরব ভূখণ্ডে আক্রমণ করতে চেয়েছিল এবং তা তার সাম্রাজ্যের অধীন করে শাসন করতে চেয়েছিল। যখন আল্লাহর নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার এই গোপন ষড়যন্ত্রের বিষয়টি জানতে পারলেন, তিনি তার সাহাবীদেরকে আল্লাহর রাস্তায় সংগ্রাম বা যুদ্ধে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিতে বললেন।

আরবে তখন ছিল একদিকে গ্রীষ্মের প্রখর তাপ বা খরা অন্যদিকে চলছিল চরম দুর্ভিক্ষ ও দুর্ভোগ। আল্লাহর নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদেরকে নগদ অর্থ সম্পদ দান করার ব্যাপারে জোরালো আহ্বান জানান, প্রত্যেকে তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী সর্বোচ্চ দান করেছিলো। মহিলারা তাদের অলংকার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাতে সমর্পণ করেন এবং তিনি এগুলো সৈন্যদের যাবতীয় অস্ত্র সংগ্রহে ব্যয় করেন। যখন হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এ আহ্বান শুনলেন; তিনি তাবুক অভিযানের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সকল সৈনিকের ব্যয়ভার গ্রহণ করলেন। হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাবুক অভিযানে সৈনিকদের জন্য এক হাজার পশু সরবরাহ করেন যার মধ্যে নয়শত চল্লিশটি উট এবং ষাটটি ঘোড়া ছিলো। হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সেনাবাহিনীকে সজ্জিত করার লক্ষ্যে পূর্বে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট দশ হাজার দিনার প্রদান করেন। হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর দানের টাকা হাতে নিয়ে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এই সকল সম্পত্তি দানের পরও উসমানকে কোনো প্রকার সমস্যায় পড়তে হবে না। সে এর প্রতিদান অবশ্যই পাবে।

হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর শাহাদাত

খিলাফতের শেষদিকে হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বিদ্রোহীদের পক্ষ থেকে নানারকম অমূলক অভিযোগের স্বীকার হন। তারা তাকে খিলাফত ত্যাগ নতুবা হত্যার হুমকী দেয়। হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কয়েকবারই বিদ্রোহীদেরকে বুঝাতে চেষ্টা করেন। একবার গৃহের ছাদে উঠে বলতে লাগলেন, "লোকসকল, ঐদিনের কথা স্মরণ কর, যখন মসজিদে নববী একেবারে ছোট ছিল। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছিলেন, এমন কেউ আছে কি, যে মসজিদ সংলগ্ন স্থানটুকু কিনে নিয়ে মসজিদের নামে ওয়াকফ করে দেয় এবং বিনিময়ে জান্নাতে এর চাইতে উৎকৃষ্ট জায়গার অধিকারী হয়। তখন কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এ নির্দেশ পালন করতে এগিয়ে এলো।

হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, আর আজ সেই কূপের পানি হতে তোমরা আমাকে বঞ্চিত করছ? আবার বললেন, মুসলিম বাহিনীর সাজসরঞ্জাম কে বৃদ্ধি করেছিল? লোকেরা বলল, আপনি।

www.pathagar.com

অতঃপর বললেন, "আমি তোমাদেরকে খোদার কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি যে সত্যের সমর্থন করবে এবং বলবে, একদিন আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন ওহুদ পর্বতে উঠলেন তখন পর্বত কাঁপতে লাগল। আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পর্বতের উপর পদাঘাত করে বললেন, "হে ওহুদ, স্থির হও! তোমার উপর এখন একজন নবী, একজন সিদ্দিক এবং দুইজন শহীদ রয়েছেন, তখন আমিও আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সঙ্গে ছিলাম।"লোকেরা বলতে লাগল,- আপনি সত্য বলেছেন।

পুনরায় বলতে লাগলেন, লোকসকল, আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে বল, হোদায়বিয়া নামক স্থানে রাসূলুলাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন আমাকে দূত হিসেবে কোরায়শদের নিকট প্রেরণ করেছিলেন, তখন কি ঘটেছিল? তা কি সত্য নয়, তখন আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্বীয় এক হাতকে আমার হাত বলে তাতে তোমাদের বায়আত গ্রহণ করেছিলেন? জনতার মধ্য হতে আওয়াজ এলো, আপনি সত্য বলেছেন!

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত ওসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) সম্পর্কে যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, সাধারণ মুসলমানগণ বিদ্রোহীদের ধ্বংসাত্মক অভিযানের মধ্যে অশ্রুসিক্ত নয়নে তাই দেখছিলেন। একমাত্র হযরত ওসমানই নির্বিকার চিত্তে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অন্তিম বাণীর বাস্তবতা দেখার জন্য অপেক্ষা করেছিলেন। জুমার দিন সূর্যোদয়ের পূর্বেই তিনি রোজার নিয়ত করলেন। এ দিন সকালের দিকে স্বপ্ন দেখলেন, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত আবু বকর সিদ্দিক ও হযরত ওমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) একসাথে তশরীফ এনেছেন এবং বলেছেন- ওসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু), শীঘ্র চলে আস। আমি এখানে তোমার ইফতারের অপেক্ষায় বসে আছি। চক্ষু খোলার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বিবিকে ডেকে বললেন, আমার শাহাদাতের সময় নিকটবর্তী হয়েছে। বিদ্রোহীরা এখনই আমাকে হত্যা করে ফেলবে। বিবি বললেন,- না, না, এরূপ কিছুতেই হতে পারে না। তিনি বললেন, আমি এখনই স্বপ্নে দেখেছি। এ কথার পর বিছানা হতে উঠে একটি নতুন পাজামা পরিধান করলেন এবং কুরআন তেলাওয়াতে বসে গেলেন।

হযরত ওসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তখন একাকী নীচে বসে কুরআন তেলাওয়াতে মশগুল ছিলেন। বিদ্রোহীদের সাথে গৃহে প্রবেশ করে মোহাম্মদ ইবনে আবু বকর অত্যন্ত দুঃখজনক ব্যবহার করলেন। তিনি হযরত ওসমানের পবিত্র দাড়ি ধরে সজোরে মাটিতে ফেলে দিলেন। আমীরুল মোমেনীন ওসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তখন বলতে লাগলেন- ভ্রাতুষ্পুত্র, আজ হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) জীবিত থাকলে এ দৃশ্য কিছুতেই পছন্দ করতেন না। এ কথা শুনে মোহাম্মদ ইবনে আবু বকর লজ্জিত হয়ে পিছু হটে গেলেন; কিন্তু ইবনে বেশর একটি লোহার শলাকা দিয়ে খলিফার মাথায় এক নিদারুণ আঘাত করল। আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর

www.pathagar.com

রাসূলের এ সম্মানিত প্রতিভূ বিছানায় গড়িয়ে পড়লেন এবং বলতে লাগলেন, "বিসমিল্লাহ, আল্লাহর ওপর ভরসা করছি।" দ্বিতীয় আঘাত করল সাওদান ইবনে আমরান। দ্বিতীয় আঘাতে রক্তের ফোয়ারা বয়ে চলল। আমর ইবনে হোমকের নিকট এ নৃশংসতা যথেষ্ট মনে হল না। হতভাগ্য নায়েবে রাসূলের বুকের উপর উঠে খড়গ দ্বারা আঘাতের পর আঘাত করতে শুরু করল। এ সময় অন্য এক নির্দয় তরবারি দ্বারা আঘাত করল। এ আঘাতে বিবি হযরত নায়েলার তিনটি আঙ্গুল কেটে গেল। এ ধস্তাধস্তির মধ্যেই আমীরুল মোমেনীনের পবিত্র আত্মা জড়দেহ ছেড়ে অনন্ত শূন্যে মিলে গেল। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন।

দুর্ঘটনার সময় ওসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কোরআন তেলাওয়াত করেছিলেন। তাঁর সম্মুখে পবিত্র কোরআন খোলা অবস্থায় পড়েছিল। হযরত ওসমানের পবিত্র রক্ত কোরআন পাকের নিম্নলিখিত আয়াত রঞ্জিত করে দিয়েছিল, "আল্লাহই তোমার জন্য যথেষ্ট। তিনি প্রাজ্ঞ, তিনি সব শোনেন।"

জুমার দিন আছরের সময় তিনি শহীদ হলেন। হযরত জুবাইর ইবনে মোতে্য়েম জানাযার নামায পড়ালেন।

৪. হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর ওপর জুলুম-নির্যাতন ও কষ্ট স্বীকার

হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর শাহাদাতের পর যে সকল নেতৃস্থানীয় সাহাবী মদিনায় উপস্থিত ছিলেন তারা পরবর্তী খলিফা নির্বাচনের জন্য সমবেত হন। সকল সাহাবী সর্বসম্মতভাবে ঐক্যমত পোষণ করেন যে, ঐ সময় হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর চেয়ে অধিক যোগ্যতাসম্পন্ন দ্বিতীয় আর কেউ ছিলেন না। তাই তারা নতুন খলিফা হিসেবে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর হাতে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চাচাতো ভাই ও জামাতা হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত হতে আগ্রহী ছিলেন না। শুধু মদিনায় উপস্থিত সাহাবীদের জোর অনুরোধে তিনি খেলাফতে অধিষ্ঠিত হতে সম্মত হন। কারণ তিনি আশঙ্কা করেছিলেন যে, এ মুহূর্তে যদি তিনি খেলাফতের হাল না ধরেন তাহলে বিপর্যয় আরো বৃদ্ধি পেতে থাকবে এবং তা দ্রুত গতিতে ছড়িয়ে পড়বে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কয়েকজন সাহাবী হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর সাথে সাক্ষাত করে বললেন– বিশ্বাসীদের নেতা শহীদ হয়েছেন। আর তাই জনগণের একজন খলিফা নিয়োগ করা অবশ্যই প্রয়োজন; কিন্তু আমরা

www.pathagar.com

আপনাকে ছাড়া অন্য কোন যোগ্য, বয়োজ্যেষ্ঠ অথবা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অধিকতর নিকটস্থ কাউকে দেখি না।

হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ইতস্তত বোধ করে বললেন- না এটা করো না; বরং আমি নেতা হওয়া থেকে তোমাদের উপদেষ্টা হওয়া ভাল মনে করি। সাহাবীরা অনুরোধ করে বললেন- না, না, আল্লাহর শপথ! আমরা আপনার নিকট আনুগত্যের বাইয়াত না নেওয়া পর্যন্ত কোন কিছুই করবো না।

হযরত হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) উত্তরে বললেন, তাহলে গোপনে বাইয়াত গ্রহণ করা উচিত নয়; বরং মুসলমানদের সম্মতিক্রমেই বাইয়াত হওয়া উচিত।

যখন আলী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) মসজিদে প্রবেশ করলেন তখন মুহাজির ও আনসার সাহাবী সকলেই সমবেত হলেন এবং তাঁর নিকট আনুগত্যের শপথ নিলেন। তারপর অবশিষ্ট লোকেরা শপথ নিলেন।

হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এমন এক সময় খলিফা হয়েছিলেন– যখন মুসলিম উম্মাহ কঠিন সংকটে নিমজ্জিত ছিল। এমন কিছু কাজ তার সামনে এসেছিলো যা প্রকৃতপক্ষে মারাত্মক কঠিন, জটিল, চরম দুঃসাধ্য ব্যাপার। তিনি দুটি মৌলিক সমস্যার সম্মুখিন হন- ১. সমস্যা জর্জরিত রাষ্ট্রটির পুর্নগঠন এবং শান্তি ও সংহতি স্থাপনে পরিকল্পনা প্রণয়ন। ২. হযরত উসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর হত্যাকারীদের খুঁজে বের করা এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা। এভাবে তিনি চরম ক্রান্তিকালে ইসলামী খিলাফতের খলিফা নিযুক্ত হন।

ইসলামের জন্য ত্যাগ স্বীকার

হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ইসলামের জন্য নানা ধরনের ত্যাগ স্বীকার করেন। হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ইসলাম প্রচার-প্রসারে সর্বদা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অনুসরণ করতেন। তায়েফে নিষ্ফল যাত্রা থেকে ফিরে আসার পর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দৃঢ়ভাবে অনুভব করলেন মক্কা তার বসবাসের জন্য অনুপযুক্ত। এদেশের মূর্তি পূজারীরা সত্যের এ দূত রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে প্রত্যাখ্যান করেছে। তারা এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর ইবাদত করতে অস্বীকৃতি জানাল।

আবু তালিবের মৃত্যুর পর মক্কার মূর্তি পূজারীরা মুসলমানদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে উদগ্রীব হয়ে উঠল। এমনকি মুসলিম সম্প্রদায়ের বেঁচে থাকার সুযোগটুকু ক্ষীণ হয়ে গিয়েছিল। সারা দুনিয়া যখন মুসলমানদের জন্য এতটুকু আশ্রয় দিতে চাইল না, ঠিক তখন আল্লাহ তা'আলা মদিনার (তৎকালীন ইয়াসরিব) বুক প্রশস্ত করে দিলেন। মদিনার লোকেরা তাদেরকে আলিঙ্গন করে নিল। এরপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সবাইকে সেখানে হিজরত করার জন্য অনুমতি দিলেন।

www.pathagar.com

কোরাইশরা ক্ষুদ্র এ মুসলিম সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জাল বিছিয়ে দিল। তারা তাদের পরামর্শসভা 'দার-উন নদওয়া' কার্যালয়ে বৈঠক ডাকল। এ বৈঠকে সিদ্ধান্ত হল নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে মক্কাবাসীকে মুক্ত করার একমাত্র পথ হচ্ছে তাকে হত্যা করা। যাহোক আল্লাহ তা'আলা তার নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিব্রাঈল عليه السلام-এর মাধ্যমে সমস্ত ঘটনা জানিয়ে দিলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সৃষ্টিজগতে সবচেয়ে প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি। তিনি হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে বললেন– আমি অতিশীঘ্রই মদিনায় হিজরত করতে যাচ্ছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন মক্কার লোকদের বিশ্বস্ত; তারা তার কাছে ধন-সম্পদ আমানত রাখত। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নিকট গচ্ছিত মক্কার লোকদের আমানতগুলো তার মালিকের হাতে ফেরত দেওয়া পর্যন্ত হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিছানায় অবস্থান করার জন্য অনুরোধ করলেন। এরপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে ঐ রাতে তাঁর নিজ বিছানায় ঘুমাতে বললেন।

এদিকে ষড়যন্ত্রকারীরা সকলে একসাথে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাড়ি ঘেরাও করল। শত্রুরা যাকে হত্যা করার জন্য সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করেদিল ঠিক সেই মুহূর্তে এমন কারও সাহস আছে! যে তার বিছানায় নিশ্চিন্তে অবস্থান করবে?

তিনি জানতেন এ মুহূর্তে যদি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিছানায় ঘুমাই তাহলে নিশ্চিত তাকে শাহাদাতবরণ করতে হবে। কেবল বীর, অধিক সাহসী এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি অগাধ বিশ্বাসীরাই এরূপ ঝুঁকি নিতে পারে। আর এ জন্য আল্লাহ তা'আলা হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কেই বাছাই করেছিলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে ঘুমানোর জন্য একটা চাদর দিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমার বিছানায় ঘুমাও এবং গায়ে এ সবুজ রং-এর চাদরটি জড়িয়ে রাখ। আল্লাহর ওপর ভরসা করে এর ভিতর ঘুমিয়ে থাকবে, তাহলে কোন বিপদ তোমাকে স্পর্শ করবে না।

মহান আল্লাহর ওপর ভরসা রেখে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু শুয়ে থাকেন এবং ঘুমিয়ে পড়েন। এদিকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শত্রুদের চোখ ফাঁকি দিয়ে তাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করে চলে গেলেন। শত্রুরা সকালবেলা হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিছানায় দেখে বুঝতে পারল যে, হযরত মুহাম্মদ আর নেই- তিনি হিজরতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছেন।

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ছিলেন একজন বীর যোদ্ধা। তিনি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য নিজের জীবনকে উৎসর্গ করতে প্রস্তুত ছিলেন। রাত কাটানোর জন্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিছানা ছাড়া বিকল্প কোন কিছু করেননি। যদিও তিনি জানতেন কোরাইশদের তরবারি তার গরদান বিচ্ছিন্ন করে দিবে।

www.pathagar.com

জীবনের এ ঝুঁকিপূর্ণ সময়েও তিনি নিজের নিরাপত্তার চিন্তা করেননি; বরং তার নিকট এটা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, আল্লাহর নবী বেঁচে থাক এবং তাকে যেনো সামান্যতম আঘাতও স্পর্শ না করে। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু নিজ জীবনের চেয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে অধিক ভালোবাসতেন; রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিরাপত্তাকে সবচেয়ে বেশি অগ্রাধিকার দিতেন। এ উদাহরণই প্রমাণ করে তাঁর কত গভীর ও দৃঢ় বিশ্বাস ছিল আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি।

ইসলামের জন্য স্বদেশ ছেড়ে মদিনায় হিজরত

পরের দিন সকালে হযরত আলী ইবনে আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ঘর থেকে বের হন। কোরাইশরা তাৎক্ষণিক তাকে চিনতে পারেন এবং বুঝতে পারেন যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের চোখে ধুলা দিয়ে চলে গেছেন।

হাতের শিকার হাতছাড়া করে রাগন্বিত হয়ে তারা হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে গ্রেপ্তার করল এবং টেনে কা'বা ঘরে নিয়ে আসল। তারা তাঁকে গালিগালাজ করল ও তাঁকে সামান্য সময়ের জন্যও মুক্তি দিতে অস্বীকার করল। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ধৈর্যসহকারে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাদের এই নির্দয় আচরণ সহ্য করে নিলেন। তিনি আল্লাহর নবীর নিরাপত্তার জন্য উদ্বিগ্ন ছিলেন এবং আনন্দিত হন এ কারণে যে, তিনি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জন্য সকল কষ্ট সহ্য করে চলেছেন।

যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তিনি নবীর আদেশ বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট গচ্ছিত আমানতের মালিকদের খোঁজ করলেন এবং তাদের হাতে তাদের আমানত সোপর্দ করলেন। এজন্য তিনি মক্কায় তিনদিন অবস্থান করেন। এ কাজ সমাধা করার পর মদিনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে একত্রিত হন।

হিজরতের সময়ে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু দিনেরবেলায় লুকিয়ে থাকতেন এবং রাতেরবেলায় পায়ে হেঁটে চলতেন। শেষ পর্যন্ত তিনি মদিনায় পৌছালেন। কারণ তার কাছে কোন ঘোড়া, উট বা গাধা ছিল না। সমগ্র দূরত্ব তাকে হাঁটতে হয়েছে, ফলে তার পা ফুলে গেল এবং চামড়া ফেটে যেতে লাগল।

দিনেরবেলা তাপমাত্রা এত তীব্র ছিল যে, এ সময়ে হেঁটে চলা তার জন্য অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাকে সাহায্য করার জন্য কোন বন্ধু বা সাথী ছিল না। শুধু আল্লাহর প্রতি অকৃত্রিম ঈমান ছিল যা তাকে চলতে সাহায্য করেছিল। মদিনায় প্রিয় সাথী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে গিয়ে প্রকৃত নিরাপত্তা ও আনন্দ খুঁজে পেয়েছিলেন। সর্বশেষ মদিনায় পৌছালে বানু আমীর ইবনে আউফ তাকে অভ্যর্থনা জানালেন। কুলসুম বিন হাদাম এর বাড়িতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে আমন্ত্রিত মেহমান

www.pathagar.com

হলেন। সময়টি ছিল রবিউল আওয়াল মাস। তখন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুবায় থাকতেন। হিজরতের সময় হযরত আলী বয়স ছিল ২৩ বছর।

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর শাহাদাত

মক্কায় বসে খারেজীগণ ইসলামের ইতিহাস সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত করে দেয়ার ষড়যন্ত্র করল। এজন্য তিন ব্যক্তি তিনটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করে। আমর ইবনে বকর তামিমী শপথ করল, "আমি মিসরের শাসনকর্তা আমর ইবনুল আসকে দুনিয়া হতে বিদায় করব। কারণ, বর্তমান রাষ্ট্রীয় বিপর্যয়ের মূল উদ্যোগতা তিনি।" বারক ইবনে আবদুল্লাহ তামিমী শপথ নিল, "আমি মোয়াবিয়া ইবনে আবু ছুফিয়ানকে হত্যা করব, কারণ, তিনি সিরিয়ায় রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে চলেছেন।"

দুই ব্যক্তির শপথের পর মুহূর্তের জন্য মন্ত্রণাসভায় নীরবতা দেখা দিল। তৃতীয় ব্যক্তি কর্তৃক হযরত আলীকে হত্যা করার কল্পনা যেন সকলের অন্তরকেই একবার কাঁপিয়ে তুলল। শেষ পর্যন্ত আবদুর রহমান ইবনে মুলজিম মুরাবী নীরবতা ভঙ্গ করে বলল, আমি হযরত আলীকে হত্যা করব।

মক্কা হতে রওনা হয়ে আবদুর রহমান কুফায় পৌঁছাল। এখানেও খারেজীদের একটি বিরাট দল মওজুদ ছিল। আবদুর রহমান তাদের নিকট যাতায়াত করত। একদিন তামীমুর রুবাব গোত্রের কতিপয় খারেজীর সাথে তার সাক্ষাৎ হল।

বিভিন্ন বর্ণনায় জানা যায়, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা অনাগত দুর্ঘটনার কথা অনুমান করতে পেরেছিলেন। তিনি আবদুর রহমান ইবনে মুলজিমকে দেখেই মনে করতেন, এর হাত হয়ত রক্তে রঞ্জিত হবে। আবদুর রহমান ইবনে মুলজিম দুইবার তাঁর নিকট বায়আতের জন্য উপস্থিত হয়; কিন্তু দুইবারই তিনি তাকে ফিরিয়ে দেন। তৃতীয়বার আমলে তিনি বলতে লাগলেন, "সবচাইতে ঘৃণ্য নরাধমকে কে ফিরিয়ে দিচ্ছে? (দাড়িতে হাত দিয়ে বললেন) আল্লাহর শপথ, এ বস্তু নিশ্চয়ই রঙ্গিন হয়ে উঠবে।"- (ইবনে সাদ)

একদিন খুৎবা দিতে গিয়ে বললেন, "ঐ মহান শক্তির শপথ, যিনি বীজ, অঙ্কুর ও জীবন সৃষ্টি করেছেন, তা অবশ্যই এ বস্তু দ্বারা রঞ্জিত হবে (দাড়ি ও মাথার প্রতি ইঙ্গিত করলেন)। হতভাগ্য কেন বিলম্ব করছে?"

লোকেরা নিবেদন করল, আমীরুল মোমেনীন; আমাদেরকে তার নাম বলুন, এখনই তার দফা শেষ করে দেই। বললেন, এমতাবস্থায় তোমরা এমন ব্যক্তিকে হত্যা করবে, যে এখনও আমাকে হত্যা করেনি।

হযরত আলীর দাসী উম্মে জাফরের বর্ণনা, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু নিহত হওয়ার কয়েকদিন পূর্বে আমি একদিন তাঁর হাত ধুয়ে দিচ্ছিলাম। তিনি মাথা উঠিয়ে

www.pathagar.com

দাড়িতে হাত রাখলেন এবং বলতে লাগলেন, "আক্ষেপ তোর জন্য, তুই রক্ত দ্বারা রঞ্জিত হবি।"- (ইবনে সাদ)

আশ্‌আস একদিন ইবনে মুলজিমকে একটি নতুন তরবারি ধার দিতে দেখলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, এখন তো কোন যুদ্ধ নেই, নতুন তরবারি ধার দিতেছ কেন?

ইবনে মুলজিম জওয়াব দিল, একটি জংলী উট জবেহ করতে হবে। আশ্‌আস ব্যাপারটি বুঝতে পারলেন এবং খচ্চরে আরোহণ করে হযরত আলীর নিকট গিয়ে বলতে লাগলেন, "আপনি কি ইবনে মুলজিমের দুঃসাহস ও ধৃষ্টতা সম্পর্কে কি জ্ঞাত আছেন? হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু জওয়াব দিলেন; কিন্তু সে তো এখনও আমাকে হত্যা করেনি। -(আল-কামেল)

হত্যার দুর্ঘটনা জুমার দিন ফজরের সময় সংঘটিত হয়। ইবনে মুলজিম সারারাত আশ্‌আস্ ইবনে কায়স কেন্দীর মসজিদে বসে তাঁর সাথে কথাবার্তা বলে কাটিয়ে দেয়। সে কুফার শাবীব বাজরা নামক আর একজন খারেজীকে এ দুষ্কর্মের সঙ্গী করে নিয়েছিল। রাত শেষে উভয়েই তরবারি নিয়ে রওয়ানা হয় এবং মসজিদের যে দরজা দিয়ে সাধারণত আমীরুল মোমেনীন প্রবেশ করতেন সেই দ্বারে এসে বসে থাকে। -(ইবনে সাদ)

সেই রাতে আমীরুল মোমেনীনের নিদ্রা এলো না। হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন, সকালবেলা আমি তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে আসলে বলতে লাগলেন, বৎস, রাতভর একটুকুও ঘুমাতে পারিনি। একবার বসে বসেই একটু তন্দ্রার ভাব হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে স্বপ্নে দেখলাম। বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনার উম্মত দ্বারা আমি বড় কষ্ট পেয়েছি। তিনি বললেন, দোয়া কর যেন আল্লাহপাক তাদের কবল হতে মুক্তি দেন। (কামেল)

সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার সঙ্গেই দুইটি তরবারি একত্রে চমকিতে দেখা গেল। সঙ্গে সঙ্গে একটি আওয়াজ শোনা গেল; "রাজ্য আল্লাহর, হে আলী, তোমার নয়।" শাবীবের তরবারি লক্ষ্যভ্রষ্ট হল; কিন্তু ইবনে মুলজিমের তরবারি তাঁর ললাটদেশে বিদ্ধ হয়ে মস্তিষ্ক পর্যন্ত এসে পৌঁছিল।" (ইহ্‌ইয়াউল উলুম)

তারপর সকল সন্তানদের ডেকে বললেন, "আল্লাহকে ভয় করবে। অলস নিষ্কর্মা হবে না। নীচতা অবলম্বন করবে না। হে খোদা, আমাদের সকলকে হেদায়েতের পথে দৃঢ় রাখ। আমাকে ও তাদেরকে দুনিয়ার প্রতি নিরাসক্ত করে দাও। আমার ও তাদের জন্য আখেরাত এখানকার চাইতে ভাল করে দাও।" (আল-ইমামাতু ওয়াস সিয়াসাতু)

www.pathagar.com

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু যেখানে শুয়ে ছিলেন। সেই স্থানকে ইঙ্গিত করে বললেন, "হে আব্দুল মোত্তালিবের সন্তানেরা! আমি তোমাদেরকে মুসলমানদের রক্তের খেলায় দেখতে চাই না। এই লোকটিকে ব্যাতীত অন্য কাউকে তোমরা রাগের বশতঃ হত্যা করবে না। হে হাসান! যদি আমি তার রক্তের কারণে মারা যাই, তোমরা তাকে আঘাতের পর আঘাত করবে; তবে তার শরীরকে কেটেছিঁড়ে টুকরা বানাবে না। কেননা, আমি আল্লাহর রাসূলকে বলতে শুনেছি যে, "তোমরা কাউকে অঙ্গহানির বিষয়ে সতর্ক হও, এটা হচ্ছে বন্য কুকুর বা হায়েনার কাজ।"

এই কথার সাথে সাথে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু আল্লাহর নাম নিতে থাকেন এবং শাহাদাতের স্বাদ গ্রহণ করেন। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু-এর মৃতদেহ তার দুই পুত্র হাসান-হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু ও তাঁর ভাতিজা আব্দুলাহ্ ইবনে জাফর গোসল দেন। হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু তাঁর পিতার জানাযার নামায পড়ান। এর কিছু পরই ইবনে মুলজামের প্রাণদণ্ড নেয়া হল।

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু-এর কবরের জায়গাটি অজানা রাখা হল, কারণ লোকেরা এই আশংঙ্কা করল যে, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু-এর শত্রুরা এই কবরকে অপবিত্র করে তুলবে অথবা অন্যরা একে মাজার হিসেবে ইবাদাতের স্থান বানিয়ে নিবে। তবে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মতে, হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু তাঁর পিতাকে কুফার দূরবর্তী কোনো স্থানে কবর দেন, তবে সঠিক স্থানটি গোপন রাখা হয়েছে।

পরিচ্ছেদ-২
সাহাবায়ে কেরামের জুলুম-নির্যাতন ও কষ্ট স্বীকার

১. ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু-এর শাহাদাত

ইসলামের ইতিহাসে হযরত ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু-এর অপরিসীম ব্যক্তিত্বের কথা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। খোলাফায়ে রাশেদীনের পর যে মর্মান্তিক ঘটনা ইসলামের ধর্মীয় ও রাজনৈতকি ক্ষেত্রে সবচাইতে বেশি প্রভাব বিস্তার করেছে, তা হচ্ছে হযরত ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু শাহাদাতের ঘটনা।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আহলে বায়ত প্রথম হতেই নিজেদেরকে খেলাফতের প্রকৃত দাবীদার মনে করতেন। আমির মোয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ানের ইন্তেকালের পর খেলাফতের মসনদ শূন্য হয়। ইয়াযিদ ইবনে মোয়াবিয়া পূর্ব হতেই খেলাফতের উত্তরাধিকারী ঘোষিত হয়েছিলেন। তিনি তাঁর খেলাফতের কথা ঘোষণা করে দিলেন এবং হযরত হোসাইন ইবনে আলীর নিকটও আনুগত্য প্রকাশ করে বায়আত গ্রহণের নির্দেশ প্রেরণ করলেন। আমীরুল মোমেনীন হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু কুফায় তাঁর রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। এজন্য সেখানে আহলে বায়তের সমর্থকের সংখ্যা বেশি ছিল। কুফাবাসীরা হযরত ইমাম

www.pathagar.com

হোসাইনকে লিখলেন, আপনি এখানে আসলে, আমরা আপনার সহযোগিতা করব। হযরত হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাঁর পিতৃব্য মুসলিম ইবনে আকীলকে কুফাবাসীর বায়আত গ্রহণ করার জন্য প্রেরণ করলেন এবং স্বয়ং কুফা যাত্রার আয়োজন করতে লাগলেন।

হযরত হোসাইনের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবগণ এ কথা শুনতে পেয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন। তাঁরা কুফাবাসীদের বিশ্বাসঘাতকতা ও সুযোগ-সন্ধানী চরিত্র সম্পর্কে বিশেষভাবে জানতেন। তাই সকলে মিলে এ সফরের বিরোধিতা করতে লাগলেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন, "জনসাধারণ এ কথা শুনে অস্থির হয়ে উঠেছে যে, আপনি ইরাকে রওয়ানা হচ্ছেন, আমাকে প্রকৃত ঘটনা খুলে বলুন।"

এতদিন হযরত ইমামের অন্তরে স্থির বিশ্বাস জন্মেছিল, তিনি নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। 'কাসরে বনী মাকাতেল' নামক স্থানে পৌঁছে তিনি সামান্য তন্দ্রাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। জাগ্রত হয়ে বার বার 'ইন্না লিল্লাহি' পড়তে লাগলেন। তাঁর পুত্র আলী আকবর জিজ্ঞাসা করলেন- ইন্না লিল্লাহ্ পড়ার অর্থ কি আব্বা? হযরত ইমাম বললেন, বৎস, এখন একটু তন্দ্রাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলাম। স্বপ্নে দেখি, একজন আশ্বারোহী ছুটে আসছেন এবং বলছেন,- "লোক সামনে অগ্রসর হচ্ছে আর মৃত্যু তাদের সঙ্গে চলেছে।" আমি বুঝতে পেরেছি, এর দ্বারা আমাদের মৃত্যু সংবাদই শোনা হয়েছে।

আলী আকবর বললেন, আল্লাহ আপনাকে এমন মন্দ দিন না দেখান। আমরা কি সত্য পথে নই? হযরত ইমাম বললেন, নিশ্চয় আমরা সত্য পথে রয়েছি। একথা শুনে তিনি চিৎকার করে বলে উঠলেন, "যদি আমরা সত্য পথই থাকি তবে মৃত্যুর আর কোন পরোয়া নাই।" হযরত ইমামের এ পুত্রই কারবালার ময়দানে শহীদ হয়েছিলেন। -(ইবনে জরীর)।

কারবালা প্রান্তরে

তৃণ-গুল্মহীন এক শুষ্ক প্রান্তরের মধ্যে ছিল পার্বত্য এলাকা। স্থানটির নাম জিজ্ঞাসা করে জানা গেল, 'কারবালা'। হযরত ইমাম বললেন, কারব (যাতনা) ও বালা (বিপদ)। এটি হিজরী ৬১ সনের ২রা মহররমের ঘটনা। -(আল-ইমামাতু ওয়াস সিয়াসাতু)

হযরত ইমাম শিবিরের সকলকে নিয়ে এ রাতটি নামায, দোয়া ও রোনাজারি করে কাটিয়ে দিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, শত্রুসৈন্যরা সারা রাত আমাদের শিবিরের চারদিকে চক্রাকারে ঘুরে বেড়িয়েছে। হযরত হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তখন উচ্চঃস্বরে কুরআনের আয়াত পড়ছিলেন, আয়াতের অর্থ হল- "শত্রুরা মনে করে,

www.pathagar.com

আমাদের একটু বিরাম তাদের পাপের বোঝা আরও বর্ধিত হয়। আল্লাহ মুমিনদেরকে এরূপ অসহায় অবস্থায় ফেলে রাখবেন না। তিনি পবিত্রকে অপবিত্র হতে পৃথক করে দিবেন।"

শত্রুদের জনৈক অশ্বারোহী সৈন্য এ আয়াত শোনার পর চিৎকার করে বলতে লাগল "কাবার প্রভুর শপথ, আমরাই পবিত্র, তোমাদের নিকট হতে আমাদেরকে পৃথক করা হয়েছে।"

যুদ্ধ শুরু

এ ঘটনার পর আমর ইবনে সাদ ধনুক উঠিয়ে ইমাম বাহিনীর প্রতি তীর নিক্ষেপ করে বলতে লাগলেন, তোমরা সাক্ষী থেকো; সর্বপ্রথম তীর আমি নিক্ষেপ করেছি। অতপর ব্যাপকভাবে তীর বর্ষিত হতে লাগল। কিছুক্ষণ তীরবৃষ্টি হওয়ার পর যিয়াদ ইবনে আবিহে, আবদুল্লাহ ইবনে যিয়াদের গোলাম ইয়াসার ও সালেম ময়দানে এসে ইমাম বাহিনীকে মলযুদ্ধে আহ্বান করল।

ব্যাপক আক্রমণ

উভয়পক্ষ হতে দুই-একজন করে বীর বের হয়ে আসতে লাগল এবং পরস্পরের মধ্যে অস্ত্রের বাহাদুরী দেখাতে লাগল; কিন্তু সৈন্যদের যে কেউই ইমাম বাহিনীর সম্মুখে আসছিল, তরবারির আঘাতে দ্বিখণ্ডিত হয়ে ভূ-শয্যায় লুটিয়ে পড়ছিল। মুসলিমই ইমাম বাহিনীর তরফ হতে প্রথম শহীদ। অতপর দ্বিতীয় আক্রমণ শুরু হল শিমারের নেতৃত্বে। মাত্র বত্রিশজন ঘোরসওয়ার ইমাম বাহিনীর পক্ষ হতে প্রতিরোধ করতে দাঁড়ালেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই শত্রুবাহিনী অনুভব করল, এ তেজবীর্যের সম্মুখে টিকে থাকা সম্ভব নয়। সঙ্গে সঙ্গে আরও পাঁচশত তীরন্দাজ যোগ দিলে আক্রমণ তীব্রতর করা হল। অল্পক্ষণের মধ্যেই চারদিকের তীরবৃষ্টির সম্মুখে মুষ্টিমেয় ইমাম বাহিনীর ঘোড়াগুলো অচল হয়ে গেল। অশ্বারোহী সৈন্যগণ নিরুপায় হয়ে পাদাতিকরূপে ময়দানে অবতরণ করতে বাধ্য হলেন।

তাঁবুতে অগ্নিসংযোগ

ইমাম বাহিনী তাঁবু কেন্দ্র করে একস্থানে থেকে যুদ্ধ চালাচ্ছিলেন। এ অবস্থায় আমর ইবন সাদ ইমাম শিবিরে আক্রমণ চালালেন; কিন্তু মাত্র কয়েকজন সৈন্য এ আক্রমণ প্রতিরোধ করে ফেললেন। এবার শত্রুগণ তাঁবুতে অগ্নিসংযোগ করে দিল। ইমাম বাহিনী অধির হয়ে উঠলেন। হযরত ইমাম বলতে লাগলেন, তাবু জ্বালিয়ে দাও। এতে আমরা আরও একত্রিত হয়ে প্রতিরোধ করতে সুযোগ পাব। পরিণামে হলও তাই।

www.pathagar.com

নামাযে বাধাদান

আবু তামামা আমর ইবনে আবদুল্লাহ ইমাম বাহিনীর অসহায় অবস্থা দেখে হযরত ইমামের নিকট নিবেদন করলেন, "শত্রুরা একেবারেই নিকটবর্তী হয়ে গেছে। আল্লাহর শপথ, যে পর্যন্ত আমার শরীরের রক্তবিন্দু অবশিষ্ট থাকবে, আপনার কোন ক্ষতি হতে দেব না। তবে আমার শেষ আরজু; নামায পড়ার পর প্রভুর দরবারে হাজির হতে চাই।"

হযরত ইমাম বললেন, "শত্রুদের বল, আমাদেরকে নামাযের সময় দিক, কিন্তু শত্রুরা এ আবেদন মঞ্জুর না করে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে লাগল।"

সদ্যোজাত শহীদ

এরপর হযরত হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আবার নিজ স্থানে এসে দাঁড়ালেন। এ সময় তাঁর এক পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। তাঁবুর ভিতর হতে সদ্যোজাত শিশুকে এনে তাঁর কোলে দেয়া হল। তিনি শিশুর কানে আজান দিতে লাগলেন। এমন সময় হঠাৎ একটি তীর এসে শিশুর কণ্ঠনালীতে বেধেঁ গেল। সঙ্গে সঙ্গে কচি শিশুর প্রাণবায়ু বের হয়ে গেল। হযরত হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু শিশু শহীদের কণ্ঠ হতে তীর টেনে বের করলেন। হাতে তাজা খুন নিয়ে তাঁর সর্বশরীর ছিটিয়ে দিতে দিতে বলতে লাগলেন, আল্লাহর শপথ, খোদার নিকট তুমি হযরত সালেহ আলাইহিস সালামের উষ্ট্রীর চাইতেও প্রিয়। আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর দৃষ্টিতে হযরত সালেহ আলাইহিস সালাম হতেও প্রিয়। ইলাহী, আমার উপর হতে তুমি যখন বিজয়ের হাত উঠিয়ে নিয়েছ তখন যাতে মঙ্গল হয় তাই কর। (আইয়ুব : ইবনে জারীর)

হযরত ইমামের শাহাদাত

এক পর্যায়ে হযরত ইমামের ওপর সর্বদিক হতে আক্রমণ শুরু হল। হযরত ইমাম ভীষণবেগে তরবারি চালনা করতে লাগলেন। যেদিকে তিনি যাচ্ছিলেন, শত্রুসৈন্যদের কাতারের পর কাতার পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছিল। আবদুল্লাহ ইবনে আম্মার নামক এক ব্যক্তি এ যুদ্ধে শরীক ছিলেন। তিনি বর্ণনা করেন, আমি বর্শা দ্বারা হযরত হোসাইনকে আক্রমণ করি। অল্পক্ষণের মধ্যেই আমি তার নিকট পৌঁছে গিয়েছিলাম। ইচ্ছা করলেন আমি তাঁকে হত্যা করতে পারতাম; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই এ ধারণার বশবর্তী হয়ে ফিরে এলাম, এ মহাপাপ কেন কাঁধে নিতে যাব? দেখতে পেলাম, ডানবাম সবদিক হতেই তার উপর আক্রমণ চলছে; কিন্তু তিনি যেদিকে ফিরতেন, শত্রুরা সেদিক হতেই পলায়ন করতে থাকত। হযরত ইমাম তখন গায়ে জামা ও মাথায় পাগড়ি পরিধান করে রেখেছিলেন। আল্লাহর শপথ, আমি ইতিপূর্বে এমন প্রশস্ত-হৃদয় মানুষ আর কখনও দেখিনি, যার চক্ষের সম্মুখে আত্মীয়, বান্ধব পরিবার-পরিজন সকলেই একে একে প্রাণ দিল। সেই দুঃখসাগরে মানুষটিই এমন দৃঢ়তা ও বীরত্ব সহকারে যুদ্ধ করেছিলেন যে,

www.pathagar.com

যেদিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন, শক্রসৈন্যগণ ব্যাঘ্রতাড়িত মেষপালের ন্যায় ছুটে প্রাণরক্ষা করছিল। দীর্ঘক্ষণ এ অবস্থা চলিল। এ সময় হযরত ইমামের বোন হযরত যয়নব চিৎকার করতে করতে তাঁবু হতে বের হয়ে আসলেন, তিনি বলছিলেন, হায়! হায়!! আকাশ যদি মাটিতে ভেঙ্গে পড়ত! ইতিমধ্যে আমর ইবনে সাদ হযরত ইমামের একবারে নিকটে পৌঁছে গেলেন। হযরত যয়নব বলতে লাগলেন, আমর, আবু আবদুল্লাহ (হযরত হোসাইন) কি তোমাদের সম্মখেই নিহত হয়ে যাবেন। আমর তাঁর দিক হতে মুখ ফিরে নিলেন; কিন্তু অশ্রুতে তার দাড়ি ও গণ্ডদেশ ভেসে গেল।

যুদ্ধ করতে করতে হযরত ইমাম ভীষণভাবে পিপাসিত হয়ে গেলেন। পানির জন্য তিনি ফোরাতের দিকে চললেন; কিন্তু শক্ররা তাঁকে অগ্রসর হতে দিল না। একটি তীর এসে তাঁর কণ্ঠদেশে বিদ্ধ হল। হযরত ইমাম তীরের ফলক টেনে বের করে ফেললেন। হাত উপরে তুলবার সময় তাঁর উভয় হাত রক্তে ভরে উঠল। তিনি রক্ত আকাশের দিকে ছিটাতে ছিটাতে খোদার শোকর আদায় করতে করতে বলতে লাগলেন, "ইলাহী, আমার অভিযোগ একমাত্র তোমারই দরবারে। দেখ দেখ, তোমার রাসূল দৌহিত্রের সাথে কি ব্যবহার হচ্ছে।"

হযরত ইমাম ফোরাতের পথ ছেড়ে তাঁবুর দিকে ফিরে আসতে লাগলেন। শিমার একদল সৈন্যসহ এদিকেই তাঁর পথ রুদ্ধ করে দিল। হযরত ইমাম অনুভব করলেন, পাপিষ্ঠরা তাঁবু লুণ্ঠন করতে চায়। বলতে লাগলেন, "তোমাদের মধ্যে যদি ধর্মের কোন মমতা অথবা শেষ বিচারের কোন ভয় না-ও থেকে থাকে, তবু অন্তত মানবতার দিকে চেয়ে হলেও কুফার এ অসভ্যদের কবল হতে আমার তাঁবুটি রক্ষা করো।" শিমার উত্তর দিল, "আচ্ছা তাই করা হবে, আপনার তাঁবু রক্ষা করা হবে।"

সময় অতিবাহিত হয়ে চলছিল। বর্ণনাকারী বলেন, শক্ররা ইচ্ছা করলে বহু পূর্বেই তাঁকে হত্যা করে ফেলতে পারত; কিন্তু এ পাপ কেউ বহন করতে চাচ্ছিল না। শেষ পর্যন্ত শিমার চিৎকার করে বলতে লাগল, দেরী করছ কেন? শীঘ্র কাজ শেষ করে ফেলছ না কেন? এর পর আবার চারদিক হতে আক্রমণ শুরু হল। হযরত ইমাম উচ্চস্বরে বলতে লাগলেন, "আমাকে হত্যা করার জন্য কেন একে অপরকে উত্তেজিত করছ? আল্লাহর শপথ, আমার পর এমন কোন লোক থাকবে না যাকে হত্যা করলে আল্লাহ্ আজকের চাইতে বেশি অসন্তুষ্ট হবেন।"

শেষ সময় নিকটবর্তী হল। জোরআ ইবনে শরীফ তামিমী তাঁর বাম হাতে আঘাত করল, এরপর পাশথেকে তরবারি চালাল। হযরত ইমাম বেদনায় অস্থির হয়ে উঠে দাঁড়াইতে চাইলেন। এ দৃশ্য দেখে শক্ররা পিছিয়ে যেতে লাগল। ইতিমধ্যেই সেনান ইবনে আনাস আখরী এসে বর্শা মারল। হযরত ইমাম মাটিতে

www.pathagar.com

লুটিয়ে পড়লেন। পাপিষ্ঠ অন্য এক ব্যক্তিকে নির্দেশ দিল, "মাথা কাটে ফেল।" লোকটি অগ্রসর হল; কিন্তু সাহসে কুলাল না। পাপাচারী দাঁতে দাঁত পিষে বলতে লাগল, "তোর হাত নষ্ট হয়ে যাক!" এ কথা বলে নিজেই লাফিয়ে পড়ল এবং হযরত ইমামের মাথা কেটে দেহ হতে পৃথক করে নিল। জাফর ইবনে মোহাম্মদ ইবনে আলী বর্ণনা করেন, নিহত হওয়ার পর দেখা গেল, হযরত ইমামের শরীরে ৩৩টি তীর ও ৪৩টি তরবারীর আঘাত রয়েছে।

মদিনায় মাতম

আহলে বায়তের মদিনায় পৌঁছার বহু পূর্বেই এ হৃদয়বিদারক খবর মদিনায় পৌঁছে গিয়েছিল। বনী হাশেমের অন্তঃপুরবাসিনীগণ পর্যন্ত এ খবর শুনে বিলাপ করতে করতে পথে বের হয়ে আসলেন। হযরত আকীল ইবনে আবু তালেব-কন্যা সকলের অগ্রে অগ্রে আসছিলেন এবং বলছিলেন :

"নবী যখন তোমাদেরকে প্রশ্ন কররেন, তখন কি জবাব দিবে? হে আমার শেষ উম্মত, তোমরা আমার পরে আমার আওলাদ ও খান্দানের সাথে কি ব্যবহার করেছিলে? এদের কতক বন্দী হলেন আর কতক রক্ত-স্নাত হয়ে পড়ে রইলেন।"

২. হযরত হামজা (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)-এর শাহাদাত

বদর যুদ্ধের দিন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় চাচা হযরত হামজা রাদিয়াআল্লাহু তা'য়ালা আনহু তাঁর মাথার পাগড়ির সাথে উট পাখির পালক লাগিয়েছিলেন। সেদিনও তিনি দু'হাতে তরবারি চালনা করে বাতিল শক্তির ভেতরে ত্রাস সৃষ্টি করেছিলেন। মাথায় পাখির পালক থাকার কারণে তিনি যেদিকেই অগ্রসর হচ্ছিলেন, তাঁকে সহজেই চেনা যাচ্ছিলো।

নিহত হওয়ার আগে হযরত বিলালকে নির্যাতনকারী মক্কার কাফির নেতা উমাইয়া হযরত আব্দুর রহমান রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'মাথায় উট পাখির পালক লাগনো লোকটি কে?'

হযরত আব্দুর রহমান বলেছিলেন, 'তিনি বিশ্বনবীর চাচা হযরত হামাজা।' উমাইয়া আক্ষেপ করে বলেছিল, 'ঐ ব্যক্তি আজ আমাদের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করেছে।' বদরের ময়দানে মক্কার জুবায়ের ইবনে মুতায়িমের চাচা হযরত হামজা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর হাতে নিহত হয়েছিল। ওহুদের দিন সে তার গোলাম ওয়াহশীকে শর্ত দিয়েছিল, 'তুমি যদি হামজাকে হত্যা করে আমার চাচা হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারো তাহলো আমি তোমাকে দাসত্বের এই ঘৃণ্য জীবন থেকে মুক্তি দেবো।' ওয়াহশী ওহুদের প্রান্তরে একটি বিশাল পাথর খণ্ডের আড়ালে এমন একটি বর্শা হাতে ওঁৎ পেতে বসেছিল, যে বর্শা দূর থেকে ছুড়ে প্রতিপক্ষকে হত্যা করা যায়। হযরত হামজা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু দু'হাতে

www.pathagar.com

তরবারি পরিচালনা করছেন আর কাফিরদের ব্যূহ ভেঙে সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। শত্রুপক্ষ তাঁর সূতীক্ষ্ণ-ধার তরবারির সামনে কাটা কলা গাছের মতই মাটিতে লুটিয়ে পড়ছিল। হযরত হামজা যে মুহূর্তে পাথর খণ্ড অতিক্রম করছিলেন, পাথরের আড়ালে ওঁৎ পেতে বসে থাকা ওয়াহশী তার হাতের বর্শা হযরত হামজার নাভি লক্ষ্য করে ছুড়ে মারলো।

তীক্ষ্ণ বর্শা নবীর প্রিয় চাচার নাভিমূলে বিদ্ধ হয়ে পৃষ্ঠদেশ পার হয়ে গেল। জীবনের এই শেষ মুহূর্তেও ইসলামের এই বীর সেনানী শত্রুকে আঘাত করার জন্য সামনের দিকে অগ্রসর হলেন; কিন্তু তাঁর জীবনীশক্তি আর অবশিষ্ট ছিল না। তিনি রক্তাক্ত দেহে ওহুদের রণপ্রান্তরের লুটিয়ে পড়লেন। মক্কায় আবু জাহিল নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সামান্য আঘাত করেছিল, চাচা হামজা তা সহ্য করতে না পেরে আবু জেহেলকে আঘাত করে রক্তাক্ত করে দিয়েছিলেন। কিন্তু ওহুদের প্রান্তরে যখন আব্দুল্লাহ ইবনে কামিয়াহ আল্লাহর নবীকে আঘাত করে রক্তাক্ত করে দিল তখন হযরত হামজা প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য এগিয়ে আসতে পারলেন না। ওয়াহ্শীর নিক্ষিপ্ত বর্শার আঘাত তাঁকে চিরদিনের মতই নিথর নিস্তব্ধ স্পন্দনহীন করে দিয়েছে। তিনি আর কোনদিন আল্লাহর নবীর সামনে এসে দাঁড়াবেন না।

হযরত হামজা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে হত্যা করে ওয়াহশী যুদ্ধ করার আগ্রহ হরিয়ে ফেলেছিল। সেদিন আর তার পক্ষে যুদ্ধ করা সম্ভব হয়নি। দাসের জীবন থেকে সে মুক্তি লাভ করে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। ওয়াহশী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু আল্লাহর রাসূলের সামনে এসে দাঁড়াতেই রাসূলের মানসপটে প্রিয় চাচা হামজার শতসহস্র স্মৃতি ভেসে উঠেছিল। তিনি বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে হযরত ওয়াহশীকে বলেছিলেন, 'ওয়াহশী! তুমি আমার সামনে এসো না। তোমাকে দেখলেই আমার চাচার কথা মনে পড়ে।'

হযরত ওয়াহশী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু প্রতীক্ষা করেছিলেন, হযরত হামজা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে হত্যা করে যে পাপ তিনি করেছেন, জীবন দান করে হলেও তিনি সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবেন। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর খেলাফতকালে হযরত ওয়াহশী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ভণ্ডনবী মুসাইলামাকে হত্যা করে তাঁর সে কৃতকর্মের কাফফারা আদায় করেছিলেন।

কুরাইশদের নারী বাহিনী মুসলিম বাহিনীর শাহাদাত বরণকারীদের নিথর লাশের উপরে শুকুনের মতোই ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। শহীদের লাশের নাক, কান ও বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে মালা বানিয়ে তাদের গলায় পরেছে। আল্লাহর নবীর প্রিয় চাচা হযরত হামজা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর স্পন্দনহীন লাশ নিয়ে মক্কার হিংস্র

www.pathagar.com

হায়েনার দল পৈশাচিক উল্লাসে মেতে উঠেছিল। তাঁর পবিত্র নাক-কান ও দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিচ্ছিন্ন করে মালা বানিয়ে তা গলায় পরে নগ্ন উল্লাস প্রকাশ করেছিল।

এতেও তাদের হিংস্র আক্রোশ চরিতার্থ হলো না, আবু সুফিয়ানের স্ত্রী, আমীরে মুয়াবিয়ার মাতা হিন্দা হযরত হামজার পেট-বুক চিরে ফেললো। রাসূলের চাচার বুকের ভেতর থেকে হিন্দা কলিজা বের করে আনলো। সে কলিজা হিন্দা চিবিয়ে খেয়ে ফেলার চেষ্টা করলো; কিন্তু আল্লাহর ফায়সালা ছিল ভিন্ন ধরনের। হিন্দা সে কলিজা গিলতে না পেরে বমি করে ফেলে দিল। ইতিহাস মক্কার এই নারীকে 'কলিজা ভক্ষণকারিণী' হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

যুদ্ধ অবসানে শহীদদের লাশ দাফন করা হচ্ছে। শাহাদাতের রক্তাক্ত ময়দানে আল্লাহর নবীর প্রিয় চাচার প্রাণহীন দেহ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন অবস্থায় পড়ে আছে। হযরত হামজা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর লাশের এ অবস্থা দেখে সাহাবায়ে কেরাম ফুঁফিয়ে কেঁদে উঠলেন। আল্লাহর নবী অশ্রু সংবরণ করতে পারেননি। তিনি বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, চাচা! তোমার ওপর আল্লাহ রহম করুন কিয়ামতের ময়দানে তুমি হবে শহীদদের নেতা। আমার মন চায় তোমাকে এভাবেই এখানে ফেলে রাখি। পশু-পাখি তোমার লাশ ভক্ষণ করতো। কিয়ামতের দিন তোমাকে পশু-পাখির পেট থেকে জীবন্ত বের করা হতো; কিন্তু তোমার লাশ এভাবে ফেলে গেলে তোমার বোন শোকে অধির হয়ে পড়বে। চাচা! তুমি কাজে অগ্রগামী ছিলে। আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি তোমার কতই না মমতা ছিল!'

আপন ভাই হযরত হামজা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর শাহাদাতের সংবাদ পেয়ে তাঁর বোন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফুফু হযরত সাফিয়া রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা শোকে অধীর হয়ে ওহুদের প্রান্তরে ছুটে এলেন। আল্লাহর নবী হযরত সাফিয়ার সন্তান হযরত যুবায়েরকে বললেন, তোমার মাকে তার ভাইয়ের এই করুণ অবস্থা দেখতে দিও না। সে সহ্য করতে পারবে না।'

হযরত যুবায়ের রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তাঁর মাকে লাশ দেখতে নিষেধ করলেন। হযরত সাফিয়া বললেন, 'আমার আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাঁর নাক-কান ও বুকের কলিজা দান করেছে, এর চেয়ে সৌভাগ্যের আর কী আছে! আমিও আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ধৈর্য ধারণ করবো।'

হযরত সাফিয়া রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহার এ কথা শুনে আল্লাহর রাসূল তাঁকে হযরত হামজার লাশ দেখার অনুমতি দিলেন। হযরত সাফিয়া ময়দানে আসার পথেই ভাইয়ের কাফনের জন্য দুটি কাপড় এনেছিলেন। মুসলিম বাহিনী আল্লাহর

www.pathagar.com

পথে সমস্ত কিছুই উৎসর্গ করেছিলেন। বাকি ছিল শুধু প্রাণ, সে প্রাণও উৎসর্গ করলেন। কাফন দেয়ার মত কাপড়ও ছিল না। হযরত হামজার পাশেই হযরত ছুহায়েন আনসারীর প্রাণহীন দেহ পড়েছিল। তাঁর লাশকেও কাফিররা বিকৃত করেছিল। শহীদদের লাশ একত্র করা হলো। কাফনের যে কাপড় দেয়া হলো, সে কাপড়ে মাথা ঢাকলে পা বের হয়ে যায়, আর পা ঢাকলে মাথা বের হয়ে থাকে। অবশেষে মাথার দিক ঢেকে পায়ের দিকে ইজখির নামক এক ধরনের সুগন্ধ বিশিষ্ট ঘাস দিয়ে দোজাহানের বাদশাহর চাচার লাশ ওহুদের প্রান্তরেই দাফন করা হয়েছিল।

৩. হযরত মুসআব (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)-এর শাহাদাত

ওহুদের রণপ্রান্তরে ইসলামের শত্রুরা নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে হত্যা করার লক্ষ্যে এগিয়ে এলো। হযরত মুসআব ইবনে ওমায়ের রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বিপদের ভয়াবহতা উপলব্ধি করলেন। তিনি ছিলেন ওহুদ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর পতাকাবাহক। তিনি ক্ষণিকের মধ্যেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন, তাঁর দেহে প্রাণ থাকা পর্যন্ত তিনি রাসূলের দেহে সামান্যতম আঘাত বরদাশত করবেন না। আল্লাহর নবীর দিকে কাফির বাহিনী শাণিত অস্ত্র হাতে ছুটে আসছে। হযরত মুসআব এক হাতে পতাকা আরেক হাতে তরবারি নিয়ে রাসূলকে নিজের পেছনে রেখে কাফিরদের আক্রমণ প্রতিহত করতে থাকলেন। কাফিরদের ভেতরে ত্রাস সৃষ্টি করার জন্য তিনি তাদের সামনে ভয়ঙ্কররূপ ধারণ করে মুখ দিয়ে ভীতিকর শব্দ সৃষ্টি করতে লাগলেন। এ ধরনের ভূমিকা গ্রহণ করার কারণ হলো কাফিরদের দৃষ্টি রাসূলের ওপর থেকে সরিয়ে তাঁর নিজের ওপরে নিয়ে আসা। রাসূলুল্লাহ যেন নিরাপদে থাকতে পারেন, এটাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। এভাবে হযরত মুসআব ওহুদের প্রান্তরে মুসলিম বাহিনীর এক করুণ মুহূর্তে নিজের একটি মাত্র সত্তাকে একটি বাহিনীতে পরিণত করেছিলেন। তিনি কাফিরদের সামনে ঢালের মতোই ভূমিকা পালন করছিলেন। শত্রুরা তাঁর দেহের উপর দিয়েই আল্লাহর নবীকে আক্রমণ করছিল। শত্রুদের তীব্র আক্রমণের মুখে যখন মুসলিম সৈন্য বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়তো, তখন হযরত মুসআব একাই শত্রুর সামনে পাহাড়ের মতই অটল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন। রাসূলকে আঘাতকারী জালিম ইবনে কামিয়াহ এগিয়ে এলো। হযরত মুসআব রাদিয়াআল্লাহু তা'য়ালা আনহু তাকে বাধা দিলেন। পাপিষ্ঠ কামিয়াহ তরবারি দিয়ে আঘাত করে হযরত মুসআবের ডান হাত বিচ্ছিন্ন করে দিল।

কাফিরদের তরবারির আকেটি আঘাতে হযরত মুসআবের আরেকটি হাত বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। তিনি তাঁর কাটা হাতের বাহু দিয়ে ইসলামের পতাকা জড়িয়ে ধরে

www.pathagar.com

উড্ডীয়মান রাখলেন। ইসলামের শত্রুরা এবার তাঁর ওপর বর্শার আঘাত হেনে তাঁকে পৃথিবী থেকে চিরদিনের জন্য বিদায় করে দিল। তিনি শাহাদাতের অমিয় সুধা পান করলেন।

দাফন-কাফনের সময় হযরত মুসআব রাদিয়াল্লাহু তা'য়াআলা আনহুর লাশ পাওয়া গেল। হাত দুটি তাঁর নেই। তিনি হাত দুটি দিয়ে মহাসত্যের পতাকা ধারণ করেছিলেন, এ অপরাধে শত্রুরা তাঁর হাত দুটি দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। তাঁর পবিত্র শরীরে রয়েছে জোড়াতালি দেয়া শতছিন্ন জামা। সে জামাও রক্ত আর বালুতে বিবর্ণ। তবুও তাঁর গোটা মুখমণ্ডল দিয়ে যেন জান্নাতের দ্যুতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মুসআবের এই অবস্থা দেখে চোখের পানি ধরে রাখতে পারলেন না।

সাহাবায়ে কেরাম এতক্ষণ নীরবে চোখের পানি ফেলছিলেন। রাসূলের চোখে পানি ঝরতে দেখে সহাবায়ে কেরাম ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। তাঁকে কাফন দেয়ার মত ছোট এক টুকরা কাপড় ছাড়া আর কিছুই পাওয়া গেল না। সে কাপড় দিয়ে পা ঢাকলে মাথা উন্মুক্ত থাকে, মাথা ঢাকলে পা উন্মুক্ত থাকে। তিনি ছিলেন মক্কার ধনীর আদরের দুলাল। তাঁর কাফনের আজ এই করুণ অবস্থা। অথচ ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তাঁর মত জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক আর সুগন্ধি কেউ ব্যবহার করতো না। আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি তরুণ বয়সেই পৃথিবীর সমস্ত বিলাসিতা আর ধন-সম্পদের পাহাড়কে পদাঘাত করে রাসূলের সাথী হয়েছিলেন। হযরত মুসআব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু অত্যন্ত সুদর্শন ও বিশাল ধন-সম্পদের উত্তরাধিকারী ছিলেন। দৃষ্টি আকর্ষণকারী মূল্যবান পোশাক ব্যবহার করা ছিল তাঁর অভ্যাস। শরীরে তিনি এমন সুগন্ধি ব্যবহার করতেন যে, তাঁর বিচরণ ক্ষেত্র আকর্ষণীয় গন্ধে আমোদিত হয়ে উঠতো। ওহুদের যুদ্ধে তাঁর মা ছিল ইসলামের শত্রুদের দলে। ইসলাম গ্রহণের অপরাধে তাঁর মা তাঁকে বন্দী করে রাখতো। অসহনীয় অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে তিনি আবিসিনিয়ায় হিজরত করেছিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামের প্রথম দূত হিসেবেই তাঁকে মক্কা থেকে মদিনায় প্রেরণ করেছিলেন। মদিনার ঘরে ঘরে ইসলামের আলো জ্বালিয়ে দেয়ার একক কৃতিত্ব যেন তাঁরই।

৪. হযরত হানযালা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর শাহাদাত

হযরত হানযালা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ওহুদের যুদ্ধে প্রথমে যোগ দিতে পারেননি। ছিলেন সুন্দর সুঠাম দেহের অধিকারী সুদর্শন যুবক। কথিত রয়েছে, সুন্দরী তন্বী-তরুণী এক ষোড়শীকে তিনি সবেমাত্র পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করেছিলেন। সেদিন ছিল তাঁর বাসর রাত। স্ত্রীকে নিয়ে তিনি বাসর রাত অতিবাহিত করেছেন। ফরজ গোছল আদায়ের প্রস্তুতি গ্রহণ করছেন হযরত

www.pathagar.com

হানযালা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু। এমন সময় তিনি সংবাদ পেলেন ওহুদের ময়দানে আল্লাহর রাসূল ﷺ বাতিল কর্তৃক আক্রান্ত হয়েছেন। তিনি ফরজ গোছল উপেক্ষা করে তরবারি হাতে ওহুদের ময়দানের দিকে ছুটলেন। আল্লাহর এই ব্যঘ্র 'আল্লাহু আকবার' বলে গর্জন করে শত্রু বাহিনীর ভেতরে প্রবেশ করে শত্রু নিধন করতে থাকলেন। শত্রুর অস্ত্রের আঘাতে এক সময় তিনি শাহাদাত বরণ করলেন। যুদ্ধ শেষে নবী করীম ﷺ শহীদানদের দাফন করছেন। এমন সময় হযরত হানযালা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর সদ্য বিবাহিতা এবং বিধবা স্ত্রী এসে আল্লাহর রাসূলকে জানালেন, 'হে আল্লাহর রাসূল ﷺ আমার স্বামীর ওপর গোছল ফরজ ছিল, তাঁকে গোছল না দিয়ে দাফন করবেন না।'

নবী করীম ﷺ তাঁর প্রিয় সাহাবীর লাশের সন্ধান করবেন, এ সময়ে হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম এসে নবীকে অবগত করলেন, ইয়া রাসূল ﷺ! হানযালাকে গোছল দেয়ার কোন প্রয়োজন নেই। মহান আল্লাহ তাঁর ওপর এত খুশি হয়েছেন যে, ফেরেশতাদের মাধ্যমে তাঁকে গোছল করিয়েছেন।' রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবায়ে কেরামকে এ কথা জানিয়ে দিলেন। উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম হযরত হানযালা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর লাশের কাছে গিয়ে দেখলেন, তাঁর লাশ থেকে জান্নাতি সুঘ্রাণ ছড়িয়ে পড়ছে আর মাথার চুল ও মুখের দাড়ি থেকে সুগন্ধযুক্ত পানি ঝরছে। পৃথিবীর সমস্ত আকর্ষণের মাথায় পদাঘাত করে হযরত হানযালা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ওহুদের রণক্ষেত্রে ছুটে এসেছিলেন। মহান আল্লাহ তাঁকে তাঁর এই উত্তম কর্মের পুরস্কার কিভাবে দান করেছিলেন, পৃথিবীর মানুষ তা ওহুদের রণক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ করেছিল।

৫. হযরত বেলাল (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)-এর ওপর অমানবিক নির্যাতন

বেলাল ছিলেন একজন কাফ্রী ক্রীতদাস। দেখতে তিনি অত্যন্ত কৃষ্ণকায় ও কদাকার ছিলেন। কিন্তু তা হলে কি হয়! বাহিরটা তাঁর কালো হলেও ভিতরটা যে আলোয় আলোময়। কালো কয়লার খনির তলে যেমন করে উজ্জ্বল হীরক-খণ্ড লুকিয়ে থাকে, বেলালের কুৎসিত দেহের মধ্যে তেমনি ছিল এমনি একটি সুন্দও জ্যোতির্ময় আত্মা!

বেলালের প্রভুর নাম ছিল উমাইয়া। বেলাল গোপনে গোপনে ইসলাম গ্রহণ করে নিশিদিন আল্লাহর গুণগান করতেন। এ কথা জানতে পেরে উমাইয়া একেবারে ক্ষিপ্ত ব্যাঘ্রের মত হয়ে উঠিল। বেলালকে তৎক্ষণাৎ সম্মুখে এনে মারতে মারতে বলতে লাগল, "যদি ভাল চাস ত এখনি মুহম্মদের ধর্ম পরিত্যাগ কর।" কিন্তু বেলাল কিছুতেই রাযী হলেন না। অত্যাচারের মাত্রা বেড়ে চলল, বেলাল কিন্তু একেবারেই অনমনীয়।

www.pathagar.com

তখন উমাইয়া এক অদ্ভুত শাস্তির ব্যবস্থা করল। বেলালের গলায় দড়ি বেঁধে পশুর মত টানা-হেঁচড়া করবার জন্য তাঁকে মক্কার বালকদের হাতে সমর্পণ করল। বালকেরা প্রত্যহ তাকে রাজপথে টেনে বেড়াত এবং নানাভাবে বিদ্রূপ ও উৎপীড়ন করত। তারপর সন্ধ্যার সময় অর্ধমৃত অবস্থায় উমাইয়ার বাড়িতে রেখে আসত। উমাইয়া প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় বেলালকে জিজ্ঞাসা করত, "কেমন, এখনো মুহম্মাদের ধর্ম পালন করবার সাধ আছে নাকি?" বেলাল নির্ভীক চিত্তে উত্তর দিতেন : "জীবন থাকতে এই ধর্ম পরিত্যাগ করতে পারব না।" বেলালকে কিছুতেই যখন নিরস্ত করা গেল না, তখন উমাইয়া অত্যাচারের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দিল। বেলালকে হাত-পা বেঁধে মধ্যাহ্ন-সূর্যের প্রখর তাপদগ্ধ মরুবালুকার উপরে চিৎ করে শোয়াইয়া দেওয়া হল এবং যাতে সে পার্শ্ব পরিবর্তন করতে না পারে, সেই উদ্দেশ্যে পাষণ্ডেরা তাঁর বুকের উপর এক প্রকাণ্ড পাথর চাপিয়ে দিল। এই অবস্থায় উমাইয়া তাঁকে শাসিয়ে বলল, "বেলাল যদি ভাল চাও তবে এখনও মুহাম্মদের ধর্ম ত্যাগ কর"। কিন্তু বেলাল প্রশান্ত মুখে উত্তর দিলেন : "আহাদুন। আহাদুন। এক- সেই অদ্বিতীয় এক!"

বেলালকে কখনও বা অনাহারে রাখা হত। সারাদিন ক্ষুধার যন্ত্রণায় বেলাল যখন অবসন্ন হয়ে পড়তেন, তখন উমাইয়া তাঁহাকে চাবুক মারতে মারতে বলিত : "কেমন, এখনও মুসলমান হবার সাধ আছে তোমার?" বেলালের মুখে সেই একই বাণী ঃ আহাদুন! আহাদুন! কী পবিত্র দৃশ্য এ! ক্ষুধার তাড়নায় প্রাণ ওষ্ঠাগত, বেত্রাঘাতে দেহ জর্জরিত, শোণিত ধারায় সর্বাঙ্গ অভিষিক্ত; অথচ তার মধ্য হতে ঝঙ্কৃত হচ্ছে শুধু সেই এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর বিজয় ঘোষণা।

৬. হযরত আমর ইবনে জমুহ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-এর শাহাদাত

হযরত আমর ইবনে জুমুহ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ছিলেন পঙ্গু। মসজিদে নব্বীর অদূরেই তিনি বাস করতেন। নবীর এই সাহাবী ঠিকভাবে হাঁটতে পারতেন না। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতেন তিনি। তবুও তিনি যুদ্ধে যাবেন। পিতার জিদ দেখে তাঁর সন্তানগণ তাঁকে আটকিয়ে রেখে তাঁর চার সন্তান ওহুদের দিকে যাওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করলো। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে উপস্থিত হয়ে আবেদন করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমার সন্তানগণ আমাকে যুদ্ধে যেতে দিতে দিচ্ছে না। আমার ইচ্ছা আমি আল্লাহর পথে শাহাদাতবরণ করে জান্নাতে এভাবে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটবো।'

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'আল্লাহ তোমাকে জিহাদের দায়িত্ব থেকে মুক্তিদান করেছেন। এরপর তিনি হযরত আমরের সন্তানদের বললেন, 'তোমাদের পিতা যদি যেতে চায় তাহলে বাধা না দিলেও পারো। আল্লাহ তাঁর ভাগ্যে শাহাদাত লিখে রাখতে পারেন।'

www.pathagar.com

হযরত আমরের সন্তানগণ ওহুদের দিকে চলে গেল। তিনি ভাবলেন, তাঁর সন্তানগণ যদি শাহাদাতবরণ করে, তাহলে তাঁর আগেই তাঁরা আল্লাহর জান্নাতে যাবে। হযরত আমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু দেখলেন, একজন কিশোর তরবারি ঝুলিয়ে তাঁর দিকেই আসছে। কিশোর এসে তাঁর কাছে দোয়া চেয়ে ওহুদের দিকে চলে গেল। তিনি নিজেকে আর স্থির রাখতে পারলেন না। তিনি আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন, 'হে আমার আল্লাহ! তুমি আমাকে আর আমার বাড়িতে ফিরিয়ে এনো না।'

হযরত আমর ইবনে জমুহ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ওহুদের রণপ্রান্তরে উপস্থিত হলেন। মক্কার ইসলামবিরোধী বাহিনীর ভেতরে তিনি প্রবেশ করে বীর বিক্রমে আক্রমণ করলেন। তিনি তাকিয়ে দেখলেন, তাঁর আশপাশেই তাঁর সন্তানগণ যুদ্ধ করছে। তাঁর চোখের সামনে একে একে তাঁর চার সন্তান শাহাদাতবরণ করলেন। কাফিরদের শাণিত অস্ত্র এক সময় তাঁর পঙ্গু দেহকে দ্বিখণ্ডিত করে দিল। তিনি শাহাদাতবরণ করলেন। হযরত আমরের স্ত্রী তাঁর স্বামীর এবং সন্তানদের লাশ গ্রহণ করার জন্য উট নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে ওহুদের ময়দানে এলেন। লাশ উটের পিঠে উঠিয়ে তিনি উটকে বাড়ির দিকে নিতে চাইলেন। উট স্থির থাকলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ কথা জানানোর পর তিনি হযরত আমরের স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার স্বামী বাড়ি থেকে আসার সময় কি কিছু বলেছিল?'

হযরত আমর ইবনে জমুহ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর স্ত্রী জানালেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমার স্বামী আল্লাহর কাছে দোয়া করে বলেছিল, 'হে আমার আল্লাহ! তুমি আমাকে আর আমার বাড়িতে ফিরিয়ে এনো না।' এ কথা শোনার পর আল্লাহর নবী করীম ﷺ বললেন, 'আল্লাহ আমরের দোয়া কবুল করে নিয়েছেন। তাকে ওহুদের ময়দানেই অন্তিম শয়ানে শুইয়ে দাও।'

৭. হযরত আনাস বিন নযর (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)-এর শাহাদাত

হযরত আনাস বিন নযর একজন আল্লাহর রাসূলের সম্মানিত সাহাবী ছিলেন। তিনি বদরের যুদ্ধে যোগ দিতে পারেননি। এ কারণে তিনি এই বলে আক্ষেপ করতেন, ইসলামের গৌরবোজ্জ্বল প্রথম যুদ্ধে সকলেই অংশগ্রহণ করলো। কেউ শহীদ কেউ গাজী হয়ে ইসলামের ইতিহাসে অমর হয়ে রইলো, আর আমি হতভাগ্য এতে যোগ দেয়ার কোন সুযোগই পেলাম না।

দুঃখ ও আক্ষেপে অত্যন্ত মনোক্ষুণ্ন হয়ে তিনি সঙ্কল্প করলেন যে, যদি ভবিষ্যতে কোন জিহাদের সুযোগ মিলে তবে তাঁর এই অসম্পূর্ণ আকাঙ্ক্ষা নিয়ে যুদ্ধে যোগ দেবেন। ওহুদের যুদ্ধে প্রথমত: মুসলমানদের বিজয় লাভ হয়; কিন্তু শেষ দিকে

www.pathagar.com

একটি মাত্র ভুলে জন্য তাঁদেরকে পরাজয় বরণ করতে হয়েছিল। তাঁদের এই ভুলটি নবী করীম ﷺ-এর আদেশ অমান্য করার কারণেই সংঘটিত হয়েছিল। আল্লাহর নবী পঞ্চাশ জন তীরন্দাজকে ওহুদ পর্বতের পেছনের দিকে একটি গিরিপথ পাহারা দেয়ার জন্য আদেশ দিয়েছিলেন। তাঁদের নির্দেশ ছিলো, কোন অবস্থাতেই যেন তারা ঐ স্থান পরিত্যাগ না করেন। কারণ ঐ পথ দিয়ে শত্রুদের আক্রমণ করার আশঙ্কা ছিল।

যুদ্ধের শুরুতেই মুসলমানদের যখন বিজয় ঘটলো এবং কাফিরা ছত্রভঙ্গ হয়ে এদিকে ওদিক ছুটে পালাতে লাগলো, তখন সেই তীরন্দাজগণ মনে করলেন যে, যুদ্ধ শেষ হয়ে গিয়েছে এখন ঐ স্থান পরিত্যাগ করে শত্রুগণের পশ্চাদ্ধাবন করা এবং তাদের পরিত্যক্ত সম্পদ কুড়িয়ে নেয়া যেতে পারে। তাঁদের নেতা তাঁদেরকে স্থান ত্যাগ করতে নিষেধও করেছিলেন এবং আল্লাহর নবীর আদেশের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন; কিন্তু তাঁরা মনে করলেন যে, আল্লাহর নবীর আদেশ শুধু যুদ্ধের সময়ের জন্যই দেয়া হয়েছিল অন্য সময়ের জন্য তা প্রযোজ্য নয়। এ কথা মনে করে তাঁরা ঐ স্থান পরিত্যাগ করে যুদ্ধক্ষেত্রে এসে উপস্থিত হলেন এবং শত্রুর পরিত্যক্ত সম্পদ কুড়াতে আরম্ভ করলেন।

পলায়নরত শত্রুরা গিরিপথটি অরক্ষিত অবস্থায় দেখতে পেয়ে প্রতিআক্রমণের মহাসুযোগ পেয়ে গেলো। তারা ঐ পথ দিয়ে প্রবেশ করে অপ্রস্তুত মুসলমানদের ওপর প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করলো। এ অতর্কিত আক্রমণে মুসলমানরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়লেন। সামনে ও পেছনে দু'দিকের আক্রমণে তারা শত্রুর দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে পড়লেন এবং নিতান্ত অসহায়ের মতো প্রতিপক্ষের হাতে নির্মমভাবে শাহাদাত বরণ করতে লাগলেন।

হযরত আনাস মুসলমানদের এ দুরবস্থা দেখ অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। তার সম্মুখে হযরত সায়াদকে দেখতে পেয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় যাচ্ছো সায়াদ? আল্লাহর কসম আমি ওহুদের পর্বত থেকে জান্নাতের খুশবু পাচ্ছি। এই কথা বলেই তিনি শত্রুদের মধ্যে ঢুকে পড়লেন এবং যে পর্যন্ত না শহীদ হলেন, অবিরত তলোয়ার চালিয়ে গেলেন।

যুদ্ধ শেষে শহীদানদের লাশ দাফন-কাফনের জন্য একত্রিত করা হলো। হযরত আনাসের লাশ এমনভাবে বিকৃত করা হয়েছিলো যে, কারো পক্ষে তা সনাক্ত করা সম্ভব ছিলো না। নানা ধরনের অস্ত্রের আঘাতে তাঁর লাশ ক্ষত-বিক্ষত ও রক্তাক্ত হয়ে গিয়েছিলো। তাঁর বোন তাঁর হাতের একটি আঙুল দেখে লাশ সনাক্ত করেছিলেন। যাঁরা অকৃত্রিম মন-মানসিকতা নিয়ে আল্লাহর কাজে নিজেকে বিলিয়ে দেন, তাঁরা বাস্তবিকই পৃথিবীতে জান্নাতের সুগন্ধ পেয়ে থাকেন; হযরত আনাস জীবিত অবস্থায় জান্নাতের সুগন্ধ পেয়েছিলেন।

www.pathagar.com

৮. ফাঁসির কাষ্ঠে হযরত খুবাইব রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর শাহাদাত

মক্কার কোরায়শগণ মানসিক অস্থিরতার চাপে স্বতপ্রবৃত্ত হয়েই সংঘর্ষ সৃষ্টির পথে অগ্রসর হল; কিন্তু বদর ও ওহুদের ময়দানে শক্তি পরীক্ষার পর যখন তাদের ক্ষামতার মিথ্যা আত্মাভিমানও নিঃশেষ হয়ে গেল, তখন চারদিক হতে তারা ব্যাপকভাবে ষড়যন্ত্রজাল বিস্তার করতে শুরু করে। তারা আজল ও কারা গোত্রের সাত ব্যক্তিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট প্রেরণ করে এ প্রস্তাব পেশ করে, আপনি যদি কিছুসংখ্যক বিশিষ্ট সাহাবী প্রেরণ করেন, তবে আমরা গোত্রের সকল লোকই ইসলাম গ্রহণ করব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আসেম ইবনে ছাবেত রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর নেতৃত্বে দশ জন বিশিষ্ট সাহাবীর একটি প্রতিনিধি দল প্রেরণ করলেন। অপরদিকে এক স্থানে কাফেরদের দুইশত যোদ্ধা মুসলমানদের এ সংক্ষিপ্ত জামাতটির অপেক্ষা করছিল। মুসলমানদের জামাত তখন সেখানে পৌঁছালেন তখন নাঙ্গা তরবারী বিজলীর শক্তিতে তাঁদের অভ্যর্থনা করল। মুসলমানরা যদিও কুরআনের বাণী প্রচার করতে বের হয়েছিলেন; কিন্তু একেবারে নিরস্ত্র ছিলেন না। সংকট দেখার সঙ্গে সঙ্গেই দুইশত তরবারির সম্মুখে দশটি তরবারিও কোষমুক্ত হল এবং উভয়পক্ষে তুমুল সংগ্রাম শুরু হয়ে গেল। আটজন সাহাবী বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে শহীদ হয়ে গেলেন। হযরত খুবাইব ইবনে আদী এবং যায়েদ ইবনে দাসেনা রাদিয়াল্লাহু আনহু নামক দুই সিংহপুরুষ গ্রেফতার হয়ে গেলেন। সুফিয়ান হোযালী এ দুই বীরকে মক্কায় নিয়ে গিয়ে নগদ মূল্যে মক্কার হিংস্র পশুদের নিকট বিক্রয় করে দিলো।

উভয় বন্দীকেই হারেস ইবনে আমেরের গৃহে রাখা হল। কাফেররা এরূপ নির্দেশ দিল, তাদের রুটি বা পানি কিছুই যেন দেয়া না হয়। হারেস অক্ষরে অক্ষরের নির্দেশ পালন করল। বন্দীদের জন্য খাবার সম্পূর্ণ রূপে বন্ধ করে দেয়া হল।

কোরায়েশ দল কয়েকদিন অপেক্ষা করল; কিন্তু অনাহারে যখন মৃত্যু হল না তখন তাঁকে হত্যা করার জন্য তারিখ ঘোষণা করা হল। খোলা ময়দানে একটি কাষ্ঠফলক পোঁতা হল। কোরায়েশ দল ফলকটির চারধারে তরবারি ও বর্শা উচিয়ে দাঁড়াল। কেউ কেউ তরবারি ভাজতে ছিল। কেউ কেউ ধনুকে তীর সংযোজন করছিল। এমনাবস্থায় ঘোষণা করা হল, খুবাইবকে আনা হচ্ছে। মুহূর্তে ময়দান সরগরম হয়ে উঠল। উৎসুক দর্শকের দল চারদিকে ছুটাছুটি করতে শুরু করল। কিছু লোক অস্ত্র ঠিক করতে করতে বন্দীর উপর আক্রমণ করে পৈশাচিক উপায়ে রক্ত প্রবাহিত করতে প্রস্তুত হল।

বীর মুসলিম হযরত খুবাইব রাদিয়াল্লাহু আনহু এক পা এক পা করে বধ্যভূমির দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। তাঁকে শূলের নীচে এনে খাড়া করা হল। এক ব্যক্তি তাঁকে সম্বোধন করে বলতে লাগল, খুবাইব, আমরা তোমার এ বিপদে দুঃখ অনুভব করছি। এখনও যদি তুমি ইসলাম ত্যাগ কর তবে তোমাকে মুক্তি দেয়া যেতে পারে।

www.pathagar.com

হযরত খুবাইব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সম্বোধনকারীর দিকে মুখ করে বলতে লাগলেন, ইসলামই যদি অবশিষ্ট না থাকে, তবে জীবন রক্ষা অর্থহীন। এ দৃঢ়তাব্যঞ্জক জবাব জনতার মধ্যে বিদ্যুতের ন্যায় ছড়িয়ে পড়ল। ক্ষণিকের জন্য উত্তেজিত জনতা স্তব্ধ ও নীরব হয়ে গেল।

দ্বিতীয় এক ব্যক্তি অগ্রসর হয়ে বলল, "খুবাইব, কোন অন্তিম ইচ্ছা থাকলে বলতে পার।"

হযরত খুবাইব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু জবাব দিলেন, "মাত্র দুই রাকাত নামায পড়তে চাই; অন্য কোন ইচ্ছা নাই।" জনতা জানিয়ে দিল, ভাল কথা- শীঘ্র আদায় করে নাও। ফাঁসির রজ্জু প্রস্তুত ছিল, হযরত খুবাইব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু নীচে দাঁড়িয়ে প্রাণ ভরে শেষ বারের মত প্রিয়তমের এবাদত করতে প্রস্তুত হলেন। হৃদয়ের নিষ্ঠা ও অনুরাগ নিংড়ানো এ মুখ প্রিয়তমের গুণগান করতে গিয়ে বন্ধ হতে চাইল না। যে দুই হাত মহান আল্লাহর সম্‌দুখে বন্ধ হয়েছিল, তা আর খুলতে চাইল না। রুকুর উদ্দেশে অবনত কোমর আর সোজা হতে চাইল না। মাটির বিছানা হতে সেজ্‌দার অনুরাগ শেষ হল না! চক্ষুযুগল হতে এত বিনয়ের অশ্রু প্রবাহিত হতে চাইল, যেন শরীরের প্রতি রক্তবিন্দু অশ্রু হয়ে চোখের কোণে নেমে আসে। আল্লাহর এ ঊষর পৃথিবী যেন অশ্রু সিঞ্চনীতে জান্নাতুল ফেরদাউসের প্রাণ-প্রাচুর্যে ভরে উঠে!

হযরত খুবাইবের প্রেমিক অন্তরে আত্মনিবেদনের আনন্দে মত্ত ছিল; কিন্তু হঠাৎ তিনি অন্তর হতে এক নূতন আহ্বান শুনতে পেলেন, এ আহ্বান বুঝি একমাত্র শহীদের অন্তরই অনুভব করতে পারে। তিনি যেন অনুভব করলেন, নামায অধিক লম্বা করলে কাফেরগণ এ কথা ভাবতে শুরু করবে, তাঁর মুসলিম অন্তর বুঝি মৃত্যু ভয়ে ভীত হয়ে গিয়েছে। এ কথা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ডান দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুলাহ। কাফেরদের তরফ হতে কোন জবাব এলো না; কিন্তু তাদের অগণিত তীরের তীক্ষ্ণ মুখ এবং উত্তোলিত তরবারির তীক্ষ্ণধার যেন সজীব হয়ে সালামের জবাব দিয়ে উঠল। তিন বাম দিকে মুখ ফিরিয়ে সালামের বাণী উচ্চারণ করলেন। কাফেরকুলের নির্বাক জামাত এরও কোন জবাব দিতে পারল না; কিন্তু অগণিত বর্শার সুতীক্ষ্ণ ফলক যেন বলে উঠল, হে ইসলামের অমর মোজাহেদ, তোমার উপর আল্লাহর শান্তি বর্ষিত হোক।

মরদে মোজাহেদ হযরত খুবাইব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সালাম ফিরিয়ে শূলের নীচে এসে দাঁড়ালেন। কাফেররা তাঁকে কাষ্ঠের সাথে বন্ধন করে তীক্ষ্ণধার তীর ছুঁড়ে তাঁর খোদা প্রেমের শেষ পরীক্ষা নিতে শুরু করল। এক ব্যক্তি পূর্বেই মানাযের বিছানায় মরদে মুমিনের যে পবিত্র রক্ত অশ্রুর বন্যায় প্রবাহিত হয়ে আসছিল,

www.pathagar.com

তাই শতছিদ্র দিয়ে বের হতে শুরু করল। হযরত খুবাইবের এ ধৈর্য কি অপূর্ব! শূলের স্তম্ভের সাথে তাঁর সর্বশরীর আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা রয়েছে। তৎপর এক এক তীর এসে তাঁর শরীরে এপার-ওপার হয়ে যাচ্ছিল। তীক্ষ্ণধার বর্শা তাঁর বুকের পাঁজর ভেদ করে বিদ্ধ হচ্ছে। এক একটি আঘাত তিনি নিজ চোখে প্রত্যক্ষ করছেন, কিন্তু এ অবস্থায়ও তিনি ইসলামের কঠোর স্বীকারোক্তিতে অটল রয়েছেন। দুঃখ-বেদনার এ প্রলয়ও তাঁর অন্তরকে ইসলামের ওপর হতে হটাতে পারছে না।

এ সময় আর এক ব্যক্তি এসে তাঁর বুকে বর্শা রাখল। ধীরে ধীরে তা এতটুকু বিদ্ধ করল যে, অর্ধেকটুকু ফলক তাঁর শরীরে প্রবিষ্ট হয়ে গেল। এসময় আক্রমণকারী তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, "এখন তোমার স্থানে যদি মোহাম্মদকে বেঁধে তোমাকে মুক্তি দেয়া হয়, তবে তুমি কি তা পছন্দ করবে?" ধৈর্যের প্রতিমূর্তি হযরত খুবাইব (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) একটি একটি করে অস্ত্রের কঠিন আঘাত সহ্য করেছিলেন; কিন্তু তাঁর নিকট পাপাত্মার এ একমাত্র বাক্যবাণ যেন সহ্য হল না। যবানের এক এক ফোঁটা রক্ত যদিও ইতিপূর্বেই নিঃশেষে ঝরে পড়ছিল, তবুও এ শুষ্ক মুখেই নুতন শক্তি দেখা দিল। জ্বালাময়ী ভাষায় তিনি বলতে লাগলেন, "নিষ্ঠুর! খোদা জানেন, আমি তিলে তিলে প্রাণ দিয়ে দিতে পারি; কিন্তু আল্লাহর রাসূলের পায়ে একটি কাঁটা বিদ্ধ হওয়ার দৃশ্যও সহ্য করতে আমি প্রস্তুত নই।"

৯. হযরত বারা বিন মালিক আল আনসারী-এর শাহাদাত

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উল্লেখযোগ্য একজন সাহাবী হযরত বারা বিন মালিক "। তিনি ছিলেন সশস্ত্র সাহসী বীরযোদ্ধা যিনি যুদ্ধে সর্বদা সম্মুখে অবস্থান করতেন। এ কারণে হযরত উমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তার শানে বলেছেন: "সাবধান! তোমরা বারাকে কখনো সেনাপতির দায়িত্ব দিবে না, কেননা ভয় হয় সে নির্দ্বিধায় তার সৈন্যদেরকে শত্রুর সম্মুখে এগিয়ে নিয়ে ধ্বংস করে দিবে।"

হযরত বারা বিন মালিক (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হচ্ছেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর খাদেম হযরত আনাস বিন মালিক (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর আপন ভাই।

এই ঘটনাটি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ইন্তেকালের কয়েক ঘণ্টা পর থেকে শুরু হয়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ইন্তেকালের পর মক্কা, মদিনা ও তায়েফের লোকেরা ব্যতীত অন্যান্য গোত্রের লোকেরা একযোগে ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে আগের ধর্মে ফিরে যেতে লাগল। যেমনিভাবে তারা ইসলামের বিজয় দেখে একযোগে ইসলামে প্রবেশ করেছিল, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ইন্তেকালের পর ঠিক তেমনিভাবে ইসলাম ত্যাগ করে একযোগে মুরতাদ হতে লাগল। তখন মক্কা, মদিনা, তায়েফ ও অন্যান্য কিছু গোত্রের লোকেরা যাদের অন্তরকে আল্লাহ ঈমানের ওপর মজবুত রেখেছে তারাই ইসলামে স্থায়ী ছিলেন।

www.pathagar.com

ইয়ামামার ময়দানে উভয় দল যুদ্ধের মুখোমুখি হলো। তাদের তুলনায় মুসলমানদের সংখ্যা ছিল নগণ্য। যুদ্ধের প্রথমদিকে মুসায়লামা ও তার বাহিনীর বিজয়ের পাল্লা ভারি হতে লাগল। যুদ্ধের অবস্থা মতো ভয়াবহ হয় যে, মুসলমানরা ময়দানে দাঁড়াতে পারছিল না। তাদের পায়ের তলের মাটি কাঁপতে শুরু করে। আর তাই তারা ধীরে ধীরে পিছনের দিকে যেতে লাগল। এমনকি শত্রু বাহিনীর সৈন্যরা খালেদ বিন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর তাঁবুটিও দখল করে নিল। যে তাঁবুটি মুসলমানদের সবচেয়ে বড় তাঁবু ছিল। তারা তাঁবুটি উঠিয়ে ফেলল এবং তার পর্দাগুলো ছিঁড়ে ফেলল। তারা তাঁর স্ত্রীকে হত্যা করার চেষ্টা করে; কিন্তু তিনি পালিয়ে গিয়ে বেঁচে গেলেন।

এই যুদ্ধে পরাজয় বরণ করলে যে কঠিন বিপদের সম্মুখীন হতে হবে তা মুসলিম বাহিনী আঁচ করতে পারে। যদি মুসলমানরা আজ তাদেরকে পরাজিত করতে না পারে তাহলে ইসলাম আর কখনো মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে না। শরিকবিহীন সত্ত্বা আল্লাহ তাআলার ইবাদত করার মতো কেউ আর এই পৃথিবীতে বাকি থাকবে না।

আর তাই হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু আবার সৈন্যদের মনোবল ফিরিয়ে এনে তাদেরকে প্রস্তুত করতে শুরু করেন। তিনি মুহাজির ও আনসার সাহাবীদেরকে দুইটি বাহিনীতে ভাগ করলেন। আর তৃতীয় বাহিনী হিসেবে বেদুঈনদেরকে নির্ধারণ করে সর্বোপরি মুসলিম সৈন্যদেরকে মুহাজির, আনসার ও বেদুঈন তিন ভাগে ভাগ করলেন।

তিনি প্রত্যেক সন্তানকে তাদের পিতার ঝাণ্ডার নিচে একত্রিত করলেন যাতে করে তারা যুদ্ধে তাদের অবস্থান উপলব্ধি করতে পারে।

মুসলমান ও মুরতাদদের মাঝে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। যে যুদ্ধের মতো যুদ্ধ মুসলমানরা কখনো দেখেনি। মুসায়লামার বাহিনী অটল পর্বতের মতো যুদ্ধের ময়দানে অবস্থান নিল। অন্যদিকে মুসলমানরা এমন দুঃসাহসিকতা ও বীরত্ব দেখাতে লাগল, যদি তা লিপিবদ্ধ করা হতো তাহলে তা অতুলনীয় রণকাব্যে রূপ নিত।

ইনি হলেন হযরত সাবিত বিন কায়েস রাদিয়াল্লাহু আনহু। যার হাতে আনসারদের ঝাণ্ডা তুলে দেওয়া হয়েছে। তিনি সুগন্ধি মেখে কাফনের কাপড় পরে নিজের জন্যে একটি কবর খুঁড়ে তাতে নেমে পড়লেন। তিনি সগোত্রীয় ঝাণ্ডা হাতে নিয়ে স্থির-অবিচল থেকে যুদ্ধ করতে করতে এক সময় শহীদ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন।

ইনি হলেন হযরত জায়িদ বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু যিনি হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর আপন ভাই। তিনি মুসলমানদেরকে ডেকে বললেন– হে মানুষেরা তোমরা তোমাদের অবস্থানে অনড় থাক, তোমাদের শত্রুদেরকে খতম করতে থাকো এবং সামনের

www.pathagar.com

দিকে পা বাড়াও..........। আল্লাহর শপথ! আমি এর পরে আর কোনো কথা বলব না যতক্ষণ না মুসায়লামাকে পরাজিত করব অথবা আমি শহীদ হয়ে আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে যাব।

তারপর তিনি শত্রু বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়তে শুরু করলেন। অবশেষে লড়াই করতে করতে তিনি শহীদ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন।

আর ইনি হযরত সালেম রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু। যিনি মুহাজিরদের ঝাণ্ডা হাতে নিলেন; কিন্তু অন্যান্যরা তাঁর দুর্বলতার কারণে অটল অবিচল না থাকার ভয় করতে লাগল। তারা তাঁকে বলল– আমরা আপনার দিক থেকে আক্রান্ত হওয়ার ভয় করছি।

তিনি বললেন– যদি তোমরা আমার দিক থেকে আক্রান্ত হও তাহলে আমি কতই না নিকৃষ্ট কোরআন ধারণকারী।

এরপর তিনি শত্রুদের মোকাবিলা করতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। অবশেষে তিনি তাদের আক্রমণের শিকার হয়ে শাহাদাত বরণ করেন।

কিন্তু হযরত বারা বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর বীরত্বের দিকে তাকালে এই সকল মহান বীরদের বীরত্ব অনেক ক্ষুদ্র মনে হবে।

তা হচ্ছে, যখন হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু যুদ্ধের ময়দান অনেক উত্তপ্ত দেখলেন তিনি বারা বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে ডাক দিয়ে বললেন: হে আনসারী যুবক তুমি এদের দিকে যাও।

বারা বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর জাতির দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন। তিনি তাদেরকে বলতে লাগলেন- হে আনসার বাহিনী! তোমরা মদিনায় ফিরে যাওয়ার চিন্তাও করবে না। আজকের পর তোমাদের জন্য মদিনা বলতে কিছুই নেই; বরং তোমাদের জন্য এক আল্লাহ রয়েছেন.........

এরপর জান্নাত................

তারপর তিনি মুশরিকদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। তাঁর সাথে একযোগে আনসাররাও ঝাঁপিয়ে পড়ল। তিনি শত্রুদের কাতার ভেঙে সামনের দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন এবং তাঁর তরবারি দ্বারা শত্রুদের ঘাড়ে আঘাত করতে লাগলেন। আক্রমণ তীব্র হওয়ার কারণে মুশরিকরা পিছু হঠতে বাধ্য হলো। তারা তাদের বাগানে আশ্রয় নিল। যে বাগান ইতিহাসে মরণ বাগান নামে পরিচিত। কেননা সেখানে একত্রে অসংখ্য লোক মারা গিয়েছিল, যার তুলনা ইতিহাসে নেই।

এই বাগানটি চারদিকে উঁচু প্রাচীর দ্বারা ঘেরাও করা ছিল। তাই মুসায়লামা ও তার অনুগত সৈন্যরা এর ভেতরে ঢুকে ফটক বন্ধ করে দিল। বাগানের দেওয়ালটি সুউচ্চে তাই তারা এর ভেতরে দুর্গের মতো আশ্রয় নিল। তারা ভেতর থেকে মুসলমানদের দিকে বৃষ্টির মতো তীর নিক্ষেপ করতে লাগল; কিন্তু

www.pathagar.com

দরজা বন্ধ থাকায় মুসলমানরা তাদের ওপর কোনোভাবেই আক্রমণ করতে পারছিল না।

আর তখনি বারা বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এগিয়ে গিয়ে বললেন– হে আমার গোত্রের লোকেরা তোমরা আমাকে চাকতিতে বসাও, তারপর তা বর্শার দ্বারা উপরে তুলে আমাকে বাগানের ভেতরে দরজার নিকটে ছেড়ে দাও। হয় আমি শহীদ হয়ে যাব, অন্যথায় তোমাদের জন্য দরজা খুলে দিব।

চোখের পলকে বারা বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু চাকতিতে বসলেন। তিনি ছিলেন চিকন ও হালকা ওজনের মানুষ। তারপর ওই চাকতিটি দশটি বর্শা দ্বারা উপরে তুলে তাঁকে বাগানের ভেতরে মুসায়লামার হাজার হাজার সৈন্যের মাঝে ফেলে দিল। তিনি তাদের সামনে বজ্ররের ন্যায় পতিত হলেন। তিনি দরজার দিকে যাওয়ার চেষ্টা করতে লাগলেন। অন্যদিকে মুসায়লামার সৈন্যরা তাঁকে দেখে তাঁর দিকে তেড়ে আসে। তিনি তাদের দশ জন সৈন্যের ঘাড়ে তরবারি দ্বারা আঘাত করে তাদেরকে খতম করে দিলেন। অবশেষে তিনি দরজা খুলতে সক্ষম হলেন। এর মধ্যে তার শরীরে আশিটিরও বেশি তরবারি ও বর্শার আঘাত লাগে।

দরজা খোলার সাথে সাথে মুসলমানরা ধাক্কা দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল। এরপর তারা মুরদাত ও ইসলামের শত্রুদের মাথায় তরবারি দিয়ে আঘাত করতে থাকে। এমনকি সেখানে মুসলমানরা মুসায়লামার বিশ হাজারের কাছাকাছি সৈন্যকে হত্যা করে জাহান্নামে পাঠিয়ে দেয়। অবশেষে তারা মুসায়লামার নিকটে পৌঁছে গেল এবং তাকে হত্যা করে ধরাশায়ী করল।

হযরত বারা বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু-কে চিকিৎসা করার জন্য নিয়ে আসা হলো। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাঁর নিকটে এক মাস অবস্থান করেন। দীর্ঘ এক মাস পর আল্লাহ তাআলা তাঁকে সুস্থতা দান করেন। তাঁর সাহসী ভূমিকায় আল্লাহ তাআলা মুসলমানদেরকে ইয়ামামার যুদ্ধে বিজয় দান করেছিলেন।

হযরত বারা বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সর্বদা শাহাদাত লাভের আশায় বিভোর থাকতেন। যে শাহাদাতের কামনা তিনি ইয়ামামার যুদ্ধে করেছিলেন; কিন্তু সেদিন তার ভাগ্যে তা লিখা ছিল না। এ কারণে তিনি একের পর এক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে লাগলেন। তিনি আশা করতেন তিনি শহীদ হয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে মিলিত হবেন।

পারস্যের তুসতর নামক এলাকা বিজয়ের দিন পারস্যবাসী একটি মজবুত দুর্গে আশ্রয় নেয়। মুসলমানরা সেই দুর্গের চারদিক ঘেরাও করে।

যখন কাফেরদের ওপর যুদ্ধ করা কঠিন হয়ে দাঁড়ালো তখন তারা ওপর থেকে লোহার শিকলে বাঁধা উত্তপ্ত লাল টকটকে আংটা ফেলতে শুরু করল। সেই সকল

www.pathagar.com

লোহার আংটা যার গায়ে বিঁধে যেত সে হয় মারা যেত না হয় পঙ্গু হয়ে যেত। অবশেষে তারা আঘাতকৃত লোকটিকে মৃত বা পঙ্গু অবস্থায় তাদের নিকটে নিয়ে যেত এবং তাকে নির্মমভাবে অত্যাচার করে হত্যা করত।

এমন একটি লোহার টুকরা বারা বিন মালিক -এর ভাই আনাস -এর উপরে পতিত হলো। তিনি তা দেখে দেওয়ালের দিকে লাফ দিলেন এবং সে লোহার আংটাটি ধরে ফেললেন। এতে তাঁর হাত পুড়ে গিয়ে হাতের গোস্ত খসে পড়তে লাগল; কিন্তু তিনি সেদিকে কোনো ভ্রুক্ষেপই করলেন না; বরং তিনি তাঁর ভাইকে মুক্ত করে নিয়ে আসেন। আর তখন তাঁর হাতে কোনো গোশত বাকি ছিল না। গোশতগুলো খসে পড়ে হাড্ডিগুলো ভেসে উঠল।

এই যুদ্ধে তিনি আল্লাহর নিকটে দোয়া করেছেন আল্লাহ যেন তাঁকে শাহাদাত দান করেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর দোয়া কবুল করেন এবং তাকে শহীদী মৃত্যু দান করেন।

আল্লাহ তাআলা হযরত বারা বিন মালিক -এর চেহারাকে জান্নাতে উজ্জ্বল করুক এবং রাসূলুল্লাহ -এর সহবতে তাঁর চক্ষু শীতল করুক। তিনি তাঁর ওপর সন্তুষ্ট হন এবং তাঁকে সন্তুষ্ট করুন।

১০. হযরত আব্দুল্লাহ বিন জাহ্‌স-এর শাহাদাত

যে সকল সাহাবী থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে আব্দুল্লাহ বিন জাহ্‌স তাঁদের মধ্যে একজন। ইসলামের প্রথম যুগে যাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তিনি তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন।

তিনি রাসূলুল্লাহ -এর ফুফাতো ভাই ছিলেন। কেননা আব্দুল মুত্তালিবের কন্যা উমাইমা ছিলেন তাঁর মাতা। যিনি রাসূলুল্লাহ -এর আপন ফুফু ছিলেন।

অন্যদিকে তিনি রাসূলুল্লাহ -এর শ্যালক ছিলেন। কেননা তাঁর বোন যায়নাব বিনতে জাহ্‌স রাসূলুল্লাহ -এর পবিত্র স্ত্রীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন।

তাছাড়াও হযরত আব্দুল্লাহ বিন জাহ্‌স ইসলামের ঝাণ্ডা বহনকারী প্রথম যোদ্ধা ছিলেন।

তিনি সেই ব্যক্তি যাকে সর্বপ্রথম আমীরুল মুমিনীন বলে ডাকা হয়।

রাসূলুল্লাহ দারুল আরকামে প্রবেশ করার পূর্বে আব্দুল্লাহ বিন জাহ্‌স ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি প্রথম ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন।

কোরাইশদের অত্যাচার বেড়ে গেলে রাসূলুল্লাহ মুসলমানদেরকে দ্বীন বাঁচানোর জন্যে মদিনায় হিজরত করতে অনুমতি প্রদান করলেন। আব্দুল্লাহ বিন জাহ্‌স রাসূলুল্লাহ -এর অনুমতি পেয়ে মদিনায় হিজরত করেন। তিনি হিজরতকারীদের মধ্যে দ্বিতীয় ব্যক্তি। তাঁর পূর্বে শুধু আবু সালামা হিজরত

www.pathagar.com

করেছিলেন; কিন্তু ঘর-বাড়ি, পরিবার-পরিজন ত্যাগ করে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে হিজরত করা তাঁর অপরিচিত ছিল না। কেননা মদিনায় হিজরত করার পূর্বে তিনি হাবশায়ও হিজরত করেছিলেন। তাই মদিনায় হিজরত করার সময় হিজরত করার কষ্ট তাঁর জন্য নতুন ছিল না। তাঁর হাবশায় হিজরত ছিল একাকি; কিন্তু মদিনায় হিজরত ছিল অনেক ব্যাপক। কারণ তখন তাঁর সাথে তাঁর বাবার সকল সন্তান, ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতনী ও দাস-দাসীসহ পুরো পরিবারের সকলে একত্রে মদিনায় হিজরত করেন। তাঁর পরিবারটি ছিল একটি ইসলামী পরিবার। যে পরিবারের সকলে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

বদরের পর উহুদের যুদ্ধে তাঁর ও তাঁর সাথি সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর সাথে ঘটে যাওয়া সেই ঘটনা যা ভুলে যাওয়ার মতো নয়। সে ঘটনা হযরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন। তিনি বলেন– ওহুদের যুদ্ধের পূর্বমুহূর্তে হযরত আব্দুল্লাহ বিন জাহ্স আমার সাথে দেখা করে বলে- তুমি আল্লাহর কাছে দোয়া করবে না?

আমি বললাম– অবশ্যই করব।

তারপর আমরা এককোণে গিয়ে দোয়া করলাম, আমি বললাম– হে আমার প্রতিপালক! আমি যখন শত্রুর সম্মুখীন হব আপনি আমার সাথে এক শক্তিশালী ব্যক্তিকে সাক্ষাৎ করাবেন যে খুব সাহসী এবং খুব রাগী, আমি তার সাথে লড়াই করব এবং সে আমার সাথে লড়াই করবে। এরপর তাকে পরাজিত করার জন্য তুমি আমাকে সাহায্য করবে, এতে আমি তাকে হত্যা করব এবং তার থেকে গনিমত নিয়ে নিব। দোয়া শেষে হযরত আব্দুল্লাহ বিন জাহ্স আমীন বলেন।

এরপর আব্দুল্লাহ বিন জাহ্স দোয়া করতে লাগলেন- হে আল্লাহ! আমার সাথে এক শক্তিশালী ব্যক্তিকে সাক্ষাৎ করাবেন যে খুব সাহসী এবং প্রচণ্ড রাগী, আমি তার সাথে লড়াই করব আর সে আমার সাথে লড়াই করবে। এরপর সে আমাকে ধরে ফেলবে এবং আমার নাক-কান কেটে ফেলবে। যখন আমি কিয়ামতের দিন তোমার সাথে সাক্ষাৎ করব তুমি বলবে– তোমার নাক কান কেন কাটা হয়েছে? আমি বলব- তোমার জন্য এবং তোমার রাসূলের জন্য।

তুমি বলবে– তুমি সত্য বলেছ।

হযরত সা'দ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন–

আমার দোয়া থেকেও আব্দুল্লাহ বিন জাহসের দোয়া উত্তম ছিল। আমি দিনের শেষে দেখেছি সে নিহত হয়েছে এবং তার নাক-কান কেটে ফেলা হয়েছে। তার নাক ও কান একটি গাছের ডালে সুতা দিয়ে ঝুলানো ছিল।

www.pathagar.com

আল্লাহ তাআলা হযরত আব্দুল্লাহ বিন জাহসের দোয়া কবুল করেছেন এবং তাঁকে শহীদি মর্যাদা দান করেছেন যেমনিভাবে তাঁর মামা হযরত হামজা (রা.)-কে দান করেছেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে ও হযরত হামজা (রা.)-কে একই কবরে দাফন করেন। তখন তাঁর অশ্রু শাহাদাতের সুঘ্রাণে ভরা কবরকে সিক্ত করেছে।

১১. হযরত আব্দুল্লাহ বিন উম্মে মাকতুম (রা.)-এর শাহাদাত

হযরত আব্দুল্লাহ বিন উম্মে মাকতুম মক্কায় বসবাস করতেন। ইসলামের প্রথমদিকে আল্লাহ তাঁর হৃদয় খুলে দিয়েছেন। আর তাই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি ইসলামের প্রথম যামানায় ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে একজন ছিলেন।

তিনি মক্কায় অন্যান্য মুসলমানদের মতো কষ্ট সহ্য করে বসবাস করেছিলেন। ইসলামের জন্য কোরাইশদের শত নির্যাতন ও শাস্তি সহ্য করেছিলেন; কিন্তু কোরাইশদের শত নির্যাতনেও তাঁর ঈমানীশক্তি একটুও কমত না; বরং তা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেত।

যতই দিন যেত ততই তিনি ইসলামের প্রতি আরো বেশি আকৃষ্ট হতেন। আল্লাহর কিতাবের সাথে তার সম্পর্ক আরো বেশি বৃদ্ধি পেত। শরীয়ত সম্পর্কে জানার আগ্রহ বৃদ্ধি পেত। আর তাই তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে বেশি বেশি গমন করতেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন কোরাইশদের বড় বড় নেতাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান করার প্রতি অধিক আগ্রহী ছিলেন এবং তাদেরকে নিয়ে খুব ব্যস্ত ছিলেন।

আর এরপর আল্লাহ তাআলা আব্দুল্লাহ বিন উম্মে মাকতুম (রা.)-এর শানে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওপর অহী নাযিল করেন। তার শানে নাযিলকৃত আয়াত-

عَبَسَ وَتَوَلَّىٰٓ أَن جَآءَهُ ٱلْأَعْمَىٰ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُۥ يَزَّكَّىٰٓ أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ ٱلذِّكْرَىٰٓ أَمَّا مَنِ ٱسْتَغْنَىٰ فَأَنتَ لَهُۥ تَصَدَّىٰ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّىٰ وَأَمَّا مَن جَآءَكَ يَسْعَىٰ وَهُوَ يَخْشَىٰ فَأَنتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ كَلَّآ إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَن شَآءَ ذَكَرَهُۥ فِى صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍۭ بِأَيْدِى سَفَرَةٍ كِرَامٍۭ بَرَرَةٍ

হযরত আব্দুল্লাহ বিন উম্মে মাকতুম ছিলেন প্রথম সারীর হিজরতকারীদের মধ্যে অন্যতম।

বদরের যুদ্ধের পর আল্লাহ তাআলা মুজাহিদ ও শহীদদের মর্যাদা বর্ণনা করে আয়াত নাযিল করেন। আল্লাহ তাআলা মুজাহিদ ও শহীদদেরকে উৎসাহিত

www.pathagar.com

করার জন্য তাঁদের উচ্চ মর্যাদার কথা বর্ণনা করেন এবং যারা যুদ্ধ না করে ঘরে বসে ছিল তাদের নিন্দা করেন। এই আয়াতগুলো আব্দুল্লাহ বিন উম্মে মাকতুম রাদিআল্লাহু আনহা-এর অন্তরে খুব লাগে এবং এই মহান মর্যাদাপূর্ণ ইবাদত করতে না পেরে তিনি আফসোস করতেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বললেন– হে আল্লাহর রাসূল! যদি আমি জিহাদ করতে সক্ষম হতাম তাহলে অবশ্যই আমি জিহাদ করতাম।

তিনি আল্লাহর কাছে দোয়া করতেন– হে আল্লাহ! তুমি আমার ওযরের ব্যাপারে কোরআনের আয়াত নাযিল কর। অবশেষে আল্লাহ তাআলা তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাঁর ও অন্যান্য যাদের ওযর ছিল তাদের সম্পর্কে আয়াত নাযিল করলেন।

অহী লেখক হযরত জায়েদ বিন সাবিত রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু বলেন–

আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পাশে ছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্থির হয়ে যান এবং তার উরু আমার উরুতে এসে লাগে। এতে আমি ভারী কিছুর অনুভব করতে পারলাম। তারপর তিনি স্বাভাবিক হলেন। তিনি আমাকে বললেন– লেখ, তারপর তিনি নাযিলকত কোরআনের আয়াত তেলাওয়াত করলেন।

لَّا يَسْتَوِى ٱلْقَـٰعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُجَـٰهِدُونَ فِى سَبِيلِ ٱللّٰهِ

অনুবাদ-

"মুমিনদের মধ্যে যারা বসেছিল আর যারা জিহাদ করেছিল তারা সমান নয়............"[সূরা নিসা-৯৫]

এই আয়াত শুনার পর আব্দুল্লাহ বিন উম্মে মাকতুম রাদিআল্লাহু আনহা দাঁড়িয়ে বললেন– তাহলে তার কি হবে যে জিহাদ করতে সক্ষম না?

তাঁর কথা শেষ না হতেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার স্থীর হয়ে যান এবং আবার তার উরু আমার উরুতে লাগে এতে আমি প্রথম বারের মতো ভারী কিছুর অনুভব করলাম। এরপর তিনি স্বাভাবিক হলেন।

তিনি আমাকে বললেন– হে জায়েদ যা লিখেছ তা পাঠ কর।

আমি পাঠ করলাম-

لَّا يَسْتَوِى ٱلْقَـٰعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ............

তিনি আয়াতটি তেলাওয়াত করে বললেন– লেখ, তারপর তিনি আয়াতের পরবর্তী অংশ তেলাওয়াত করলেন।

غَيْرُ أُوْلِى ٱلضَّرَرِ

অনুবাদ- "অক্ষম ব্যক্তিরা ব্যতীত........"

www.pathagar.com

পূর্ণ আয়াটি-

لَّا يَسْتَوِي ٱلْقَٰعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُو۟لِى ٱلضَّرَرِ وَٱلْمُجَٰهِدُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ

অর্থ- "মুমিনদের মধ্যে যারা বসেছিল আর যারা জিহাদ করেছিল তারা সমান নয়, তবে ওযরযুক্ত ব্যক্তিরা ব্যতীত..........."[সূরা নিসা-৯৫]

জিহাদ না করে ঘরে বসে থাকা লোকদের নিন্দা করার পর আল্লাহ তাআলা ওযরযুক্ত লোকদেরকে এই নিন্দা থেকে বাদ দিয়ে হযরত আব্দুল্লাহ বিন উম্মে মাকতুম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু-এর আকাঙ্ক্ষা পুরো করলেন।

আল্লাহ তাআলা তাঁর জন্যে ও তাঁর মতো অন্যান্য লোকদের জন্যে জিহাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত রহিত করে দিলেন। তিনি অন্ধ, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি বসে থাকতে রাজি ছিলেন না। তিনি জিহাদ করার পূর্ণ প্রতিজ্ঞা করেন। কেননা তার আত্মা এত বড় ছিল যে, অন্ধত্ব তাঁকে জিহাদ থেকে বিরত রাখতে পারেনি।

সেদিন থেকে তিনি একটি যুদ্ধও ছাড়তে চাননি। তিনি জিহাদের জন্য অস্ত্র প্রস্তুত করেন। তিনি বলতেন: তোমরা আমাকে দুই সারির মাঝে দাঁড় করিয়ে দাও। আর আমার হাতে পতাকা দাও আমি তা বহন করব। আমি তা হেফাজত করব। কেননা আমি অন্ধ, আমি পালিয়ে যেতে পারব না।

চতুর্দশ হিজরীতে হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু পারস্য রাজ্য আক্রমণ করার সংকল্প করেন এবং সেদেশ দখল করতে চান। আর তাই তিনি প্রতিটি শহরের আমীরের নিকটে চিঠি লিখেন যে, যার যার অস্ত্র, অশ্ব, বীরত্ব ও বুদ্ধি আছে তাদেরকে নিয়ে অতিদ্রুত আমার নিকটে পাঠিয়ে দাও।

মুসলমানরা বিভিন্ন অঞ্চল থেকে হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু-এর ডাকে সাড়া দিয়ে মদিনায় এসে জমা হতে লাগল। আর এই মুজাহিদ বাহিনীদের মধ্যে আব্দুল্লাহ বিন মাকতুমও একজন ছিলেন।

হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হযরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু-কে তাঁদের আমীর বানালেন। তিনি তাঁকে বিভিন্ন বিষয়ে উপদেশ দিয়ে বিদায় জানালেন।

সৈন্যবাহিনী কাদেসিয়া নামক স্থানে পৌঁছার পর হযরত আব্দুল্লাহ বিন উম্মে মাকতুম তাঁর বর্ম পরিধান করে পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে এলেন এবং যুদ্ধে মুসলমানদের পতাকা বহন করার দায়িত্ব নিয়ে তা আমরণ হেফাজত করার প্রতিজ্ঞা করলেন।

উভয় দল এই কঠিন তিনটি দিন যুদ্ধ চালিয়ে যায়। উভয় দলের মধ্যে এমন যুদ্ধ চলে যা ইতিহাস আর কখনো দেখেনি। অবশেষে আল্লাহর সাহায্যে মুসলমানদের সাহসী আক্রমণে কাফেররা পিছু হটতে বাধ্য হয়। আর বিশাল এই

রাজ্য মুসলমানদের হাতে চলে আসে। এতে পতন হয় একটি অহংকারী রাজ্যের। আর একটি শক্তিশালী রাজ্যে তাওহীদের পতাকা উঁচু হয়।

কিন্তু এই বিজয় এমনি এমনি আসেনি; বরং তা শত শহীদের রক্তের বিনিময়ে এসেছে। আর সেই শহীদি কাফেলার একজন ছিলেন হযরত আব্দুল্লাহ বিন উম্মে মাকতুম। যুদ্ধে শেষে তাঁকে রক্তাক্ত অবস্থায় রণাঙ্গনে পাওয়া গেল। তিনি শহীদ হয়ে গেছেন তবু তাওহীদের পতাকাকে জড়িয়ে ধরে রেখেছেন।

আল্লাহ তাআলা তাঁকে উত্তম প্রতিদান দান করুক। আমীন।

১২. হযরত জায়েদ বিন হারেসা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু-এর শাহাদাত

সু'দা বিনতে সা'লাবা তার গোত্র বনূ মাআন সাথে সাক্ষাৎ করার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছেন। তিনি তার সাথে তার পুত্র জায়েদ বিন হারেসাকে সাথে নিলেন। তিনি তার পুত্রকে নিয়ে তার গোত্রের নিকটে না পৌঁছতেই হঠাৎ করে বনূ কায়নের কিছু লোক তাদের ওপর আক্রমণ করে এবং তাদের সব মালামাল ও বাচ্চাদেরকে তুলে নিয়ে গেল।

ওই সকল বাচ্চাদের মধ্যে হযরত জায়েদ বিন হারেসাও একজন ছিলেন।

তখন হযরত জায়েদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মাত্র আট বছরের বালক ছিলেন। তাঁকে উকায মেলায় বিক্রি করার জন্য আনা হলো। কোরাইশী সম্পদশালী নেতাদের মধ্যে একজন নেতা যার নাম হাকিম বিন হাজাম বিন খুওয়াইলাদ তাঁকে চারশত দেরহামে ক্রয় করেন। তিনি তাঁর সাথে আরো কয়েকটি গোলাম ক্রয় করেন।

যখন তাঁর ফুফু হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা তাঁর আগমনের কথা শুনতে পেলেন তিনি তাঁকে মারহাবা জানাতে লাগলেন।

তিনি তাঁর ফুফুকে বললেন– হে আমার ফুফু, আমি উকায মেলা থেকে কয়েকটি গোলাম ক্রয় করেছি সুতরাং এদের মধ্যে আপনার যাকে পছন্দ হয় তা আপনার জন্য উপহার।

হযরত খাদিজা গোলামদের চেহারার দিকে তাকালেন। তারপর তিনি জায়েদ বিন হারেসাকে পছন্দ করলেন। কেননা তিনি তাঁর মধ্যে বুদ্ধিমত্তার ছাপ দেখতে পেলেন।

এর কিছুদিন যাওয়ার পর তিনি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে কিছু হাদিয়া দিতে চাইলেন; কিন্তু জায়েদ বিন হারেসার মতো উত্তম অন্য কিছু আর তিনি পেলেন না। আর তাই তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এই গোলামটি হাদিয়া দিলেন।

হযরত জায়েদ বিন হারেসা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ছোটবেলা থেকে শ্রেষ্ঠ মানব হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্নেহ ও আদর্শে বড় হতে লাগলেন। ওই দিকে তাঁর মা তাঁকে হারিয়ে

www.pathagar.com

তার দুই চোখে ঘুম নেই এবং তিনি তাঁর চিন্তাই কখনো শান্তিতে বিছানায় পিঠ লাগাতে পারছিলেন না। দুই চোখের পানিতে তার বুক ভেসে যেত। সন্তান হারানোর কষ্টে তিনি পাগলের মতো হয়ে গেলেন। এক হজ্বের মওসুমে জায়েদের গোত্রের এক দল লোক হজ্ব করার উদ্দেশ্যে মক্কার দিকে রওয়ানা দিল। তারা তাওয়াফ করার সময় হঠাৎ করে জায়েদ তাদের সম্মুখে পড়েন। তারা তাকে চিনতে পারে এবং তিনিও তাদেরকে চিনতে পারেন। তারা হজ্বের কাজ শেষ করে বাড়িতে ফিরে গেলে তাঁর বাবাকে গিয়ে তাঁর কথা বলে।

অষ্টম হিজরীতে আল্লাহ তাআলা তাঁর ইচ্ছায় দুই ভালোবাসার মাঝে পরীক্ষা করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত হারিস বিন উমাইরকে ইসলামের দাওয়াতের একটি চিঠি দিয়ে বসরার সম্রাটের নিকটে প্রেরণ করেন। যখন তিনি মুতা নামক জায়গায় পৌঁছেন তখন তিনি গসাসেনার এক আমীরের নিকটে চিঠিটি প্রদান করেন। সে তাঁকে বন্দি করে এবং কঠিনভাবে বেঁধে তাঁর ঘাড়ে বেদম প্রহার করে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ব্যাপারটি অনেক কষ্ট দিল। কেননা তাঁকে ব্যতীত আর কোনো দূতকে কেউ হত্যা করেনি। আর তাই তিনি একদল সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করেন এবং জায়েদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু-কে তাদের আমীর বানান। তারপর তিনি বলেন− যদি জায়েদ যুদ্ধে শহীদ হয় তাহলে জাফর বিন তালিব দায়িত্ব নিবে। জাফর যুদ্ধে শহীদ হলে আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহা দায়িত্ব নিবে। আব্দুল্লাহ যুদ্ধে শহীদ হলে মুসলমানগণ নিজেদের আমীর নিজেরা ঠিক করে নিবে।

মুজাহিদ বাহিনী যেতে যেতে মাআন নামক স্থানে পৌঁছেন। ওইদিকে হিরাকলিয়াস মুসলমানদের থেকে গসাসেনা রক্ষা করার জন্য নিজেদের এক লাখ সৈন্য জমা করে এবং তাদের সাথে আরব মুশরিকদের এক লাখ লোক জমা করে। তারা মুসলমানদের অতি নিকটে অবস্থান নেয়। তারপর দুই বাহিনী যুদ্ধে লিপ্ত হলো। মুসলমানরা এত বেশি সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করতে লাগল এর তুলনা ইতিহাসে নেই। তাদের দুই লাখ সৈন্যের মাঝে মুসলমানদের তিন হাজার সৈন্যের প্রভাব এত ছিল যে, শত্রুবাহিনীর অন্তর ভয়ে কাঁপতে লাগল। ওই দিকে হযরত জায়েদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বীরের মতো লড়তে লাগলেন। তাঁর দেহ অন্তত একশতেরও বেশি তীরের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হলো। অবশেষে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। তার শহীদী রক্তে জমিন লাল হয়ে গেল।

তিনি শহীদ হয়ে গেলে হযরত জাফর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ইসলামের ঝাণ্ডা হাতে নেন। তিনিও শ্রেষ্ঠ বীরত্ব দেখিয়ে শহীদ হয়ে যান।

তারপর হযরত আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহা ইসলামের ঝাণ্ডা হাতে নেন। তিনিও শহীদ হয়ে যান।

www.pathagar.com

তারপর মুসলমানগণ খালেদ বিন ওয়ালিদের হাতে ইসলামের ঝাণ্ডা দেন। তিনি মুসলমান সৈন্যবাহিনীকে সাজিয়ে নিয়ে কাফেরদের ওপর তীব্র আক্রমণ করেন। এতে কাফেরদের পায়ের নিচে মাটি সরে গেল। তারা শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করল।

ওই দিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ জায়েদ, জাফর ও আব্দুল্লাহর শাহাদতের কথা জানতে পেরে খুব চিন্তিত হলেন। তিনি এত বেশি চিন্তিত আর কখনো হননি।

যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ জায়েদ (রা.)-এর বাড়িতে পৌছলেন তাঁর ছেলে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে কাঁদতে কাঁদতে ছুটে আসল। রাসূলুল্লাহ ﷺ-ও কাঁদতে শুরু করলেন এমনকি তাঁরা চিৎকার দিয়ে কান্না শুরু করলেন।

তখন সা'দ বিন উবাদাহ্ রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন– আপনি এমন কান্নার কারণ কি? তিনি বললেন– এ হচ্ছে ভালোবাসার জন্য ভালোবাসার কান্না।

১৩. হযরত জাফর বিন আবু তালিব (রা.)-এর শাহাদাত

বনূ আবদে মানাফ গোত্রের পাঁচজন লোক ছিলেন যাদের সাথে চেহারাগতভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে অধিক সাদৃশ্য ছিল। অনেক সময় দূর থেকে দেখলে তাদের মধ্যে কে মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ্ তা চিনতে কষ্ট হয়ে যেত।

হযরত জাফর (রা.) ও তাঁর স্ত্রী ইসলামের সূচনা কালেই ঈমানের পথে পা বাড়ান। রাসূলুল্লাহ ﷺ দারুল আরকামে প্রবেশ করার পূর্বে তাঁরা দুইজন আবু বকর (রা.)-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন।

এই হাসিমী যুবককে অন্যান্য নওমুসলিমদের মতো অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে। তিনি সকল কষ্টকে হাসিমুখে বরণ করে নিয়েছেন, কেননা তিনি জানতেন জান্নাতের পথ কাঁটা বিছানো। সুতরাং জান্নাতে যেতে চাইলে একটু কষ্ট করতে হবেই। কোরাইশরা তাঁর মাঝে ও মুসলমানদের মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে লাগল। তাঁরা মুসলমানদেরকে শান্তি মতো ইবাদত করতে দিত না। প্রতিটি রাস্তায় তারা পাহারা দিত।

এ কঠিন অবস্থায় তিনি ও তাঁর স্ত্রী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকটে হাবশা হিজরত করার অনুমতি চাইলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদেরকে অনুমতি দিলেন।

তাঁদেরকে ঘর-বাড়ি ছেড়ে যেতে দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মনে খুব দুঃখ লাগল। অথচ কোনো অপরাধ তাদের নেই, একটাই অপরাধ তারা ইসলাম গ্রহণ করেছে; কিন্তু তারা সংখ্যায় কম ও শক্তিতে দুর্বল হওয়ার কারণে এ অত্যাচার প্রতিরোধ করতে সক্ষম হননি।

অষ্টম হিজরীতে রাসূলুল্লাহ ﷺ রোমদের বিরুদ্ধে একটি বাহিনী তৈরি করেন। তিনি জায়িদ বিন হারিসাকে এ বাহিনীর দায়িত্ব দিয়ে বললেন: যদি জায়িদ বিন

www.pathagar.com

হারিসা শহীদ হয় তাহলে জাফর বিন আবু তালিব দায়িত্ব নিবে আর জাফর শহীদ হলে আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহা দায়িত্ব নিবে। আর আব্দুল্লাহ শহীদ হলে মুসলমানরা তাদের আমীর নির্ধারণ করে নিবে।

মুসলমানগণ মুতা নামক স্থানে পৌঁছার পর দেখল রোমদের সৈন্য সংখ্যা ছিল এক লাখ এবং তাদের সাথে আরব খ্রিস্টানদের আরো এক লাখ সৈন্য ছিল।

আর অন্যদিকে মুসলমানদের সৈন্য সংখ্যা ছিল মাত্র তিন হাজার।

দুই বাহিনীর যুদ্ধ শুরু হলো, ধীরে ধীরে যুদ্ধের উত্তাপ বাড়তে লাগল। হযরত জায়িদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু যুদ্ধ করতে করতে এক সময় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন।

তারপর জাফর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু জিহাদের ঝাণ্ডা তুলে নিলেন। তিনি তীব্র আক্রমণ করে সামনের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তিনি শত্রুবাহিনীর ভেতরে ঢুকে পড়েন। শত্রুরা তাঁর ডান হাত কেটে ফেলে এতে তিনি বাম হাতে ইসলামের ঝাণ্ডা তুলে নেন। তারা তাঁর বাম হাতও কেটে ফেলে তখন তিনি তাঁর বুকের ওপর দুই বাহুর মাধ্যমে ঝাণ্ডা তুলে নেন। তারপর তারা তৃতীয় আঘাতটি করে এতে তাঁর দেহ দুই খণ্ড হয়ে গেল। তিনি তাঁর মহান রবের নিকটে চলে গেলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাফর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু শহীদ হওয়ার খবর জানতে পেরে খুব বেশি চিন্তিত হলেন। তিনি তাঁর চাচাতো ভাই জাফরের বাড়ির দিকে গেলেন। তিনি তার বাড়িতে গিয়ে তার স্ত্রীকে দেখতে পেলেন সে জাফরের জন্যে সেজেগুজে অপেক্ষা করছিল। সে নিজেও তার সন্তানদেরকে গোসল করিয়ে পোশাক-পরিচ্ছেদ পরিধান করাল।

হযরত আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আমাদের দিকে আসছিলেন আমি তাঁর চেহারায় দুশ্চিন্তার ছাপ দেখতে পেলাম। আর এতে আমার মনে ভয়ের উদ্রেক হয়। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জাফর সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস করতে পারছি না এ ভয়ে যদি এমন কোনো খবর শুনি যা আমি কামনা করছি না। তিনি আমাদেরকে অভিবাদন জানিয়ে বললেন– আমার নিকটে জাফরের সন্তানদেরকে নিয়ে আস।

আমি তাদেরকে ডেকে দিই। তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকটে খুশি হয়ে ছুটে যায়। তারা তাঁর নিকটে ভিড় করতে লাগল এবং প্রত্যেকে নিজেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অধিক নিকটে যেতে চেষ্টা করল।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের দিকে ঝুঁকে পড়ে তিনি তাদের ঘ্রাণ নিতে লাগলেন আর তাঁর চোখ থেকে পানি ঝরছিল। আমি বললাম– হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনি কেন কাঁদছেন? আপনার নিকটে কি জাফর ও তাঁর সাথিদের ব্যাপারে কোনো সংবাদ এসেছে? তিনি বললেন– হ্যাঁ। তারা আজ শহীদ হয়েছে। বাচ্চারা যখন

www.pathagar.com

দেখল তাদের মা কান্না শুরু করল তখন তাদের হাসি হারিয়ে গেল। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর চোখের পানি মুছতে মুছতে চলে যেতে লাগলেন আর বললেন– আমি জাফরকে জান্নাতে দেখেছি, তার রক্তমাখা দুটি ডানা রয়েছে এবং তার পাগুলো রক্তে রঞ্জিত।

১৪. হযরত জুল বিজাদাইন رضي الله عنه-এর শাহাদাতের মর্যাদা লাভ

এ যুবক সাহাবী নিজের ইসলাম গ্রহণের কথা তাঁর গোত্রের লোকদের কাছে গোপন রেখেছেন। বিশেষ করে তাঁর চাচার কাছে গোপন রেখেছেন। তিনি মানুষের থেকে অনেক দূরে পাহাড়ের এক পাশে গিয়ে গোপনে ইবাদত করতেন।

তিনি আশা করতেন তাঁর চাচা একদিন ইসলাম গ্রহণ করবেন। আর সেই দিন তিনি তাঁর ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করবেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে দেখা করার জন্যে মদিনায় যাবেন।

কিন্তু অনেক দিন পার হয়ে যাওয়ার পরেও তাঁর চাচা মুসলমান হল না। তিনি দেখলেন তাঁর চাচা ইসলাম থেকে অনেক দূরে.......। তাছাড়া তাঁর অপেক্ষায় তাঁকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহবত থেকে দূরে থাকতে হচ্ছে। আর তাই তিনি তাঁর চাচার নিকটে গিয়ে বললেন– হে চাচা! আমি আপনার ইসলাম গ্রহণের অপেক্ষায় ছিলাম; কিন্তু এখন আমার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেছে। যদি আপনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং আল্লাহ আপনাকে সৌভাগ্যবান করে থাকেন তাহলে আপনি যা করবেন তা অনেক উত্তম। আর যদি অন্যকিছু হয় তাহলে আমাকে অনুমতি দিন আমি আমার ইসলাম গ্রহণের কথা মানুষের মাঝে প্রকাশ করি।

তাঁর কথাগুলো চাচার কানে পৌছার সাথে সাথে তিনি রাগান্বিত হয়ে বললেন– আমি লাত ও উজ্জার নামে শপথ করে বলছি, যদি তুমি ইসলাম গ্রহণ করে থাকো তাহলে আমি তোমাকে যা কিছু দিয়েছি সব কিছু ছিনিয়ে নিয়ে যাব এবং তোমাকে গরিব অবস্থায় ছেড়ে দিব। আর অবশ্যই আমি তোমাকে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যতার মাঝে ফেলে দিব; কিন্তু এ ধমক তাঁকে ইসলাম থেকে বিরত রাখতে পারেনি........। পারেনি তাঁর ইচ্ছাশক্তিকে দমন করতে।

তাঁর চাচা তার গোত্রের লোকদেরকে ডেকে তাঁর ব্যাপারে সাহায্য চাইল। তিনি তাঁকে বুঝানো ও ধমকানোর কথা বলল; কিন্তু এ যুবক বললেন– তোমরা যা ইচ্ছা কর, আল্লাহর শপথ! আমি মুহাম্মদের অনুসারী এবং পাথরের পূজা বর্জনকারী। আর আমি সেই একক রবের দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। সুতরাং তোমাদের ও আমার চাচার যা হবার হোক।

www.pathagar.com

তার এমন কথায় তাঁর চাচা তাঁর থেকে সবকিছু কেড়ে নিল এবং তিনি তাঁকে সব ধরনের সাহায্যসহযোগিতা বন্ধ করে দিল। এমনকি তাঁর চাচা তাঁর পরনের কাপড় ব্যতীত সবই নিয়ে গেল।

এ যুবক ইসলামের জন্যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উদ্দেশ্যে হিজরতে রওয়ানা হলেন এবং তাঁর শৈশব ও বাল্যকালের সকল স্মৃতি ও তাঁর সকল ধন-সম্পদ পিছনে ফেলে আসলেন।

তিনি তাঁর চাচার অঢেল সম্পত্তি ও বিলাসিতা প্রত্যাখান করে আল্লাহর নিকটে আখেরাতকে পাওয়ার আশা করলেন। তিনি মদিনার দিকে দ্রুত পা বাড়াতে লাগলেন। তিনি প্রতিটি কদম মদিনার দিকে বাড়াচ্ছেন, অন্যদিকে তাঁর অন্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দিদার পেতে ব্যাকুলতা আরো বাড়তে থাকে। যখন তিনি মদিনার নিকটবর্তী হলেন তখন তাঁর কাপড় দুই টুকরো হয়ে গেল। এতে তিনি কাপড়ের এক টুকরো পরে নিলেন আরেক টুকরো গায়ে দিলেন। এরপর তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মসজিদে গমন করেন এবং মসজিদেই সে রাতটি কাটিয়ে দিলেন।

সকাল হলে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ঘরের দরজার নিকটে অবস্থান করলেন যাতেকরে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পবিত্র চেহারা দেখতে পান। রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ঘর থেকে বের হতে দেখে তাঁর চোখ থেকে পানি ঝর ঝর করে ঝরতে লাগল।

ফজরের নামাজ শেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর স্বভাব মত প্রত্যেককে দেখতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর তাঁর নজর সেই যুবকের দিকে পড়ল। তিনি বললেন– তুমি কোথায় থেকে এসেছ?

হযরত যুল বিজাদাইন তাঁর পরিচয় বললেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন– তোমার নাম কি?

তিনি বললেন– আব্দুল উজ্জা।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন– বরং তোমার নাম আব্দুল্লাহ।

তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর নিকটবর্তী হয়ে বললেন– তুমি আমাদের কাছে থাকো এবং আমাদের মেহমানদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও। সে দিন থেকে মানুষ তাঁকে আব্দুল্লাহ বলে ডাকতে লাগলো। আর সাহাবায়ে কেরামগণ তাঁকে জুল বিজাদাইন উপাধি দিলেন, কেননা তাঁরা তাঁর গায়ে দুইটি কাপড়ের টুকরা দেখতে পেলেন যাকে আরবীতে বিজাদাইন বলে। আর এ কারণে তিনি এ নামেই ইতিহাসে পরিচিতি লাভ করেন।

তাবুকের যুদ্ধে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকটে দোয়া চাইলেন, তিনি যাতে তাঁর জন্যে শাহাদাতের দোয়া করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ দোয়া করলেন- আল্লাহ

www.pathagar.com

যেন তাঁর রক্তকে কাফেরদের তরবারি থেকে হেফাযত করে। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বললেন– আমার পিতামাতা আপনার জন্য কোরবানি হউক! আমি তা চাইনি। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন– তুমি যখন গাজী হয়ে আল্লাহর রাস্তায় বের হবে যদি তুমি পথে অসুস্থ হয়েও মারা যাও তাহলেও তুমি শহীদ। যদি তোমার বাহন তোমার অবাধ্য হয় এতে তুমি বাহন থেকে পড়ে মারা যাও তাহলেও তুমি শহীদ।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এ হাদীস বর্ণনা করার পর একদিন একরাত না যেতেই এ যুবককে জ্বরে আক্রান্ত করে। তিনি এ জ্বর অবস্থা মারা গেলেন। তিনি আল্লাহর রাস্তায় মুহাজির অবস্থায় মারা গেছেন। তিনি তাঁর পরিবার ও এলাকা থেকে অনেক দূরে মারা গেছেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর এ কর্মের উত্তম প্রতিদান দান করেছেন। সাহাবায়ে কেরাম তাঁর পবিত্র কবর খনন করেছেন। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বয়ং নিজে তাঁর কবরে নেমেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু বকর ও উমরকে বললেন– তোমাদের ভাইকে আমার নিকটে দাও। তারা দুইজন তাঁকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকটে দিলেন। তারপর তিনি নিজ হাতে তাঁকে কবরে রাখলেন। হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ এ ঘটনার সময়ে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলতেন– হায় আফসোস! যদি আমি সেই কবরের অধিবাসী হতাম। আল্লাহর শপথ! আমি তাঁর জায়গায় হওয়ার আশা করতাম, যদিও আমি তাঁর পনের বছর পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছি।

১৫. আ'সেম বিন সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর শাহাদাত

কোরাইশরা তাদের নেতা থেকে শুরু করে দাস পর্যন্ত সবাইকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে উহুদের দিকে রওয়ানা হয়। তাদের অন্তর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি ঘৃণা ভরে গেছে এবং প্রতিহিংসার আগুনে তাদের অন্তর জ্বলছিল। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাহিনীর হাতে বদরের যুদ্ধে তাদের অনেকের আত্মীয়-স্বজন নিহত হয়েছে। সুলাফা পাগলের মতো হয়ে গেল, সে চিৎকার দিয়ে কাঁদতে লাগল। সে লাত ও উজ্জার নামে শপথ করে বলল– আমার যন্ত্রণা কখনো কমবে না, আমার কান্না কখনো থামবে না যতক্ষণ না কোরাইশরা আসেম বিন সাবিত থেকে প্রতিশোধ না নিবে এবং মদ পান করার জন্যে তাঁর মাথার খুলি এনে না দিবে। তারপর সে ঘোষণা দিল- যে ব্যক্তি আসেম বিন সাবিতকে বন্দি করবে অথবা হত্যা করে তার মাথা এনে দিবে সে বিনিময়ে যা চাইবে তাকে তাই দিবে। এ সংবাদ কোরাইশদের মাঝে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। কোরাইশদের সকল যুবক মনে মনে আসেমকে হত্যা করে তাঁর মাথা সুলাফার হাতে তুলে দেয়ার জল্পনা কল্পনা করত। কেননা এর বিনিময়ে বিশাল অংকের অর্থ মিলে যাবে।

www.pathagar.com

মুসলমানরা যুদ্ধ শেষে মদিনায় ফিরে আসে। তাঁরা শহীদদের বিরত্ব নিয়ে আলোচনা করতে লাগল। সাথে সাথে তাঁদেরও আলোচনাও করতে লাগল যাঁরা যুদ্ধে বীরের মতো লড়াই করেছে। তাঁদের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন হযরত আসেম বিন সাবিত। তাঁরা অবাক হল কিভাবে তিনি একই পরিবারের তিন ভাইকে হত্যা করলেন। তাঁদের মধ্যে একজন বলে উঠল– এতে আশ্চর্যের কি আছে? তোমাদের কি স্মরণ নেই বদরের যুদ্ধে যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন আমরা কিভাবে যুদ্ধ করব? তখন আসেম বিন সাবিত হাতে ধনুক নিয়ে বলল– যখন শত্রুরা আমাদের একশত গজ দূরে থাকবে তখন তীর নিক্ষেপ করা হবে। আর যখন আমাদের এত নিকটে চলে আসবে যে তাঁদেরকে বর্শা দিয়ে আঘাত করা যায় তখন বর্শা দিয়ে দ্বারা আঘাত করা হবে। যখন বর্শা ভেঙে যাবে তখন তরবারির দ্বারা যুদ্ধ করা হবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: এভাবেই যুদ্ধ.........। যে যুদ্ধ করবে সে যেন আসেম বিন সাবিতের মতো যুদ্ধ করে। উহুদের যুদ্ধের পর কিছুদিন পরেই রাসূলুল্লাহ ﷺ ছয় জনের একটি বাহিনী এক জায়গা প্রেরণ করেন। আর সেই বাহিনীর দায়িত্ব হযরত আসেম বিন সাবিতের ওপর অর্পণ করেছিলেন। সাহাবীদের সেই দলটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশ মত রওয়ানা দিল। তাঁরা উসফান ও মক্কার মাঝামাঝি স্থানে পৌঁছলে বনূ হুজাইল গোত্র তাঁদের আগমনের কথা জানতে পারে। বনূ হুজাইল গোত্র দ্রুত এসে তাঁদেরকে ঘেরাও করে ফেলল।

হযরত আসেম ও তাঁর সাথীরা তাঁদের তলোওয়ার হাতে নিয়ে মোকাবিলা করতে প্রস্তুত হয়ে গেলেন। হুজাইলীরা তাঁদেরকে বলল– আমাদেরকে মোকাবিলা করার মতো শক্তি তোমাদের নেই। তাছাড়া আমরা এ এলাকার বাসিন্দা, আমাদের সংখ্যা অনেক, আর তোমাদের সংখ্যা খুবই কম। আমরা তোমাদের থেকে অনেক বেশি শক্তিশালী আর তোমরা খুবই দুর্বল। আমরা কা'বার প্রভুর শপথ করে বলছি, যদি তোমরা আত্মসমর্পণ কর তাহলে আমরা তোমাদের কোনো ক্ষতি করব না। এ কথার ওপর আল্লাহকে সাক্ষ্য রেখে তোমাদের সাথে আমাদের ওয়াদা।

একথা শুনার পর সাহাবায়ে কেরাম একে অপরের দিকে তাকাতে লাগলেন মনে হয় যেন তাঁরা এ ব্যাপারে পরামর্শ করছিলেন।

হযরত আসেম রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর সাথীদের দিকে তাকিয়ে বললেন– আমি মুশরিকদের নিরপত্তায় কখনো নিজেকে সমর্পণ করব না। তারপর তিনি সুলাফার মান্নাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন এবং তাঁর তরবারীকে তিনি খাপমুক্ত করে বলতে লাগলেন- হে আল্লাহ! আমি তোমার দ্বীনকে রক্ষা করতে লড়াই করেছি। সুতরাং তুমি আমার গোশতগুলো এবং আমার হাড্ডিগুলো রক্ষা কর এবং সেগুলোর

www.pathagar.com

ওপর কাউকে বিজয়ী হতে দিও না। এ কথাগুলো বলে হযরত আসেম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কাফেরদের সাথে মোকাবিলা করতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তাঁর সাথে আরো দুইজন সাহাবী অংশগ্রহণ করলেন। নিহতের একজন হযরত আসেম বিন সাবিত একথা জানতে পেরে হুজাইলীরা অনেক বেশি আনন্দিত হল। আনন্দিত হবে না কেন? কেননা সুলাফা মান্নাত করেছে যদি সে আসেম বিন সাবিতের ওপর বিজয় লাভ করতে পারে তাহলে সে তাঁর খুলি দ্বারা মদ পান করবে। সেতো ঘোষণা করেছে যে ব্যক্তি তাঁকে জীবিত বা মৃত ধরে নিয়ে আসতে পারবে সে যা চাইবে তাকে তাই দিবে। কয়েক ঘন্টা না যেতেই কোরাইশরা জেনে যায় আসেম বিন সাবিত নিহত হয়েছেন। কেননা হুজাইলীরা মক্কার নিকটেই বসবাস করত। এতে কোরাইশদের নেতারা আসেম বিন সাবিতের মাথা নিয়ে আসার জন্যে তাদের নিকটে দূত প্রেরণ করে। যাতেকরে সুলাফা তার শপথ পুরো করতে পারে এবং আসেমের হাতে নিহত তার তিন পুত্রের প্রতিশোধ নিতে পারে। হযরত আসেমের মাথার বিনিময় হুজাইলীদেরকে অর্পণ করতে দূতদেরকে তারা যথেষ্ট অর্থ দিয়ে প্রেরণ করে।

হুজাইলীরা হযরত আসেমর শরীর থেকে মাথাকে আলাদা করার জন্যে গেল, কিন্তু তারা দেখল হযরত আসেমকে মৌমাছি চারদিক থেকে ঘেরাও করে রেখেছে। তারা যখনই লাশের দিকে যেতে চাইত তখনই মৌমাছিরা তাদের দিকে তেড়ে এসে তাঁদের চেহারা ও কপালসহ শরীরের বিভিন্ন স্থানে মারাত্মকভাবে দংশন করত। বার বার চেষ্টা করে যখন তারা দেখল লাশের নিকটে যেতে পারছে না তখন তারা বলতে লাগল– এখন রাখ, যখন রাত হবে তখন মৌমাছিরা চলে যাবে। একথা বলে তারা লাশের অদূরে বসে অপেক্ষা করতে লাগল। দিন শেষ হয়ে রাত না আসতেই আকাশ কালো মেঘে ঢেকে যায়। আকাশে গর্জন শুরু হয়ে যায়। আর সেই গর্জন ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। এরপর কঠিন বৃষ্টি শুরু হলো। বৃষ্টির এত বেশি বর্ষণ হলো যে, এমন বৃষ্টি ওই এলাকাবাসী আর কখনো দেখেনি। বৃষ্টিতে পানি এত বেশি বর্ষিত হল যে, পুরো এলাকা পানিতে প্লাবিত হতে লাগল এবং সকল কূপ ও গর্ত ভরপুর হয়ে গেল। যখন সকাল হল আর বৃষ্টিও থেমে গেল হুজাইলীরা আসেমের লাশ খুঁজতে লাগল, কিন্তু তারা কোথাও তাঁর লাশ খুঁজে পায়নি। কেননা স্রোত তাঁকে অনেক দূরে নিয়ে গেল। পানির স্রোত তাঁকে কোথায় নিয়ে গেল তা শুধু আল্লাহই ভালো জানেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর দোয়া কবুল করেছেন এবং তাঁর পবিত্র শরীরকে কাফেরদের হাত থেকে রক্ষা করেছেন.........। মহান রব মুমিনদের ওপর কাফেরদের বিজয় হতে দেননি।

www.pathagar.com

১৬. হযরত খাব্বাব বিন আরাত রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর উপর অমানবিক নির্যাতন

উম্মে আনমার একটি গোলাম খরিদ করার জন্যে মক্কার নাখ্‌খাসদের নিকটে গেল। গোলামের খেদমত দ্বারা উপকৃত হতে এবং বিভিন্ন কাজে সহযেগিতা নিতে সে একটি গোলাম খরিদ করতে চাইল। সেখানে গোলাম পছন্দ করার জন্যে একের পর এক দেখতে লাগল। তখন একটি অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালকের প্রতি তার নজর গেল। সে তাঁর শরীরের দিকে তাকিয়ে তাঁকে সুস্থ দেখলো। তাছাড়াও তাঁকে অনেক মেধাবী মনে হল। আর তাই সে এ গোলামটি ক্রয় করতে আগ্রহী হলো এবং এর মূল্য পরিশোধ করে তাঁকে নিয়ে বড়ির দিকে রওয়ানা হলো।

উম্মে আনমার তার গোলামকে একটি কামারের দোকানে কাজ করতে দিল। যাতেকরে সে তরবারি বানানো শিখতে পারে। গোলামটি অতি দ্রুত তরবারি বানানো শিখে নিলেন। তিনি খুব সুন্দর তরবারি বানাতে পারতেন। যখন গোলামটি পূর্ণ বিদ্যা অর্জন করল তখন উম্মে আনমার তাঁকে একটি দোকান ভাড়া নিয়ে দিল। সে তাঁকে তরবারি তৈরি করার সামগ্রীও কিনে দিল এবং গোলামটির তরবারি বানানোর বিদ্যাকে ব্যবহার করে ব্যবসা শুরু করল। কিছুদিন না যেতেই হযরত খাব্বাব মক্কায় বিখ্যাত হয়ে গেলেন। মানুষ তাঁর বানানো তরবারি ক্রয় করতে খুব বেশি আগ্রহী ছিল। কেননা তাঁর সততা ও দক্ষতা মানুষকে মুগ্ধ করেছে। হযরত খাব্বাব তখন যুবক থাকা সত্ত্বেও তাঁর চিন্তা-চেতনা ও বুদ্ধি ছিল বয়স্ক মানুষের মতো। তিনি তাঁর কাজ থেকে অবসর হলে মনে মনে এ জাহিলী সমাজের কথা চিন্তা করতেন। যে জাহিলিয়তা মানুষের মাথা থেকে পা পর্যন্ত ডুবিয়ে রেখেছে। তিনি এ সমাজের পথভ্রষ্টতা নিয়ে ভাবতেন এবং মনে মনে এর অবসান কামনা করতেন। তিনি মনে মনে বলতেন- এ অন্ধাকার যুগের অবসান হওয়া দরকার..... এবং আশা করতেন তাঁর হায়াত যেন অনেক দীর্ঘ হয় যাতেকরে তিনি এ অন্ধকারের অবসান ও আলোর আগমন নিজ চোখে দেখতে পান; কিন্তু হযরত খাব্বাবকে বেশিদিন অপেক্ষা করতে হয়নি। তাঁর মনের বাসনা পূরণে আল্লাহ তাআলা সেই সময়ে মুহাম্মদ নামের এক আলোর দিশারীকে প্রেরণ করেছেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আগমনের কথা জানতে পেরে তাঁর নিকটে গেলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী মনযোগ দিয়ে শুনলেন। এতে তাঁর অন্তর নূরে ভরপুর হয়ে গেল এবং তাঁর বাসনা পুরা হলো। তিনি সাথে সাথে তাঁর হাত বাড়িয়ে সাক্ষ্য দিলেন আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।

হযরত খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর ইসলাম গ্রহণের কথা কারো নিকটে গোপন করেননি। এমনকি তাঁর ইসলাম গ্রহণের খবর উম্মে আনমারের কানেও গিয়েছে। এতে সে

www.pathagar.com

রাগে ফুলে উঠে। সে তার ভাই সিবা বিন আব্দুল উজ্জাকে সাথে নিল। তাদের সাথে মক্কার অনেক যুবকও মিলিত হলো। তারা সকলে খাব্বাবের নিকটে রওয়ানা হল। সেখানে গিয়ে তারা তাঁকে তাঁর কাজে ব্যস্ত দেখল। সিবা খাব্বাবকে লক্ষ্য করে বলল– তোমার সম্পর্কে আমাদের নিকট এমন একটি সংবাদ এসেছে যা আমরা বিশ্বাস করি না। তিনি বললেন– কি? সিবা বলল– প্রচার করা হচ্ছে তুমি নাকি বেদ্বীন হয়ে গেছ এবং বনূ হাসিমের সেই লোকটির অনুসরণ করেছ। তিনি শান্তভাবে বললেন– আমি বেদ্বীন হয়নি; বরং আমি আল্লাহর কোনো শরীক নেই একথার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেছি এবং তোমাদের মূর্তিগুলোকে প্রত্যাখান করেছি। আর আমি সাক্ষ্য দিয়েছি মুহাম্মদ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। হযরত খাব্বাবের কথা সিবা ও তার সাথে থাক লোকদের কানে পৌঁছার সাথে সাথেই তারা তাঁর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারা তাঁকে হাত দ্বারা মারতে লাগলো, পা দ্বারা লাথি দিতে লাগল এবং তাদের নিকটে থাকা লোহা দ্বারা তাঁকে আঘাত করতে লাগল। অবশেষে তিনি আঘাতে আঘাতে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন।

এ সংবাদ মক্কার অলি-গলিতে বাতাসের বেগে ছড়িয়ে পড়ল। মানুষ হযরত খাব্বাবের সাহসিকতা দেখে হতভম্ব হয়ে গেল। কেননা তারা ইতিপূর্বে কাউকে ইসলাম গ্রহণ করে তা প্রকাশ্যে বলতে দেখেনি। কোরাইশদের নেতারা খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর এ সাহাসিকতায় শিহরিত হয়ে উঠে। তারা চিন্তা করে কূল পাচ্ছিল না যে একজন কামার যে উম্মে আনমারের গোলাম, যার মক্কাতে কোনো আত্মীয়-স্বজন বলতে কেউ নেই, যাকে সাহায্য করার মতো কোনো লোক নেই সে প্রকাশ্যে ইসলামের কথা ঘোষণা করেছে। তারা ভয় করতে লাগল সামনে যদি মানুষ এভাবে ইসলামের ঘোষণা প্রকাশ্যে দিতে থাকে তাহলে তাদের বাপ-দাদার ধর্মের মর্যাদা অক্ষুণ্ন থাকবে না; কিন্তু তাদের সে কথা সত্য প্রমাণিত হয় কেননা হযরত খাব্বাবের পরে অন্যান্য মুসলমানরাও তাঁদের ইসলামের কথা প্রকাশ করতে শুরু করল।

হযরত খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে শাস্তি দেয়ার দায়িত্ব সিবা বিন উজ্জার ওপর পড়ল। সে প্রতি দিন যখন সূর্যের আলো প্রখর হত হযরত খাব্বাবকে নিয়ে মরুভূমিতে চলে যেত। সে খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর শরীর থেকে জামা কাপড় খুলে ফেলে তাঁকে লোহার পোষাক পরাত। তারপর তাঁকে উত্তপ্ত মরুর বালির উপরে শোয়াত। যখন তাঁর কষ্ট শেষ সীমায় গিয়ে পৌঁছত তারা তাঁর নিকটে এসে বলত– মুহাম্মদের ব্যাপারে তুমি কি বল? তিনি বলতেন– তিনি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। যিনি সত্য ও হেদায়েতের ধর্ম নিয়ে আগমন করেছেন, যাতেকরে আমাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে যেতে পারেন। এ কথাগুলো শুনে তারা

www.pathagar.com

তাঁকে আরো বেশি ঘুষি ও লাথি মারত। তারপর বলত– তুমি লাত ও উজ্জার সম্পর্কে কি বল? তিনি বলতেন– তারা দুইটি মূর্তি বোবা ও বধির, তারা কোনো উপকার বা ক্ষতি করতে পারে না। তার এমন উত্তরে তারা উত্তপ্ত পাথর নিয়ে তাঁর পিঠে ও বাহুতে চাপ দিতো। উত্তপ্ত পাথরের তাপে তাঁর শরীর থেকে গোশত খসে পড়ত।

ওই দিকে উম্মে আনমারও তাঁর ভাইয়ের থেকে কম ছিল না। সে একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে খাব্বাবের দোকানে এসে কথা বলতে দেখল। তা দেখে তাঁর মাথায় আগুন ধরে গেল। সে প্রতিদিন খাব্বাবের নিকটে আসত এবং গরম লোহা নিয়ে তাঁর মাথায় রাখত। লোহার গরমে মাথা থেকে ধোঁয়া বের হত। এতে তিনি বেহুঁশ হয়ে যেতেন। হযরত খাব্বাব উম্মে আনমার ও তাঁর ভাই সিবার বিরুদ্ধে আল্লাহর নিকটে বদদোয়া করতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীরা যখন হিজরতের অনুমতি পেলেন, হযরত খাব্বাব (রা.) মদিনায় হিজরত করার জন্যে সুযোগ খুঁজতে লাগলেন। তবে তিনি মক্কা ত্যাগ করার পূর্বে উম্মে আনমারের ওপর তাঁর বদদোয়া কবুল হতে দেখলেন। উম্মে আনমার মাথায় এমন এক তীব্র ব্যথা অনুভব করছিল যে রকম ব্যথা সে আর কখনো অনুভব করেনি। আর এ কারণে সে কুকুরের মত চিৎকার করতে থাকত। তার সন্তানেরা সব জায়গায় তাঁর চিকিৎসার জন্যে গেল। চিকিৎসকরা তাদেরকে বলল– এ রোগ ভালো করতে হলে নিয়মিত মাথায় আগুন দিয়ে ছেঁক দিতে হবে। তারা তাঁকে প্রতিদিন উত্তপ্ত লোহা দিয়ে ছেঁক দিতে লাগল। এতে তাঁর ব্যথা কমত।

হযরত খাব্বাব (রা.) আনসারদের সাহায্য সহযোগিতায় তাঁর জীবনে দীর্ঘদিন বঞ্চিত থাকা সুখ ও আনন্দ খুঁজে পেলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে থেকে দ্বীনের কাজ করার সৌভাগ্য লাভ করলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে বদর যুদ্ধে শরিক হয়েছেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নেতৃত্বে জিহাদ করেছেন। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে উহুদের যুদ্ধেও শরীক হয়েছেন। সেই যুদ্ধে হামজার হাতে সিবা নিহত হয়েছে। আর এ দৃশ্য দেখিয়ে আল্লাহ তাআলা তাঁর চক্ষুকে শীতল করেছেন এবং তাঁর অন্তরে প্রশান্তি দান করেছেন। তাঁর হায়াত এত দীর্ঘ হয় যে তিনি চার খলীফার শাসনকাল দেখতে পেয়েছেন।

হযরত উমর (রা.)-এর শাসন আমলে তিনি একদিন হযরত ওমরের নিকটে গেলেন। হযরত উমর (রা.) তাঁর জন্যে বসার জায়গাকে উঁচু করে বললেন– এ স্থানে বসার হকদার আপনি ব্যতীত আর শুধু বেলালের আছে। তারপর তিনি তাঁকে মুশরিকদের নির্যাতনের সেই ঘটনা বলতে বললেন; কিন্তু তিনি বলতে লজ্জা করলেন। যখন হযরত উমর (রা.) বার বার অনুরোধ করলেন তখন তিনি

তাঁর শরীর থেকে চাদর উঠিয়ে দেখালেন। হযরত উমর তাঁর পিঠের অবস্থা দেখে হতভম্ব হয়ে গেলেন। তিনি বললেন– কিভাবে এমন হয়েছে? হযরত খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন– মুশরিকরা আমার জন্য কাঠ জ্বালিয়ে কয়লা বানাত। তারপর তারা আমার শরীর থেকে জামা-কাপড় খুলে ফেলত এবং আমাকে ওই কয়লার ওপর শোয়াত এতে আমার পিঠের হাড় থেকে গোশত খসে পড়ে যেত। আর সেই আগুন কেউ নিভাত না। অবশেষে আমার ঘামে সেই আগুন নিভত। হযরত খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মারা যাওয়ার পর হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর কবরের পাশে দাঁড়িয়ে বললেন– আল্লাহ খাব্বাবের প্রতি দয়া করুক, তিনি আগ্রহী হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছেন, অনুগত হয়ে হিজরত করেছেন এবং মুজাহিদ হিসাবে জীবন কাটিয়েছেন।

১৭. হযরত ইয়াসিরের পরিবার, সুমাইয়া ও আম্মার-এর শাহাদাত

এক সুন্দর সকালে....... আলোকিত পরিবেশে...... ইয়ামান থেকে আগত এক কাফেলা মক্কা এসে পৌঁছে। যখন হযরত ইয়াসির বিন আমির রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কা'বা শরীফ দেখতে পেলেন তিনি আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন। তাঁর অন্তর খুশিতে ভরে গেল। কেননা তিনি ইতোঃপূর্বে আর কখনো কা'বা শরীফ দেখেননি।

অন্যান্য কাফেলার মতো মক্কায় হযরত ইয়াসির ব্যবসা করতে আসেননি। তিনি ও তাঁর ভাইয়েরা মক্কা আগমন করেছেন তাঁর হারানো এক ভাইকে খোঁজার জন্যে। তারা তাঁদের ভাইকে কয়েক বছর আগে হারিয়ে ফেলেছিলেন। এ তিন ভাই তাঁদের হারানো ভাইকে মক্কার অলি-গলিতে খুঁজতে লাগলেন। তাঁরা প্রত্যেক লোককে তাঁদের ভাই সম্পর্কে জিজ্ঞেসা করতে লাগলেন। খুঁজতে খুঁজতে তাঁরা যখন নৈরাশ হয়ে গেলেন তখন ইয়ামানে ফিরে যেতে চাইলেন। তার দুই ভাই ইয়ামানে ফিরে গেল; কিন্তু তিনি মক্কায় থেকে গেলেন। তিনি মক্কা নগরীকে তাঁর আবাস ভূমি হিসেবে গ্রহণ করলেন।

হযরত ইয়াসির তখন জানতেন না তাঁর এ সিদ্ধান্ত তাঁকে কোন মর্যাদায় নিয়ে পৌঁছাবে। তিনি এও জানতেন না যে, তিনি ইতিহাসের অমর পাতায় তাঁর নাম লিখাচ্ছেন; কিন্তু হযরত ইয়াসির রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর মক্কায় কোনো আত্মীয়-স্বজন ছিল না। তার এমন কোনো পরিবারও নেই যে তাঁকে আশ্রয় দিবে। আর তাই অন্যান্য বিদেশি লোকদের মত তাঁকেও কোরাইশদের কোনো নেতার হাতে জোটবদ্ধ হয়ে থাকতে হবে। যাতেকরে নিরাপদে বসবাস করতে পারেন। তিনি আবু হুজায়ফা বিন আলমুগীরার সাথে জোটবদ্ধ হয়ে বসবাস শুরু করলেন।

আবু হুজাইফা দেখল ইয়াসির একজন উত্তম চরিত্রের মানুষ। তাঁর ব্যবহার ও কথাবার্তা অনেক সুন্দর আর তাই তিনি তাঁর দাসী সুমাইয়া বিনতে খিবাতকে তাঁর সাথে বিয়ে দিলেন। হযরত ইয়াসির রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর প্রথম সন্তান জন্মগ্রহণ করায়

www.pathagar.com

তাঁরা অনেক খুশি হলেন। তারা তাঁর নাম রাখলেন আম্মার। তাদের এ খুশি বেড়ে দ্বিগুণ হয়ে গেল যখন আবু হুজায়ফা তাঁদের সন্তানকে আযাদ করে দিল। এ পরিবার বনূ মাখজুম গোত্রের আশ্রয়ে খুব শান্তিতে বসবাস করা লাগলেন। দিনের পর দিন, বছরের পর বছর এভাবে কাটতে লাগল। একদিন হযরত ইয়াসির ও হযরত সুমাইয়া বৃদ্ধ বয়সে উপনিত হলেন। আর তাঁদের সন্তান হযরত আম্মার যুবকে পরিণত হলেন। আর তখন মহান রব আসমান থেকে জমিনে নূর প্রেরণ করতে শুরু করলেন। মক্কার জমিনে এক উজ্জ্বল নক্ষত্রকে প্রেরণ করলেন। যার আলোতে জাহিলী সমাজ আলোকিত হতে লাগল। তিনি হচ্ছেন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ। রাসূলুল্লাহ ﷺ মহান রবের হুকুমে তাঁর দাওয়াতি কাজ শুরু করলেন।

হযরত আম্মার দারুল আরকামে গেলেন। সেখানে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাক্ষাতে নিজেকে ধন্য করলেন এবং তাঁর থেকে হেদায়েতের বাণী শ্রবণ করলেন। এতে তাঁর অন্তর হেদায়েতের জন্যে খুলে গেল। তিনি ইসলাম গ্রহণ করার জন্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দিকে তাঁর হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন– আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো ইলাহ্ নেই এবং আপনি আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। এরপর হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর মায়ের নিকটে গিয়ে তাঁকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। তিনি তাঁর দাওয়াতের সাথে সাথে ইসলাম গ্রহণ করলেন। মনে হয় তিনি অনেক পূর্ব থেকে ইসলামের সাথে পরিচিত। এরপর তিনি তাঁর বাবা ইয়াসিরের নিকটে গেলেন। তাঁর বাবাও তাঁর মায়ের মতো সাথে সাথে ইসলাম গ্রহণ করলেন। এ তিন নক্ষত্রের ইসলাম গ্রহণ আজ পর্যন্ত মুমিনদের হৃদয়কে আলোকিত করছে। আল্লাহর রহমতে তাঁদের এ আত্মত্যাগ কিয়ামত পর্যন্ত মুমিনদেরকে পথ দেখাবে।

তাদের ইসলাম গ্রহণের কথা বনূ মাখজুম গোত্রে ছড়িয়ে পড়ে। এতে তারা প্রচণ্ড রাগান্বিত হয়। তারা তাঁদেরকে ইসলাম থেকে ফিরানোর জন্যে তাঁদের সর্বশক্তি ব্যয় করতে শুরু করল। লোহার বর্মা পরিয়ে উত্তপ্ত মরুভূমির বালুর উপরে সূর্যের তীব্র তাপের মধ্যে তাঁদেরকে রেখে দিত। তারা তাঁদেরকে পানি দিত না; বরং বেদম প্রহার করত। এমনকি তাঁদের গলা শুকিয়ে যেত তাঁদের শরীর থেকে রক্ত প্রবাহিত হতো। যে চাবুক দিয়ে তাঁদেরকে মারা হতো তা ফেটে যেত।

একদিন তাঁদেরকে শাস্তি দেওয়া অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদের নিকট দিয়ে গমন করছিলেন। তিনি তাঁদেরকে এ অবস্থায় দেখে খুব দুঃখ পেলেন। তিনি তাঁদেরকে বললেন– হে ইয়াসিরের পরিবার! তোমরা ধৈর্যধারণ কর, নিশ্চয়ই তোমাদের স্থান জান্নাতে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এ কথা তাঁদের অন্তর প্রশান্তি লাভ করে।

www.pathagar.com

শত কষ্টের মাঝেও তাঁদের মুখে হাসি ফুটে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এ কথা বাস্তবায়ন হতে বেশি দিন লাগেনি। হযরত সুমাইয়া রাদিআল্লাহু আনহা-এর নিকট দিয়ে আবু জাহেল অতিক্রম করে যাচ্ছিল তখন তাঁকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছিল। সে সুমাইয়া রাদিআল্লাহু আনহা-কে গালাগালি করল এবং খারাপ খারাপ কথা বলল; কিন্তু হযরত সুমাইয়া তাঁর কথার প্রতি কোনো ভ্রুক্ষেপ করেননি। এতে সে তাঁর বর্শা দিয়ে হযরত সুমাইয়া রাদিআল্লাহু আনহা-এর তলপেটে আঘাত করে। বর্শাটি তাঁর পিষ্ঠদেশ দিয়ে বের হয়ে গেল।

আর হযরত সুমাইয়া রাদিআল্লাহু আনহা শহীদ হয়ে গেলেন। তিনি হচ্ছেন ইসলামের প্রথম শহীদ। হযরত ইয়াসির রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু কঠিন নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। তিনি মৃত্যুর সময় বলছিলেন আল্লাহ্ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল। হযরত ইয়াসির রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু ও সুমাইয়া রাদিআল্লাহু আনহা-এর মৃত্যুর পর হযরত আম্মারের ওপর শাস্তির পরিমাণ আরো বেড়ে যায়। একদিন তিনি খুব চিন্তিত ও লজ্জিত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকটে গেলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দিকে তাকাতে চাইলেন; কিন্তু তিনি তাকাতে সক্ষম হলেন না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন– তোমার কি হয়েছে হে আম্মার? তিনি বললেন: খুব খারাপ, হে আল্লাহর রাসূল।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন– তা কি? তিনি বললেন– গত রাতে আমাকে এমন শাস্তি দেওয়া হয়েছে যে আমার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেছে। যদি কোনো পাহাড়কে এমন শাস্তি দেওয়া হতো তাহলে তা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যেত। এরপর আল্লাহর শক্ররা আমাকে দুপুরে মরুর উত্তপ্ত বালির ওপর রেখে ক্ষান্ত হয়নি তারা আমার শরীরে আগুন দ্বারা পুড়িয়ে দিয়েছে। তারা আমার মুখ দিয়ে আপনার বিরুদ্ধে ও তাঁদের মূর্তির প্রশংসা বের করে ক্ষান্ত হয়েছে। তারপর তিন খুব বেশি কন্না শুরু করলেন। যে কান্না হৃদয়কে গলিয়ে দেয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন– হে আম্মার! তুমি তোমার অন্তরকে কেমন পেয়েছ? তিনি বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! তা আস্থাশীল ছিল। তারপর আল্লাহ্ তাআলা কোরআনের আয়াত নাযিল করে হযরত আম্মারকে সম্মানিত করলেন। আল্লাহ্ তাআলা বলেন-

مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْ بَعْدِ اِيْمَانِهٖ اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ وَقَلْبُهٗ مُطْمَئِنٌّ بِالْاِيْمَانِ وَلٰكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللّٰهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ -

"যে ব্যক্তি একবার ঈমান আনার পর কুফরী করে, সেই লোক ব্যতীত যাকে কুফরী বাক্য উচ্চারণ করতে বাধ্য করা হয় অথচ তার অন্তর ঈমানের ওপরই

www.pathagar.com

সন্তুষ্ট থাকে; কিন্তু যে তার অন্তরকে কুফরীর জন্য সদা উন্মুক্ত করে রাখে তাদের ওপর আল্লাহর গযব, তাদের জন্য রয়েছে মারাত্মক শাস্তি।" (সূরা নাহল-১০৬)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাঁর সাহাবীদেরকে হিজরতের অনুমতি দিলেন। হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হিজরতকারীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন যাঁরা নিজের দ্বীন ও ঈমানকে বাঁচানোর জন্যে হিজরত করেছিলেন। যখন তিনি কুবা নগরীতে পৌঁছেন তখন তিনি মুহাজিরদেরকে মসজিদ বানানোর প্রতি আহ্বান করলেন। হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর নির্মিত মসজিদ হচ্ছে ইসলামের প্রথম মসজিদ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ভীষণ খুশি হলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহবতে একনিষ্ঠভাবে থাকা শুরু করলেন। তিনি তাঁর রাত-দিনকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে কাটাতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর এ ভালোবাসার সুন্দর প্রতিদান দিতেন। যখনই তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকটে আসতেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন- পবিত্র ও পবিত্রকারী এসেছে।

বদরের যুদ্ধে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নেতৃত্বে যুদ্ধ করেছেন। তিনি এমন একজন মুসলমান যার বাবা-মা দুইজনই ইসলামের জন্যে শহীদ হয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাঁর প্রভুর নিকটে চলে গেলেন তখন ইয়ামামার লোকেরা মুরতাদ হয়ে যেতে শুরু করল। তিনি ইয়ামার যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেছিলেন। যুদ্ধ তীব্র থেকে তীব্র আকার ধারণ করল। মুসলমানদের পায়ের তলে মাটি যেন সরে যাচ্ছিল। তখন হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু একটি পাথরের উপরে দাঁড়ালেন। যুদ্ধে তাঁর কান কেটে গেছে। তিনি বলতে লাগলেন- হে মুসলমানগণ! তোমরা কি জান্নাত থেকে পালিয়ে যাচ্ছ? আমার দিকে আস, আমার দিকে আস হে মুসলমানদের দল। তখন তারা কঠিন আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়ল এমনকি শেষ পর্যন্ত মুসলমানগণ মুসায়লামাতুল কাজ্জাবকে হত্যা করল।

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায়

দ্বীনের মুজাহিদদের জুলুম-নির্যাতন ও কষ্ট স্বীকার

ইমাম আবু হানিফাকে কারাগারে নিক্ষেপ

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) খ্রিস্টীয় ৬৯৯ সনে বানু উমাইয়া খলীফা আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের শাসনকালে কুফায় জন্মগ্রহণ করেন। আবু হানিফা (রহ.) যখন যৌবনে পৌঁছেন তখন উমর ইবনে আবদুল আযীযের স্বর্ণযুগ শেষ হয়ে গেছে; কিন্তু তাঁর নির্দেশে হাদীস সংগ্রহের যেই অভিযান শুরু হয় তা পুরোদমে চলছিল। খ্রিস্টীয় ৭৫০ সনে বনি উমাইয়া খিলাফতের অবসান ঘটে। শুরু হয় বনি আব্বাসের খিলাফত। আবু হানিফা (রহ.) বনি আব্বাসের দ্বিতীয় খলীফা আবু জাফর আবদুল্লাহ আল মানছুরের শাসনকালের মধ্যভাগ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। এই সময় খারেজী, মু'তাযিলা ও মুরজিয়া নামে বিভিন্ন চিন্তাধারার নেতা ও কর্মীরা ঈমান, কুফর, খোলাফায়ে রাশেদা এবং সাহাবীদের মর্যাদা ইত্যাদি বিষয়ে বিভ্রান্তিকর চিন্তা ছড়াতে থাকে। আবু হানিফা (রহ.) এসব মতবাদের ভ্রান্তি উন্মোচন করে সঠিক চিন্তাধারা উপস্থাপন করেন। সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহর। আইনের উৎস সম্পর্কেও তিনি সঠিক চিন্তার অধিকারী ছিলেন। তিনি বলেন, আল্লাহর কিতাবে কোনো বিধান পেলে আমি তা দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করি। আল্লাহর কিতাবে সেই বিধানের সন্ধান না পেলে আল্লাহর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাহ গ্রহণ করি। আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহতে কোনো বিধান না পেলে আসহাবে রাসূলের ইজমা অনুসরণ করি। আর কোনো বিষয়ে তাঁদের মতপার্থক্য থাকলে কোনো সাহাবীর মত গ্রহণ করি ও ভিন্নমত পোষণকারী সাহাবীর মত প্রত্যাখ্যান করি। তাদের বাইরে অন্য কারো মত গ্রহণ করি না। বাকি রইলো অন্যদের মত। ইজতিহাদের অধিকার তাঁদের যেমন আছে, তেমনি অধিকার আমারও আছে।'

আবু হানিফার শিক্ষামজলিস থেকে আহরিত জ্ঞান নিয়ে হাজার হাজার ছাত্র রাষ্ট্রের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েন। বনি উমাইয়ার সর্বশেষ খলীফা মারওয়ান ইবনে মুহাম্মদ কর্তৃক নিযুক্ত ইরাকের গভর্নর ছিলেন ইয়াযিদ ইবনে উমর ইবনে হুবাইরা। তিনি ইমাম আবু হানিফাকে বিচারপতির পদ গ্রহণ করার জন্য প্রস্তাব দেন। ইমাম সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। এতে ইয়াযিদ ইবনে উমর ক্ষেপে যান। তার নির্দেশে প্রতিদিন দশটি করে ১১ দিন পর্যন্ত আবু হানিফার পিঠে ১১০টি চাবুক মারা হয়। এতো বড় শাস্তির পরও ইমাম তাঁর সিদ্ধান্তে অটল থাকেন। বনি আব্বাসের খলীফা আল মানছুর আবু হানিফাকে বিচারপতি বানাতে

www.pathagar.com

চান। তিনি রাজি হননি। এজন্য তাঁকে বন্দি করা হয়। খ্রিস্টীয় ৭৬৭ সনে তিনি বন্দি অবস্থায় বাগদাদে মৃত্যুবরণ করেন। খলীফা ও গভর্ণরের স্বেচ্ছাচারিতা ও তাদের মনমতো বিচার করে রায় দিতে হবে বলে ইমাম এ গুরুত্বপূর্ণ সম্মানজনক পদটি অলংকৃত করতে অস্বীকৃতি জানান।

মালিক ইবনে আনাস (র)-এর ওপর যুলুম

বানু উমাইয়ার খলীফা আল ওয়ালীদ ইবনে আবদুল মালিকের শাসনকালে ইমাম মালিক ইবনে আনাস ৭১৪ খ্রিস্টাব্দে মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন। বনি আব্বাসের খলীফা হারুনুর রশীদের শাসনকালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। উমর ইবনে আবদুল আযীযের মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ছয় বছর। যৌবনে পৌঁছে তিনি হাদীস সংগ্রহের অভিযান প্রত্যক্ষ করেন। হাদীস সংগ্রহ এবং হাদীস বিশ্লেষক এই দুই ধারার সাথেই তাঁর সংশ্লিষ্টতা ছিল।

তাঁর প্রণীত হাদীস সংকলনের নাম 'আল মুয়াত্তা'। হাসান ইবনে আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বংশীয় মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ, যাকে 'আন্ নাফসুয্ যাকিয়া' বলা হতো, 'খিলাফত আলা মানহাজিন নবুওয়াত' প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু করেন।

তাঁর প্রতি মালিক ইবনে আনাসের সমর্থন রয়েছে অভিযোগ এনে তাঁকে গ্রেফতার করা হয় এবং মদীনার গভর্ণরের নির্দেশে তাঁর পিঠে চাবুক মারা হয়। ইমাম মালিক সুস্পষ্টভাবে এই অভিমত ব্যক্ত করতেন যে, জোর করে ক্ষমতা দখল করা বৈধ নয়। তাঁর এই স্পষ্ট উক্তিতে বনি আব্বাসের খলীফা আল মানছুর তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হন। তাঁকে বন্দি করে এনে চাবুক মারা হয়। তাঁর হাত পেছনে এমনভাবে শক্তভাবে বাঁধা হয়েছিল যে, কনুইয়ের জোড়া শিথিল হয়ে যায়। এজন্য বাকি জীবন তিনি দারুণ কষ্টভোগ করেন। ৭৯৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি খলীফা হারুনুর রশীদের শাসনকালে মদীনায় মৃত্যুবরণ করেন।

আহমাদ ইবনে হাম্বল (র)-এর ওপর নির্যাতন

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র) খ্রিস্টীয় ৭৮০ সনে বনি আব্বাসের খলীফা মুহাম্মদ আল মাহদীর শাসনকালে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন। খলীফা আল মামুন তাঁর খিলাফতকালে বসরায় প্রখ্যাত তাবেয়ী হাসান বসরী (র)-এর শিক্ষা মজলিসে বসতেন। এই মজলিসের অন্যতম ছাত্র ছিল ওয়াসিল ইবনে আতা। তার ভ্রান্ত চিন্তার পরিচয় পেয়ে হাসান বসরী তাঁর শিক্ষা মজলিস থেকে তাকে বের করে দেন। এই ওয়াসিল ইবনে আতা'ই হচ্ছে মুতাযিলাবাদের প্রবর্তক। খলীফা আল মামুনের পৃষ্ঠপোষকতায় মুতাযিলাবাদ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। মুতাযিলারা বিভিন্ন সরকারি পদে অধিষ্ঠিত হয়। মুতাযিলা তাত্ত্বিকগণ মসজিদে ও শিক্ষালয়ে গিয়ে বক্তৃতার মাধ্যমে তাদের ভ্রান্ত মত প্রচার করতে থাকে। তারা বলত, আল-কুরআন একটি সৃষ্ট বস্তু। মানুষের কার্যাবলি সম্বন্ধে কোনো চিরস্থায়ী

www.pathagar.com

বিধিবিধান নেই। আসমানী অনুশাসনগুলোও পরিবর্তনের অধীন। তারা আখিরাতে মানুষের শারীরিক পুনরুত্থানে বিশ্বাস করত না। তারা ইসলামী আইনের উৎস হিসেবে হাদীস ও ইজমাকে প্রায় বাতিল বলে গণ্য করতো ইত্যাদি।

এই চিন্তার বিভ্রান্তিকে রুখে দেয়ার জন্য ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র) মাথা উঁচু করে দাঁড়ান। তিনি একদিকে গ্রিক দর্শন ও ভারতীয় দর্শন, অন্যদিকে মুতাযিলাবাদের সমালোচনা করে লোকদেরকে কুরআন ও সুন্নাহর স্বচ্ছ ধারার অনুসারী হওয়ার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, আল্লাহর সঠিক পরিচয় একমাত্র কুরআনেই রয়েছে। আল্লাহর ওপর ঈমান আনার অর্থ হচ্ছে কুরআনে আল্লাহ নিজের যেরূপ পরিচয় তুলে ধরেছেন সেভাবে তাঁকে মানা। আল্লাহর গুণাবলি এবং সার্বভৌমত্ব সঠিক বলে মেনে নিলেই চলবে না, আল্লাহর সত্তা, আল্লাহর আরশ, আখিরাতে মুমিনদেরকে তাঁর দর্শন দান ইত্যাদিও বিশ্বাস করতে হবে। আরো বিশ্বাস করতে হবে যে, বিশ্বজাহানের কোনো কিছুরই আল্লাহর সাথে কোনো সাদৃশ্য নেই। আহমাদ ইবনে হাম্বল দৃঢ়ভাবে এই অভিমত ব্যক্ত করতেন যে, কুরআন সৃষ্ট বস্তু নয়, এটি আল্লাহর চিরন্তন বাণী। তিনি আরো বলতেন, কুরআনের শব্দাবলির প্রত্যক্ষ অর্থ বাদ দিয়ে কোনো পরোক্ষ অর্থ গ্রহণ করা যাবে না। হাদীসকেও সেভাবেই গ্রহণ করতে হবে। এই দুটির পর আসহাবে রাসূলের অভিমতকে গ্রহণ করতে হবে। কারণ আসহাবে রাসূলুল্লাহ পরবর্তীকালের লোকদের তুলনায় কুরআন ও হাদীসে অনেক বেশি পারদর্শী ছিলেন এবং তাঁরা পূর্ণ নিষ্ঠার সাথে কুরআন ও হাদীসের নির্দেশগুলো অনুসরণ করতেন। প্রশাসনে জেঁকে বসা মুতাযিলারা চক্রান্তে মেতে ওঠে। ওই সময় খলীফা আল মামুন তারসুসে অবস্থান করছিলেন। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলকে গ্রেফতার করে শিকল পরিয়ে তাঁর সামনে হাজির করার জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। পথিমধ্যে খবর পাওয়া যায় যে, আল মামুন মারা গেছেন। তখন ইমামকে ছেড়ে দেয়া হয়। পরবর্তী খলীফা মু'তাসিম বিল্লাহও মুতাযিলাবাদের পৃষ্ঠপোষকতা করতে থাকেন। ইমাম আহমদ হাম্বলকে আবার গ্রেফতার করে জেলে পাঠিয়ে দেয়া হয়।

একদিন খলীফা মু'তাসিম বিল্লাহর নির্দেশে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র)-কে দরবারে আনা হয়। উদ্দেশ্য ছিল তাঁর কাছ থেকে মুতাযিলাবাদের পক্ষে সমর্থন আদায় করা। তিনি মুতাযিলাবাদের বিরুদ্ধে তাঁর বক্তব্য পেশ করেন। খলীফার নির্দেশে তাঁর পিঠে চাবুক মারা শুরু হয়। অতঃপর তাঁকে জেলখানায় পাঠিয়ে দেয়া হয়। এবার জেলে থাকতে হয় দুই বছর। দুই বছর পর মুক্তি দিয়ে তাঁকে স্বীয় গৃহে নজরবন্দি করে রাখা হয়। পরবর্তী খলীফা আলওয়াসিক বিল্লাহর শাসনকালেও তাঁকে দৈহিক নির্যাতনের শিকার হতে হয়; কিন্তু বারবার নির্যাতিত হয়েও তিনি নিরেট যুক্তিবাদীদের অযৌক্তিক বক্তব্যের কাছে কুরআন ও হাদীসের শিক্ষাকে বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হননি। ৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে খলীফা হন আল

www.pathagar.com

মুতাওয়াক্কিল বিল্লাহ। সৌভাগ্যের বিষয় তিনি মুতাযিলাবাদের ভ্রান্তি বুঝতে সক্ষম হন এবং সালফে সালেহীনের চিন্তাধারাকে পৃষ্ঠপোষকতা করতে শুরু করেন। তাঁর শাসনকালে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল স্বস্তি লাভ করেন। উমাইয়া খলীফা উমর ইবনে আবদুল আযীযের নির্দেশে হাদীস সংগ্রহের যেই প্রবাহ শুরু হয়েছিল, তিনি সেই প্রবাহে নিজেকে সংশ্লিষ্ট করেন। তিনি ঊনত্রিশ হাজার হাদীস সম্বলিত একটি সংকলন তৈরি করেন, যার নাম মুসনাদে আহমাদ। ৮৮৫ সালের ২৪৯ হিজরীতে খলীফা আল মুতাওয়াক্কিলের শাসনকালে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল বাগদাদে মৃত্যুবরণ করেন।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া

ইমাম ইবনে তাইমিয়াকে ৭২০ হিজরীতে ফতোয়া দেয়াকে কেন্দ্র করে একাধিকবার নজরবন্দী ও কারাবরণ করতে হয়েছে। সপ্তম-অষ্টম হিজরী শতকে ইবনে তাইমিয়া ছিল একটি নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের নাম। তিনি সংগ্রাম করেন শিরক ও বিদআতের বিরুদ্ধে। তিনি সংগ্রাম করেন অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে, জুলুম ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে। তাঁর নির্ভীক ও বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বরে অমিততেজা রাজশক্তির হৃদয়ও কেঁপে ওঠে। দুর্জনদের পরামর্শে পরাক্রান্ত রাজশক্তি তাঁকে লৌহ কপাটের অন্তরালে নিক্ষেপ করে। কারাগারে বসেও তিনি লেখনী চালাতে থাকেন অতি দ্রুতবেগে। তাঁর নির্জলা সত্যের প্রকাশে কারাপ্রাচীর বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। বিরোধী পক্ষ হিংসার আগুনে তাঁকে পুঁড়িয়ে ছারখার করে ফেলতে চায়। এবার রাজার হুকুমে তাঁর কাছ থেকে বইপত্র, খাতা, কলম, কালি দোয়াত সব কিছুই ছিনিয়ে নেয়া হয়, তবুও তিনি দমেননি। ছেঁড়া টুকরো কাগজ জমা করে কয়লা দিয়ে তাতে লিখতে থাকেন। এভাবে সত্যের নির্ভীক সেনানী আমৃত্যু লড়ে যেতে থাকেন অসত্যের বিরুদ্ধে।

তাঁর সাতষট্টি বছরের জীবনকাল ছিল মিথ্যা ও বাতিল, অন্যায় ও অসত্যের ন্যাক্কারজনক পরাজয়ের ইতিবৃত্ত। ইবনে তাইমিয়ার খুরধার লেখনী আজও মিথ্যা ও বাতিলের পরাজয়ের কাহিনী লিখে চলছে।

কুরআন ও সুন্নাহ হচ্ছে ইসলামের সত্য জ্ঞানের দুইটি মূল উৎস। ইমাম ইবনে তাইমিয়া ইসলামী জ্ঞানের সমস্ত শাখা-প্রশাখাকে আবার এই মূল উৎস দুইটির সাথে সংযুক্ত করে দিয়ে যান। এর জন্য তাঁর সমস্ত ইসলামী যোগ্যতা ও বুদ্ধিবৃত্তিকে ব্যবহার করেন। এ পথে তিনি কোন দোর্দণ্ড প্রতাপ শাসক ও অসীম ক্ষমতাধর প্রতিপক্ষের রক্তচক্ষুকে একটুও আমল দেননি। সত্যের জন্য তাঁর এই অকুতোভয় সংগ্রাম ও সাধনা কিয়ামত পর্যন্ত এই মিল্লাতকে জীবনীশক্তি যোগাতে থাকবে। ইবনে তাইমিয়ার মতো মনীষী তাই যেমন হাজার বছরে জন্মে তেমনি হাজার বছরেও তার মৃত্যু হয় না।

www.pathagar.com

শায়েখ আবুল বারাকাত বাদরুদ্দীন আহমাদ সরহিন্দি (রহ.)-এর ইসলাম প্রচার ও তাঁর ওপর নির্যাতন

শায়খ আহ্মদ সরহিন্দি ১৫৬৩ সালে ভারতের তৃতীয় মুঘল সম্রাট আকবরে শাসনামলে পূর্ব পাঞ্জাবের পাতিয়ালা রাজ্যের সরহিন্দ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। অন্যদিকে বিকৃত সুফীবাদ মুসলমানদেরকে বিপথগামী করে চলছিল। ওই সময় 'আলফিয়াহ' নামে একটি মতবাদও প্রচারিত হতে থাকে। এই মতবাদের বক্তব্য ছিল : ইসলাম এসেছিল এক হাজার বছরের জন্য। এক হাজার বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। এখন নতুন দ্বীনের প্রয়োজন।

সম্রাট আকবর ফতেহপুর সিক্রি নামক স্থানে একটি ইবাদতখানা স্থাপন করেন। এই ইবাদতখানায় বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী পণ্ডিতদেরকে ডাকা হতো। তিনি তাদের আলোচনা শুনতেন। তবে ইসলাম সম্পর্কিত আলোচনা তার ভালো লাগত না। ১৫৮২ সালে আকবর 'দ্বীনে ইলাহী' নামে এক নতুন ধর্মমতের প্রবর্তন করেন। এই ধর্মের কালেমা ছিল: 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আকবারু খলীফাতুল্লাহ।' সালাম বা সম্ভাষণ ছিল: 'আল্লাহু আকবার (সম্রাট আকবর), আর এর উত্তর ছিল: জাল্লাজালালু।' এই সময় শায়খ আহমাদ সরহিন্দি ১৯ বছরের একজন তরুণ; কিন্তু তিনি কুরআন ও সুন্নাহর স্বচ্ছ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। কুরআন ও সুন্নাহর সাথে সাংঘর্ষিক ছিল বিধায় তিনি দ্বীনে ইলাহীর বিরোধীতা শুরু করেন। তিনি চিন্তার বিশুদ্ধি সাধনের কাজে হাত দেন। তিনি নিয়মিত শিক্ষা মজলিস পরিচালনা করতেন। সালাতুয যোহর থেকে সালাতুল আছর পর্যন্ত চলতো সাধারণ অধিবেশন। সালাতুল আছর থেকে সালাতুল মাগরিব পর্যন্ত বসত বিশেষ অধিবেশন। এভাবে তিনি লোক তৈরির কাজ চালাতে থাকেন। তিনি ইসলামী বিষয়ে পন্ডিত বলে পরিচিত ব্যক্তিদের কাছে জ্ঞানগর্ভ দিকনির্দেশনামূলক চিঠি পাঠাতে থাকেন। তাঁর সান্নিধ্যে থেকে গড়ে উঠা তরুণ ব্যক্তিদেরকে তিনি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে দিয়ে লোকদেরকে ইসলামের সঠিক ধারণা দেয়ার কাজ শুরু করেন।

১৬০৫ সালে আকবর মারা যান। পরবর্তী সম্রাট নুরুদ্দীন মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর দ্বীনে ইলাহীর প্রচার চালাতে থাকেন। শায়খ আহমাদ সরহিন্দি সম্রাট, শাহজাদা খুররম, সম্রাটের পরিষদবর্গ এবং সেনাপতিদের নিকট ইসলামের প্রকৃত রূপ তুলে ধরেন এবং তা অনুসরণের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করে দাওয়াতি চিঠি পাঠাতে থাকেন। সম্রাট জাহাঙ্গীর শায়খ আহমাদ সরহিন্দিকে আগ্রার রাজপ্রাসাদে ডেকে পাঠান। তিনি সম্রাটের নিকটবর্তী হলে ডান ও বাম দিক থেকে বলা হলো: 'সম্রাটকে কুর্নিশ করুন।' তিনি বললেন, 'মুমিনের মাথা তো আল্লাহ ছাড়া আর কারো কাছে নত হয় না।' ভীষণ রেগে যান জাহাঙ্গীর। তাঁকে

www.pathagar.com

গ্রেফতারের নির্দেশ দেন। তাঁকে বন্দি করে গোয়ালিয়ার দুর্গে পাঠিয়ে দেয়া হয়। দুর্গে বন্দি কয়েদিদের মধ্যে তিনি দাওয়াতি কাজ শুরু করেন। বহু কয়েদি এবং কারারক্ষী তাঁর দারস শুনে খাঁটি মুমিন হিসেবে জীবন গড়ার শপথ নেয়। এক বছর প্রলম্বিত হয় তাঁর জেলজীবন। ইতোমধ্যে সম্রাট জাহাঙ্গীরের চিন্তায় বেশ পরিবর্তন আসে। তিনি দ্বীনে এলাহীর প্রচার বন্ধ করে দেন। আকবরের প্রবর্তিত বহু রীতি ত্যাগ করেন। মুসলিমপ্রধান শহরগুলোতে মাদরাসা এবং গ্রামগুলোতে মাকতাব স্থাপনের নির্দেশ দেন। সম্রাট রাজপ্রাসাদের পাশেই একটি মসজিদ নির্মাণ করেন এবং পরিষদবর্গকে নিয়ে ওই মসজিদে সালাত আদায় শুরু করেন। শায়খ আহমাদ সরহিন্দি (র) নাস্তিকতা ও শিরকের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলেন। সুফীবাদের নামে যেই নর্তন-কুর্দন চলত, সেইগুলোর কঠোর সমালোচনা করেন। তিনি বিজাতীয় দর্শন ও ভক্তিবাদের অনিষ্ট সম্পর্কে মুসলমানদেরকে সতর্ক করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় প্রশাসনের ওপর থেকে শিয়া প্রভাব বিদূরিত হয়। ১৬২৪ সালে শায়খ আহমাদ সরহিন্দি সরহিন্দেই মৃত্যুবরণ করেন। শাহজাদা খুররম শায়খ আহমাদ সরহিন্দির দাওয়াতি চিঠি পড়ে ইসলামের অনুরাগী হয়ে ওঠেন। ১৬২৭ সালে সম্রাট জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর শাহজাদা খুররম শিহাবুদ্দীন দিল্লি জামে মসজিদ এবং লাহোর জামে মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা। দিল্লি জামে মসজিদে খতীব হিসেবে দায়িত্ব পালন করার জন্য তিনি বুখারা থেকে এক বিশিষ্ট আলিমকে নিয়ে আসেন।

বালাকোটের রক্তস্নাত ময়দান ও সাইয়েদ বেরলভী (রহ.)-এর শাহাদাত

১৭৫৭ সাল থেকে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যায় প্রতিষ্ঠিত ছিল ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসন। এ সময় সাইয়েদ আহমাদ বেরলভী তাঁর কর্মস্থল হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন দুর্গম পাহাড়ি এলাকা। প্রতিরক্ষার দৃষ্টিতে এলাকাটি ছিল খুবই সুরক্ষিত। সেখানকার জনসংখ্যার শতকরা একশত ভাগ ছিল মুসলিম। ১৮২৭ সালের ১১ জানুয়ারি 'সামাহ' নামক স্থানে আলিম গোত্রীয় সরদারদের এক বিরাট সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সেই সমাবেশে সাইয়েদ আহমাদ বেরলভী আমির নির্বাচিত হন। সামাহকে কেন্দ্র করে একটি রাষ্ট্র অস্তিত্ব লাভ করে। তিনি ইসলামী শরী'আহ অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা শুরু করেন। শিখ রাষ্ট্রপ্রধান রণজিৎ সিং ইসলামী রাষ্ট্রের অস্তিত্ব মেনে নিতে পারেননি। অচিরেই এই নবগঠিত রাষ্ট্রের ওপর শিখদের হামলা শুরু হয়। ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে কাগান ও কাশ্মীরের কয়েকজন মুসলমান সর্দার শিখদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য প্রাথমিকভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। পরে এ ব্যাপারে সাহায্যের জন্য তাঁরা সৈয়দ আহমাদ বেরলভীর নিকট আবেদন জানান। মুসলমান ভাইদের সাহায্যের ডাকে সাড়া দিয়ে সৈয়দ সাহেব

www.pathagar.com

মুজাহিদ বাহিনীকে তৈরি হওয়ার নির্দেশ দেন। সোজা পথে প্রতিবন্ধকতা থাকায় সৈয়দ সাহেব তাঁর বাহিনী নিয়ে এক দুর্গম পথে কাশ্মীর রওনা হন। শীতের তীব্রতা এবং পথ বন্ধুর হওয়ায় দীর্ঘদিন পর মুজাহিদ বাহিনী ঐ সালেরই এপ্রিল মাসের শেষ সপ্তাহে বালাকোট ময়দানে ক্লান্ত-শ্রান্ত অবস্থায় উপস্থিত হন।

বালাকোটে অবস্থানকারীদের অবস্থা, সংখ্যা এবং গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করা সুবিধাজনক ছিল। মুজাহিদ বাহিনী বালাকোটে পৌঁছার পর পার্শ্ববর্তী এলাকায় পাহারারত মুজাহিদ বাহিনীর কয়েকটি টহল দলের সাথে শিখ টহল দলের মধ্যে কিছু বিচ্ছিন্ন সংঘর্ষ হয়েছিল। এসব সংঘর্ষের প্রায় সবগুলোতেই মুজাহিদগণ বিজয় লাভ করেছেন; কিন্তু শিখ শিবিরে শিখ সৈন্যদের সংখ্যা মুজাহিদ বাহিনীর চেয়ে বহুগুণ বেশি ছিল। পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য মুজাহিদ শিবিরে শুরার বৈঠক বসল। শুরায় দু'ধরনের মতামত এলো। এক : মুজাহিদ বাহিনীকে বিশ্রাম করতে দেয়া এবং বাহিনী বৃদ্ধি করে পরে আক্রমণের উদ্দেশ্যে এখন আত্মরক্ষা করে নিরাপদ স্থানে সরে যাওয়া প্রয়োজন। দুই : শত্রুকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন না করে আল্লাহর ওপর ভরসা করে শত্রুর মোকাবিলায় অগ্রসর হওয়া। এতে বিজয় লাভ করলে গাজী এবং মৃত্যুবরণ করলে শহীদ। অতএব আত্মরক্ষার চেষ্টা না করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে হবে। শেষ পর্যন্ত বৈঠকে দ্বিতীয় মতের পক্ষেরই সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। জয়-পরাজয়ের দায়িত্ব আল্লাহর ওপর ছেড়ে দিয়ে মুজাহিদ বাহিনী যুদ্ধের জন্য তৈরি হতে থাকেন।

১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে মে মাসের ৬ তারিখে সুর্যোদয় হলো। মাটিকোটের উত্তর দিকে শিখ সৈন্যদের অগ্রযাত্রা দেখা দিল। তাদের গতি বালাকোটের দিকে। ক্রমেই শিখদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। মুজাহিদ শিবিরে এবং পার্শ্ববর্তী মুসলিম জনবসতিতে শিখদের বন্দুকের গুলি এসে পৌঁছতে লাগলো। এ পরিস্থিতিতে খুব ভোরে খাওয়া-দাওয়া সেরে নিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়ার নির্দেশ এলো। এমন সময় মুযাফফরাবাদের আমীর মাসুদ খানের একটি গোপন চিঠি সৈয়দ সাহেবের হাতে পৌঁছানো হলো। চিঠির বিষয়বস্তু ছিল যদি শিখ সৈন্যদের মোকাবিলা করতে পারবেন বলে মনে করেন, তবে সেখানেই থাকুন। অন্যথায় বারনা অথবা সতবনের খাল দিয়ে মুজাহিদ বাহিনীকে নিয়ে পাহাড়ের পেছনে চলে যান। এর আগেও নজফ খান একই ধরনের আরেকটি চিঠি সৈয়দ সাহেবের নিকট পাঠিয়েছিলেন। এবার সৈয়দ সাহেব নজফ খানের জন্য উত্তর লিখে পাঠালেন– আপনার দু'খানা পত্র আমি পেয়েছি। আপনার পরামর্শও অবগত হলাম। আমাদের প্রতি আপনার যে হক ছিল, তা আপনি পালন করেছেন। আল্লাহ আপনাকে তার প্রতিদান দিন। কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধান, লোক কম-বেশির প্রশ্ন আদৌ আমাদের সামনে নেই। শুরার সিদ্ধান্তও

www.pathagar.com

তাই। তাছাড়া শত্রুর ভয়ে সরে যাওয়া ইসলাম কখনো অনুমোদন করে না। আল্লাহর ইচ্ছা এই বালাকোটেই বাস্তবে পরিণত হবে। সৈয়দ আহমদ বেরলভীর নিজেই আজকের যুদ্ধে সেনাপতির দায়িত্ব পালন করছেন। ছোট ছোট গ্রুপ কমান্ডারদের প্রতিও নির্দেশ হলো সমবেত আক্রমণ হবে। সকলেই নিজ নিজ ব্যূহর মধ্যে থেকেই গুলি চালাবে। যেহেতু শত্রুসৈন্য বেশি, সেহেতু বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে নয়, সম্মিলিতভাবে আক্রমণ করলেই সুবিধা হবে। শিখ সৈন্যরা ক্রমে ক্রমে মুজাহিদ বাহিনীর দিকে স্রোতধারার মতো অগ্রসর হতে থাকে। শিখ সৈন্যরা খুব কাছাকাছি পৌঁছলে ইমাম সাহেব তাকবীর ধ্বনি করে আক্রমণ করলেন এবং সকলকে আক্রমণের নির্দেশ দিলেন।

মুজাহিদ বাহিনীর প্রথম আক্রমণ সহ্য করতে না পেরে শিখ বাহিনী পশ্চাদপসারণ করে পাহাড়ের উপর আরোহণ করতে থাকে। মুজাহিদ বাহিনী তাদের পিছু ধাওয়া করতে করতে পাহাড়ের পাদদেশে উপস্থিত হয়। শিখ সেনাপতির উৎসাহে শিখ বাহিনী আবার সামনে অগ্রসর হতে শুরু করে। ইমাম সাহেব পুনরায় বিদ্যুৎবেগে শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। শত্রুদের কেউ অস্ত্র ধারণ করলো, কেউ পলায়ন করলো; কিন্তু কোথায় পালাবে? তারা পাহাড় থেকে স্রোতের বেগে নামছিল, অতটা দৌঁড়ে পাহাড়ে উঠতে পারছিল না। যারা নিচে নেমে গিয়েছিল তাদের প্রায় সকলেই নিহত হলো। উপর থেকে শিখ সৈন্যরা গুলি করছিল বৃষ্টির মতো। উভয়পক্ষে পাথর বিনিময়ও চলছে। অবশেষে অসংখ্য শিখ স্রোতের মতো মুজাহিদ বাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লে প্রচণ্ড যুদ্ধ, হাতাহাতি এবং মল্ল যুদ্ধ শুরু হয়। এক একজন মুজাহিদ কোনো বর্ণনা মতে ১০০ শিখ সৈন্যের সাথে মোকাবিলা করতে করতে শাহাদাত বরণ করেন। এক পর্যায়ে দুপুর ১১টা কি ১২টার দিকে গুলির আঘাতে মারাত্মকভাবে আহত হয়ে মাটিকোটের খালের তীরে সৈয়দ আহমাদ বেরলভী ইমাম শাহাদাত বরণ করেন। দিনটি ছিল ১৮৩১ সালের ৬ মে রোজ শুক্রবার ১২৪৬ হিজরির ২০ যিলকদ।

এই যুদ্ধের পরও প্রায় তিনশত মুজাহিদ জীবিত ছিলেন। শিখ সৈন্যরা যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করলে মুসলিম অধিবাসীগণ মুজাহিদদের লাশ দাফন করেন। একই মাসের ১৮ তারিখে অর্থাৎ মাত্র ১১ দিনের ব্যবধানে ইংরেজদের কামানের মুখে বঙ্গবীর তিতুমীরের বাঁশের কিল্লা উড়ে যায় এবং তিনিও সেখানে শহীদ হন। ইংরেজদের পরাধীনতা থেকে স্বাধীনতা লাভের জন্য প্রথম বাংলা ভাষাভাষী শহীদের গৌরব একমাত্র তাঁরই। সৈয়দ আহমদ বেরলভীর ত্বরীকায়ে মুহাম্মাদী আন্দোলন তাঁর শাহাদাতের পর সরাসরি ব্রিটিশবিরোধী ভূমিকা পালন করে। আর বাংলাদেশের ফরায়েজী আন্দোলন এবং উদ্যোক্তাদের জীবদ্দশাতেই

www.pathagar.com

ব্রিটিশবিরোধী ছিল। কিন্তু এই তিনটি আন্দোলনের মধ্যে সাংগঠনিক মজবুতি এবং ক্যাডার পদ্ধতির কারণে সৈয়দ আহমদ বেরলভীর ত্বরীকায়ে মুহাম্মাদী আন্দোলনই দীর্ঘস্থায়ী এবং সুদূরপ্রসারী হয়েছিল।

১৮৫৮ সালে ইংরেজরা শিখ এবং নেপালের গুর্খা সৈন্যদের সহযোগিতায় ভারতের আযাদী সংগ্রামকে স্তব্ধ করে দিতে সক্ষম হয়। হাজার হাজার সৈনিককে ফাঁসি দেয়া হয়। খোঁজাখুঁজি করে ত্বরীকায়ে মুহাম্মাদীয়ার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের গ্রেফতার করা শুরু হয়। ১৮৬৫ সনে অনুষ্ঠিত হয় পাটনা ট্রায়াল। অন্যতম সেরা সংগঠক মৌলভী আহমাদুল্লাহকে গ্রেফতার করে ১৬ জানুয়ারি বিচারের সম্মুখীন করা হয়। মহারানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অপরাধে তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। অবশ্য হাইকোর্ট এই দণ্ড পরিবর্তন করে তাঁকে সারা জীবনের জন্য আন্দামানে নির্বাসন দণ্ড দেয়। ১৮৬৫ সালের জুন মাসে মৌলভী আহমাদুল্লাহকে আন্দামান পৌঁছানো হয়। এরপর হাজী মোবারক আলীর নেতৃত্বে এই আন্দোলন এগিয়ে চলে। ১৮৬৬ সালে অনুষ্ঠিত হয় আমবালা ট্রায়াল। ২ মে মৌলভী ইয়াহইয়া আলী, মুহাম্মদ জা'ফর থানেশ্বরী এবং মুহাম্মদ শাফীকে মহারানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অপরাধে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। লে. গভর্নর দণ্ড পরিবর্তন করে তাঁদেরকে সারা জীবনের জন্য আন্দামান দ্বীপে নির্বাসনে পাঠানোর সিদ্ধান্ত দেন। তাঁদেরকে শিকল পরিয়ে হাঁটিয়ে আমবালা থেকে লাহোরে আনা হয়। সেখান থেকে করাচী, করাচী থেকে বোম্বাই পরে আন্দামান দ্বীপে পাঠিয়ে দেয়া হয়। এই আন্দোলনের কর্মীদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস গ্রন্থে উইলিয়াম হান্টার লিখেছেন, মুহাম্মাদী আন্দোলনের কর্মীরা ছিল অক্লান্ত পরিশ্রমী, ব্যক্তিস্বার্থ সম্পর্কে একেবারে অমনোযোগী, নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী, বিধর্মী ইংরেজ উৎখাত করার জন্য সর্বস্ব ত্যাগে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, কর্মী, সমর্থক ও অর্থ সংগ্রহের স্থায়ী ব্যবস্থা পত্তনে অত্যন্ত সুকৌশলী এবং চরিত্রবান হিসেবে সর্বদা প্রশংসার যোগ্য।

হাজী শরীয়তুল্লাহ ও তিতুমীরের আন্দোলন

সৈয়দ আহমাদ বেরলভীর আন্দোলন চলাকালীন বাংলাদেশের ফরিদপুর ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় ফারায়েজী আন্দোলন নামে অপর একটি ইসলামী সংস্কার আন্দোলন চলছিল, যার নেতৃত্বে ছিলেন হাজী শরীয়তুল্লাহ। এ আন্দোলনটি ত্বরীকায়ে মুহাম্মাদী আন্দোলনের সাথে সামঞ্জস্যশীল ছিল। বাংলার মাটিতে যখন হাজী শরীয়তুল্লাহ বিদ্রোহের বীজ বপন করছিলেন, সৈয়দ আহমদ বেরলভীর বিপ্লবাত্মক আন্দোলন যখন উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের আকাশ-মাটি তোলপাড় করছিল, তখন উপমহাদেশের পূর্ব প্রান্তে আরেকজন মর্দে মুজাহিদ বিপ্লবের আগুন জ্বালিয়েছিলেন, তিনি হলেন সৈয়দ নিসার আলী, যিনি তিতুমীর

www.pathagar.com

নামে সমধিক খ্যাত। ১৭৮২ সালে চব্বিশ পরগণা জেলার চাঁদপুর গ্রামে তিতুমীর জন্মগ্রহণ করেন। সৈয়দ আহমাদ বেরলভী যখন মক্কায় হজ করতে যান, ঘটনাক্রমে তিতুমীরও সেবার মক্কা শরীফ গিয়েছিলেন। তিতুমীর সেখানে সৈয়দ সাহেবের সান্নিধ্য পান এবং তাঁর দীক্ষায় দীক্ষিত হয়ে ১৮২৭ সালে দেশে ফিরে ইসলামী সংস্কার আন্দোলন শুরু করেন। তিতুমীরের এ সংস্কার আন্দোলন চব্বিশ পরগণা, ফরিদপুর ও নদীয়া জেলায় জোরদার হয়েছিল। ওদিকে আন্দোলনের চূড়ান্ত সফলতার পূর্বেই ১৮৪০ সালে হাজী শরীয়তুল্লাহ ইন্তেকাল করেন। তিনি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর আদর্শের প্রতি অবিচল ছিলেন। এদিকে ইংরেজদের তোপের মুখে তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা উড়ে যায়।

জয়নাব আল গাজালী (রহ.)-এর কণ্ঠে নির্যাতনের কাহিনী

"আমাদের সৌভাগ্য যে, পঁচাশি বছরের বৃদ্ধাও আল্লাহর পথে জিহাদ করতে গিয়ে কারাগারের দুঃসহ নির্যাতনকে হাসিমুখে বরণ করে নিচ্ছেন; কিন্তু খোদাদ্রোহী বাতিল শাসনের সামনে মাথা নত করেননি। তাঁর ওপর আল্লাহর রহমত নাজিল হোক এবং আল্লাহ তার কাজে সন্তুষ্ট হোন।

"দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই; আল্লাহই আমাদেও জন্য যথেষ্ট। তিনিই উত্তম ব্যবস্থাপক। আমাদের প্রকৃত ঠিকানা তো আখেরাতে...। আর এই পৃথিবীতো ক্ষণস্থায়ী.....।"

কারাগারের বিভিন্ন অংশে আমি ইখওয়ানদের ওপর অত্যাচার-উৎপীড়নের বিভৎস চিত্র দেখে আঁতকে উঠি। তাদেরকে বিবস্ত্র করে খামের সাথে কষে বেঁধে বেপরোয়া চাবুক মারা হচ্ছিল। চাবুকের ঘায়ে তাদের চামড়া চৌচির হয়ে শত ধারায় রক্ত প্রবাহিত হচ্ছিল। আবার কোন কোন ইখওয়ানকে হান্টার মেরে তাদের ওপর ক্ষুধার্ত শিকারী কুকুর ছেড়ে দেয়া হচ্ছিল। কুকুরের বিষাক্ত দংশনে ক্ষতবিক্ষত হচ্ছিল তাদের দেহ। অনেক ইখওয়ানকে দৈহিক নির্যাতনের আগে দেয়ালের দিকে মুখ করে বেঁধে রাখা হয়েছিল।

দিন কেটে যেত তাদের ইসলামী আন্দোলনের কাজে, আর রাতের অন্ধকারে তারা মশগুল থাকতো আল্লাহর জিকিরে। জাতির ভবিষ্যৎ কর্ণধার এবং জনগণের নয়নের মণি এসব যুবকদের প্রতি এই নির্মম নির্যাতন, এই নিষ্ঠুর বর্বরতা প্রদর্শন কেবল ইসলামের জঘন্যতম শত্রুরাই করতে পারে! কিন্তু এই অকথ্য জুলুম-নিপীড়নের পরেও তাদের চেহারায় স্বাভাবিক দীপ্তি, ধৈর্য ও স্থিরতা দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়েছি আমি!

তাদের সারা শরীর রক্তাক্ত, হান্টারের ঘায়ে ক্ষতবিক্ষত পিঠ, চেহারায় আঁচড়ের রক্তাক্ত চিহ্ন, আর শতচ্ছিন্ন পরণের একপ্রস্থ কাপড়। যে কপাল খোদার দরবার

www.pathagar.com

ছাড়া কোনদিন কারো সামনে নত হয়নি, সেই কপাল বেয়ে দরদর করে পড়ছে উষ্ণ রক্তধারা; কিন্তু কি আশ্চর্য্য! অদ্ভুত এক রশ্মিতে ভাস্বর তাদের চোখ-মুখ। শুলিতে চড়েও তারা প্রশান্ত মুখে আল্লাহর জয়গান গাইছে। তাদেরকে ছাদ থেকে উল্টো লটকিয়ে রাখা হয়েছে, তাতেও তাদের ধৈর্য ও সত্যবাদিতায় এতটুকু ব্যত্যয় ঘটেনি।

জুলুম-নির্যাতনের স্টীমরোলার

এই প্রশান্তি বেশীদিন থাকেনি। একদিন বিকেলে হঠাৎ কক্ষের দরজা খুলে সাফওয়াত এসে উপস্থিত। সে তার হাতের চাবুক দিয়ে দেয়াল পিটাতে পিটাতে আমাকে ধরে টেনে-হেঁচড়ে কারাগারের অফিসের কাছে নিয়ে একটি চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে চলে যায়। কয়েক মুহূর্ত পরে এক ব্যক্তি এসে আমাকে জিজ্ঞেস করল-

তুমি কি জয়নব আল-গাজালী?

ইতিবাচক জবাব পেয়ে সে চলে গেল। এবার এলো বিরাটকায় ভয়ঙ্কর তিনজন সামরিক জওয়ান। মনে হচ্ছিল, তারা যেন এক্ষণি জাহান্নাম থেকে উঠে এসেছে। তাদের চেহারায় নিষ্ঠুরতার স্পষ্ট চিহ্ন। এরপর আরেক ব্যক্তি এসে তাদের জিজ্ঞেস করল-

তারা কি আমাকে চিনতে পেরেছে?

জবাবে তারা সবাই বলল-

হ্যাঁ চিনেছে বৈ-কি। এর মৃত্যুর মুহূর্ত ঘনিয়ে এসেছে।

এরপর দেখি, তারা বেরিয়ে গিয়ে ভাই ফারুক মনসাবীকে চাবুক মারছে। তাকে উঁচু কাঠের উপর লটকিয়ে রাখা হয়েছে আগ থেকেই। চাবুক মারার সাথে সাথে তারা ভাই ফারুককে জিজ্ঞেস করছিল-

"জয়নব গাজালীর সাথে কয়বার দেখা করেছিস? এর সাথে সাথে তারা আমাকে অশ্লীল ভাষায় গালি দেয়ার জন্যেও বলছিল। কিন্তু সেই আল্লাহর বান্দা ওদের কথা মানতে অস্বীকার করলে পিটুনির মাত্রা বৃদ্ধি পায়। তাঁর এই অবস্থা দেখে আমার চোখ ফেটে অশ্রুর বদলে যেন রক্ত গড়িয়ে পড়ছিল। অনেক মারধরের পর ভাই ফারুককে মাটিতে ছুড়ে ফেলে দেয়া হয়। তাঁর অবস্থা দেখে মনে হচ্ছিল, এই বুঝি তাঁর প্রাণ বেরিয়ে পড়ল; কিন্তু আল্লাহর রহমতে তিনি বেঁচে যান। শেষ পর্যন্ত বিচারের নামে প্রহসন চালিয়ে তাঁকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড দেয়া হয়। আল্লাহর এই সৈনিক জেলে বসেও কায়েদীদের মধ্যে ইসলাম প্রচার করে তাদেরকে ইসলামী আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত ইসলামের দুশমনরা তাঁকে লিমানতারা জেলে নিয়ে গিয়ে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাই রাজেউন) তিনি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে অবিচল থেকে শাহাদাতের সৌভাগ্য অর্জন করেন।

www.pathagar.com

পাপিষ্ঠরা শুধু ভাই ফারুকের ওপরই এমন অত্যাচার করেনি। তারপর, তারা অন্য এক ভাইকে কাঠে লটকিয়ে সেই একই ধরনের প্রশ্ন করে এবং আমাকে গালি দিতে বলে। কিন্তু ভাইটি গালি দিতে অস্বীকার করলে তাঁকে এমন নিষ্ঠুরভাবে মারা হয় যে, তিনি বেহুঁশ হয়ে পড়েন। এই অবস্থায় তিনি মরে গেছেন মনে করে স্ট্রেচারে তুলে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। আসলে পাপিষ্ঠরা মনে করেছিল, এসব দেখে আমি তাদের মর্জিমত মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে রাজী হয়ে যাব। এ উদ্দেশ্যেই তারা আমার কাছে এক ব্যক্তিকে পাঠায়। সেই ব্যক্তি আমার কাছে এসে নিজেকে অত্যন্ত ভদ্র এবং আমার শুভাকাঙ্ক্ষি হিসেবে জাহির করার চেষ্টা করে।

সে এসে আমাকে সালাম করে পরিচয় দেয়-

পরে আমি জানতে পেরেছি, তার কথা মিথ্যা। আসলে সেও ঐ শয়তানদেরই একজন। সে তার কথা শুরু করতে গিয়ে বলে-

"জয়নব, আমি তোমার সাথে সমঝোতা করতে আগ্রহী। তুমি নিজেই নিজেকে সে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছ, তা থেকে তোমার মুক্তি করানোই আমার উদ্দেশ্য......। তুমি একজন সম্মানীতা মহিলা। একটু ভেবে দেখতো! হুজায়বীর মতো লোকেরা পর্যন্ত সব স্বীকার করে নিয়েছে এবং তারা তোমার ব্যাপারে এমনসব কথা প্রকাশ করেছে, যাতে তোমার ফাঁসির শাস্তিও হতে পারে। তারা নিজেদেরকে তো বাঁচিয়ে নিয়েছে; কিন্তু তোমাকে আরো বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছে। আমার মতে সময় থাকতে তুমি এখনো নিজের মান-ইজ্জত রক্ষা কর এবং সবকিছু বলে দাও। বল, তাদের উদ্দেশ্য কি ছিল? এবং তোমার নিজের মতামতও বিস্তারিত ভাবে জানাও। আমার ধারণা, তোমার মতামতই যথার্থ হবে।"

ওর এসব ভনিতা শুনেও আমি চুপ করে রইলাম। কোন জবাব না পেয়ে সে আবার বলল-

"জয়নব, তুমি খুব ভেবেচিন্তে জবাব দিও। আসলে আমি প্রকৃত ব্যাপার জানতে চাই।"

এবার আমি বললাম-

"আমার যতটুকু ধারণা, ইখওয়ানুল মুসলিমুন এমন কোন কাজ করেনি, যা কোন সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তির কাছে ক্রোধের কারণ হতে পারে। আমি নিজেও ইখওয়ানের সাথে রয়েছি। আমরা এমন কিই-বা অপরাধ করেছি? আমরা লোকদের ইসলামী শিক্ষা দেই, এটা কি কোন অপরাধের কাজ?"

এই বলে আমি চুপ করে গেলে সে বলল-

www.pathagar.com

কিন্তু এতেকরে এটা প্রমাণিত হচ্ছে যে, তারা এমন অনেক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল, যার মধ্যে জামাল আবদুন নাসেরের হত্যা এবং দেশে অরাজকতা সৃষ্টির ষড়যন্ত্রে শামিল ছিল। আর তাতে তুমি তাদের মদদ দিচ্ছিলে। দেখ, আমি এটর্নি, বাস্তব সম্পর্কে অবহিত হওয়াই আমার কাজ। আমি বললাম-

আবদুন নাসেরকে হত্যা করা বা দেশে অরাজকতা সৃষ্টি করা ইখওয়ানের উদ্দেশ্য হতেই পারে না। বরং জামাল নাসেরই দেশকে ধ্বংস করে ছেড়েছে। বস্তুতঃ আমাদের উদ্দেশ্য অনেক উন্নত এবং গঠনমূলক এটা একটা অকাট্য সত্য। আমরা নিখুঁত তাওহীদ, ইবাদাত তথা কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে আল্লাহর মনোনীত জীবনাদর্শ কায়েম করতে চাই। আমরা যখন এই মহৎ উদ্দেশ্য অর্জন করব, তখন মিথ্যে জুলুমাতের তখত-তাউস আপনা থেকেই বিলুপ্ত হয়ে যাবে। সব নকল কাহিনীর বিনাশ ঘটবে। মনে রেখো, আমাদের উদ্দেশ্য সংস্কার সাধন ও পুনর্গঠন। ভাঙ্গা নয় নির্মাণ এবং উন্নতিই আমাদের কাম্য। একথা শুনে সে হেসে বলল-

"প্রকৃতপক্ষে তোমরা জামাল নাসের এবং তার সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছিলে। এটা তোমার কথাতেই বোঝা যায়।" আমি বললাম-

দেখ, ইসলামে ষড়যন্ত্র, চক্রান্তের কোন অবকাশ নেই। আমরা ওসব জানি না; বরং আমরা সব রকমের অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার। আমরা মানুষের সামনে দুটি পথের স্বরূপ তুলে ধরি। তার একটি হচ্ছে আল্লাহর নির্দেশিত পথ এবং অন্যটি শয়তানের পথ। যারা শয়তানের পথে চলে আমরা তাদেরকে বিভ্রান্ত রোগী মনে করি। এসব লোকদের আমরা অত্যন্ত স্নেহের সাথে সত্যের ওষুধ দান করি। আর তা হচ্ছে আল্লাহর শরীয়ত, আল্লাহর দ্বীন।

"আমরা কুরআন নাযিল করেছি, তা মোমেনদের জন্যে রহমত এবং মুক্তি (স্বরূপ), এবং অত্যাচারীদের জন্যে ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই নেই।"

এবার সেই শয়তানের কথাবার্তা পাল্টে যেতে লাগলো, যে নিজেকে এটর্নি হিসেবে জাহির করছিল। আসলে এ ছিল সাঈদ আবদুল করিম। সে এই বলে বেরিয়ে গেল-

"আমি তোমার উপকার করতে চেয়েছিলাম; কিন্তু মনে হচ্ছে, তুমি এখনো ইখওয়ানের ভাবপ্রবণতার শিকার হয়ে রয়েছো।"

এরপর সাফওয়াত রুবী এসে আমাকে দেয়ালের দিকে মুখ করিয়ে দেয়। এভাবে বেশ কয়েক ঘণ্টা পর্যন্ত আমাকে নিশ্চলভাবে দাঁড় করিয়ে রাখে এবং আমার সামনে ইখওয়ানদের ওপর অকথ্য ও অমানুষিক নির্যাতন চালাতে থাকে। এসব দেখে দেখে আমার রক্ত পানি হচ্ছিল শুধু। এঁদের মধ্যে অনেককেই আমি ঘনিষ্ঠভাবে জানি। যেমন, সারসী মুস্তফা, ফারুক আসসাদী, তাহের আব্দুল

আজীজ সালেম। এঁরা আন্দোলনের বিশিষ্ট কর্মী। কিছুক্ষণ পর সেই তথাকথিত এটর্নি, হামজা বিসিউবি এবং সাফওয়াত রুবি ফিরে আসে। হামজা বলল-

"তুমি এটর্নির সাথে সমঝোতায় আসতে চাচ্ছ না কেন? আমরাতো তোমাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করতে চাচ্ছি। আমি তোমার স্বামীকে যতটুকু জানি, তিনি খুবই ভাল লোক; কিন্তু তুমি প্রতারণার শিকারে পরিণত হয়েছো। হাসান হুজায়বী সব কিছুই বলে দিয়েছে।

আমি শ্লেষের স্বরে জিজ্ঞেস করলাম-

"সত্যিই কি ইখওয়ানরা সবকিছু বলে দিয়েছে? আর এজন্যেই তোমরা ওদের ওপর এখানো অমানুষিক নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছ? তাদের গুলিকাষ্ঠে ঝুঁলিয়ে চাবুক মারছো!...জেনে রেখো, আমি কক্ষণো ইখওয়ানের বিরুদ্ধে বা আমার নিজের বিরুদ্ধে মিথ্যা বলতে পারবো না। আমরা মুসলমান। ইসলামের জন্যেই আমাদের সব চেষ্টা সাধনা। এই আমাদের কাজকর্ম।"

এদের পিছনে চারজন জল্লাদ দাঁড়িয়েছিল। ওদের হাতের হান্টার ও চাবুক এই ক্ষণিক আগে ইখওয়ানদের রক্ত ঝরাচ্ছিল। আমি তথাকথিত এটর্নির দৃষ্টি সেদিকে আকর্ষণ করে তিরস্কারের স্বরে বললাল-

মিষ্টার এটর্নি! এসব হান্টার আর চাবুকও বুঝি আপনাদের আইন কলেজের পাঠ্য সূচীর বিষয়বস্তু ছিল?- আমার কথা শেষ হবার আগেই হামজা বিসিউনি আমার গালে প্রচণ্ড এক চড় বসিয়ে দিয়ে বলল-

"তুই আমাদের সবাইকে পাগল ঠাউরিয়েছিস, না? আমি তোকে আজ এমন ভাবে দাফন করে দেবো, যেভাবে রোজ দশজন ইখওয়ানকে দাফন করে থাকি।"

আমি দ্বিতীয়বার তথাকথিত এটর্নির দিকে লক্ষ করে বললাম-

সত্যি সত্যিই যদি এটর্নি হয়ে থাক, তাহলে তুমি তোমার সার্বক্ষণিক ডায়রীতে এসব অত্যাচারের ঘটনা নোট করছ না কেন?... তাছাড়া তুমি যে এটর্নি তার প্রমাণ কি....?

একথা শুনে হামজা বিসিউনি বলল-

"ব্যাস, যাও তোমরা নিজ নিজ কাজে যাও। আমি তো এর উপকার করতে চেয়েছিলাম; কিন্তু সে যে তা চায় না।"

এর সাথে সাথে সাফওয়াত এবং তার সাথী জল্লাদরা এলোপাথাড়ীভাবে আমার ওপর হান্টার চালাতে শুরু করে। চোখ রক্ষার জন্যে আমি দু'হাতে চোখ ঢেকে রাখি। বাকী সমগ্র শরীর হান্টারের আঘাতে জর্জরিত হচ্ছিল। আমি এই দুঃসহ উৎপীড়নের অনুভূতি হ্রাসের উদ্দেশ্যে আল্লাহর দারবারে মোনাজাত করি এবং

www.pathagar.com

হান্টারের প্রতিটি ঘায়ের সাথে "ইয়া রব-ইয়া আল্লাহ' শব্দ উচ্চারণ করতে থাকি।

সাফওয়াত ও তার সঙ্গীরা অনেক হান্টার চালিয়ে প্রায় ক্লান্ত হয়ে গিয়ে আমাকে বেঁধে দেয়ালের গায়ে লটকিয়ে রাখে এবং হাত দু'টিকে যতটুকু সম্ভব উপর দিকে টেনে বেঁধে রেখে চলে যায়। এ অবস্থায় আমার শান্তি ও আরাম লাভের একমাত্র সম্বল ছিল আল্লাহর নাম জিকির করা। সুতরাং আল্লাহর নাম জিকির এবং তাঁরই কাছে মোনাজাত করতে থাকি।

বেশ কয়েক ঘণ্টা এভাবে রাখার পর সাফওয়াত সাম্বো নামক এক কৃষ্ণাকায়কে নিয়ে আমার কাছে আসে। আসা মাত্রই তারা উভয়ে আমার উপর ধামাধাম কিল-ঘুষি আর চড় মারতে থাকে। এরপর আমাকে সেলে নিয়ে বন্ধ করে দেয়।

ওরা চলে যাবার পর দূরে কোন মসজিদের মিনার থেকে ফজরের আযান ধ্বনি ভেসে আসে। আমি সব ব্যথা-বেদনা ভুলে গিয়ে প্রথমে নামায আদায় করি। এরপর দু'হাত তুলে খোদার কাছে বলি-"ইয়া রাব্বুল আলামীন, তুমি যদি আমার ওপর অসন্তুষ্ট না হও তাহলে দুনিয়ার কোন অত্যাচারকেই ভ্রূক্ষেপ করিনা। তোমার দয়া এবং রহমত আমার জন্যে যথেষ্ট। আমি তোমার আলোক কামনা করি যা দুনিয়া ও আখেরাতকে আলোকিত করে এবং তোমার অসন্তুষ্টি ও গজব থেকে মুক্তি চাই। হে খোদা, আমি তোমারই দরবারে হাজির হয়েছি- হে প্রভু! তুমি আমার ওপর সন্তুষ্ট থাক; নিঃসন্দেহে তুমিই সব কিছুর মালিক সর্বশক্তিমান"

প্রেসিডেন্ট নাসেরের চিঠি

সেলের দরজা বন্ধ হয়ে গেলে আমি যেন আরেক দুনিয়ায় গিয়ে পৌঁছুই। সমস্ত শরীর, প্রতিটি জোড়া এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেন খসে পড়ে যাচ্ছে। ব্যথা-বেদনা, জ্বালা ও যন্ত্রণায় অস্থির অবস্থা। কিছুতেই শান্তি পাচ্ছি না। বসতে পারছি না, দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না। জড়সড় হয়ে একটু শুতে চেষ্টা করলাম; কিন্তু ব্যথা। চাবুক-হান্টার, কিল-ঘুঁষি এবং লাথির আঘাতে অসহ্য যন্ত্রণায় শুধু ছটফট করছিলাম। মেরে মেরে ওরা আমার গোটা শরীরকে ক্ষত-বিক্ষত করে দিয়েছে আর অকথ্য-অশ্রাব্য গালি দিয়ে আমার আত্মাকে বিষণ্ন করে দিয়েছে। অস্থিরতা ও যন্ত্রণায় এপাশ ওপাশ করতে করতে ফজরের আজান শোনা গেল। আলীয়া এবং গা'দা আম্মার নামাজের জন্য জেগে উঠল। আমরা তায়াম্মুম করে নামাজ আদায় করি। আমার অবস্থা ছিল তখন সকল প্রশ্নে জবাবের মত। কি হয়েছে, কেন হয়েছে, তা স্পষ্টই বোঝা যায়। আলীয়া আমাকে বলল-

ডাক্তার আমাকে ঘুমের বড়ি দিয়েছে। আপনি নেবেন কি একটা.......?

www.pathagar.com

আমি বললাম--

দিতে পার। আমি ঘুমাবার উদ্দেশ্যে চাইলাম; কিন্তু কোথায় ঘুম; আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ শরীর আর আহত মনের অস্থিরতায় ঘুম আসবে কোত্থেকে? একমাত্র আল্লাহর রহমত ছাড়া আর কোন উপায় নেই। আমি আল্লাহর নামের মধ্যেই প্রশান্তি খুঁজে পাই। এত নির্যাতনের মধ্যেও নামাজের জন্যে এবং আল্লাহর কুরআন পাঠের জন্যে নিজের মধ্যে এক অজানা শক্তির আভাষ পাই।

গা'দা আম্মার সেলে দেয়ালে দাগ কেটে তারিখ লিখে রাখতো। সে বলল-

আজ আঠারই অক্টোবর। আমি বললাম-

আল্লাহর ফজলে অবশিষ্ট দিনগুলোও পেরিয়ে যাবে। আলীয়া বলল-

ইনশাআল্লাহ।

বিকেল চারটায় সেলের দরজা খুলে সাফওয়াতের সাথে দু'জন সিপাহী প্রবেশ করল। তাদের হাতে মস্তবড় এক স্যুটকেস। স্যুটকেস দেখেই তা আমি চিনে নিয়েছি। এটা আমার বাড়ী থেকেই আনা হয়েছে। সাফওয়াত স্যুটকেস খুলে একটা জিনিস বের করে দেখাতে দেখাতে বলল-

জয়নব, এসব কাপড়-চোপড় এবং জিনিসপত্র আমরা তোমার বাড়ী থেকে আনিয়েছি। এরপর সব জিনিস আবার স্যুটকেসে ভরে তা বন্ধ করে রাখল। দেখে মনে হচ্ছিল, যেন আমাকে কোথাও লম্বা সফরে পাঠানো হবে।

আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম-

এসব কে আনিয়েছে এবং কে এনেছে? সাফওয়াত বলল-

আমরাই আনিয়েছি এবং তোমার বোন হায়াত এসব এখানে পৌঁছিয়ে গেছে। এরপর সে সিপাহীদেরকে চলে যেতে বলে, একটু পরে নিজেও ফিরে যায়। জল্লাদকে আবার ফিরে আসতে দেখ বিরক্তিতে চোখ বন্ধ করে রাখি এবং হঠাৎ অচেতন হয়ে পড়ি। আলীয়া ও গা'দা ত্বরিত আমার হাত-পায়ের তালু মালিশ করতে শুরু করল। ওদের চেষ্টায় আমার চেতনা ফিরে এলে ওরা আমাকে সান্ত না দিয়ে বলল-

কিছু নয়, আলহাজ্বা! ব্যাপারটা তো খুবই সহজ! আপনার পরণের কাপড় নষ্ট হয়ে গেছে তাই হয়তো ওরা ভাল কাপড়-চোপড় আনিয়েছে। আর কোন বিশেষ কারণ নেই।

আলীয়াকে বললাল–

এটা আসন্ন সংকটের ইঙ্গিত বহন করছে, আলীয়া!

না আলহাজ্বা! ওরা স্রেফ আপনার প্রয়োজনের তাগিদেই এসব আনিয়ে থাকবে। -আলীয় বলল।

www.pathagar.com

আমি বললাম–

না আলীয়া, না! এটা আরেক পরীক্ষা নয়তো! শুধু আমার কাপড়ই আনা হবে কেন? আমি তো আনতে বলিনি– আমার ওপর বিরাট বিপদ আসতে যাচ্ছে....আল্লাহ্ আমাকে সত্যের উপর সুদৃঢ় রেখে বিপদমুক্ত করুন।

আমরা আসরের নামাজ আদায় করছিলাম। হঠাৎ সাফওয়াত ভেতরে ঢুকে আমাকে নামাজ থেকেই ধাক্কা মেরে টেনে-হেঁচড়ে নিয়ে যেতে যেতে বলল-

আমার সাথে চল। এরপর আলীয়া ও গা'দাকে সেলে বন্ধ করে আমাকে নিয়ে চলে যায়। সে আমাকে আলাদা এক গ্যালারীতে নিয়ে যায়। এরপর কী সংকীর্ণ অন্ধকার এবং দুর্গন্ধময় স্থানে ঠেলে দেয়া হয়। এ স্থানটি ছিল সাপ ও ইঁদুরের গর্তে ভরা ভীষণ ভয়ঙ্কর স্থান। প্রচণ্ড শীত, দুর্গন্ধ এবং ভয়াল নীরবতা আমাকে দারুণভাবে সন্ত্রস্ত করে তোলে। আমি অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি এবং সংকট মোকাবিলার জন্যে তাঁর সাহায্য কামনা করি।" জেনে রেখো, আল্লাহর নাম জপলে আত্মায় এক অবর্ণনীয় শক্তি ও প্রশান্তির সঞ্চার হয়।

হঠাৎ আলো দেখা দেয় এবং সাফওয়াত ভেতরে এসে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল-

নে এই চিঠি পড়ে নে।

আমি চিঠি খুলে দেখলাম ছাপার অক্ষরে লেখা-

"প্রেসিডেন্টের দফতর। এরপর টাইপের অক্ষরে লেখা হয়েছে–

"প্রেসিডেন্ট আবদুন নাসেরের নির্দেশে জয়নব আল-গাজালীকে পুরুষদের চেয়েও বেশি নির্যাতন এবং দুঃখময় শাস্তি দেয়া হোক।"

স্বাক্ষর

জামাল আবদুন নাসের

মিশরের প্রেসিডেন্ট

www.pathagar.com

সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী (রহ)

বিশ্বব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টিকারী ইসলামী চিন্তাবিদ, গবেষক, লেখক, সংগঠক, প্রতিষ্ঠাতা বহুবিদ প্রতিভার অধিকারী শতাব্দীর গুণের ক্ষনজন্মা প্রাণপুরুষ সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী (রহঃ)।

১৯০৩ সালে হিন্দুস্থানের (ভারতের) হায়দারাবাদ রাজ্যের (বর্তমান অন্ধ্র প্রদেশ) আওরঙ্গাবাদ শহরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর আব্বার নাম সাইয়েদ আহমাদ হাসান। আম্মার নাম রুকাইয়া বেগম। সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রহ) আল হুসাইন ইবনু আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বংশের বিয়াল্লিশতম পুরুষ।

তাঁর শ্রদ্ধেয় আব্বার কাছেই সাইয়েদ আবুল আ'লার শিক্ষা জীবন শুরু হয়। বয়স বাড়ার সাথে সাথে তাঁকে বিভিন্ন বিষয়ে শেখানোর জন্য গৃহ-শিক্ষক রাখা হয়। এগার বছর বয়সে তিনি আওরঙ্গাবাদের মাদ্রাসা ফাওকানিয়াতে অষ্টম শ্রেণীতে ভর্তি হন। ঐ মাদ্রাসাতে ভাষার সাথে সাথে গণিত, পদার্থ বিদ্যা, রসায়ন বিদ্যা ও ইতিহাস বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শীতা অর্জন করেন।

১৯১৬ সনে তিনি মাদ্রাসা ফাওকানিয়া থেকে ম্যাট্রিকুলেশান মানের পরীক্ষা পাস করেন ও হায়দারাবাদ কলেজে ভর্তি হন। তখন তাঁর আব্বা পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়ে ভূপালে অবস্থান করছিলেন। আব্বার সেবা-যত্নের জন্য সাইয়েদ আবুল আ'লা তাঁর আম্মাকে নিয়ে ভূপালে আসেন। তখন তাঁর কলেজ-জীবনের মাত্র ছয়টি মাস অতিবাহিত হয়েছে। এই অল্প বয়সেই তাঁর ছাত্র জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

এই সময় প্রখ্যাত লেখক নিয়ায ফতেহপুরীর সাথে তরুণ সাইয়েদ আবুল আ'লার সাক্ষাত ও পরিচয় ঘটে। এরই মধ্যে সাইয়েদ আবুল আ'লা সংকল্প গ্রহণ করেন যে, তিনি একজন লেখক হবেন ।

১৯১৮ সনে বিজনৌর থেকে প্রকাশিত মাদীনা পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হন সাইয়েদ আবুল আ'লার বড়ো ভাই সাইয়েদ আবুল খায়ের মওদূদী। সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী সম্পাদকীয় স্টাফের একজন সদস্য হিসেবে মাদীনা পত্রিকায় যোগ দেন। এভাবে একজন সাংবাদিক হিসেবে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। এই সময় তিনি মাত্র পনর বছরের একজন তরুণ। অবশ্য দুই মাস পর তাঁদেরকে দিল্লী চলে আসতে হয়।

১৯১৮ সনেই জনৈক তাজউদ্দিন জব্বলপুর থেকে সাপ্তাহিক তাজ নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। সাইয়েদ আবুল খায়ের ও সাইয়েদ আবুল আ'লার ওপর সম্পাদনার দায়িত্ব অর্পিত হয়। কিন্তু অর্থের অভাবে কিছুকাল পরই পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়।

www.pathagar.com

দিল্লীতে অবস্থানকালে সাইয়েদ আবুল আ'লা ইংরেজী ভাষা শেখেন। তিনি গভীর মনোযোগের সাথে ইংরেজী ভাষায় লিখিত দর্শন, ইতিহাস, রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজ বিজ্ঞানের বই-পুস্তক পড়তে থাকেন।

খৃস্টীয় ১৯১৯ সনে বৃটিশ শাসিত উপ-মহাদেশের মুসলিমরা উসমানী খিলাফাতের অখন্ডতা অক্ষুণ্ন রাখার দাবিতে তুমুল আন্দোলন গড়ে তোলে। এই আন্দোলনেরই নাম খিলাফাত আন্দোলন। প্রবল বেগে এগুচ্ছিলো খিলাফাত আন্দোলনের জোয়ার। এই প্রেক্ষাপটে তাজউদ্দিন সাহেব ১৯২০ সনে আবার সাপ্তাহিক তাজ পত্রিকার প্রকাশনা শুরু করেন। সম্পাদক নিযুক্ত হন সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী। তখন তাঁর বয়স মাত্র সতর বছর।

সাপ্তাহিক তাজ পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী চলমান রাজনীতির দিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখছিলেন। খিলাফাত আন্দোলনের জোয়ার জব্বলপুরেও পৌছে। সাইয়েদ আবুল আ'লা এই আন্দোলনের বিভিন্ন তৎপরতার সাথে জড়িত হয়ে পড়েন। জব্বলপুরের বিভিন্ন জনসভায় তাঁকে বক্তৃতা দিতে হয়।

সাইয়েদ আবুল আ'লার নিরলস প্রচেষ্টায় সাপ্তাহিক তাজ দৈনিক তাজে উন্নীত হয়। কিন্তু দৈনিক তাজ বেশিদিন টিকে থাকতে পারেনি। বৃটিশ-বিরোধী একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করার কারণে পত্রিকাটির প্রকাশনা বন্ধ করে দেয়া হয়।

ঐ বছর সাইয়েদ আবুল আ'লার আব্বা সাইয়েদ আহমাদ হাসান ইন্তিকাল করেন। সাইয়েদ আবুল আ'লা দিল্লীতে চলে আসেন। খৃস্টীয় ১৯২১ সনে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের মুফতী কিফায়েত উল্লাহ ও মাওলানা আহমাদ সাঈদের সাথে তাঁর পরিচয় ঘটে। জমিয়ত তখন মুসলিম নামে একটি পত্রিকা প্রকাশনা শুরু করেন। সাইয়েদ আবুল আ'লা সম্পাদক নিযুক্ত হন।

দিল্লীতে অবস্থানকালে পত্রিকা সম্পাদনার ফাঁকে ফাঁকে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী প্রখ্যাত আরবী ভাষাবিদ মাওলানা আবদুস সালাম নিয়াযীর কাছে আরবী ভাষা শিখতে থাকেন এবং অল্পকালের মধ্যেই আরবী ভাষায় পারদর্শিতা অর্জন করেন। তিনি ছিলেন দারুন পরিশ্রমী। তিনি আলকুরআনের তাফসীর, আলহাদীস, আলফিকহ ও অন্যান্য বিষয় ব্যাপকভাবে অধ্যয়ন করেন। তরুণ বয়সেই তিনি ইসলামী জীবন-দর্শন ও জীবন-বিধানের একজন সুপন্ডিত রূপে গড়ে ওঠেন।

খৃস্টীয় ১৯২৩ সনে মুসলিম পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়।

খৃস্টীয় ১৯২৫ সনে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ 'আলজমিয়ত' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশনা শুরু করে। সম্পাদক করা হয় সাইয়েদ আবুল আ'লাকে।

www.pathagar.com

ঐ সনেই হিন্দুদের অন্যতম সংগঠন 'আর্য সমাজের' একজন নেতা স্বামী শ্রদ্ধানন্দ শুদ্ধি আন্দোলন শুরু করেন। তাঁর বক্তব্য ছিলো, "উপ-মহাদেশের মুসলিমদের পূর্ব পুরুষরা ছিলো হিন্দু। মুসলিম শাসকদের চাপে পড়ে তারা হিন্দুত্ব ত্যাগ করে মুসলিম হয়। এখন মুসলিমদের উচিত হিন্দুত্বে ফিরে আসা"।

এই আন্দোলন ছিলো মুসলিমদের জন্য বেদনাদায়ক। স্বামী শ্রদ্ধানন্দের প্রচারনায় উত্তেজিত হয়ে একজন মুসলিম ১৯২৬ সনে তাঁকে হত্যা করে। এতে গোটা উপ-মহাদেশে মুসলিম-বিরোধী দাংগা বেঁধে যায়। হিন্দু নেতারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে, আল-কুরআনের বিরুদ্ধে ও আলকুরআনের অন্যতম পরিভাষা আলজিহাদের বিরুদ্ধে বিষোদগার করতে থাকে।

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী এই প্রচার যুদ্ধের বুদ্ধিবৃত্তিক জওয়াব দেয়া শুরু করেন আল-জমিয়ত পত্রিকার মাধ্যমে। ১৯২৬ ও ১৯২৭ সনে মোট চব্বিশ কিস্তিতে তিনি 'আলজিহাদু ফিল ইসলাম' শীর্ষক জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশ করেন।

১৯২৮ সনে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ অল ইন্ডিয়া ন্যাশনাল কংগ্রেসের এক জাতি তত্ত্বের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করে। সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের এই ভূমিকা সঠিক বলে মেনে নিতে পারেননি। ফলে তিনি আল জমিয়ত পত্রিকার সম্পাদক পদে ইস্তফা দেন।

এই সময় তিনি গবেষকের মন নিয়ে ইমাম ইবনু তাইমিয়া (রহ), হাফিয ইবনুল কাইয়্যেম (রহ) ও শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলবীর (রহ) গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করতে থাকেন।

খৃস্টীয় ১৯৩২ সন। আবু মুহাম্মদ মুসলিহ হায়দারাবাদ থেকে মাসিক তরজুমানুল কুরআন নামে একটি ইসলামী পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ নেন। সম্পাদক নিযুক্ত করেন সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীকে। এই সময় তাঁর বয়স হয়েছিলো উনত্রিশ বছর। অল্পকাল পর এই পত্রিকার মালিকানাও তাঁর হাতে তুলে দেয়া হয়।

তারজুমানুল কুরআনের প্রথম সম্পাদকীয়তে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী লেখেন, "এই পত্রিকার উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর বাণীকে বুলন্দ করা ও মানুষকে আল্লাহর পথে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানোর আহবান জানানো। বিশেষ উদ্দেশ্য হচ্ছে আল-কুরআনের নিরিখে দুনিয়ায় বিস্তারশীল চিন্তা-চেতনা, সভ্যতা-সংস্কৃতির নীতিমালার ওপর মন্তব্য করা; বর্তমান দর্শন, বিজ্ঞান, রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি ও সমাজতত্ত্বের প্রেক্ষাপটে আলকুরআন ও আসসুন্নাহর বিধানগুলোর প্রয়োগ-পদ্ধতি নির্দেশ করা। এই পত্রিকা মুসলিমদেরকে এক নতুন জীবনের দিকে আহবান জানাচ্ছে।"

www.pathagar.com

ইসলামী জাগরণের নাকীব হিসেবেই মাসিক তারজুমানুল কুরআনের আত্মপ্রকাশ ঘটে। খৃস্টীয় ১৯৩৭ সনে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী দিল্লীর এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে বিয়ে করেন। এই সময় তাঁর বয়স হয়েছিলো ৩৪ বছর।

ডঃ মুহাম্মাদ ইকবালের পরামর্শে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী হায়দারাবাদ ছেড়ে পাঞ্জাবে স্থানান্তরিত হতে সম্মত হন। জনৈক চৌধুরী নিয়ায আলীর বিশাল ভূ-সম্পত্তি ছিলো পূর্ব পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর জিলার পাঠানকোট তহসিলের জামালপুর গ্রামে। সেই সম্পত্তি তিনি দ্বীনের কাজে ওয়াকফ করে দেবার সিদ্ধান্ত নেন। ১৯৩৮ সনের মার্চ মাসে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী নব পরিণীতা স্ত্রী মাহমুদাকে নিয়ে আসেন জামালপুরে।

কয়েকটি বাড়ি নিয়ে একটি গ্রাম। শহুরে জীবনের চাকচিক্য ও সুযোগ-সুবিধা ছিলো অনুপস্থিত। এক মহান স্বপ্নে বিভোর সাইয়েদ আবুল আ'লা এলেন এই গ্রামে। গঠিত হয় দারুল ইসলাম ট্রাস্ট। তিনি মনোযোগ দেন একদল গবেষক গড়ে তোলার কাজে।

মাসজিদে নিয়মিতভাবে সালাত আদায় শুরু হয়। ইমামত করতেন সাইয়েদ আবুল আ'লা। প্রতিদিন সকালে তিনি পেশ করতেন দারসুল কুরআন। সেখানে একটি সমৃদ্ধ লাইব্রেরী গড়ে তোলা হয়। জুমাবার নিকটবর্তী গ্রামের লোকেরা আসতো সেই মাসজিদে। সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী খুতবা দিতেন ও সালাতুল জুমুআর ইমামত করতেন। খুতবার মাধ্যমে তিনি ঈমান, ইসলাম, সালাত, সাওম, যাকাত, হাজ্জ, জিহাদ ইত্যাদি সম্পর্কে শ্রোতাদেরকে জ্ঞান-সমৃদ্ধ করে তুলতেন।

হায়দারাবাদে অবস্থানকালে তিনি তারজুমানুল কুরআনে প্রধানত ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো নিয়ে লিখতেন। জামালপুর এসে তিনি মৌলিক বিষয়গুলোর সাথে রাজনৈতিক সমর্থকে পরিণত হওয়ায় তিনি এই সংস্থারও সমালোচনা করেন। তদুপরি অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগের ভ্রান্তিও চোখে আংগুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে থাকেন।

দূরদর্শী সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী অনুভব করেন যে, সামগ্রিক প্রয়োজনের বিবেচনায় দারুল ইসলাম ট্রাস্টকে দারুল ইসলাম আন্দোলনে পরিণত করা প্রয়োজন। এই বিষয়ে চৌধুরী নিয়ায আলীর সাথে তাঁর মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়। ফলে ১৯৩৮ সনের ডিসেম্বর মাসে তিনি জামালপুর ছেড়ে লাহোর চলে আসেন। ইসলামীয়া পার্কের একটি বাড়ি ভাড়া করে তাতে উঠেন। এই বাড়িটি তাঁর বাসস্থান ও তারজুমানুল কুরআনের কার্যালয় হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে।

১৯৩৯ সনের ৭ই সেপ্টেম্বর সাইয়েদ আবুল আ'লা লাহোর ইসলামীয়া কলেজে ইসলামীয়াতের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তবে তিনি বেতন নিতে রাজি হননি।

www.pathagar.com

অধ্যাপক হিসেবে তিনি ইসলামের আধ্যাত্মিক দিক বিশ্লেষণ করেই ক্ষান্ত হতেন না। তিনি সুন্দরভাবে ইসলামের রাজনীতি, অর্থনীতি, মুসলিম উম্মাহর কর্তব্য ইত্যাদি বিষয় উপস্থাপন করতেন। এতে কলেজ কর্তৃপক্ষ বিব্রত বোধ করে ও তাঁকে রাজনীতি সম্পর্কে আলোচনা পরিহার করতে বলে। সাইয়েদ আবুল আ'লা কর্তৃপক্ষের বেঁধে দেয়া গণ্ডির ভেতরে থেকে ইসলামকে কাটসাঁট করে আলোচনা রাখতে অস্বীকার করেন। এই মতপার্থক্যের কারণে তিনি ১৯৪০ সনের সেপ্টেম্বর মাসে ইসলামীয়া কলেজের অধ্যাপনা ত্যাগ করেন।

যালিমের কারাগারে মওদূদী

মাওলানা মওদূদী (রহ)-কে ১৯৪৮ সালে ৪ঠা অক্টোবর পাকিস্তান সরকার জননিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার করে।

অনেকবার তিনি কারাবরণ করেছিলেন। আবার আন্দোলনের মুখে মুক্তও হয়েছেন। মাওলানা মওদূদী কাদিয়ানি সমস্যা শীর্ষক একটি গ্রন্থ রচনার জন্য সামরিক আদালত মওদূদীকে মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রদান করেন। মাওলানা মওদূদীকে যখন উক্ত আদেশ শোনানো হয়, তিনি তখন শান্ত। ফাঁসির সেলে নিজেই হেঁটে যান। মওদূদীকে প্রাণভিক্ষা করার কথা বলা হলো। তিনি তা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে বলেন, আপনারা মনে রাখবেন আমি কোন অপরাধ করিনি। আমি কিছুতেই তাদের কাছে প্রাণভিক্ষা চাইব না এবং আমার পক্ষে অন্য কেউ যেন প্রাণভিক্ষা না চায়। না আমার মা, না আমার ভাই, না আমার স্ত্রী-পুত্র পরিজন। জামায়াতের লোকদের কাছেও আমার এই অনুরোধ।

কারণ জীবন ও মরণের সিদ্ধান্ত হয় আসমানে, জমিনে নয়। তিনি শাহাদাতের জন্য প্রস্তুত হন। এই আদেশ রেডিও-টিভিতে প্রচারিত হওয়ার পর দেশে-বিদেশের প্রতিবাদে সরকারও ফাঁসির আদেশ কারাদণ্ডে রূপান্তরিত করে। তারপরও বিশ্বব্যাপী প্রতিবাদের ঝড় অব্যাহত থাকলে পাকিস্তান সরকার ১৯৫৫ সালে মাওলানা মওদূদীকে নিঃশর্ত মুক্তি দিতে বাধ্য হয়।

হাসানুল বান্না (রহ.)-এর শাহাদাত

খৃস্টীয় ১৯০৬ সনে মিসরের মাহমুদিয়া শহরে শায়খ হাসানুল বান্না জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর আব্বার নাম আবদুর রাহমানুল বান্না। হাসানুল বান্নার আনুষ্ঠানিক শিক্ষা জীবন শুরু হয় মাদরাসা আর আল কুরআন হিফয ও কায়রো আসের ও আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রি অর্জন করেন। কায়রোতে অবস্থান কালে মিসরের অন্যতম সেরা ইসলামী ব্যক্তিত্ব শায়খ মাহমুদ কর্তৃক পরিচালিত জামিয়াতুল মাকারিমিল আখলাক আল ইসলামীয়া নামক সংস্থার সদস্য হন। এখানেই তাঁর "আমর বিল মা'রূফ ওয়া নাহি আনিল মুনকার" তৎপরতার হাতেখড়ি।

www.pathagar.com

খ্রিস্টীয় ১৯২৭ সনে তিনি দারুল উলুম থেকে ডিপ্লোমা লাভ করেন। এখানেই ঘটে তাঁর আনুষ্ঠানিক শিক্ষা জীবনের সমাপ্তি। ঐ সনেই তিনি সরকারী স্কুলের শিক্ষক নিযুক্ত হন । খ্রিস্টীয় ১৯২৮ সনের মার্চ মাসে ছয়জন ইসলামী ব্যক্তিত্ব তাঁর বাসায় আসেন দ্বীনী বিষয়ে আলাপ-আলোচনার জন্য। হাসানুল বান্না তাদের সামনে তাঁল চিন্তাধারা পেশ করেন এবং সমাজ অংগনের সর্বত্র ইসলামের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে সংঘবদ্ধ প্রয়াসের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেন। এ মিটিংয়ে আগত ছয়জন ব্যক্তি হচ্ছেন–

(১) হাফিয আবদুল হামীদ, (২) আহমাদ আল হাসরী, (৩) ফুয়াদ ইবরাহীম, (৪) আবদুর রাহমান, (৫) ইসমাঈল ইযয ও (৬) যাকী আল মাগরেবী।

তাঁরা হাসানুল বান্নার চিন্তাধারার সাথে একমত হন। সাত ব্যক্তি মিলে গঠন করেন একটি ছোট্ট সংগঠন। নাম রাখা হয় আল-ইখওয়ানুল মুসলিমূন। হাসানুল বান্না তখন ২২ বছরের একজন দীপ্তিমান যুবক। শায়খ হাসানুল বান্না ইসমাঈলিয়া শহরের বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে লোকদের কাছে ইসলামের আলো ছড়িয়েছেন। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মসজিদে সমবেত করে তাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখতেন। এভাবে তিনি তিন বছর কাজ করেন ।

ইসমাঈলিয়াতেই ছিল আল ইখওয়ানুল মুসলিমুনের প্রধান কার্যালয়। এখানে নির্মাণ করা হয় একটি মাসজিদ। দেশের বিভিন্ন স্থানে গড়ে ওঠা শক্তিশালী শাখাগুলোও মাসজিদ নির্মাণ, স্কুল, ক্লাব গঠন ও কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতো। খ্রিস্টীয় ১৯৩২ সনের অক্টোবর মাসে শায়খ হাসানুল বান্না বিয়ে করেন। একটি মাসজিদে অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁর বিয়ে সম্পন্ন হয়।

হাসানুল বান্না মহিলাদেরকে স্বতন্ত্রভাবে সংগঠিত করা ও তাদের মাধ্যমে মহিলা অংগনে দ্বীনের মর্মকথা পৌঁছিয়ে দেয়ার গুরুত্ব উপলব্ধি করেন। কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের নিকটে স্থাপিত উম্মাহাতুল মুমিনীন মাদ্রাসার শিক্ষিকাদেরকে নিয়ে তিনি আল-ইখওয়ানের মহিলা শাখা গঠন করেন। এর নাম রাখেন আল আখাওয়াত আল মুসলিমাত।

খ্রিস্টীয় ১৯৩৩ সালে হাসানুল বান্না কায়রোতে আল-ইখওয়ানের সাধারণ সম্মেলন আহ্বান করেন।

খ্রিস্টীয় ১৯৩৯ সনে শুরু হয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। ইংল্যান্ড চাচ্ছিল মিসর তার পক্ষাবলম্বন করে যুদ্ধে নামুক। অথচ ইংল্যান্ডের পক্ষাবলম্বন করার মানে ছিলো তুর্কীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামা। অর্থাৎ রণাংগনে মুসলিম সৈন্যরা মুসলিম সৈন্যদেরকেই আহত ও নিহত করবে। শায়খ হাসানুল বান্না হুশিয়ারী উচ্চারণ করেন। অবশ্য প্রধানমন্ত্রী আলী মাহির পাশা ও প্রধান সেনাপতি জেনারেল

www.pathagar.com

আযীয আলী আল মিসরীও ইংরেজদের আবদার রক্ষা করার বিপক্ষে ছিলেন। ইংরেজদের বিরাট স্বার্থ তখন সুয়েজে। মিসরের স্বাধীনতা সরকারের ইংল্যান্ডের স্বার্থ-বিরোধী পদক্ষেপ নিতে পারে এই আশঙ্কায় ইংরেজরা প্রচণ্ড কূটনৈতিক চাপ দিতে থাকে কিং ফারুকের ওপর। দুঃখের বিষয় কিং ফারুক ইংরেজদের নিকট নতি স্বীকার করেন।

১৯৪০ সনের জুন মাসে নতুন প্রধানমন্ত্রী হাসান সাবরী পাশার নেতৃত্বে মিসর ইংরেজদের পক্ষ নিয়ে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে খ্রিস্টীয় ১৯৪১ সনে শায়খ হাসানুল বান্না আল-ইখওয়ানের ষষ্ঠ সাধারণ সম্মেলন আহ্বান করেন। এই সম্মেলন আগামীতে জাতীয় নির্বাচনগুলোতে অংশগ্রহণের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী আলী মাহির পাশা প্রাক্তন সেনাপ্রধান আযীয আলী আলমিসরী ও শায়খ হাসানুল বান্না মিলে একটি মোর্চা গঠন করে সরকারের জন্য বিব্রতকর অবস্থা সৃষ্টি করতে পারেন, এই আশঙ্কায় অন্যত্র বদলি করা হয় আযীয আলী মিসরীকে।

কিছুকাল পর ইংরেজ বিরোধী জনমত গড়ে তোলার জন্য হাসানুল বান্না কায়রো আসেন। সরকার আতংকিত হয়ে পড়ে এবং হাসানুল বান্না আল-ইখওয়ানের সেক্রেটারী জেনারেল আবদুল হাকীম আবিদীনকে গ্রেফতার করে। আল-ইখওয়ানের পত্রিকাগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়। অন্যসব পত্রিকায়ও আল-ইখওয়ানের খবর ছাপানো যাবে না বলে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। মিছিল ও জনসভা নিষিদ্ধ করা হয়। কিছুকাল পর হাসানুল বান্না ও আবদুল হাকীম আবিদীন মুক্তি লাভ করেন।

আল-ইখওয়ানের স্বেচ্ছাসেবকদের সাফল্য ইংরেজদের বশংবদ কিং ফারুক ও প্রধানমন্ত্রী মাহমুদ ফাহমী আন্‌নুকরামী পাশার মনে ভয় ঢুকিয়ে দেয়। এই বুঝি আল-ইখওয়ান গোটা মিসর দখল করে নেয়। সরকারের নির্দেশে মিসর বাহিনীর প্রধান সেনাপতি ফুয়াদ সাদিক আল-ইখওয়ানের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী ভেঙ্গে দেন।

খ্রিস্টীয় ১৯৪৮ সনের ৮ই ডিসেম্বর।

রাত এগারোটা। শায়খ হাসানুল বান্না সহকর্মীদের নিয়ে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে বসে রেডিওতে খবর শুনছিলেন। খবর প্রচারিত হলো, আলইখওয়ানুল মুসলিমুনকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। কারণ হিসেবে বলা হলো যে, আল-ইখওয়ান দেশে একটি সশস্ত্র বিপ্লব ঘটাবার প্রস্তুতি নিয়েছে।

সংগে সংগে ছুটে আসে পুলিশের গাড়ি। উপস্থিত সবাইকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতার করা হলো না শুধু হাসানুল বান্নাকে। আল-ইখওয়ানের সব সম্পদ

www.pathagar.com

বাজেয়াপ্ত করা হয়। আল-ইখওয়ান পরিচালিত স্কুল, ক্লাব, হাসপাতাল ও শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়। সারাদেশে অভিযান চালিয়ে হাজার হাজার সদস্যকে গ্রেফতার করা হয়। জেলখানায় তাদের ওপর চালানো হয় নির্যাতন। কেন্দ্র থেকে গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত সদস্যদেরকে গ্রেফতার করা হয়, কিন্তু গ্রেফতার করা হয়নি শায়খ হাসানুল বান্নাকে। শায়খ হাসানুল বান্না বলেন, তাঁকে গ্রেফতার না করার অর্থ হচ্ছে যে তাঁর মৃত্যু পরোয়ানা জারি হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, তখন মিসরের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ইবরাহীম আবদুল হাদী।

খ্রিস্টীয় ১৯৪৯ সনের ১২ ফেব্রুয়ারী।

এই দিন কায়রোতে ইয়ং মুসলিমস এসেসিয়েশনের একটি মিটিংয়ে বক্তব্য রাখেন শায়খ হাসানুল বান্না। মিটিং শেষে বেরিয়ে তিনি ট্যাক্সীতে উঠতে যাচ্ছিলেন। এমন সময় আততায়ীর গুলি এসে লাগে তাঁর বুকে। রক্তরঞ্জিত দেহ নিয়ে তিনি লুটিয়ে পড়েন। সংগীরা তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে আসেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি শাহাদাত বরণ করেন। আল্লাহর দীনের সৈনিক আল্লাহর একান্ত সান্নিধ্যে চলে যান।

লাশ পাঠানো হয় তাঁর বাসায়। পুলিশ এসে বাড়ি ঘেরাও করে ফেলে। নিকট আত্মীয় ছাড়া কাউকে কাছে ঘেঁষতে দেয়া হলো না। ট্যাংক বাহিনী ও সাঁজোয়া বাহিনীর কড়া প্রহরায় লাশ নেয়া হয় কবরস্থানে। লাখ লাখ লোক দূরে অবস্থান করে অশ্রু বিসর্জন করতে থকে। একান্ত আপনজনেরা তাঁর কাফন, জানাযা ও দাফন সম্পন্ন করেন।

এটাই আল্লাহর নির্ধারিত পথ এবং আল্লাহর নির্ধারিত পথ কখনো বদলায় না।

www.pathagar.com

সাইয়েদ কুতুব (রহ.)-এর শাহাদাত

সাইয়্যেদ কুতুব ১৯০৬ সালে মিসরের উসইউত জিলার মুশা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার আম্মা ফাতিমা হোসাইন উসমান অত্যন্ত দ্বীনদার ও আল্লাহভীরু মহিলা ছিলেন। সাইয়েদের পিতা হাজী ইবরাহীম চাষাবাদ করতেন; কিন্তু তিনিও ছিলেন অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ ও চরিত্রবান।

গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সাইয়্যেদ কুতুবের শিক্ষা শুরু হয়। মায়ের ইচ্ছানুসারে তিনি শৈশবেই কুরআন হেফয করেন। পরবর্তীকালে তার পিতা কায়রো শহরের উপকণ্ঠে হালওয়ান নামক স্থানে বসবাস শুরু করেন। সাইয়্যেদ তাজাহিযিয়াতু দারুল উলুম মাদরাসায় ভর্তি হন। ১৯২৯ সালে ঐ মাদরাসায় শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি কায়রোর বিখ্যাত মাদরাসা দারুল উলুমে ভর্তি হন। ১৯৩৩ সালে ঐ মাদরাসা থেকে বি, এ, ডিগ্রি লাভ করেন এবং সেখানেই অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

কিছুকাল আধ্যাপনা করার পর তিনি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে স্কুল ইন্সপেক্টর নিযুক্ত হন । মিসরে ঐ পদটিকে অত্যন্ত সম্মানজনক বিবেচনা করা হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকেই তাকে আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি পড়াশুনার জন্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাঠানো হয় দু'বছরের কোর্স শেষ করতে আমেরিকা থাকা কালেই তিনি বস্তুবাদী সমাজের দুরবস্থা লক্ষ্য করেন। তার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, একমাত্র ইসলামই সত্যিকার অর্থে মানব সমাজকে কল্যাণের পথে নিয়ে যেতে পারে।

আমেরিকা থেকে দেশে ফেরার পরই তিনি ইখওয়ানুল মুসলিমুন দলের আদর্শ, উদ্দেশ্য ও কর্মসূচী যাচাই করতে শুরু করেন। ১৯৪৫ সালে তিনি ঐ দলের সদস্য হয়ে যান। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বৃটিশ সরকার যুদ্ধ শেষে মিসরকে স্বাধীনতা দানের ওয়াদা করে। যুদ্ধ শেষ হওয়ার সাথে সাথেই ইখওয়ান দল বৃটিশের মিসর ত্যাগের দাবীতে আন্দোলন শুরু করে। এর ফলে তাদের জসপ্রিয়তা অত্যন্ত বেড়ে যায়। মাত্র দু'বছর সময়ের মধ্যে এ দলের কর্মী সংখ্যা পঁচিশ লাখে পৌছে। সাধারণ স্বৈরাচারী মিসর সরকার ইখওয়ানের জনপ্রিয়তা দেখে ভীত হয়ে পড়ে এবং এ দলের বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়।

ইংরেজী ১৯৫০ সালে ১২ই মার্চ দলের প্রতিষ্ঠাতা মোরশেদ-এ-আম উস্তাদ হাসানুল বান্না শাহাদাত বরণ করেন এবং ইখওয়ানুল মুসলিমুন বেআইনি ঘোষিত হয়।

ইংরেজী ১৯৫২ সালের জুলাই মাসে মিসরে সামরিক বিপ্লব অনুষ্ঠিত হয়। ঐ বছরেই ইখওয়ান দল পুনরায় বহাল হয়ে যায়। ড. হাসানুল হোদাইবি দলের

www.pathagar.com

মোরশেদ-এ আম নির্বাচিত হন। সাইয়্যেদ কুতুব ইখওয়ান দলের কেন্দ্রীয় ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য মনোনিত হন। দলের আদর্শ প্রচার ও আন্দোলনের সম্প্রসারণ বিভাগ তার পরিচালনাধীনে অগ্রসর হতে থাকে। পরিপূর্ণরূপে নিজেকে আন্দোলনের কাজে উৎসর্গ করেন তিনি।

১৯৫৪ সালে ইখওয়ান পরিচালিত সাময়িকী "ইখওয়ানুল মুসলিমুন"-এর সম্পাদক নির্বাচিত হন সাইয়্যেদ কুতুব। ছ'মাস পরই কর্নেল নাসেরের সরকার পত্রিকাটি বন্ধ করে দেন। কারণ ঐ বছর মিসর সরকার বৃটিশের সাথে নতুনকরে যে চুক্তিপত্র সম্পাদন করেন, পত্রিকাটি তার সমালোচনা করে। পত্রিকা বন্ধ করে দেয়ার পর নাসের সরকার এ দলের ওপর নির্যাতন শুরু করেন। একটি বানোয়াট হত্যা ষড়যন্ত্র মামালার অভিযোগে ইখওয়ানূল মুসলিমুন দলকে বেআইনি ঘোষণা করে দলের নেতাদের গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতার ও নির্যাতন

গ্রেফতারকৃত ইখওয়ান নেতাদের মধ্যে সাইয়্যেদ কুতুবও ছিলেন। তাঁকে মিসরের বিভিন্ন জেলে রাখা হয়। গ্রেফতারের সময় তিনি ভীষণভাবে জ্বরে আক্রান্ত ছিলেন। সামরিক অফিসার তাঁকে সে অবস্থায়ই গ্রেফতার করেন। তাঁর হাতে-পায়ে শিকল পরানো হয়। শুধু তাই নয়, সাইয়্যেদ কুতুবকে প্রবল জ্বরে আক্রান্ত অবস্থায় জেল পর্যন্ত হেঁটে যেতে বাধ্য করা হয়। পথে কয়েকবার বেহুঁশ হয়ে তিনি মাটিতে পড়ে যান। হুঁশ ফিরে এলে তিনি বলতেন "(আল্লাহু আকবার ওয়া লিল্লাহিল হামদ)"

জেলে ঢুকার সাথেই কর্মচারীগণ তাকে মারপিট করতে শুরু করে এবং দু'ঘণ্টা পর্যন্ত এ নির্যাতন চলতে থাকে। তারপর একাট প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরকে তার উপর লেলিয়ে দেয়া হয়। কুকুর তার পা কামড়ে ধরে জেলের আঙ্গিনায় টেনে নিয়ে বেড়ায়। এ প্রাথমিক অভ্যর্থনা জানানোর পর একটানা সাত ঘণ্টা ব্যাপী তাঁকে জেরা করা হয়। তার স্বাস্থ্য এসব নির্যাতন সহ্য করার যোগ্য ছিল না। কিন্তু তিনি তার সুদৃঢ় ঈমানের বলে পাষাণ প্রাচীরের ন্যায় সব অমানুষিক অত্যাচার অকাতরে সহ্য করেন। তাঁর মুখ থেকে উচ্চারিত হতে থাকে "(আল্লাহু আকবার ওয়া লিল্লাহিল হামদ)"।

জেলের অন্ধকার কুঠরী রাতে তালাবদ্ধ করা হতো। আর দিনের বেলা তাঁকে রীতিমত প্যারেড করানো হতো। তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। বক্ষপীড়া, হৃদপিণ্ডের দুর্বলতা ও সর্বাঙ্গে জোড়ায় জোড়ায় ব্যথা ইত্যাদি বিভিন্ন রোগে তিনি কাতর হয়ে পড়েন। পুলিশের কুকুর তাঁর শরীরে নখ ও দাতের আঁচড় কাটে। তাঁর মাথায় খুব গরম এবং পরক্ষণেই বেশি ঠাণ্ডা পানি ঢালা হতে থাকে। লাথি, কিল, ঘুষি, অশ্লীল ভাষায় গালাগালি ইত্যাদি তো ছিল দৈনন্দিন ব্যাপার।

www.pathagar.com

১৯৫৫ সালের ১৩ই জুলাই গণআদালতের বিচারে তাঁকে পনের বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেয়া হয়। তিনি এক বছর কারাভোগের পর নাসের সরকারের পক্ষথেকে প্রস্তাব দেয়া হয় যে, তিনি সংবাদপত্রের মাধ্যমে ক্ষমার আবেদন করলে তাকে মুক্তি দেয়া যেতে পারে। মর্দে মুমিন এ প্রস্তাবের যে জবাব দিয়েছিলেন, তা ইতিহাসের পাতায় অম্লান হয়ে থাকবে। তিনি বলেন,

আমি এ প্রস্তাব শুনে অত্যন্ত বিস্মিত হচ্ছি যে, মযলুমকে যালিমের নিকট ক্ষমার আবেদন জানাতে বলা হচ্ছে। আল্লাহর কসম! যদি ক্ষমা প্রার্থনার কয়েকটি শব্দ আমাকে ফাঁসি থেকে রেহাই দিতে পারে, তবুও আমি এরূপ শব্দ উচ্চারণ করতে রাজি নই। আমি আল্লাহর দরবারে এমন অবস্থায় হাযির হতে চাই যে, আমি তাঁর প্রতি এবং তিনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট।

পরবর্তীকালে তাঁকে যতবার ক্ষমা প্রার্থনার পরামর্শ দেয়া হয়েছে ততবারই তিনি একই কথা বলেছেনঃ "যদি আমকে যথার্থই অপরাধের জন্য কারারুদ্ধ করা হয়ে থাকে, তাহলে আমি এতে সন্তুষ্ট আছি। আর যদি বাতিল শক্তি আমাকে অন্যায়ভাবে বন্দী করে থাকে তাহলে আমি কিছুতেই বাতিলের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করব না।"

১৯৬৪ সালের মাঝামাঝি ইরাকের প্রেসিডেন্ট আবদুস সালাম আরিফ মিসর যান। তিনি সাইয়্যেদ কুতুবের মুক্তির সুপারিশ করায় কর্নেল নাসের তাকে মুক্তি দিয়ে তারই বাসভবনে অন্তরীণাবদ্ধ করেন।

আবার গ্রেফতার ও দন্ড

এক বছর যেতে না যেতে তাকে আবার বলপূর্বক ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়। অথচ তিনি তখনও পুলিশের কড়া প্রহরাধীন ছিলেন। শুধু তিনি নন তার ভাই মুহাম্মদ কুতুব, বোন হামিদা কুতুব ও আমিনা কুতুবসহ বিশ হাজারেরও বেশি লোককে গ্রেফতার করা হয়েছিলো। এদের মধ্যে প্রায় সাত'শ ছিলেন মহিলা।

১৯৬৫ সালে কর্নেল নাসের মস্কো সফরে থাকাকালীন এক বিবৃতিতে ঘোষণা করেন যে, ইখওয়ানুল মুসলিমুন তাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিল। আর এই ঘোষণার সাথে সাথেই সারা মিসরে ইখওয়ান নেতা ও কর্মীদের ব্যাপক ধরপাকড় শুরু হয় । ১৯৬৪ সালে ২৪শে মার্চে জারীকৃত একটি নতুন আইনের বলে প্রেসিডেন্টকে যেকোন ব্যক্তিকে গ্রেফতার, তার সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ প্রভৃতি দণ্ডবিধানের অধিকার প্রদান করা হয়। তার জন্যে কোন আদালতে প্রেসিডেন্টের গৃহীত পদক্ষেপের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করা যাবে না বলেও ঘোষণা করা হয়। কিছুকাল পর বিশেষ সামরিক আদালতে তাদের বিচার শুরু হয়।

www.pathagar.com

প্রথমত ঘোষণা করা হয় যে, টেলিভিশনে ঐ বিচারানুষ্ঠানের দৃশ্য প্রচার করা হবে; কিন্তু অভিযুক্ত ব্যক্তিগণ অপরাধ স্বীকার করতে অস্বীকার এবং তাদের প্রতি দৈহিক নির্যাতনের বিবরণ প্রকাশ করায় টেলিভিশন বন্ধ করে দেয়া হয়। তারপর রুদ্ধদার কক্ষে বিচার চলতে থাকে । আসামী পক্ষের কোন উকিল ছিল না। অন্য দেশ থেকে আইনজীবীগণ আসামী পক্ষ সমর্থনের আবেদন করেন; কিন্তু তা প্রত্যাখ্যান করা হয়। ফরাসী বার এসোসিয়েশনের ভূতপূর্ব সভাপতি উইলিয়াম থরপ ও মরোক্কোর দু'জন আইনজীবী আসামী পক্ষ সমর্থনের জন্য রীতিমত আবেদন করেন; কিন্ত তা নামঞ্জুর করা হয়। সুদানের দু'জন আইনজীবী কায়রো পৌঁছে বার এসোসিয়েশনে নাম রেজিস্ট্রি করে আদালতে হাযির হন। পুলিশ তাদের আদালত থেকে ধাক্কা মেরে বের করে দেয় এবং মিসর ত্যাগ করতে বাধ্য করে। সাইয়্যেদ কুতুব ও অন্যান্য আসামীগণ ১৯৬৬ সালের জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসে বিচার চলাকালে ট্রাইবুনালে বলেন তাদের ওপর দৈহিক নির্যাতন চালানো হয়। ট্রাইবুনালের সভাপতি আসামীদের কোন কথার প্রতিই কান দেননি।

ইংরেজী ১৯৬৬ সালের আগস্ট মাসে সাইয়্যেদ কুতুব ও তার দু'জন সাথীকে সামরিক ট্রাইবুনালের পক্ষ থেকে মৃত্যুদণ্ডাদেশ শুনানো হয়। সারা দুনিয়ায় প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। কিন্তু ২৫ আগস্ট ১৯৬৬ সালে ঐ দণ্ডাদেশ কার্যকর করা হয়।

মিসরে ইখওয়ানুল মুসলেমীনের উপর জুলুম-নির্যাতন

প্রাচীন সভ্যতার দেশ মিসর। নীলনদ আর পিরামিড তার অনন্য বৈশিষ্ট্য। খ্রিস্টীয় সপ্তম শতক থেকে ইসলাম মিসরের একটি অবিচ্ছেদ্য উপাদান হিসেবে কাজ করে আসছে। আমর ইবন আল-আসের নেতৃত্বে মুসলিম সেনাদল মিসর জয় করে। উমাইয়া ও আব্বাসীয় আমলে মিসর ছিল মুসলিম সাম্রাজ্যের অধীন। অনেক উত্থান-পতন, আর বিশ্বাসঘাতকতার মধ্য দিয়ে রচিত মিসরের ইতিহাস। মিসরে ১৮৫০-১৯৫২ পর্যন্ত রাজতন্ত্র, ১৯৫৩-১৯৫৮ সাল পর্যন্ত সামরিক শাসন। ১৯৫৭-১৯৭৭ সাল পর্যন্ত গামাল আবদেল নাসেরের একদলীয় শাসন। ১৯৭৭-২০১২ সাল স্বৈরশাসক হোসেন মোবারক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে ৩০ বছরের এই স্বৈরশাসকের পতন হয় ২০১১ সালে। অনেক রক্তপাত আর শহীদের রক্তের মিনিময়ে দীর্ঘ ৮৪ বছর পর জনগণের ম্যান্ডেট নিয়ে ক্ষমতা লাভ করে ইখওয়ান তথা মুসলিম ব্রাদারহুড, প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন ড. মোহাম্মদ মুরসি ।

অনেক চড়াই-উৎরাইয়ের মধ্য দিয়ে ইখওয়ান আজকে এ পর্যায়ে এসে উপনীত হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে সংগঠনটি মিসর ছাড়িয়ে অন্যান্য দেশেও

www.pathagar.com

প্রভাব বিস্তার লাভ করে। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন শুরু করলে দলটির জনপ্রিয়তা বেড়ে যায়। মাত্র দু'বছরের মধ্যে পঁচিশ লাখ কর্মী বৃদ্ধি পাওয়ায় স্বৈরাচারী সরকার আরও ভীত হয়ে পড়ে। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে ফিলিস্তিন ইস্যুতে ইখওয়ান সর্বাত্মকভাবে আরবদের সহযোগিতা করে। একদিকে তীব্র ব্রিটিশ বিরোধিতা, অপরদিকে আরব ও ফিলিস্তিনের স্বার্থের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের কারণে ইখওয়ান আরব বিশ্বে ব্যাপক বিস্তার লাভ করে। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে পর থেকে নানা মিথ্যা অভিযোগে অনেকবার সংগঠনটিকে বেআইনি ঘোষণা করে মিসরের স্বৈরাচারী সরকারগুলো। ১৯৪৯ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি অজ্ঞাত এক বন্দুকধারীর গুলিতে হত্যা করা হয় হাসান আল বান্নাকে। ১৯৫৪ সালে জামাল আবদেল নাসেরের ওপর আক্রমণের অভিযোগ এনে দলটি নিষিদ্ধ করা হয়। হাজার হাজার ইখওয়ানের নেতাকর্মীকে জেলে পুরা হয়। এর থেকে বাদ যায়নি সাইয়্যেদ কুতুবও। গ্রেফতারের পর তার হাতে-পায়ে শিকল পরানো, মারপিট আর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর দিয়ে কামড়ানো হতো। রাতে তালাবদ্ধ আর দিনেরবেলা তাকে রীতিমত প্যারেড করানো, মাথায় খুব গরম এবং ঠাণ্ডা পানি ঢালা ছিল হিংস্রতার জঘন্যতম রূপ। এভাবেই চলতে থাকে ইখয়ানের নেতা-কর্মী আর মহিলাদের ওপর অমানবিক ও পৈশাচিক জুলুম-নির্যাতন। বিশ হাজারেরও বেশি লোককে গ্রেফতার করা হয়েছিল। এদের মধ্যে প্রায় সাতশ' ছিলেন মহিলা; কিন্তু কোনোকিছুই তাদের দমাতে পারেনি।

সাইয়্যেদ কুতুব ও অন্যান্য আসামি ১৯৬৬ সালের জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসে বিচার চলাকালে ট্রাইব্যুনালে দৈহিক নির্যাতন চালানো হয়। ট্রাইব্যুনালের সভাপতি আসামিদের কোনো কথার প্রতিই কান দেননি। ইংরেজি ১৯৬৬ সালের আগস্ট মাসে সাইয়্যেদ কুতুব ও তার দু'জন সাথীকে সামরিক ট্রাইব্যুনালের পক্ষ থেকে মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেয়া হয়। সারা দুনিয়ায় প্রতিবাদের ঝড় ওঠে; কিন্তু স্বৈরাচারী সরকার কোনো কিছুর প্রতি তোয়াক্কা না করে ২৫ আগস্ট ১৯৬৬ সালে ওই দণ্ডাদেশ কার্যকর করে। ইখওয়ানের শীর্ষস্থানীয় প্রভাবশালী নেতা সাইয়্যেদ কুতুব শুধু ইসলামের রাজনৈতিক বিশ্বাসের কাছে নয়, গোটা বিশ্বে ইসলাম বিষয়ে একজন পণ্ডিত ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত ছিলেন। ১৯৮১ সালে ইসরাইলের সঙ্গে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরে বিক্ষুব্ধ সৈনিকের হাতে প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত প্রাণ হারানোর পর তখনকার ভাইস প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারক প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। সে সময় থেকে যে জরুরি অবস্থা তিনি জারি করেছিলেন তা ৩০ বছর ধরে চলে। ইখওয়ানের রাজনৈতিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে হোসনি মোবারকের দমনমূলক কর্মকাণ্ড পশ্চিমা দেশগুলো পুরোপুরি অবগত ছিল। গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ কিংবা নিপীড়নমূলক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে

www.pathagar.com

কখনো পশ্চিমারা মোবারকের সরকারের সমালোচনা বা চাপ প্রয়োগ করেনি; বরং তারা ইসলামপন্থী দলটির ওপর নির্যাতনকে সমর্থন জুগিয়েছে। আজও জনগণের ভোটে নির্বাচিত ড. মুরসির সরকারকে অত্যন্ত অন্যায় ও অগণতান্ত্রিকভাবে ক্ষমতাচ্যুত করার পর পশ্চিমারা তাদের প্রতিবাদ আর উদ্বেগের মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ রাখবে এটি বলার অপেক্ষা রাখে না। কারণ তেলসমৃদ্ধ মধ্যপাচ্যে যে আরব বসন্তের সূচনা হয়েছে, তা এর মধ্যে তিউনেসিয়াসহ্ আশপাশের সব রাষ্ট্রগুলোতে ইখওয়ানের আদর্শে বিশ্বাসীদের বিজয় পশ্চিমাদের মৌলবাদ ভীতির আশঙ্কাকে আরও ঘনীভূত করছে এবং করবে।

মিসরে ইখওয়ান বা মুসলিম বাদ্রারহুড মানুষের হৃদয়ের সংগঠন। বিগত মোবারক পতন আন্দোলনে ইখওয়ান কর্মীদের তৎপরতা ও আত্মত্যাগ জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তাছড়া নির্বাচনের আগে নতুন একটি রাজনৈতিক প-াটফরম (ফ্রিডম অ্যান্ড জাস্টিস পার্টি) ও ইশতেহারের নীতিমালা সুশাসন, মানবাধিকার, গণতন্ত্র, আইনের শাসন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, বিনিয়োগ, নারী ও অমুসলিমদের অধিকারের ইত্যাদির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ ও কপটিক খ্রিস্টানদের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন, জনগণের মধ্যে আশার আলো সঞ্চারিত করেছে। আর এসব পজিটিভ ম্যাসেজই পার্লামেন্ট নির্বাচনে বিপুল সংখ্যায় ইখওয়ানের সংসদ সদস্য ও প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে এবং জনগণ ড. মুরসিকেও নির্বাচিত করেছে।

কিন্তু মাত্র এক বছর সময় পার না হতেই মাত্র চারদিনের রাজপথে সেক্যুলারিস্টদের আন্দোলনের অজুহাত দেখিয়ে জনগণের সেই কাঙ্ক্ষিত নির্বাচিত প্রেসিডেন্টকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়। এভাবে ক্ষমতাচ্যুত করা কতটুকু বৈধ! কিন্তু আমরা গণতন্ত্রের ফেরিওয়ালাদের মধ্যে উদ্বেগ ছাড়া আর কোনো পদক্ষেপ দেখিনি। অবশ্য পশ্চিমাদের নিকট এর বেশি প্রত্যাশা করাটাও বেমানান। কারণ গণতন্ত্র, মানবাধিকার মৌলবাদীদের জন্য নয়। এজন্য হেনরি কিসিঞ্জার একবার বলেছিলেন, 'আমরা মুসলমানদের সব কর্মকাণ্ড সহ্য করলেও মৌলবাদীদের কোনো রাষ্ট্রে ক্ষমতায়নকে মেনে নেব না। তা যতই গণতান্ত্রিক পন্থায় হোক না কেন। ড. মুরসির বিদায়ে বিশ্বব্যাপী আলোচনা, প্রতিক্রিয়া আব্যাহত। মুরসির দল মুসলিম বাদ্রারহুডের নেতাকর্মী, সাধারণ জনগণ ও অন্যান্য ইসলামী দলগুলো এখন রাজপথে জীবনবাজি রেখে লড়াই করছে শান্তি পূর্ণভাবে। তারা যতটুকু ক্ষুব্ধ তার প্রতিবাদে সহিংসতা নয়, বরং রাজপথে অবস্থান আর শাহাদাতের নজরানা পেশের মধ্য দিয়ে তার প্রতিবাদ করছে এখনও। সামনে কি হবে তা এখনও বলার সময় আসেনি। এর মধ্যেই

www.pathagar.com

সেনাবাহিনী দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে। আফ্রিকান ইউনিয়ন মিসরের সদস্যপদ স্থগিত করেছে। তবে এই মুহূর্ত পর্যন্ত এতটুকু বলা যায় জনগণ বিষয়টিকে খুব স্বাভাবিকভাবে ছেড়ে দেবে বলে মনে হয় না। একটি নির্বাচিত সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার ব্যাপারে যেগুলোকে অজুহাত হিসেবে পেশ করা হয় তা কতটুকু গ্রহণযোগ্য! মুরসির ব্যর্থতা বেকারত্ব দূর, জ্বালানি ও বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধান করতে না পারা। একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকারের জন্য এক বছর সময় তাকে ক্ষমতাচ্যুৎ করার কোনো মানদণ্ড হতে পারে কি? তাই যদি হয় ক্ষমতায় থাকার মানদণ্ড, তাহলে আমাদের দেশে শেখ হাসিনার সরকারের পাহাড়সমান ব্যর্থতার দায়ে কত আগে বিদায় নেয়া দরকার ছিল। আসলে ড. মুরসির বিদায়, সেনাবাহিনীর ক্ষমতা দখল আর সেক্যুলারিস্টদের আন্দোলন এবং ইসরাইল, আমেরিকার স্বার্থ একই সূত্রে গাঁথা। কারণ ড. মুরসি নির্বাচিত হওয়ার পর সেনাবাহিনী তার হাতে ক্ষমতা তুলে দিতে অনেক গড়িমসি করেছে। পশ্চিমারা ও সেনাবাহিনী সেক্যুলারিস্টদের ক্ষমতায় বসাতে প্রথম থেকেই ছিল মরিয়া। মূলত জনগণের চাপে সেনাবাহিনী বাধ্য হয়ে ড. মুরসিকে প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করেছে সত্য; কিন্তু যে কোনো সময় সেনাবাহিনী ইখওয়ানের এবং মুরসির ওপর ছোবল মারতে পারে এই সন্দেহ ছিল শুরু থেকেই প্রবল। তাছাড়া সেনাবাহিনীর সঙ্গে পার্লামেন্ট পুনরায় আহ্বান করা নিয়ে ঠাণ্ডা লড়াই চলছে প্রথম থেকে। নতুন সংবিধান রচনা ও সেনাবাহিনী নিজেদের বাজেট নির্ধারণ, যুদ্ধ ঘোষণা ও সেনাবাহিনী পরিচালনার কর্তৃত্ব পুরোপুরিভাবে তাদের হাতে রেখে দিয়েছে। সাংবিধানিক আদালতকে প্রেসিডেন্টের ক্ষমতার ভারসাম্যপূর্ণ সমাধান ও পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে নতুন অনেক চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিয়েছে। ইসরাইল ছাড়াও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় দেশগুলো নতুন সরকারের কর্মকাণ্ড গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে আসছে। ইসরাইলের পর মিসরের সেনাবাহিনী সর্বাধিক মার্কিন সাহায্য পেয়ে থাকে। ইসরাইলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক রাখা না রাখা বড় সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। কারণ হামাসের সঙ্গে ব্রাদারহুডের রয়েছে আত্মিক সম্পর্ক। মুরসি শপথ গ্রহণের পর কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের উদ্দেশে দেয়া বক্তব্যে বলেছিলেন 'ফিলিস্তিনিদের প্রতি তাদের সমর্থন অব্যাহত থাকবে।' ড. মুরসির এই ঘোষণাকে স্বাভাবিকভাবে নেয়নি ইসরাইল ও আমেরিকা।

ইউরোপ-আমেরিকা সবাই ড. মুরসিকে অভিনন্দন জানালেও তাদের প্রত্যেকেরই মুসলিম ব্রাদারহুডের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানা ছিল। তাছাড়া ইসরাইলের জন্য হুমকি এমন কোনো কিছুকেই আমেরিকা বরদাশত করবে না। নির্বাচনী রায়কে পাশ্চাত্যের শাসক ও নীতি নির্ধারকরা প্রথমেই চায়নি। যেহেতু নির্বাচনে

www.pathagar.com

তাদের তাঁবেদার গোষ্ঠী বিজয় লাভ করতে পারেনি, তাই বসে থাকেনি সেক্যুলারিস্টরা। সেই চিত্রটি ফুটে উঠেছে ২০১২ সালের ২৭ জুন তারিখে লন্ডনের 'দি ইভনিং স্ট্যান্ডার্ড' নামক একটি দৈনিকে প্রকাশিত ব্রিটেনের সাবেক প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ারের লেখা এক প্রবন্ধে। মি. ব্লেয়ারের মনোভাব বিশ্ব মোড়লদের চিন্তার একটি প্রতিচ্ছবি এতে সন্দেহ নেই। উক্ত প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন, One thing, however, is for sure. It has huge consequences for us in the West. This is not just about oil and energy. .. But the security issues alone, arising out of this upheaval, are momentous. অর্থাৎ 'একটি বিষয় অতি সুনিশ্চিত। পাশ্চাত্যে আমাদের জন্য (মধ্যপ্রাচ্যের এ বিপ্লব) বিশাল প্রভাব ফেলবে। সেটি শুধু তেল বা জ্বালানির ক্ষেত্রে নয়। শুধু নিরাপত্তার ক্ষেত্রেই এ বিপ্লব-উদ্ভূত পরিস্থিতির ফলাফলটি হবে অতি ব্যাপক।' এর মাধ্যমে টনি ব্লেয়ার ও তার পাশ্চাত্যের মিত্ররা মধ্যপ্রাচ্যের বিপ্লবে নিরপেক্ষ নন। মিসরে তাদের একটি ঘনিষ্ঠ মিত্র রয়েছে। তাদের পরাজয়ে তিনি যে দুঃখী এবং তাদের একাকী ছেড়ে দেয়া যে পাশ্চাত্যের জন্য ঠিক হবে না সে পরামর্শটিও তিনি দিয়েছেন খুব খোলামেলাভাবে।। তিনি লিখেছেন, "Remember that in Egypt, yes, the Muslim Brotherhood won a majority. But the outcome was close. There are a lot of worried liberal-minded people there who believe in more secular democracy as we do in the West. They should not be forgotten." অর্থাৎ 'স্মরণ করুন যে, মিসরে মুসলিম ব্রাদারহুড সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে; কিন্তু ফলাফলটি অতি কাছাকাছির। সেখানে রয়েছে উদার মনের বহু মানুষ যারা সেক্যুলার গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে যেমনটি আমরা পাশ্চাত্যে বিশ্বাস করি। তাদের ভুলে থাকা যাবে না।' টনি ব্লেয়ার লিখেছেন, But it must now reinforce the idea that democracy is a way of thinking, not just of voting. অর্থাৎ 'এ ধারণাটিকে অবশ্যই বলিষ্ঠ করতে হবে যে, গণতন্ত্রের অর্থ শুধু ভোটদান নয় বরং চিন্তা-চেতনার একটি ধরন।' আমার মনে হয় মিসরের ব্যাপারে পশ্চিমাদের মনোভাব জানার জন্য আর কোনো বয়ান দেয়ার দরকার আছে কি? আজ প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, মুসলমানদের ক্ষেত্রে পশ্চিমারা গণতান্ত্রিক পন্থায় নির্বাচিতকে আদৌ ইনসাফের রায় মনে করে কি? সমসাময়িক পৃথিবীতে তার প্রমাণ দুরূহ। আলজারিয়ায় মুসলিম স্যালভেশন ফ্রন্টের বিজয়ের পরও ক্ষমতার কেন্দ্রে তাদের আসীন হতে দেয়া হয়নি। মিসরের ক্ষেত্রেও কি একই নীতি কার্যকর হচ্ছে? মুসলিম বাদ্রারহুডের বিজয় শোষিত, বঞ্চিত আর অবহেলিত গোটা মুসলিম উম্মাহর জন্য আশার আলো জ্বালিয়েছিল। আবার খুব অল্প সময়ের মধ্যে

www.pathagar.com

সেক্যুলারিস্টদের ষড়যন্ত্র কূটকৌশল আর সেনাবাহিনীর অগণতান্ত্রিক হস্তক্ষেপে সোনালি সূর্য অস্তমিত হওয়ায় বিশ্বেব্যাপী মুসলিম উম্মাহর হৃদয়ে আঘাত হেনেছে এতে সন্দেহ নেই। তবে মুসলিম বাদ্রারহুডের উচিত হবে সবকিছুকে ষড়যন্ত্র দিয়ে বিবেচনা না করে নিজেদের ভুল নির্ণয় ও আগামীর কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ করে বীরের মতো এগিয়ে যাওয়া। এরই মধ্য দিয়ে অস্তমিত সূর্য আবার উদিত হবে। সেটি দেখার অপেক্ষায় তাকিয়ে আছে সারা পৃথিবীর সত্যপন্থীরা। আজ অত্যন্ত অন্যায়ভাবে সেনা সরকার নির্বাচিত প্রেসিডেন্টকে সিসি ফাঁসি দিয়ে ইসলামী আন্দোলনের নেতা-কর্মীদের ওপর হামলা-মামলা, নির্যাতন অব্যাহত রেখেছে; কিন্তু কোন ষড়যন্ত্রই ইসলামী আন্দোলনের অগ্রযাত্রা ব্যহত করতে পারবে না ইনশাল্লাহ।

রাবায়া স্কয়ারে শহীদ আসমাকে বাবার লেখা হৃদয়স্পর্শী চিঠি

মিসরের স্বৈরাচার সিসি বিরোধী আন্দোলনে ২০১৩ সালের ১৪ আগস্ট রাবায়া স্কয়ারে প্রায় ৩০০০ হাজার ইখওয়ান নেতা-কর্মী শহীদ হন। যা পৃথিবীর প্রায় সকল গণমাধ্যমে প্রচারিত ও প্রকাশিত হয়। আর তাঁদের নেতা মুহাম্মদ বেলতাগির ১৭ বছরের মেয়ে আসমা বেলতাগি রাবায়া আল আদারিয়া স্কয়ারে ১৪ আগস্ট মিসরীয় সেনাবাহিনীর স্লাইপার গুলিতে নিহত হন। বাবা নিজ কন্যার জানাযায় অংশ নিতে পারেননি। তবে তিনি তাঁর শহীদ মেয়ের জন্য একটা খোলা চিঠি লিখেছিলেন, সেটি আরবি থেকে ইংলিশে অনুবাদ করেছে 'মিডিলইস্ট মনিটর'। সংগৃহীত সেই চিঠিটির বাংলা অনুবাদ হুবহু তুলে ধরা হলো :

প্রিয় আসমা,

মা মণি, আমি তোমাকে বলবো না 'বিদায়', বরং বলবো এই তো আগামীকাল আমরা আবার মিলিত হচ্ছি।

মা আমার, তুমি বেঁচে ছিলে মাথা উঁচু করে, উদ্ধত ছিলে স্বৈরাচারের শিকল ভাঙতে, কারণ তুমি ভালোবাসতে স্বাধীনতা। খুব নীরবে নিভৃতে তুমি বেঁচেছিলে তোমার জাতিকে মহিমান্বিত করতে।

মাগো, তোমার বয়সীরা হইহুল্লোড়ের যে জীবনযাপন করতো কখনই সে জীবন তোমাকে আকৃষ্ট করেনি। ক্লাসের প্রথাগত পড়াশুনাতেও তুমি মজা পাওনি কখনো, অথচ সেই তুমিই ছিলে সবসময় ক্লাসের ফার্স্ট গার্ল।

আমার মা গো, এই সংক্ষিপ্ত জীবনে আমি তোমারা আদর আর মমতার সঙ্গ খুব বেশি পেলাম না, আমার এই সংগ্রামী জীবনে আমি কিঞ্চিত সময় করে উঠতে পারিনি তোমাকে প্রাণভরে আদর করতে।

www.pathagar.com

শেষবার যখন আমরা রাবায়া আল আদারিয়া স্কয়ারে বসেছিলাম তখন তুমি আমাকে বলেছিলে- 'বাবা এখানে আমরা একসাথে আছি, তবুও তুমি এত ব্যস্ত যে, আমি তোমাকে পাচ্ছি না। আমি উত্তরে বলেছিলাম, 'মাগো পৃথিবীর এই ছোট্ট জীবন তোমাকে আদর করার জন্য যথেষ্ট নয়, তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কাছে দু'আ করছি তিনি যেন আমাদের বাপ-বেটিকে জান্নাতে সেই সুযোগ করে দেন।'

তোমাকে হত্যা করার ঠিক দুই রাত আগে আমি তোমাকে স্বপ্নে দেখেছিলাম, অনিন্দ্য সুন্দরী তুমি একটা ধবধবে সাদা বিয়ের পোশাক পরে আমার পাশে এসে বসলে, আমি বললাম 'মা মণি আজ কি তোমার বিয়ের রাত?' তুমি উত্তরে বলেছিলে, 'রাতে নয় বাবা, আমার বিয়ে হবে দুপুরবেলা। ঠিক দুপুর বেলায় তোমাকে হত্যা করা হয়েছিল, আর সঙ্গে সঙ্গে আমি বুঝে গেলাম স্বপ্নে তুমি আমাকে কী বোঝাতে চেয়েছিলে। আমি নিশ্চিত আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তোমাকে শহীদ হিসেবে গ্রহণ করেছেন, তোমার শাহাদাত আমার বিশ্বাসের ভিতকে আর সুদৃঢ় করেছে যে নিশ্চয়ই মিথ্যার বিপক্ষে আমরা সত্যের পথে আছি।

মা মণি, তোমাকে শেষবারের মতো বিদায় জানাতে, তোমার মুখখানি শেষবারের মতো দেখে নিতে, শেষবারের মতো তোমার কপালে চুম্বন এঁকে দিতে, আর তোমার মতো সম্মানিত শহীদের নামাজে জানাযার ইমামতি করতে না পারার তীব্র যাতনা আমাকে কাতর করতে পারেনি; বরং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কসম করে বলছি, কারাগারের বন্দিজীবন অথবা মৃত্যুর ভয়ে কখনই আমি ভীত ছিলাম না, তোমার বিষয়ে এই সাক্ষ্য দিচ্ছি, নিশ্চয়ই তুমি এই সত্যের বিপ্লবে নিজেকে উৎসর্গ করেছ, ইনশা আল্লাহ বিজয় আমাদের হবেই। স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে তোমার মৃত্যু আরও শাণিত করেছে আমাদের বিপ্লবকে। ঘাতকের বুলেট আঘাত করেছে তোমার বুকে, এটাই প্রমাণ করে তোমার নিয়ত কতটা নিখাঁদ ছিল, বাবা হিসেবে আমি তোমাকে নিয়ে গর্বিত যে, আমাদের মধ্য থেকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তোমাকেই পছন্দ করেছেন এবং গ্রহণ করেছেন তোমার উৎসর্গিত জীবন।

মা মণি, পরিশেষে আমি তোমাকে বলবো না 'বিদায়' বরং বলবো 'স্বাগতম' মা মণি।

নিশ্চয়ই খুব সহসাই আমরা মিলিত হবো জান্নাতে আমাদের প্রাণপ্রিয় নবী ﷺ এবং তাঁর সাহাবীদের সঙ্গে, যেখানে আমি তোমাকে অনেক আদর করতে পারবো। পৃথিবীর এই সংক্ষিপ্ত সময়ে যা আমি পারিনি। (মিডলইস্ট মনিটর)।

www.pathagar.com

আরাকানে মুসলমানদের ওপর জুলুম-নির্যাতন

আরাকানে রোহিঙ্গাদের ওপর ইতিহাসের বর্বর, অমানবিক ও রোমহর্ষক নির্যাতনের ঘটনা এখন 'টক অব দ্যা ওয়ার্ল্ড'। মানবতাবিরোধী এমন কর্মকাণ্ডে বিশ্ববিবেক আজ স্তব্ধ ও হতবাক! এ যেন আধুনিক জাহেলিয়াতের আরেক নমুনা। মুসলিম নর-নারী আর শিশু-কিশোরদের আর্তনাদে আল্লাহর আরশ কাঁপছে! কিন্তু ইয়াজিদের মতো মন গলছে না এ সমাজের নব্য ফেরাউন আর নমরুদের উত্তরসূরিদের। কারণ একটাই নির্যাতিত, বঞ্চিত আর অবহেলিত ওরা তো মানুষ নয়, ওরা মুসলমান! এখানে জাতিসংঘ, বিশ্বমানবাধিকার সংস্থা আর বিশ্ব মোড়লদের বক্তৃতা-বিবৃতি দেয়া ছাড়া যেন আর কিছুই করার নেই। অথচ রোহিঙ্গা আজ একটি আন্তর্জাতিক সমস্যা। খ্রিস্টপূর্ব ২৬৬৬ অব্দ থেকে ১৭৮৪ অব্দ পর্যন্ত প্রায় সাড়ে চার হাজার বছর আরাকান ছিল বাঙালি মুসলমানদের গড়া এক স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র। এখানে মগ এবং মুসলমানের মধ্যে অতীত ইতিহাসে সম্প্রীতির কোনো অভাব ছিল না। ম্রোহং (রোহাং) শহর ছিল আরাকানের রাজধানী। মহানবী ﷺ-এর জীবিতকালেই আরবদের সঙ্গে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল। খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকে আরব বণিকদের সঙ্গে বঙ্গোপসাগরীয় অঞ্চলগুলোর বাণিজ্যিক যোগাযোগের মাধ্যমে আরবীয় দ্বীপগুলোতে মুসলমানরা আলাদা একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল। এ রাজ্যের শাসকের উপাধি ছিল 'সুলতান'। আরাকান মূলত ইসলামী রাষ্ট্রের আদলে গড়ে ওঠা প্রাচীন ঐতিহ্যমণ্ডিত একটি শহর; কিন্তু আজ নিজ মাটিতেই মুসলমানরা পরাধীন।

কথিত আছে, এ বংশের রাজা মহত ইং চন্দ্রের রাজত্বকালে (৭৮৮-৮১০) মুসলমানদের কয়েকটি বাণিজ্য বহর রামব্রী দ্বীপের তীরে এক সংঘর্ষে ভেঙে পড়ে। জাহাজের আরবীয় আরোহীরা তীরে এসে ভিড়লে রাজা তাদের উন্নততর আচরণে সন্তুষ্ট হয়ে আরাকানে বসতি স্থাপন করান। আরবীয় মুসলমানরা স্থানীয় রমণীদের বিয়ে করেন এবং স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। আরবীয় মুসলমানরা ভাসতে ভাসতে কূলে ভিড়লে পর রহম, রহম ধ্বনি তুলে স্থানীয় জনগণের সাহায্য কামনা করতে থাকে। বলাবাহুল্য রহম একটি আরবি শব্দ যার অর্থ দয়া করা। কিন্তু জনগণ মনে করে, এরা রহম জাতীয় লোক। রহম শব্দই বিকৃত হয়ে রোয়াং হয়েছে বলে রোহিঙ্গারা মনে করে থাকেন। এভাবেই আরাকানের গোড়াপত্তন।

বার্মার সঙ্গে আরাকানিদের সম্পর্ক সদাসর্বদা আরাকানিদের সর্বনাশ সাধন করেছে। বর্মীদের কাছে আরাকানিরা নিগৃহীত হয়েছে, লাঞ্ছিত হয়েছে এবং স্বাধীনতার চেতনায় গর্বিত আরাকানিরা হারিয়েছে তাদের প্রিয় স্বাধীনতা।

www.pathagar.com

পক্ষান্তরে বাংলা-আরাকান সম্পর্ক আরাকানিদের জন্য এনে দিয়েছে স্বাধীনতা ও জাতিগত মর্যাদা। ১৭৮২ খ্রিস্টাব্দে বর্তমান আরাকান উপকূলে অবস্থিত রামব্রী দ্বীপের অধিবাসী 'থামাদা' নামে জনৈক ব্যক্তি আরাকানের রাজধানী 'ম্রোহং'য়ের ক্ষমতা দখল করে নিজেকে রাজা বলে ঘোষণা করলে সুদীর্ঘকালের গৃহযুদ্ধে বিপর্যস্ত স্বাধীন আরাকানের রাজনৈতিক ভারসাম্য সম্পূর্ণ ধক্ষংস হয়ে পড়ে। অপরদিকে বার্মার রাজাই আরাকান থেকে শিখেছে সভ্যতা ও সংস্কৃতি In her previous connection with outside states, Arakan had always been gained. As feudatory to Bengal she (Arakan) had laid foundation of her age. But administered as a Governorship by the Burmese of the 18th century, she had nothing to teach a country which for centuries had been in touch with the world of thought and action through the Muslim Sultanates at a time when Burma herself was isolated and backward.

বঙ্গদেশের করদরাজ্য হিসেবে আরাকানকে প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে সূচিত হয় এক মহাযুগের; কিন্তু অষ্টাদশ শতকে বার্মার অধীন একটি প্রদেশ হিসেবে শাসিত হয়ে আরাকানিদের যেমন লাভ করার কিছুই ছিল না, তেমনি আরাকানিদের মতো এমন এক জাতিকে শেখানোর মতো বর্মীদেরও কিছুই ছিল না। কারণ আরাকানি জাতি কয়েক শতাব্দী ধরে জ্ঞান-গরিমার উচ্চশিখরে আরোহণকারী মুসলিম সমাজের ঘনিষ্ঠ সংশ্রবে ছিল। এ সময় বর্মীরা ছিল বিচ্ছিন্ন ও পশ্চাত্পদ একটি জাতি। ভোদাপায়া আরাকান দখল করে এ স্বাধীন অবস্থার বিলুপ্তি ঘটান। অথচ ঘা-থানডির সঙ্গে প্রতিজ্ঞা ছিল, ভোদাপায়া আরাকানের স্বাধীন অবস্থা অক্ষুণ্ন রাখবেন আর বিনিময়ে আরাকান বার্মার রাজাকে বার্ষিক কর প্রদান করবে যেমনটি করেছিল ১৪৩০ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশের গৌড়ের সুলতান জালালউদ্দিন শাহ। যা হোক, ভোদাপায়া ১৭৮৪ সালে আরাকান দখল করে বার্মাকে একটি প্রাদেশিক রাজ্যে পরিণত করলেন এবং ঘা-থানডিকে নিয়োজিত করলেন প্রাদেশিক গভর্নর হিসেবে।

ভোদাপায়ার আরাকানের ক্ষমতা দখলের মাত্র এক বছরের মধ্যেই ঘা-থানডির ওপর এসে যায় আরেক প্রবল অর্থনৈতিক আঘাত। ভোদাপায়া শ্যাম রাজ্য (বর্তমান থাইল্যান্ড) আক্রমণের জন্য চলিশ হাজার সৈন্য ও চলিশ হাজার মুদ্রা চেয়ে ঘা-থানডির ওপর প্রজ্ঞাপন জারি করলেন। প্রকৃতপক্ষে প্রকট দারিদ্র্যের সর্বনিম্ন অবস্থানে নিপতিত আরাকানের জনগণের পক্ষে এর শতাংশ ভাগ পূরণও সম্ভব ছিল না। চাপের মুখে ঘা-থানডির দাবির অর্ধেক কোনোভাবে পূরণে রাজি হলে ভোদাপায়া রাগান্বিত হয়ে ঘা-থানডির এক ছেলেকে হত্যা করেন। পুরো

www.pathagar.com

দাবি আদায় না হলে পরিবারের সবাইকে অনুরূপ হত্যা করা হবে বলে হুমকি দেন। এতে ভীত হয়ে ঘা-থানডি কয়েক হাজার অনুচর নিয়ে পালিয়ে আশ্রয় নেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি অধিকৃত সীমান্তবর্তী কক্সবাজার জেলার গভীর পার্বত্য অঞ্চলে। আর এরই সঙ্গে শুরু হয় আরাকানিদের মরণপণ স্বাধীনতা সংগ্রাম। অদৃষ্টের পরিহাস যার অনুপ্রেরণায় ভোদাপায়া আরাকান দখল করলেন, তারই নেতৃত্বে মাত্র এক বছরের মধ্যে শুরু হলো একটি স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস। মূলত দীর্ঘদিনের স্বাধীনতা হারিয়ে এবং আরাকানিদের ওপর বর্মী সৈন্যদের চরম নির্যাতন এবং জনগণের ওপর ভোদাপায়ার অতিরিক্ত কর আরোপ প্রভৃতিতে আরাকানের জনগণ অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে। আরাকান থেকে লুণ্ঠিত মাল ও বিশাল মহামুনি মূর্তি দুর্গম পার্বত্য পথ দিয়ে বার্মার মান্দালয়ে স্থানান্তর করতে হাজার হাজার মগ-মুসলিম আরাকানিদের জোর করে নিয়োগ করা হয়। দুর্গম গিরিপথ দিয়ে এ স্থানান্তরের কাজ ম্রোহং থেকে মানাদলয় পর্যন্ত পথ আরাকানিদের লাশে ভরে গিয়েছিল। এখনও ম্রোহং আন গিরিপথ পর্যন্ত এলাকা জনবসতি বিরল।

সুতরাং এ কথা আজ বুঝতে বাকি নেই আরাকানের মুসলমানদেরও আজকের এ দুর্দশার মূল কারণ তারা মুসলমান। আরকানের মুসলমানদের নির্যাতনের চিত্র প্রায় শত বছরের। অথচ আজ পৃথিবীতে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান সবার ধর্মীয় অধিকার আর স্বাধীনতা সংরক্ষণের জন্য বহুবিধ আইন হয়েছে। শুধু নেই মুসলমানদের জন্য! খ্রিস্টীয় ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে ইউরোপে ধর্মযুদ্ধ সংঘটিত হয়। সেখানে ধর্মীয় স্বাধীনতা সংরক্ষণ বিভিন্ন দেশের জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া হয়। যেমন ১৬৪৮ সালের Peace of Wesphalia জার্মানিতে রোমান ক্যাথলিক ও প্রটেস্ট্যান্টদের সমান অধিকারকে স্বীকার করে নেয় এবং এতেকরে তাদের মধ্যে ৩০ বছরের যুদ্ধের অবসান হয়। বস্তুত এর উদ্দেশ্য স্বাধীনতা নয়, ধর্মমতকে সমুন্নত রাখা। ফ্রান্স যখন হাডসন উপসাগর এবং আকাডিনকে গ্রেট ব্রিটেনের হাতে ছেড়ে দেয়ার জন্য ১৭১৩ সালে Utrecht (Netherlands) Treaty করে তখন তাকে বলা হয়েছিল, ওই এলাকার রোমান ক্যাথলিকরা এক বছরের মধ্যে সেখান থেকে চলে যাবে, আর যারা থাকতে চায় তারা ততটুকুই ধর্মীয় স্বাধীনতা পাবে যতটুকু গ্রেট ব্রিটেন আইনানুযায়ী তাদের প্রদান করবে। ১৭৬৩ সালে ফ্রান্স, গ্রেট ব্রিটেন, স্পেন এবং পর্তুগালের মধ্যে সম্পাদিত 'প্যারিস চুক্তি' (Treaty of Paris, ১৭৬৩) অনুযায়ী গ্রেট ব্রিটেন তার সদ্যপ্রাপ্ত কানাডিয়ান ক্যাথলিকদের ততটুকু ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগের সুযোগ দেয়, যতটুকু গ্রেট ব্রিটেনের আইনে অনুমোদিত হয়। ভিয়েনা কংগ্রেসে ধর্মীয় স্বাধীনতার পাশাপাশি সংখ্যালঘুদের বিষয়টিও

www.pathagar.com

বিবেচিত হয়। নেদারল্যান্ডস, গ্রেট ব্রিটেন, রাশিয়া, প্রুসিয়া এবং অস্ট্রিয়ার মধ্যে ১৮১৫ সালের ৩১ মে 'ভিয়েনা চুক্তি' সম্পাদিত হয়। এর ৮ অনুচ্ছেদে বলা হয়, সব ধর্মীয় সম্প্রদায়কে রক্ষা করা হবে এবং ধর্ম-মত নির্বিশেষে সব নাগরিক সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে সমান অধিকার ভোগ করবে। সুইস ক্যান্টন বেম ও বালের (Beme and Baal) জনগণের জন্য রচিত কংগ্রেসের Final Act-এর ৭৭ অনুচ্ছেদে ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং ব্যক্তিগত নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার স্বীকৃত হয়।

১৮শ' শতকের শেষ দিকে যখন পোল্যান্ডের রাজা তার দেশের অর্থডক্স ও প্রটেস্ট্যান্টদের ওপর অত্যাচার করছিল তখন রাশিয়ার ক্যাথেরিন দ্বিতীয় (Catherine II) এবং প্রুসিয়া ও গ্রেট ব্রিটেনের সরকার মিলে পোল্যান্ডরাজের ওপর চাপ সৃষ্টি করলে রাজা ওই অত্যাচার বন্ধ করতে বাধ্য হন। ১৯শ' শতকে তুরস্কে খ্রিস্টানরা যখন বারবার চরমভাবে মার খাচ্ছিল, তখন রাশিয়ার হস্তক্ষেপে তা বন্ধ হয়ে যায়। এমনকি গ্রিসের মাটিতে তুর্কিদের দ্বারা খ্রিস্টান-নির্যাতন বন্ধ হয় ১৮২৯ সালে ইউরোপীয় হস্তক্ষেপে। পরের বছর ১৮৩০ সালে লন্ডন কংগ্রেস্ত যা গ্রিসের স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দেয়, তা একটি প্রটোকল সই করে যাতে নতুন রাষ্ট্রগুলোর ওপর বাধ্যবাধকতা আরোপ করে বলা হয়, তারা তাদের নাগরিকদের ধর্মীয় স্বাধীনতাকে সম্মান করবে এবং সরকারি বা বেসরকারি চাকরির ক্ষেত্রে তাদের সমান সুযোগ দেয়া হবে।

১৯৪৮ সালের সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার ১৮ অনুচ্ছেদে প্রত্যেক মানুষের জন্য ধর্মীয় স্বাধীনতা সংরক্ষণ করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, প্রত্যেকেরই চিন্ত া, বিবেক ও ধর্মীয় স্বাধীনতা রয়েছে, সে তার ধর্ম বা বিশ্বাস পরিবর্তন করতে পারবে এবং প্রকাশ্যে বা গোপনে শিক্ষাদান, অনুশীলন, ধর্মানুষ্ঠান ও ধর্মপালনের মাধ্যমে তার আপন ধর্ম এবং বিশ্বাস প্রচার করতে সক্ষম হবে। নাগরিক ও রাজনৈতিক চুক্তির প্রস্তাবনার তৃতীয় প্যারায় বলা হয়েছে, free human being-এর আদর্শ, যে নাগরিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা ভোগ করে এবং ভীতি ও অভাব থেকে মুক্ত থাকে, কেবল তখনই অর্জন করা সম্ভব, যখন সেই অবস্থা সৃষ্টি করা হয়। যেখানে প্রত্যেকেই তার নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার উপভোগ করে; কিন্তু আন্তর্জাতিক এসব আইন থাকলেও তা আজ মুসলমানদের জন্য একেবারেই প্রযোজ্য নয়! কিতাবে লেখা এ আইনে আরাকানের মুসলমানদের বেঁচে থাকার সামান্য সুরক্ষাটুকু কি দিতে ব্যর্থ?

তাছাড়া ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দে নিজ ভাই আওরঙ্গজেবের হাতে পরাজিত হলে শাহ সুজা সপরিবারে এবং একদল অনুচর বাহিনী নিয়ে আরাকানে পালিয়ে যান।

www.pathagar.com

আরাকানের তৎকালীন রাজার নাম সান্দা-থু ধর্ম্মা; রাজত্বকাল ১৬৫২-১৬৪৮ খ্রিস্টাব্দ। আরাকানের রাজা চন্দ্র-সু দমবর্মা বা সান্দা-থু-ধর্ম্মা শাহ সূজার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, একটি বড় নৌ-জাহাজ দিয়ে শাহ সুজাকে সাহায্য করবেন যেন তিনি শেষ জীবন পবিত্র মক্কায় যাপন করতে পারেন। প্রতিজ্ঞানুসারে শাহ সুজা আরাকানের রাজধানী ম্রোহং পৌঁছলে রাজকীয় সম্মান দেখিয়ে আরাকানের রাজা তাকে গ্রহণ করেন এবং লেম্রো নদীর তীরে শাহ সুজাকে একটি সুন্দর প্রাসাদ নির্মাণ করে দেন। কিন্তু শাহ সুজার মূল্যবান সম্পদ ও অপূর্ব সুন্দরী কন্যা আমেনাকে দেখে সান্দা-সু-ধর্ম্মা পাগল হয়ে ওঠেন। যা হোক, রাজা সান্দা-সু-ধর্ম্মা রাজকুমারী আমেনাকে বিয়ে করার জন্য প্রস্তাব পাঠালে মুঘল বংশীয় শাহ সুজা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন। অবশেষে শাহ সুজার সঙ্গে সান্দা-সু-ধর্ম্মার যুদ্ধে রোসাঙ্গের মুসলমানদের অনেক খেসারত দিতে হয়।

আরাকানবাসীদের স্বাধীনতা সংগ্রাম

১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে বার্মার রাজা ভোদাপায়া আরাকান আক্রমণ করে দখল করে নিলে কয়েক হাজার আরাকানি পালিয়ে সীমান্তবর্তী পাহাড়ে আশ্রয় নেয়। আরাকানিরা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে অতর্কিত বর্মী বাহিনীর ওপর হামলা চালাতে শুরু করে। বিদ্রোহী আরাকানিদের আশ্রয়স্থল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনাধীন থাকায় বার্মার রাজা। এদের মূল নেতাদের ধরিয়ে দেয়ার জন্যে কোম্পানি সরকারের ওপর চাপ দিতে থাকে। নয়তো কোম্পানির এলাকা বর্মী বাহিনী আক্রমণ করবে বলে হুঁশিয়ারি দেয়। একপর্যায়ে ধূর্ত ব্রিটিশ ছল-চাতুরীর সাহায্যে তিনজন বিদ্রোহী বন্দির চোখ উপড়ে ফেলে এবং জ্বলন্ত আগুনে জীবন্ত নিক্ষেপ করে মেরে ফেলে। ব্রিটিশদের এমন ধৃষ্টতাপূর্ণ নিষ্ঠুর আচরণকে গোটা ভারত বর্বরতা বলে অভিহিত করে। এত অত্যধিক সংখ্যক আরাকানি পালিয়ে আসে যে, এ অঞ্চলে এক মানবিক সমস্যার সৃষ্টি হয়। শুধু দৈনিক শিশুর মৃত্যুর হার বিশ জন বলে এক রিপোর্টে উল্লেখ আছে। নাফ নদী আরাকানিদের মৃত দেহে ভরে ওঠে।

বর্তমান মিয়ানমারের অধীনে আরাকান প্রদেশই সেকালে রোসাঙ্গ রাজ্য হিসেবে খ্যাত ছিল। বাঙালি জাতির অনেক দুঃখ-বেদনা, আশা-আকাঙ্ক্ষার আবেগী স্মৃতির সঙ্গে এখনও মিশে আছে রোসাঙ্গ রাজ্য ও রোসং রাজসভা। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যচর্চার প্রাণকেন্দ্রে এই রোসাঙ্গ রাজ্য। বাঙালি জাতির স্বকীয় ঐতিহ্য, ধর্মীয় মূল্যবোধের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল স্বাধীন ও সার্বভৌম রোসাঙ্গ রাজ্য। স্বাধীন রোসাঙ্গ রাজ্যের শিল্প-সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সভ্যতার উত্তরাধিকারী বাঙালি মুসলিম সমাজ। প্রকৃতপক্ষে বাংলা সাহিত্যচর্চা শুরু হয় বাংলার রাজধানী গৌড়ের ইলিয়াসশাহী রাজবংশের ঐকান্তিক আগ্রহ ও আনুকূল্যে। পঞ্চদশ

www.pathagar.com

শতাব্দীর মধ্যকালে গৌড়ের পতনের পর আরাকানের রোসাঙ্গ রাজসভাই হয়ে ওঠে বাংলা সাহিত্যচর্চার প্রাণকেন্দ্র। সপ্তদশ শতকের আরাকান রাজসভার বাঙালি কবি দৌলত কাজী, আলাওল, মরদন, নাসুলা খান প্রমুখ আরাকানকে রোসাঙ্গ বলে অভিহিত করেছেন। ১৬৮৪ খ্রিস্টাব্দে আরাকানের বৌদ্ধদের মুসলমানদের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক উসকানি দিতে থাকে। সুদীর্ঘকাল ধরে পাশবিক বর্বরতায় অভ্যস্ত জলদস্যুরা আরাকান পৌঁছলে আরাকান নানা ধরনের অপকর্মে ভরে ওঠে। বর্বরতা ও পাশবিকতায় আরাকানের পরিবেশ নষ্ট হয়ে পড়ে।

সমকালীন ঐতিহাসিক সিহাবদ্দিন তালিশ মগ দস্যুদের দস্যুবৃত্তির স্বরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন, মগ দস্যুরা জলপথে নদীর মোহনা থেকে বঙ্গদেশের গভীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করে জনপদগুলোতে অতর্কিত হামলা করে গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দিত। স্ত্রী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ, ধনী-দরিদ্র যাকেই পেত অমানুষিক অত্যাচারের পর বন্দি করে নিত। বন্দিদের হাতের তালু জ্বলন্ত লৌহ শলাকা দিয়ে ছিদ্র করে ছিদ্রপথে সরু বেত চালিয়ে বেঁধে টানতে টানতে জাহাজের নিম্নতলে নিক্ষেপ করে বস্তার মতো স্তূপ করে রাখতো। সকাল-সন্ধ্যা জাহাজের উপর থেকে ছিদ্রপথে খাদ্যস্বরূপ আস্ত চাল নিক্ষেপ করত। এত পাশবিক অত্যাচারের পরও যারা বেঁচে যেত, তাদেরই তারা আরাকানে নিয়ে যেত। আরাকান রাজ এদের পতিত জমি আবাদ করে কৃষিকাজে নিয়োগ করত।

অতএব ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, অতীতে যতবার বাংলা-বার্মা বিরোধ যুদ্ধে রূপান্তরিত হয়েছে, ততবারই আরাকান বাংলাদেশের দখলে চলে এসেছে। আরও লক্ষণীয় বিষয় হলো, আরাকানের ওপর বর্মীদের দখলদারিত্বকে কেন্দ্র করেই বর্মী সৈন্যরা সীমান্তে উসকানিমূলক তৎপরতা চালিয়েছে এবং এর পরিণতিতে বাংলা-বার্মা যুদ্ধের সূত্রপাত হয়েছে।

ব্রিটিশ শাসনকালে বার্মার কাঠামোগত পরিবর্তন

১৮৮৫ সালে সংঘটিত তৃতীয় এংলো-বাংলা যুদ্ধে বর্মী রাজার সর্বশেষ সেনাবাহিনী ব্রিটিশ বাহিনীর কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হলে গোটা বার্মা ব্রিটিশদের দখলে চলে আসে। উল্লেখ্য, ১৮২৪-২৬ সালের প্রথম অ্যাংলো-বাংলা যুদ্ধে আরাকান ও টেনাসারিয়াম বর্মীদের দখলমুক্ত হয়ে ব্রিটিশদের দখলে আসে। ১৮৫২ সালে দ্বিতীয় অ্যাংলো-বার্মা যুদ্ধে পেগু ব্রিটিশদের দখলে আসে। প্রকৃতপক্ষে বর্মী সৈন্যদের স্বেচ্ছাচারিতা, বর্বরতা ও বাংলা-বার্মা সীমান্তে একগুঁয়েমি আচরণ থেকে অ্যাংলো-বার্মা যুদ্ধের সূত্রপাত এবং এর ফলে বর্মীদের হারাতে হয় স্বাধীনতা। আরাকানে রোহিঙ্গাদের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়ের প্রধান সাক্ষী রাখাইন আর মগ সম্প্রদায়ের একটি অংশ প্রতিনিয়ত রোহিঙ্গাদের বহিরাগত

www.pathagar.com

হিসেবে অপপ্রচার চালিয়ে এসেছে। বার্মার সামরিক সরকার হলো এই অপপ্রচারের প্রধান হোতা ও উসকানিদাতা। দ্বিতীয়ত ভারতীয় হিসেবে চিহ্নিত মুসলমানদের নেতৃত্বাধীন বার্মার মুসলমানরা স্বাধীনতা আন্দোলনের সুদীর্ঘ পথপরিক্রমায় বার্মার বহিরাগত মুসলমানদের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে। একশ্রেণির রাখাইন বা মগ অপপ্রচারকারী রোহিঙ্গা জাতির এই দুর্বল রাজনৈতিক অবস্থানকে প্রপাগান্ডার উপাদান হিসেবে অব্যাহতভাবে কাজে লাগায়।

আরাকানের নৃশংসতম গণহত্যা

১৯৪২ সালের জুন মাসে আরাকানের মগ সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী অস্ত্রশস্ত্র হস্তগত করে আকিয়াব, রাছিডং, ক্যকথ, মাব্রা, মিনবিয়া, পুনাজয় প্রভৃতি এলাকায় রোহিঙ্গা মুসলমানদের ওপর বেপরোয়া গণহত্যার সূচনা করে। নারী-শিশু-বৃদ্ধ নির্বিশেষে হত্যা, লুটতরাজ ও গ্রামের পর গ্রাম বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিয়েও উন্মত্ত মগ হামলাকারীরা ক্ষান্ত হয়নি, বহু মানুষের মস্তক বর্শার মাথায় বিঁধে তাণ্ডবনৃত্য করেছিল। আকিয়াবের মরহুম খলিলুর রহমান বিএ. বিএল তার কারবালা-ই-আরাকান গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি ১৯৪২ সালের গণহত্যায় সম্পূর্ণ উচ্ছেদ হয়ে যাওয়া ৩৭৬টি গ্রামের বর্ণনা দিয়ে বার্মার পত্রিকায় নিবন্ধ প্রকাশ করেছেন। উন্মত্ত মগ সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য দুর্গম আপক গিরিপথে যাওয়ার সময় হাজার হাজার লোক মৃত্যুবরণ করেন। কক্সবাজারের স্থানীয় প্রশাসন সমুদ্রের উপকূলবর্তী একটি এলাকায় বহু উদ্বাস্তুকে পুনর্বাসন করেছিলেন, যা এখনও রিফিউজি ঘোনা নামে পরিচিত। দুঃখজনক বিষয় হলো, বার্মা সরকার এসব উদ্বাস্তুকে আর স্বদেশে ফিরিয়ে নেয়নি।

বর্তমান সময়ে নির্যাতনের নিষ্ঠুর, পৈশাচিক ও লোমহর্ষক ঘটনা তো সবারই জানা, যা প্রতিনিয়ত পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে। আরাকানের গোটা মুসলিম জনগোষ্ঠীর ৯০ শতাংশেরও বেশি মুসলমান রোহিঙ্গা নামে পরিচিত। তাদের কেউ হাজার বছর, কেউ পাঁচ শতাধিক বছর আর কেউবা কয়েকশ' বছর ধরে সেখানে বসবাস করছে। স্থানীয় মগ জনগোষ্ঠী এবং প্রশাসনের প্রকাশ্য সহায়তায় আরাকানের মংডু এবং আকিয়াব এলাকায় চলছে নির্বিচারে গণহত্যা, অগ্নিসংযোগ ও লুটতরাজ। রোহিঙ্গাদের হাজার হাজার ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিয়ে বিরানভূমিতে পরিণত করছে গ্রামের পর গ্রাম। রোহিঙ্গা তরুণীদের অপহরণ করা হচ্ছে নির্দ্বিধায়। ইতোমধ্যে পাঁচ হাজারের বেশি তরুণীকে অপহরণ করা হয়েছে বলে খবরে প্রকাশ। খাল, বিল ও জঙ্গলাকীর্ণ এলাকায় বিচ্ছিন্নভাবে মহিলাদের লাশ পড়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে। ধর্ষণ শেষে নির্মমভাবে তাদের হত্যা করা হচ্ছে। মানবাধিকার চরমভাবে লজ্জিত হচ্ছে সেখানে। তাছাড়া অনেক

www.pathagar.com

মুসলমানকে হত্যার পর লাশ গুম করছে। অনেককে হত্যা করে বৌদ্ধদের গেরুয়া কাপড় দিয়ে মুড়িয়ে মিডিয়ায় বৌদ্ধ বলে চালিয়ে দিচ্ছে।

সর্বস্ব হারিয়ে নিজেদের প্রাণটুকু বাঁচানোর তাগিদে তারা পাড়ি জমানোর চেষ্টা করছে প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশে। প্রতিবেশী রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ সরকার আশ্রয় দেয়া তো দূরে থাক, আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও স্থানীয় সরকারমন্ত্রী সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম মিয়ানমারে রাখাইনদের সঙ্গে রোহিঙ্গাদের সৃষ্ট দাঙ্গায় জামায়াতে ইসলামী সরাসরি দায়ী বলে অভিযোগ করেছেন। তিনি বলেছেন, এই সন্ত্রাসী ও ধর্ষণকারীদের আমাদের দেশে আমরা আশ্রয় দিতে পারি না (ঢাকা, ২০ জুন, রিয়েল-টাইম নিউজ)। জাতীয় সংসদে একই কথা বললেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী। হায় সেক্যুলার সরকারের অমানবিকতা আর রাজনৈতিক দেউলিপনা! এ যেন রোহিঙ্গাদের কাটা গায়ে লবণ ছিটানোর মতো ব্যাপার!

অথচ আফগানিস্তানে যখন সোভিয়েত আগ্রাসন শুরু হয়, তখন ৩০ লাখ আফগান নাগরিক পাকিস্তানে আর ২০ লাখ ইরানে আশ্রয় নিয়েছিল। ১৯৪৭ সালে লাখ লাখ ভারতীয় মুসলমান জানমাল বাঁচাতে পাকিস্তানে আশ্রয় নিয়েছিল। ইসরাইলের আগ্রাসন থেকে বাঁচতে লাখ লাখ ফিলিস্তিনি প্রতিবেশী আরব দেশগুলোতে আশ্রয় নিয়েছে। সম্প্রতি সিরিয়ার হাজার হাজার নাগরিক আশ্রয় নিয়েছে পাশের তুরস্ক, জর্দান ও লেবাননে। ইতিহাসে এমন উদাহরণ ভূরি ভূরি। অসহায় উদ্বাস্তুদের প্রবেশ রুখতে কোনো প্রতিবেশী দেশই দরজা বন্ধ করে দেয় না। জান বাঁচানোর স্বার্থে কেউ যদি অন্য দেশে প্রবেশ করে, তাহলে কোনো সভ্য দেশই তাকে অবৈধ অনুপ্রবেশকারী বলে না। এটি প্রতিটি নাগরিকেরই মৌলিক মানবিক অধিকার। আর সেটিই আন্তর্জাতিক নীতি। আশার দিক হলো, মিয়ানমারের প্রেসিডেন্ট থেইন সেইন আগামী ১৫ জুলাই ঢাকা আসছেন। দেশটির উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রীও আসছেন প্রথম সপ্তাহে। দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত ও সাম্প্রতিক রোহিঙ্গা সমস্যা নিয়ে এই সফরকালে চূড়ান্ত বোঝাপড়া হতে পারে। মিয়ানমারের প্রেসিডেন্টের আসন্ন সফরে রোহিঙ্গা ইস্যুটির স্থায়ী সমাধান হতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে। তালিকাভুক্ত ২৮ হাজার শরণার্থীর প্রত্যাবাসন ও অবৈধ চার লাখ লোককেও ফেরত পাঠানোর ব্যাপারে কার্যকর পদক্ষেপ শুরু হবে। জাতিসংঘ শরণার্থী সংস্থা এক্ষেত্রে সহায়তা দিচ্ছে। (সূত্র : দৈনিক ইত্তেফাক, ২৫ জুন ২০১২)

আজ রোহিঙ্গাদের জন্য যেন কোনো আইনকানুন নেই। আইন যেন আজ নীরবে নিভৃতে কাঁদে। কারণ মুসলমানদের জন্য আইন নয়! আইন এখানে অকেজো, বিবেক এখানে ভোঁতা। মানবাধিকার লঙ্ঘনের এসব দৃশ্য আর মানুষের বোবাকান্না যেন মানব সভ্যতাকে ভাবিয়ে তুলছে! প্রতিটি রোহিঙ্গা মুসলমানের

www.pathagar.com

কান্নার আওয়াজ আমাদের আধুনিক সভ্যতার গালে এক-একটি চপেটাঘাত করে বলছে হে আধুনিক পৃথিবীর মানবসমাজ! তুমি মুসলমানদের জন্য বড়ই অমানবিক। হে সভ্যতা! তুমি এখনও মুসলমানদের জন্য অনেক বর্বর। অথচ এই পৃথিবীতে মানবিকতা, ইনসাফ আর মজলুমের অধিকার আমরাই নিশ্চিত করেছি। প্রশ্ন হচ্ছে, আরাকানের নির্যাতিত, নিপীড়িত আর বঞ্চিত মুসলমানদের জন্য বিশ্বের ঘুমন্ত বিবেক জাগবে কবে? কবে ফিরে পাবে আরাকানের মুসলমানরা তাদের হারানো স্বাধীনতা?

ফিলিস্তিনে মুসলমানদের ওপর জুলুম-নির্যাতন

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সূরা তওবার ১৪ নং আয়াতে ঘোষণা করেন-"তাদের সাথে লড়াই করো, আল্লাহ তোমাদের হাতে তাদের শাস্তি দেবেন, তাদেরকে লাঞ্ছিত ও অপদস্ত করবেন, তাদের মোকাবিলায় তোমাদের সাহায্য করবেন এবং অনেক মুমিনের অন্তর শীতল করে দেবেন। আর তাদের অন্তরের জ্বালা জুড়িয়ে দেবেন। এবং যাকে ইচ্ছা তাওবা করার তাওফীকও দান করবেন। আল্লাহ সবকিছু জানেন এবং তিনি মহাজ্ঞানী।"

কুরআনের ঘোষণা অনুযায়ী ফিলিস্তিনে ইহুদিদের মোকাবিলায় বিজয়ের আলোর আভা বিশ্ববাসী এখন তা প্রত্যক্ষ করতে শুরু করছে। কারণ আল্লাহ কখনো ওয়াদার খেলাপ করেন না। ইহুদি সন্ত্রাসীরাষ্ট্র ইসরাইল যতশক্তি নিয়ে মুসলমানদের ধ্বংস করার জন্য যুদ্ধে নেমেছে তার বিপরীত দৃশ্য সংঘটিত হয়েছে এখন গাজায়। অনেকটাই নাকানি-চুবানী খেয়েছে হামাসের কাছে। ইসরাইল সৈন্যদের আত্মহত্যা, যুদ্ধে মনোবল হারানো; এবং হামাসের রণকৌশলের কাছে হয়েছে ধারাশায়ী। এই অসম যুদ্ধে শিশু এবং বেসামরিক লোক হত্যা করে বিশ্ব দরবারে ইসরাইল অপমানজনক পরাজয় ছাড়া হয়ত আর কিছুই অর্জন করতে পারবে না।" ইসরাইল এমনই ভয় পেয়েছে অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকার আশপাশের এলাকায় বসবাসকারী দখলদার ইহুদিদের ৭৫ শতাংশই তাদের বাড়ি-ঘর ছেড়ে পালিয়েছে বলে নিশ্চিত করেছে সেই শহরের জেলা কাউন্সিলের প্রধান হাইম ইয়েলিন। (খবর প্রেস টিভি)।

বিপরীত দিকে যুদ্ধে ফিলিস্তিনিদের অনড় মনোবল, শাহাদাতের তামান্না, যুদ্ধের রণকৌশল গোটা বিশ্বকে অবাক করেছে। যা সার্বভৌম ফিলিস্তিনের গোড়াপত্তন করতে পারে বলে বিশ্লেষকরা মনে করছেন। তাছাড়া হামাস গোটা বিশ্বের মানুষের সহানুভূতি, ভালোবাসা এবং আল্লাহর রহমতে হয়েছে স্নিগ্ধ। ফিলিস্তিনি যোদ্ধা ড. আহমদ ইউসুফ বলেন- "ফিলিস্তিন জনগণের দৃঢ়তা ও প্রতিরোধের উজ্জ্বল উদাহরণ। এমন প্রত্যয় এবং লড়াকু মনোভাব আগে কখনো দেখা

www.pathagar.com

যায়নি। আমরা পাথর নিক্ষেপকারী শিশুদের মুখে গর্ব, মর্যাদা আর দৃঢ়তা দেখতে পেয়ে বিজয়ের ঘ্রাণ পেলাম। ইসরাইলি জেনারেলদের হুমকির মুখেও প্রতিবাদ অব্যাহত রইল। এটা ছিল সাহসিকতা এবং প্রতিরোধের নতুন ধরন। ফিলিস্তিনির শিশুদের মন থেকে এই সময়েই দখলদার সৈন্যদের নিয়ে ভয় কেটে যায়। যারা জাতি ও এর জনগণের মর্যাদা রক্ষার জন্য শহীদ হয়ে আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে গেছেন, তাদের জন্য দোয়া করছি। যারা রণাঙ্গনে অবস্থান করে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন, তাদেরই সব কৃতিত্ব ও গৌরব পাওনা। আমাদের মূলমন্ত্র হলো 'শাহাদাতের ইচ্ছাতেই জীবন পেত পার।' মহান লিবীয় মুজাহিদ ওমর আল-মুখতার বলেছিলেন, 'আমি আমার স্বাধীনতার অধিকার, আমার দেশের অধিকার এবং যেকোনো অস্ত্রের চেয়ে আমার এই বিশ্বাসকেই বেশি শক্তিশালী মনে করি।' আমরা আজ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, আমরাই জয়ী হবো।"

এ বিজয় শহীদের রক্তের। এ বিজয় দ্বীনের মুজাহিদের আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুলের। এ বিজয় সত্যপন্থীদের। এ বিজয় ত্যাগ-কুরবানী আর মুমীনদের চোখের পানির। কারণ শহীদের রক্ত আর চোখের পানি বৃথা যায় না। কারণ পৃথিবী এর আগে এমন অসম যুদ্ধ দেখেনি! এমন অন্যায়, অমানবিকতার ইতিহাস পৃথিবীবাসীর জানা নেই। শুধু বেছে-বেছে শিশু হত্যা করে বাবা-মায়ের কাছে লাশ তুলে দেয়ার এমন দৃশ্য এর আগে পৃথিবী সম্ভবত আর কখনো দেখেনি!! বাবার হাতে সন্তানের মাথার খুলি!! মায়ের কোলে তার নাড়িছেঁড়া আদরের ধন, সোনামনির ছিন্নভিন্ন লাশ! রক্তাক্ত চেহারা! ভাইয়ের হাতে ছোট ভাই-বোনের নাড়িভুঁড়ি তুলে দিচ্ছে ইহুদি দিচ্ছে ইসরাঈলী সৈন্যদের ট্যাংক, গোলাবারুদ, মিসাইল আর বন্দুকের নল। এ দৃশ্য বিশ্ববাসী অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছে প্রায় একমাস ধরে। কারোই যেন কিছু করার নেই; কিন্তু ফিলিস্তিনে বাবা-মায়ের কাছে তাদের সন্তানের লাশ পাহাড়ের চেয়ে অনেক বেশি ভারী। কামান-গোলাবারুদে নিজের দেহ ক্ষতবিক্ষত হওয়ার চেয়ে অনেক বেশি নিদারুন কষ্টের। এই ব্যথা তিনিই উপলব্ধি করতে পারেন! যে বাবা-মা শিশু সন্ত ান হারিয়েছেন। বহন করেছেন সন্তানের কফিন। শিশুসন্তান হারানোর এই বেদনা কত কষ্টের তা আমার মত একজন গুনাহগারের উপলব্ধি করার সুযোগ হয়েছে। আমাদের দ্বিতীয় সন্তান আহনাফ আল জাওয়াদের কফিন আমি নিজেই বহন করেছি। ২০ দিনের এই শিশুর কফিন কত ওজন! কতভারী! তা আমাদের মত ভুক্তভোগীরাই জানেন। আল্লাহর দেয়া এই আমানত তার দরবারে রেখে আসা কত কষ্টের তা লিখে প্রকাশ করার ভাষা সত্যিই এখনো অনাবিষ্কৃত। যে সমস্ত বাবা-মা শিশু সন্তান হারিয়েছেন তাদের সম্পর্কে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহাপুরস্কারের ঘোষণা দিয়েছেন। ফিলিস্তিনে একজন মা একাধিক সন্তান

www.pathagar.com

শাহাদাতের নজরানা হিসেবে পেশ করেছেন। তারা সন্তান হারিয়ে শহীদের মা-বাবা হিসাবে আজ গর্ববোধ করছেন। আল্লাহ্‌ যেন ফিলিস্তিনে সন্তানহারা মায়েদেরও মহাপুরস্কারে ভূষিত করেন।

এ অসমযুদ্ধের মুখোশ উন্মোচিত হয়েছে আরব বিশ্বের শাসকদের। স্পষ্ট হয়েছে আমেরিকা-ইউরোপ হচ্ছে ইসরাইল নামক এই সন্ত্রাসী রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষক। এতকিছুর পর বলতে হয় বিজয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ফিলিস্তিনিরা। সাবাস! ফিলিস্তিন। সাবাস হামাস! বিজয়ী বীর যোদ্ধাদের অভিনন্দন। আন্তর্জার্তিক মিডিয়ার সংবাদ শিরোনাম– অবশেষে গাজা থেকে সব সেনা প্রত্যাহারের ঘোষণা দিয়েছে ইসরায়েল। ইসরায়েলি মিডিয়া জানিয়েছে, চার সপ্তাহের এই অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল হামাস যোদ্ধাদের নির্মূল করা ও ইসরায়েলে প্রবেশের সকল সুড়ঙ্গগুলো ধ্বংস করা। তবে তেলআবিবের এই উদ্দেশ্যের সঙ্গে বাস্তবতার কোন মিল পাওয়া যায়নি। তারা নৃশংসভাবে নিরীহ ফিলিস্তিনিদের ওপর গণহত্যা চালিয়েছে। অথচ হামাসের তেমন কোন ক্ষতিই তারা করতে পারেনি। মাত্র কয়েকটি সুড়ঙ্গ তারা ধ্বংস করতে সক্ষম হয়েছে। গাজার অফিসিয়াল সূত্র জানিয়েছে, এ পর্যন্ত ইসরায়েলি বর্বরতায় নিহতের সংখ্যা ১৮'শ ছাড়িয়েছে। আহত হয়েছে ১৫ হাজারেরও বেশি। হামাসের প্রতিরোধে ৬৭ জন সেনা নিহতের কথা স্বীকার করেছে ইসরায়েল। যদিও হামাস ১০০'র অধিক ইসরায়েলি সৈন্য হত্যার দাবি করেছে। ইসরায়েল নিরীহ নারী, শিশু ও বৃদ্ধদের হত্যা করে বিশ্বব্যাপী শুধু নিন্দাই কুড়িয়েছে। মিসর, লেবানন, হিজবুল্লাহ ও হামাসের সঙ্গে কোন পূর্ববর্তী যুদ্ধে ইসরায়েলের এত সেনা নিহত হয়নি । তাই প্রকৃতপক্ষে এটা ইসরাইলেরই পরাজয় বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা। (সূত্রঃ বিবিসি)

গত ২ আগস্ট, ইহুদিবাদী ইসরাইলের পরাজয় হয়েছে বলে স্বীকার করেছেন দেশটির পর্যটনমন্ত্রী উজি ল্যানদাউ। এক টিভি সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, গাজায় ব্যাপক আকারে সেনা অভিযান চালানোর পরও একটি লক্ষ্যও অর্জন করা সম্ভব হয়নি। সেই সঙ্গে ইসরাইলের গভীর অভ্যন্তরে হামাসের রকেট ছোঁড়াও প্রতিরোধ করা যায়নি। হামাসের হামলায় এবার ইসরাইল তার বেন গুরিয়ন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিমান চলাচল বন্ধ করে দেয় বহু দেশ। তিনি বলেন, হামাসের মোকাবিলায় অব্যাহত ব্যর্থতা ইসরাইলের দুর্বলতা ধরা পড়বে এবং ইসরাইল-বিরোধী সংগঠনগুলো তেল আবিবের বিরুদ্ধে হামলা জোরদার করবে। (সূত্রঃ প্রেস টিভি)

১৯৪৮ সালের পর থেকে ফিলিস্তিনিদের দু'বারেরই লড়াই ছিল আত্মরক্ষামূলক, একবার সফল হয়েছিল, অন্যবার সফল হয়নি। এ লড়াইয়ের ফিলিস্তিন জাতি উপহার দিয়েছে ২,৬১,০০০ জন শহীদ, ১,৮৬,০০০ জন আহত, ১,৬১,০০০

www.pathagar.com

জন পঙ্গু। এছাড়া প্রায় দুই মিলিয়ন ফিলিস্তিনী স্বদেশ ছেড়ে বাইরে যেতে বাধ্য হয় এবং তাদের পরিবারবর্গসহ শরণার্থীতে পরিণত হয়। সে দুই মিলিয়ন দেশছাড়া লোক এখন ৫ মিলিয়নে পৌঁছে গেছে। সঠিক সংখ্যা হচ্ছে ৫ মিলিয়ন ৪ লাখ। এবারের লড়াইয়ে ত্যাগ-কুরবানীর পাহাড় অনেক দীর্ঘ হলেও আল্লাহ মুমিনদের সাহায্য কিভাবে করেন তার নজীর বিশ্ববাসী আবার ফিলিস্তিনের গাজায় দেখেছে।

ফিলিস্তিন এখন মুসলিম শিশু, নারী-পুরুষের রক্তে রঞ্জিত এক জনপথ। গোটা বিশ্ববাসী যখন ঈদের আনন্দ উদযাপন করছে, তখন ফিলিস্তিনের মুসলমানদের ঘরে ঘরে সন্তান হারানোর বেদনা আর আহাজারী। কাঁদতে কাঁদতে এখন যেন চোখে পানিও নেই। শোকের পাহাড় বয়ে চলছে প্রতিটি পরিবার। রক্তপিপাসু ইসরাইলের মূল লক্ষ্য এবার মুসলমানদের পরবর্তী প্রজন্মকে নি:শেষ করে দেয়া। নিহতের বেশির ভাগই শিশু। ফেরাউন মুসা (আ.)-এর আগমন ঠেকাতে সব ছেলে সন্তানকে হত্যা করলেও আল্লাহ তায়ালা তার ঘরেই মুসা (আ.) লালন পালন করানোর ব্যবস্থা করলেন। সুতরাং ইসরাইলের এই নীতিও বুমেরাং হবে। পৃথিবীর কোন যুদ্ধআইনে নারী-শিশুদের নির্বিচারে হত্যা করা সমর্থন করে না। ইসরাইলের সন্ত্রাসীরা আজ সেই জঘন্য কাজটি করছে। রমজানে ফিলিস্তিনে মুসলমান ভাই-বোনদের ইফতার এবং সাহরী হচ্ছে আপনজন হারানোর বেদনা আর চোখের পানি দিয়ে। আমরা প্রতিদিন যখন সুস্বাদু খাবার দিয়ে ইফতার করেছি তখন ফিলিস্তিনিরা বসেছিল আপনজনের কফিন নিয়ে। আমরা যখন ঈদের কেনা-কাটায় বিভোর ছিলাম তখন তারা নিজ সন্তানদের দাফন করতে কাফন খুঁজছে। রাস্তার পাশে সারি সারি লাশের সারি! সর্বত্র মানুষের খণ্ড বিখণ্ড শরীরের টুকরা। রক্তের বন্যা বয়ে যাচ্ছে সব জায়গায়! কোথায় তাদের বাড়ি-ঘর! কোথায় তাদের ঠিকানা! স্কুল-কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়, মসজিদ, হাসপাতাল সব জায়গায় চলছে অব্যাহত হামলা। হাসপাতালগুলোতে এখন আর তিল ধারণের ঠাঁই নেই। পৃথিবীতে হাসপাতালগুলোতে আক্রমণ যুদ্ধরীতি বিরুদ্ধ হলে কোন আইন, নীতি, মানবিকতা কোন কিছুরই তোয়াক্কা করছে না ইসরাইল। চলছে ইসরাইলের নরপিচাশদের আক্রমণ।

ইসরাইলের বার-ইলান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মোরদেচাই কেদর ইসরাইল সৈন্যদের গাজায় "ধর্ষণ-অস্ত্র প্রয়োগের পরামর্শ দিয়ে সারা বিশ্বে তাদের নোংরা চরিত্রের উন্মেষ ঘটালেন। ইহুদিরা এ যেন রক্তের হলি খেলায় লিপ্ত! এ হচ্ছে মানবিকতার বিরুদ্ধে ইসরাইলের সবচেয়ে বড় আঘাত। এ কোন অসম যুদ্ধ!! এতো কোন যুদ্ধ নয় এ হচ্ছে গণহত্যা। এ যেন মাছুম শিশুদের জীবন নিয়ে প্রচণ্ড তামাশা! এত অমানবিক নির্যাতন গাজায় চলছে তা মুসলিম বিশ্ব দেখেও যেন না দেখার ভান করছে। দু-একটি বিবৃতি আর বিক্ষোভ ছাড়া আর কার্যকর কোন তৎপরতা এখনো পরিলক্ষিত হয়নি। মানবাধিকার সংগঠনগুলোও

www.pathagar.com

জোরালো কোন প্রতিবাদ এখনও করেনি। সবাই যেন রুটিন মাফিক প্রতিবাদই করছে। আরব বিশ্ব অনেকটাই নীরব। দু-একটি দেশ ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে বিবৃতি পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রেখেছে। হামলা বন্ধে যারা কার্যকর উদ্যোগ নেয়ার কথা সেই মিসরে এখন আমেরিকা-ইসরাইল পুতুল সিসি সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। মূলত মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকা-ইসরাইল নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যই নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট মুরসিকে ক্ষমতাচ্যুত করেছে। এটা এখন দিবালোকের মত পরিষ্কার। বিশ্বের মানবাধিকারের ফেরিওয়ালা গাজায় এই অমানবিক নিষ্ঠুরতাকে যেন উপভোগ করছে। আমেরিকান প্রেসিডেন্ট এই ঘটনায় নিন্দা জানানোর পরিবর্তে ইসরাইলের আত্মরক্ষার্থে হামলা করার অধিকার আছে বলে অনেকটা উস্কানী দিয়েছেন।" এত কিছুর পরও মুসলমানদের দৃঢ়তা ও আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল ছিল অভাবনীয়। গত. ২৩ জুলাই ফিলিস্তিনের সাবেক নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী ও হামাস নেতা ইসমাইল হানিয়া বলেছেন, গাজা হবে ইসরাইলিদের কবরস্থান। গাজায় আগ্রাসন ও গণহত্যার মাধ্যমে ইসরাইলের আসল চেহারা উন্মোচিত হয়েছে। তবে শত বাধা ও ইসরাইলের বারবার আগ্রাসন সত্ত্বেও ফিলিস্তিনিদের তাদের সংগ্রামের পথ থেকে সরানো যায়নি।

আসলে ইহুদিরা হচ্ছে আল্লাহর অভিশপ্ত জাতি। বনী ইসরাইলদেরকে আল্লাহ তায়ালা সম্মান দিয়েছিলেন যখন তারা বিশ্বাসী বা মুমিন ছিলো। ছিলো পয়গম্বরদের অনুগত এবং নাজিলকৃত শিক্ষার বাহক। তারা কুটিল পন্থায় জটিলভাবে জড়িয়ে পড়ে। তারা ইব্রাহীম, যোসেফ এবং মূসা (আ.)-এর পবিত্র শিক্ষাকে মিথ্যায় কলুষিত করেছে। অসংখ্য পয়গম্বরকে হত্যা করেছে। সন্ত্রাস এবং কলুষতা দুনিয়ায় ছড়িয়ে দিয়েছে এবং ছলনা ও সুদীকারবার ব্যবস্থায় মানুষদেরকে তাদের ধন-সম্পদ থেকে বঞ্চিত করেছে। এজন্য আল্লাহ বলেন– হে ঈমানদারগণ! ইহুদি ও খৃস্টানদেরকে নিজেদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না। তারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। আর যদি তোমাদের মধ্য থেকে কেউ তাদেরকে বন্ধু হিসেবে পরিগণিত করে তাহলে সেও তাদের মধ্যেই গণ্য হবে। অবশ্যি আল্লাহ জালেমদেরকে নিজের পথনির্দেশনা থেকে বঞ্চিত রাখেন। (৫:৫১) অসংখ্য নবীর স্মৃতিধন্য ও মুসলমানদের প্রথম কিবলা বায়তুল মোকাদ্দাস-এর পবিত্র ভূমি ফিলিস্তিন আজ ইহুদিদের কবজায়। ১৯১৪ সালে শুরু প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে মুসলমান শাসকদের অদূরদর্শিতা এবং ব্রিটিশদের ষড়যন্ত্রের কারণে তুরস্কে মুসলিম খিলাফত ভেঙে যায়। শুধু তাই নয় ব্রিটিশ বাহিনী ১৯১৭ সালে ইরাক, সিনাই উপত্যকা, ফিলিস্তিন ও পবিত্র জেরুজালেম দখল করে নেয়। তারা ফিলিস্তিন বিজয়ীবীর সুলতান সালাহ উদ্দীন আইয়ুবীর মাযার শরীফে পদাঘাত করে উচ্চস্বরে বলতে থাকে "হে সালাহ উদ্দিন উঠে দেখ আমরা তোর সিরিয়া জয় করে এসেছি"। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুর্কি অটোমান সাম্রাজ্যের পতনের

www.pathagar.com

পর প্যালেস্টাইন বা ফিলিস্তিনসহ বেশিরভাগ আরব এলাকা চলে যায় ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের দখলে। পৃথিবীর কোন দেশ তাদের ভূখণ্ডে ইহুদিদের বসাতে রাজী হয়নি। শেষ পর্যন্ত বেলফোর ঘোষণা অনুযায়ী ফিলিস্তিন এলাকায় ইহুদিদের জন্য আলাদা রাষ্ট্র গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। মূলত মধ্যপ্রাচ্যের তেল সম্পদ কুক্ষিগত করা ও বিভিন্ন স্বার্থ অক্ষুণ্ন রাখার প্রয়োজনেই এই সন্ত্রাসী রাষ্ট্রকে লালন করা হচ্ছে। ইসরাইলের বর্তমান জনসংখ্যা ৭৪ লাখ ৬৫ হাজার। আমেরিকার মদদে ইসরাইল এখন এতটাই শক্তিশালী যে, সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে ইসরাইলের রয়েছে একচ্ছত্র আধিপত্য। মুসলমানদের শক্তি হিসেবে বর্তমানে ইসরাইলকে চোখ রাঙ্গিয়ে আসছে ইরান। আর তাই ইরান-ইসরাইল এখন এক রণাঙ্গনের নাম। বিশেষজ্ঞরা বলছেন সেদিন খুব বেশি দূরে নয় যেদিন বিশ্ব মানচিত্র থেকে ইসরাইলের নাম আবার মুছে যাবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই ভবিষ্যদ্বাণীই করেছেন ইহুদিদের সম্পর্কে। তবে সেটির জন্য দরকার মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম ও মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে একতা। গোটা মুসলিম এখনো নিরব থাকা অবিশ্বাস্য হলেও সত্য। মুলতঃ ইহুদি চক্র গোটা পৃথিবীর মুসলমানদের বিভক্ত করে রেখেছে। এ জন্যই মুসলমানরা মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারছে না। অশিক্ষা, দারিদ্র্য, অনৈক্য-সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে এই বীরের জাতি। অথচ মুসলমানদের ইতিহাস অনেক গৌরবের, অনেক সাফল্যমণ্ডিত। মুসলমানরা আজ যেন সব হারাতে বসেছে।

কিন্তু ইহুদিরা অক্ষরে অক্ষরে পালন করছে পূর্বসূরীদের নির্দেশনা। ইসরাইলী সাবেক মন্ত্রী ইজাক রবিনের The Robin Memoirs নামক আত্মজীবনীতে লিখেন– ১৯৪৮ সনে যখন ইসরাইলী সেনারা ফিলিস্তিনের ভূমি দখল করে ছলনা করে অবৈধ ইসরাইলী রাষ্ট্র গঠন করছিল, সে সময়ে রবিন একজন ২৬ বছর বয়সী তরুণ ব্রিগেড কমান্ডার হিসাবে কর্মরত ছিলেন। তিনি স্বীকার করে বলেন তখন প্রধানমন্ত্রী ডেভিড বেন গুড়িয়ান তাকে তেল আবিবের নিকটবর্তী দুটি শহর থেকে ৫০,০০০ আরব অধিবাসীকে শক্তি প্রয়োগ করে তাড়িয়ে দিতে আদেশ দেন। (News Week, Nov 5, 1979) বিশ্ব-ইহুদিদের কাছে নেপোলিয়নের আহ্বানটি এখনো অনুকরণীয় নির্দেশনা হিসেবে তারা পালন করছে-হে ইসরাইলীগণ! হে 'তীহ' প্রান্তরে বিতাড়িতগণ! শক্তির সাথে জাগ্রত হও! তোমাদের সামনে এখন তোমাদের জাতির জন্য এক ভয়াবহ যুদ্ধ অপেক্ষা করছে! দ্রুত অগ্রসর হও, এই তো সময়- এমন সুবর্ণ সময়, হয়তো হাজার বছরেও আর ফিরে আসবে না। যে অধিকার হাজার হাজার বছর ধরে তোমাদের থেকে হরণ করা হয়েছে তা হচ্ছে- বিভিন্ন জাতির মধ্যে একটি জাতি হিসেবে তোমাদের রাজনৈতিক অস্তিত্ব এবং তোমাদের প্রভু 'ইয়াহুয়াহ'কে তোমাদের

www.pathagar.com

বিশ্বাস অনুযায়ী উপাসনা করার নিরঙ্কুশ সহজাত অধিকার। তা তোমরা প্রকাশ্যে কর, চিরদিন কর! বোনাপার্ট ইহুদিদের প্রভুত্বব্যঞ্জক আচরণের শেষ কোথায়? বর্তমান সময়ে ইহুদি আগ্রাসীরা নিজেদেরকে অতীতের যে কোন উচ্চাকাঙ্ক্ষী রাজা বা দেশের চাইতেও বেশি শক্তিশালী, ধন সম্পদশালী এবং চতুরতায় পারদর্শী বলে মনে করে। তারা তাদেরকে সারা দুনিয়া এবং মানবজাতির প্রভু বলে বিবেচনা করে। মানব জাতির বাঁচার জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু যেমন প্রযুক্তি বিদ্যা, সমরাস্ত্র, অর্থ, খাদ্য, ঔষধপত্রসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি তাদের হাতে বা দখলে আছে বলে তারা দাবি করে। কিন্তু মনে রাখতে হবে ইসরাইল একদিন আমেরিকাসহ গোটা বিশ্বের জন্যই হুমকি হয়ে দাঁড়াবে সেদিন বেশি দূরে নয়। CBS টেলিভিশনের Face The Nation অনুষ্ঠানে ১৯৭৩ সনে সিনেটর উইলিয়াম ফুলব্রাইট ঘোষণা দেন যে, সিনেট হচ্ছে- আমেরিকান স্বার্থের পরিপন্থি ইসরায়েলী স্বার্থের অধীনস্থ সহায়ক কেনা গোলাম। সিনেটর জেমস জি আবরেজক বলেন : "যুক্তরাষ্ট্র যদি আগে নাও হয়ে থাকে- তবে একটি অধীন রাষ্ট্রের কাছে বন্দী হতে যাচ্ছে- অর্থাৎ ইসরাইলের অধীন হতে যাচ্ছে।"

ইসরাইলী বাহিনীর ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে গাজার নিরপরাধ মানুষের আর্তচিৎকারে পৃথিবী যখন কাঁদছে। সেই আর্তচিৎকার শুধু পৌঁছেনি বিশ্বের মোড়লদের কানে। ইসরাইলী বর্বরতা ও নিষ্ঠুর নির্যাতন থেকে নিরপরাধ এবং নিরস্ত্র মুসলমানদেরকে বাঁচানোর জন্য বিশ্বনেতাদের কেউই এগিয়ে আসছে না এখনো। বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার ইজারাদার জাতিসংঘের দায়সারা ভূমিকা প্রশ্নবিদ্ধ। জাতিসংঘ পরিচালিত স্কুলে হামলা করে ১৪ শিশুকে হত্যা ও তাদের বিবেককে জাগ্রত করতে পারেনি। গাজা গণহত্যায় নির্বিকার মুসলিম বিশ্ব, নির্বিকার ওআইসি জি-৭, আরবলিগ, এমনেস্টি ইন্টারন্যাশনালসহ বিশ্বের মানবাধিকার প্রতিষ্ঠানগুলো। এমনি সময়ে ৫ আগস্ট গাজায় ইসরাইলী আগ্রাসনের ব্যাপারে বৃটিশ সরকারের নীতির প্রতিবাদে পদত্যাগ করেছেন বৃটেনের প্রথম মুসলিম মন্ত্রী সৈয়দা ব্যারোনেস ওয়ার্সি। টুইটার বার্তায় তিনি তার পদত্যাগের কারণ জানান। একজন মুসলিম মন্ত্রীর এই প্রতিবাদ বিশ্বের মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানদের মুখে চপেটাঘাত দিয়েছে। নাড়া দিয়েছে ঈমানদের দায়িত্বানুভূতিকেও। এমন সাহসী প্রতিবাদের জন্য সৈয়দা ব্যারোনেস ওয়ার্সিকে প্রাণঢালা অভিনন্দন। আরব রাষ্ট্রগুলো প্রতিবাদের পরিবর্তে যেন হামলার যোগানদাতা। গাজা ইস্যুতে সবচেয়ে বড় পরীক্ষা, হয়েছে তথাকথিত মুসলিম রাষ্ট্র নায়কদের। যারা নিজেদের গদী রক্ষায় ইহুদিদের জুলুম নির্যাতনের প্রতিবাদ করেনি। আল্লাহর ঘোষণা হচ্ছে- "তোমরা কি একথা মনে করে রেখেছো যে তোমাদের এমনিই ছেড়ে দেয়া হবে? অথচ আল্লাহ এখনো দেখেননি তোমাদের

www.pathagar.com

মধ্য থেকে কারা (তার পথে) সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালালো এবং আল্লাহ, রাসূল ও মুমিনদের ছাড়া কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না? তোমরা যা কিছু করো, আল্লাহ তা জানেন” আজ ফিলিস্তিন মুসলমান হত্যায় বিশ্ব যতই নিরব থাকুক। হয়ত সেই দিন বেশি দূরে নয় যেদিন ইসরাইল হুমকি হয়ে দাঁড়াবে গোটা পৃথিবীর জন্য। ১৯৮৫ সালে প্রকাশিত বিশিষ্ট লেখক রোগার গ্যারাউডি তাঁর প্রধান রচনায় দুনিয়ার মুসলিম শাসককুলের প্রতি সাবধান বাণীটি ছিল “ইসরাইলের অগণিত লক্ষ্যসমূহের মধ্যে সবচাইতে ভয়ংকর হচ্ছে ফিলিস্তিনের অধিবাসীদিগকে হত্যা, জোর, জুলুম করে তাড়িয়ে দিয়ে তথায় ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা- যা তারা ইতিমধ্যে সম্পন্ন করেছে। এ কাজে তারা সফল হলে গোটা মধ্যপ্রাচ্যে মুসলমান উচ্ছেদ তারা শুরু করবে। সেই অভিযান হবে হিটলারের নতুনরূপ। (সুত্র : Garaudy, The Case of Israel) তাই এখনই মুসলিম উম্মাহকে ইহুদিদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

বাংলাদেশে ইসলাম আক্রান্ত

পশ্চিমাদের বুদ্ধিগুরু হিসেবে খ্যাত স্যামুয়েল হান্টিংটনের ‘দ্য ক্ল্যাশ অব সিভিলাইজেশনস্’ ‘সভ্যতার দ্বন্ধ’ তত্ত্বটির আলোকে কমিউনিজমের পতনের পর পশ্চিমাদের সামনে এখন একমাত্র শত্রু ইসলাম ও মুসলমান। আর এই ‘নয়া ক্রুসেড’-এর মূল লক্ষ্য মুসলমানদেরকে মৌলবাদী, সাম্প্রদায়িক, উগ্রবাদ, পশ্চাৎপদ, জঙ্গিবাদ, নাশকতাকারী, মানবতাবিরোধী, সেকেলে, অনুন্নত ও অ-আধুনিক বলে প্রচার চালানো। আমাদের দেশের একশ্রেণি সুশীল! ভাড়াটে বুদ্ধিজীবী, এবং অধিকাংশ মিডিয়াই এখন তাদের হাতের ক্রিড়নক হিসেবে কাজ করছে। আর এই পথ ধরে এখন এগিয়ে চলছে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের দোসররা। কারণ অবৈধভাবে ক্ষমতায় থাকতে বর্তমান আওয়ামী-বামদের ইসলাম বিরোধী শক্তির সন্তুষ্টি খুব বেশি প্রয়োজন। আওয়ামী-বামদের জনপ্রিয়তা এখন শূন্যের কোঠায়। বিশেষ প্রতিপক্ষ দমনের সহজ কৌশল হিসেবে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্যও নিজেদেরকে বেশি বেশি সেক্যুলার প্রমাণে করতে বড় বেশি ব্যাস্ত এই সরকার। কিন্তু সব করেও যেন শেষ রক্ষা নেই!!

বাংলাদেশে ২০০৮ সালের নির্বাচনী ইশতিহারে কুরআন-হাদিস বিরোধী কোন আইন পাস না করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় আসে আওয়মী লীগ। কিন্তু ক্ষমতায় এসেই সংবিধান থেকে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম উঠিয়ে দেয়ার জন্য চক্রান্ত শুরু করে। শুধু তাই নয়, প্রভূদের ইশারায় অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র গড়ার নামে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি বন্ধের জোর প্রচেষ্টা চালায় সরকার। সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী পাশ করার মাধ্যমে সংবিধান থেকে আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস তুলে দিয়ে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ যুক্ত করা হয়। “র‍্যানডম হাউজ অব দ্যা ইংলিশ

www.pathagar.com

ল্যাংগুয়েজ”-GSecular “যা ধর্ম সম্পর্কিত নয় (Not perlaining toor connceted with religious) এবং যা কোনো ধর্মবিশ্বাসের অন্তর্গত নয় (Not belonging to a religious order) আর ধর্মনিরপেক্ষতার সংজ্ঞায় বলা হয়েছে এটি একটি রাজনৈতিক বা সামাজিক দর্শন যা সকল ধর্মবিশ্বাসকে নাকচ করে দেয় (Rejects all forms of religious faith)।।

এই সরকারের শাসনামলেই শাহাবাগ থেকে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা শুরু হয় নাস্তিক্যতাবাদীর রাষ্ট্রীয় সূচনাপর্ব। তারই ধারাবাহিকরূপের প্রকাশ্য নৃত্যানুষ্ঠান আর আস্ফালন চলেছে শাহবাগে। চলেছে এদেশের তৌহিদী জনতার ঈমান আকিদার ওপর জঘন্যতম আক্রমণ। জনতার তীব্র আন্দোলনের মুখে সংবিধানের শুরুতে বিসমিল্লাহ ও রাষ্ট্রধর্ম ইসলামকে মুছে দেয়া সম্ভব হয়নি। কিন্তু তাছাড়াও এই বিষয়টি এতটাই হাস্যকর যে, স্রষ্টার ওপরেই কোন আস্থা থাকল না সেখানে বিসমিল্লাহ দিয়ে কী হবে?। একেই বলে ধর্মনিয়ে রাজনীতি। বাংলাদেশের সাধারণ জনগণকে চুপ রাখার এটা একটা আওয়ামী কৌশল মাত্র। আসলে এটাই হলো ধর্ম নিয়ে রাজনীতি। আর আওয়ামী লীগ বরাবরই ধর্ম নিয়ে এমন নোংরা রাজনীতি করে আসছে শুরু থেকেই। একটা কথা বলে নেয়া দরকার আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসলেই এদেশের তৌহিদী জনতার ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত, আলেম-উলামাদের ওপর জুলুম-নির্যাতন, মসজিদ, মাদ্রাসা, দাড়ি ও টুপি ওয়ালাদের অপমান করা কারোই অজানা নয়। অবস্থাটা এমন, তেল এবং পানি যেমনি মিশে না, আওয়ামী লীগের সাথে ইসলামের সম্পর্কেও তার ব্যাতিক্রম নয়।

এছাড়া সম্প্রতি দেশে মহান আল্লাহ, মুহাম্মদ ﷺ ও কালজয়ী শ্বাসত বিধান আল-ইসলামকে পরিকল্পিতভাবে অবমাননা ও আক্রমণ করা হচ্ছে। এই ভয়াবহ তৎপরতার তীব্র প্রতিবাদ, ধিক্কার ও হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে ফুসে উঠেছে সারা বিশ্ব। বিশ্বব্যাপি দুর্নীতি, সন্ত্রাস, গুম, খুন, গণহত্যা আর মানবাধিকার লংঘনের সাথে সরকারের নতুন খ্যাতি সংযোজন করলো, আল্লাহ, রাসুল ﷺ ও ইসলামের অবমাননাকারী সরকার হিসেবে। বিশ্বদরবারে আওয়ামী লীগ আমাদের জাতিকে খুব খারাপভাবে চিত্রিত করেছে। যা সহজে মুছে ফেলার নয়। তথাকথিত ব্লগার নামধারী একশ্রেণির ধর্মদ্রোহী যুবক ইসলাম, আল্লাহ ও রাসূল ﷺ-কে নিয়ে চরম আপত্তিকর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে মেতে উঠেছে। তারা অবাধে ও নির্বিঘ্নে নবী-রাসূলদের নিয়ে মনগড়া, কুরুচিপূর্ণ, অপবাদমূলক বিভিন্ন মন্তব্য ও কথাবার্তা প্রচারের দুঃসাহস দেখাচ্ছে। আর এদের প্রধান পৃষ্ঠপোষকতা দিচ্ছেন বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। কি আবাক করা কাণ্ড!! আবার তৌহিদী জনতার চাপের মুখে সরকার এখন নাকি তাদের খুঁজতেছে। অথচ নাস্তিক ব্লগাররা আছে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে সার্বক্ষণিক গোয়েন্দা হেফাজতে। দেশের জনগণের সাথে ভেলকিবাজি কাকে বলে!! এই সরকার সবটাই করছে।

www.pathagar.com

২৮ অক্টোবর : শহীদের রক্তে রঞ্জিত রাজপথ

২৮ অক্টোবর, ২০০৬। এটি একটি ঐতিহাসিক কালো অধ্যায়ের দিন। যা জাতীয় জীবনে একটি কলঙ্কের সংযোজন করেছে। এ দিনটি পল্টন হত্যা দিবস, মানবাধিকার ভূলুণ্ঠিত দিবস, বাংলাদেশের ৫৬ হাজার বর্গ মাইলের মধ্যে আজ পর্যন্ত আওয়ামী লীগ অসংখ্য ২৮ অক্টোবরের ঘটনার ঘৃণ্য ইতিহাস রচনা করেছে। দেশে এখন নুনের চেয়ে খুনের মূল্য কম। প্রতিনিয়ত আওয়ামী লীগ ফ্যাসিস্ট কায়দায় দেশের জনগণের ওপর পৈশাচিক নারকীয় ও বর্বর তাণ্ডব পরিচালনা করেছে। ২৮ অক্টোবর, ২০০৬। এটি একটি ঐতিহাসিক কালো অধ্যায়ের দিন। যা জাতীয় জীবনে একটি কলঙ্কের সংযোজন করেছে। এ দিনটি পল্টন হত্যা দিবস, মানবাধিকার ভূলুণ্ঠিত দিবস, লগি-বৈঠার তাণ্ডব দিবস, আওয়ামী বর্বরতার দিবস হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। ২৮ অক্টোবরকে স্মরণ করলে আমাদের স্মৃতিতে এক বীভৎস চিত্র ভেসে ওঠে, শিউরে উঠে মানুষের শরীর, বাকরুদ্ধ হয় বিবেক, অমানবিকতার কথা মনে করে কেঁদে উঠে মন। পৃথিবী যতদিন থাকবে অভিশপ্তদের ঘৃণা করবে বিশ্বমানবতা। পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে মানবতাবিরোধী অপরাধ সংঘঠিত হয়েছে ২০০৬ সালের ২৮ অক্টোবর। "দিন বদলের আর ডিজিটাল বাংলাদেশ" গড়ার হাজারো প্রতিশ্রুতি ভুলে খুব অল্প সময়ের মধ্যে আওয়ামী লীগ জড়িয়ে পড়ে পদ্মা সেতু, হলমার্ক, ডেসটিনি, শেয়ারবাজার, কুইকরেন্টাল বিদ্যুৎ প্রকল্পের দুর্নীতিতে। দলীয় সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, হত্যা লুটপাট আর বিরোধী দল দমনে রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করে দমন-নিপীড়ন, গুম, খুন আর গণহত্যা আর মানবাধিকার লংঘনে। ছাত্র লীগের হিংস্রতা, জঘন্যতা, পৈশাচিক, ভয়ঙ্কর দানবীয় চরিত্র, হত্যা, লুটপাট, জ্বালাও-পোড়াও, চাঁদাবাজী, টেন্ডারবাজি, ছিনতাই, সিট দখল, হল দখল ও নারী নির্যাতন, শিক্ষক লাঞ্ছনা, অস্ত্রবাজীর নখরে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ছাত্রসমাজ। আকাশে বাতাসে লাশ আর বারুদের গন্ধ, রাতের অন্ধকারে অভিযানের নামে বাড়িঘর ভাঙচুর, লুটপাট, নারী-শিশুর ওপর বর্বর নির্যাতন চলেছে। হাসপাতালের বেডে আহতের আত্মচিৎকার, গুম, খুন, গণহত্যা এখন শেখ হাসিনার রক্তপিপাসু হায়েনাদের কাছে অতিসাধারণ বিষয়ে পরিণত হয়েছে। রিমান্ডে নিয়ে অমানুষিক নির্যাতন করে চিরদিনের জন্য পঙ্গু করে দেয়া হচ্ছে অনেককে।

সংবিধান থেকে আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস তুলে দিয়ে যোগ করে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ। আলেম-ওলামাদের ওপর জুলুম-নির্যাতন, মসজিদ-মাদরাসা, দাড়ি-টুপি, বোরকা-হিজাবওয়ালাদের অপমান করা হয়ে পড়ে নিত্যদিনের কর্মসূচি। দেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পর্দানশীন ও ইসলামী ছাত্রীসংস্থার মেধাবী মেয়েদেরকে ক্লাস এবং হলে থাকতে বাধা এবং বিভিন্ন

www.pathagar.com

জায়াগায় হিজাব পরা পর্দানশীন নারীদেরকে পুলিশ হয়রানি করে গ্রেফতার, রিমান্ডে জিজ্ঞাসাবাদের নামে চালানো হয় মানুসিক ও শারীরিক নির্যাতন। এ অমানবিকতার হাত থেকে রেহাই পায়নি অন্তঃসত্ত্বা নারী, বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মহিলা, বিদেশী পর্যটক ও ৮২ বছরের মা-বোনেরাও। বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থা হিটলার ও মুসোলিনীর অক্ষশক্তির নৃশংসতা ও বর্বর কর্মকাণ্ডকেও যেন হার মানাতে বসেছে।

সেদিন ঘটনার শুরু যেভাবে– ২৮ অক্টোবর ছিল চার দলীয় জোট সরকারের শেষ দিন; কিন্তু ২৭ অক্টোবর আওয়ামী হায়েনারা সারা দেশে তাণ্ডব শুরু করে। বাড়ি ঘরে আগুন, হত্যা, লুট-পাটের জঘন্য আয়োজন শুরু করে তারা। সমাবেশ বাস্তবায়নের জন্য সকাল ১০টায় পল্টনে আমরা অবস্থান করছিলাম। হঠাৎ গেটের সামনে চিৎকার শোনা গেল। বেরিয়ে দেখি একজন ভাইকে রিকশায় করে রক্তাক্ত অবস্থায় নিয়ে আসা হচ্ছে। তার মাথার একপাশ খণ্ডিত অবস্থায় ঝুলছে। সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে দেখি অনবরত আহত ও রক্তাক্ত ভাইয়েরা আসছেন।

আহত ভাইদের সারি আস্তে আস্তে দীর্ঘ হচ্ছে। একদিকে আমরা ৪০-৫০ জন অপরদিকে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত চার হাজার থেকে পাঁচ হাজার সন্ত্রাসী হামলা চালাচ্ছে অস্ত্র, লাঠি, বোতল, বোমা ইত্যাদি নিয়ে। এমন কোনো অস্ত্র নেই যা তারা ব্যবহার করেনি। এভাবে একদিকে সন্ত্রাসীদের মারণাস্ত্রের হামলা অন্যদিকে আমরা নিরস্ত্র। এই নিরীহ মানুষগুলো ৭ ঘণ্টা সন্ত্রাসীদের মোকাবেলা করেছে। ওরা এক ইঞ্চি জায়গা থেকেও সরাতে পারেনি আল্লাহর দ্বীনের গোলামদের। এ তো আল্লাহর দ্বীনের পথে এগিয়ে যাওয়ার ঐতিহাসিক দিকনির্দেশনা। বাতিলের বিরুদ্ধে এক চরমপত্র। সেটি ছিল ১৪ দলের গালে একটি চপেটাঘাত। এখানে ছিল জীবন দেয়ার প্রতিযোগিতা। ঈমানদারের জন্য শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করার এক বিরাট সুযোগ। আগামীর পথে এক দুরন্ত সাহস। আল্লাহর প্রত্যক্ষ মদদের বাস্তব সাক্ষী ছিলাম সেদিন আমরা। ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া চলছে। কেউ কেউ আহত হচ্ছে নতুন করে, দু-একজন করে আমাদের সাথে যোগ দিচ্ছে। কিন্তু আমাদের সংখ্যা এর থেকে বাড়ছে না তারপরও আমরা টিকে আছি। কারণ বিজয় তো সংখ্যার ওপর নির্ভরশীল নয়। আমরা যখন ১৫-২০ জন নারায়ে তাকবির ধ্বনি দিয়ে এগোতে লাগলাম তাদের ৪-৫ হাজার লোক পেছনে যেতে লাগল, সেদিনের এ দৃশ্য না দেখে বিশ্বাস করা যাবে না। আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করলে তাঁর সাহায্য অনিবার্য। এটাই তার প্রমাণ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "কোনো মু'মিন মুজাহিদের জিহাদের ময়দানে নারায়ে তাকবির বাতিলের মনে চার হাজার লোক তাকবির আল্লাহু আকবার স্লোগান উচ্চারণ করলে যে আওয়াজ হয় তার সমপরিমাণ ভীতি সৃষ্টি

হয়।" ২৮ অক্টোবর হাতেনাতে তার প্রমাণ পেয়েছি। সামনে এগিয়ে গিয়ে দেখি গলির একটু ভেতরে পড়ে আছে আমাদের প্রিয় ভাই শহীদ মুজাহিদের লাশ। হায়েনারা তাকে হত্যার পর ফেলে রেখেছে গলির মধ্যে। কয়েকজন মিলে ধরে কাঁধে করে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু রক্তপিপাসু আওয়ামী সন্ত্রাসীদের লাশের উপর আক্রমণ তখনও থামছে না। লাশের উপর তারা ছুঁড়ে মারছে ইট, পাথর, বোতল ও লাঠি। তখনো ঠিক বুঝতে পারিনি আল্লাহর প্রিয় বান্দা মুজাহিদ আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছেন। আল্লাহর জান্নাতের মেহমান হিসেবে তাকে কবুল করেছেন। পরে হাসপাতালে অপারেশন থিয়েটারে গিয়ে শুনলাম মুজাহিদ আর নেই। তখন স্মৃতিতে ভেসে উঠলো সব ঘটনা। আর বিগত আন্দোলন-সংগ্রামে সারাদেশে এত রকম শত শত ঘটনার জন্ম দিয়েছে আল্লাহর দ্বীনের মুজাহিদেরা।

এ পর্যায়ে দীর্ঘ ৫ ঘণ্টা পর বুলেট এসে আমার বাম পায়ে আঘাত হানল। আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলাম না। গাড়ির চাকা পাংচার হওয়ার মতো লুটিয়ে পড়লাম হাঁটুর উপর ভর করে। কয়েকজন কাঁধে করে নিয়ে যাচ্ছেন আমাকে। পায়ের যন্ত্রণায় যতটুকু কাতর তার থেকে বেশি কষ্ট লাগছে এই ধন্য মানুষগুলোর কাতার থেকে এই অধমের বিদায় নিতে হচ্ছে এই জন্য। তখন নিজেকে খুব স্বার্থপরই মনে হচ্ছিল। সবাই যখন জীবনবাজি রেখে ভূমিকা রাখছে তখন আমি চলে যাচ্ছি অন্যের কাঁধে ভর করে। গুলিবিদ্ধ পা'টি ঝুলছে আর সেই সাথে রক্ত ঝরছে। কষ্টের মধ্যে নিজেকে একটু গুছিয়ে নিলাম। অনেক ভাই পেরেশান হয়ে গেল এবং দলবেঁধে আমার সাথে আসতে লাগল। কিছুটা ধমকের সুরে বললাম, এতজন কোথায় যাচ্ছেন? পরিস্থিতি মোকাবেলা করুন। হাসপাতাল যেন আরেক কারবালা। কিন্তু কঠিন পরিস্থিতিতে দারুণ শৃঙ্খলা এ শহীদী কাফেলার ভাইদের মাঝে। এখানেও ইয়ামামার যুদ্ধের সেই সাহাবীদের অপর ভাইকে অগ্রাধিকারের দৃষ্টান্ত। নিজেদের কষ্ট হচ্ছে, রক্ত ঝরছে তবুও ডাক্তারকে বলছে ঐভাইকে আগে চিকিৎসা করুন। এ যেন 'বুন ইয়ানুম মারসুস' এর উত্তম দৃষ্টান্ত। এ যেন আনসার-মুহাজিরদের ভ্রাতৃত্বের জীবন্ত দলিল। জোহরের নামাজ আদায় করলাম অপারেশন থিয়েটারে গুলিবিদ্ধ পা প্লাস্টার করা অবস্থায়। নিজের অজান্তেই ভাইদের জন্য দোয়া করতে লাগলাম। প্লাস্টার করছেন ডাক্তার। এক্স'রে রিপোর্ট ঝুলানো দেখা যাচ্ছে পায়ের হাড় দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেছে। কেউ যেন বলতে চেয়েও আমি ভয় পাবো সে জন্য আর কিছু বলতে চায়নি। আমি বললাম, এই গুলিটি আমার জন্য আল্লাহ কবুল করেছিলেন। শুধু তাই নয়, গুলিটি আমার পায়ের নামেই লেখা ছিল। আর এ বিশ্বাস থাকতে হবে প্রতিটি আল্লাহর দ্বীনের সৈনিকের। এই বিশ্বাসের ইমারতের উপর যে আন্দোলন গড়ে ওঠে তার ওপর আঘাতের পর আঘাত এলেও তাকে কখনো স্তব্ধ করা যাবে না।

www.pathagar.com

আজ হয়তো কেউ কেউ বলেন আমাদের প্রস্তুতির কথা। আর আমাদের প্রস্তুতি আরো ভালো থাকলে কি হতো? লাশের সংখ্যা বৃদ্ধি পেত। সমাবেশ না করলে কি হত সেটাও হয়ত কাপুরুষতা হতো কি-না? কিন্তু আমি মনে করি ২৮ অক্টোবর পুরো ঘটনার জন্য দায়ী আওয়ামী লীগ, পুলিশ প্রশাসন এবং বিএনপির মধ্যে ঘাপটি মেরে থাকা ষড়যন্ত্রকারীরা। কারণ এমন ঘটনার পূর্বাভাস অনেক দিন থেকেই পাওয়া যাচ্ছিল; কিন্তু আমার পর্যালোচনা হলো- দীর্ঘ ৭ ঘণ্টা যারা আমাদের উপর আক্রমণ করেছে কী তাদের পরিচয়? দলে তারা আওয়ামী লীগ কিন্তু ভাড়াটে সন্ত্রাসী, টোকাই গার্মেন্টকর্মী ও পতিতালয়ের হিন্দা। মুখে রুমাল, কোমরে মাফলার, খালি গায়ে মারামারিতে অংশ নিয়েছে ওরা। আমাদের প্রস্তুতি আরো ভালো হলে সেদিন লাশের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পেত আর এ ধরনের সন্ত্রাসী একজন টোকাই এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া, নামাজি, আল্লাহর দ্বীনের সৈনিকদের লাশ সবাই একই হিসেবে মূল্যায়ন করতো। হিসাব হতো কাদের লাশ কয়টি। দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় দেখানো হতো সেভাবে। অন্তত আল্লাহ তায়ালা সে কলঙ্কের হাত থেকে এ আন্দোলনকে রক্ষা করেছেন। আল্লাহ যা করেন তার মধ্যে এই আন্দোলনের জন্য কল্যাণ নিহিত। বিশ্বের মানুষ চিনতে সক্ষম হয়েছে কারা উগ্র ও জঙ্গি। ২৮ অক্টোবর প্রমাণিত হয়েছে আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ আর বামরা বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে বড় জঙ্গি সংগঠন। কিন্তু আমি জানি না ২৮ অক্টোবরের ঘটনা ১৪ দল কিভাবে পর্যালোচনা করছে। আমার মনে হয় এর মধ্যে আওয়ামী বামরা রক্ত পিপাসু। হিংস্র-উগ্রতা আর জঙ্গি মানসিকতা বিশ্ববাসী দেখেছে এবং মিডিয়ার বদৌলতে দেখতে থাকবে অনন্তকাল।

আজ যদি বলা হয়, এই দুনিয়ার বিবেচনায় ২৮ অক্টোবর সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন কে? কেউ বলবে, শহীদ মাসুম, শহীদ শিপন, শহীদ মুজাহিদ, শহীদ রফিক, শহীদ ফয়সলের পরিবার। কিন্তু না। এটি আমার আপনার হিসাব হতে পারে, তবে শহীদ পরিবারের অনুভূতি ভিন্ন। কিন্তু তা অবিশ্বাস্য হলেও সত্য। শহীদ মুজাহিদ তার মায়ের কাছে সবসময় শাহাদাতের জন্য দোয়া চাইতেন। শহীদ মুজাহিদের মা আজ তার সন্তানের শাহাদাতের জন্য গর্ববোধ করেন। সন্ত ানকে হারিয়েও বিশ্বাস করেন জান্নাতের সিঁড়িতে সন্তানের সাথে সাক্ষাৎ হবে। আর মুজাহিদের প্রিয় নানা নাতির শাহাদাতের খবর পেয়ে বলেছিলেন আলহামদুলিল্লাহ। তিনিও আজ দুনিয়া ছেড়ে বিদায় নিয়েছেন। আল্লাহ তাদেরকে একসাথে জান্নাতে থাকার সুযোগ করে দিন। শহীদ গোলাম কিবরিয়া শিপনের মায়ের ফরিয়াদ : আল্লাহর দরবারে আমার স্বপ্ন ছিল আমি শহীদের মা হবো, আল্লাহ যেন আমাকে একজন শহীদের মা হিসেবে কবুল করেন। শিপন সবসময় সত্যকে সত্য জানতো, মিথ্যাকে মিথ্যা জানতো। শহীদ সাইফুল্লাহ

www.pathagar.com

মোহাম্মদ মাসুমের গর্বিত মায়ের আহ্বান : আমার জীবনের আশা ছিল আমার ছেলে খালেদ বিন ওয়ালিদ হবে, নিষ্পাপ হবে। আমার ছেলে হাসান-হুসাইনের মতো হবে। আল্লাহপাক আমার দোয়া কবুল করেছেন। আমি আমার সাইফুল্লাহর রক্তের বিনিময়ে এ দেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হোক এই প্রার্থনা সবসময় করি। শহীদ ফয়সলের গর্বিত মা অনুভূতি ব্যক্ত করেছেন ঠিক এভাবে : আমি আশা করি ইনশাআল্লাহ আমার এই সুশিক্ষিত বিনয়ী, ভদ্র, শান্ত, অমায়িক ও সুন্দর আচরণবিশিষ্ট সন্তানকে আল্লাহ শাহাদাতের মর্যাদা দান করবেন। আমার সন্তানদের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় সন্তানকে আল্লাহ কবুল করে নিয়েছেন সেজন্য আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি।

আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীরা যাদের পিটিয়ে হত্যা করেছে, লাশের উপর নৃত্যউল্লাস করেছে, ভেঙে দিয়েছে দাঁত, উপড়ে ফেলেছে চোখ; তারা হয়তো বা ভাবতে পারে এর মধ্য দিয়ে তাদের বিজয় হয়েছে। কিন্তু জয়-পরাজয়ের হিসাব-নিকাশ এই পৃথিবীতেই শেষ নয়; বরং তাদের এই একটি আঘাত আল্লাহর দ্বীনের সৈনিকদের কাছে জান্নাতের নিকটবর্তী। যারা আঘাতের পর আঘাত চালিয়েছে এ নিষ্পাপ মানুষের দেহে, তারা কি আজ উত্তর দিতে পারবেন হাফেজ গোলাম কিবরিয়া শিপনের মায়ের জিজ্ঞাসার– 'কী অপরাধ আমার সন্তানের? আমি শহীদের মা এজন্য আমি গর্বিত; কিন্তু কেন খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে আমার সন্তানের দাঁতগুলো ভেঙে ফেলা হয়েছে? এই মুখ দিয়ে তো সে মহাগ্রন্থ আল কুরআন মুখস্থ করেছে। যাদের বুকের উপর নৃত্যউল্লাস করা হয়েছে, তারা কি জানে যে কপালে লাথি মারা হয়েছে সে কপালে দিনে পাঁচবার করে আল্লাহকে সেজদা করতো! পড়তো তাহাজ্জুদ নামাজ। যে হাত ভেঙে দেয়া হয়েছে সে হাত দিয়ে আল্লাহর দরবারে মুনাজাত করতো, যে পা গুঁড়িয়ে দেয়া হয়েছে সে পা দিয়ে আল্লাহর পথে মানুষকে আহ্বান করতে যেত। এ রকম হাজারো জিজ্ঞাসার জবাব আজ তাদের কাছে আছে কি? যারা সেদিন আমাদেরকে পিছিয়ে দিতে এসেছে তারা আমাদেরকে অনেক পথ এগিয়ে দিয়েছে। আরেকবার আমরা দেখে নিয়েছি আমাদের পরীক্ষিত নেতৃত্ব। যাদের সাহস আমাদের এগিয়ে দেয়। যাদের আল্লাহর নির্ভরতা এ কাফেলার কর্মীদের আশান্বিত করে। যাদের ত্যাগ আমাদের অনুপ্রাণিত করে। আমরা দেখেছি তাদেরকে। আমরা দেখেছি তাকে যাকে ঘিরে এ জনসভার আয়োজন। শ্রদ্ধেয় আমীরে জামায়াত মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী সাহেবকে। মুহুর্মুহু গুলি আর বোমা স্তব্ধ করতে পারেনি তার বলিষ্ঠ কণ্ঠকে। যা ছিল তেজোদীপ্ত, নিশ্চল, অবিরত আর অবিচল। তিনি যেন মাওলানা মওদূদীর অবিকল প্রতিচ্ছবি। এমনি এক জনসভায় অবিরাম গুলিবর্ষণ চলাকালে মাওলানা মওদূদীকে বসে পড়ার জন্য অন্যরা অনুরোধ করলে দৃঢ়তার

www.pathagar.com

সাথে তিনি বলেছিলেন, আমিই যদি বসে পড়ি তাহলে দাঁড়িয়ে থাকবে কে? তাই আমাদের বিশ্বাস শহীদের রক্ত বৃথা যাবে না, একদিন কথা বলবেই। সে দেশপ্রেমিক পরিক্ষিত সাহসী, নেতৃত্বকে আওয়ামী লীগ আজ আদর্শিকভাবে মোকাবেলা করতে ব্যর্থ হয়ে হত্যা করার নানা ষড়যন্ত্র করছে। ইতোমধ্যেই রাষ্ট্রীয় হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন শহীদ আবদুল কাদের মোল্লা। কিন্তু আওয়ামী লীগ জানে না জীবিত আবদুল কাদের মোল্লার চাইতে শহীদ আবদুল কাদের মোল্লা ইসলামী আন্দোলনের জন্য কোটিগুণ বেশি শক্তিশালী।

কিন্তু একথা সত্য যে, ইসলামী আন্দোলনের উপর জুলুম-নির্যাতন যত বেশি আসবে আন্দোলন তত মজবুত ও শক্তিশালী হবে। এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্রশিবিরকে দমন করার জন্য হামলা, মামলা ও খুন, গুম, অপহরণ, হত্যা, সন্ত্রাস, লুটপাট কর্মসূচি। প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মদতে এদেশে ইসলাম ও তথাকথিত যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের নামে নেতৃবৃন্দকে হত্যা করার গভীর ষড়যন্ত্র। প্রতিটি মুহূর্তে শাহাদাতের মিছিল দীর্ঘ হচ্ছে। সন্তানহারা পিতা-মাতার আহাজারি, ভাইহারা বোনের আর্তনাদ, পিতাহারা সন্তানের করুণ চাহনী, মাহারা সন্তানের অব্যক্ত বেদনা বাংলার আকাশ-বাতাসকে প্রকম্পিত করছে। এভাবে শাহীদের তালিকায় যোগ হচ্ছে সমাজের সব শ্রেণি পেশার মানুষ।

ইসলামী আন্দোলনের ওপর হাজারো জুলুম-নির্যাতনের মাঝে এই কাফেলা কর্মীদের ত্যাগ, কুরবানী, ভ্রাতৃত্ব, পরকাল ভীতি এবং নিজেদের পরিশুদ্ধ করার অনেক উপাদানের সন্ধান পেয়েছে এই সময়। কারণ যারা আমাদের পিছিয়ে দিতে চায় তাদের অনেক কর্মকাণ্ডের মধ্যেই আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য কল্যাণ রেখেছেন। আমাদের প্রতিপক্ষের অপপ্রচার, অপবাদ, হিংসা, উস্কানীর কারণে মানুষের মনে আন্দোলনকে জানার এক প্রচণ্ড আগ্রহ তৈরি হয়েছে। এর মধ্যেই হাজার হাজার মানুষ এ আন্দোলনে শরীক হচ্ছে। অনিবার্য হয়ে উঠছে তার বিজয়।

প্রিয় ভাইদের হারিয়ে আজ আমরা শোকাহত। বৃদ্ধ বাবা-মা আর পরিবারের সদস্যরা তাদেরকে হারানোর বেদনায় জ্বলতে থাকবে প্রতিদিন, প্রতিক্ষণ, প্রতিটি মুহূর্ত। মহান রবের দরবারে সন্তানহারা মায়ের আহাজারি আর প্রতিরাতে তাহাজ্জুদের নামাজ শেষে চোখের পানি কি কোনোই কাজে আসবে না? অবশ্যই আসবে। একদিন তারা শহীদের পিতা-মাতা হিসেবে আল্লাহর সম্মানিত অতিথি হবেন। সেদিন জান্নাতের সবুজ পাখি হয়ে উড়তে থাকবেন শহীদেরা। এটাই তো শহীদের চূড়ান্ত সফলতা! ন্যায় ও বাতিলের এই দ্বন্দ্ব কোনো সাময়িক বিষয় নয়, এটি চিরস্থায়ী আদর্শিক দ্বন্দ্বেরই ধারাবাহিকতা মাত্র। শাহাদাত ইসলামী

www.pathagar.com

আন্দোলনের বিপ্লবের সিঁড়ি, কর্মীদের প্রেরণার বাতিঘর, উজ্জীবনী শক্তি, নতুন করে পথ চলার সাহস।

আমাদের বিশ্বাস এই দুনিয়ার আদালতে এই সকল হত্যার নায্য বিচার না হলেও আল্লাহর আদালত থেকে খুনিরা রেহাই পাবে না। সর্বপরি মহান মাবুদের কাছে ফরিয়াদ। হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে সকল ত্যাগের বিনিময়ে বাংলার জমিনে দ্বীন কায়েমের তাওফিক দাও।

শহীদ মুজাহিদের মায়ের অনুভূতি -"আমি দারুণভাবে গর্বিত"

আমি আমার আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি পরিপূর্ণ আস্থা রেখে, সন্তান শহীদ মুজাহিদ সম্পর্কে কিছু কথা বলার চেষ্টা করছি মাত্র। মুজাহিদ মাতৃগর্ভে থাকাকালীন অবস্থায় সব সময়ই আল্লাহ তায়ালার দরবারে প্রার্থনা করতাম, আল্লাহ তুমি যা দান করবে তাতেই আমি সন্তুষ্ট। তবে তুমি যাকে দান করবে, সে যেন হয় সুস্থ, সবল এক পূর্ণাঙ্গ শিশু। সেই সাথে তোমার কাছে মিনতি আমার, সেই শিশু হয় যেন মুমিন, মুত্তাকি, চক্ষুশীতলকারী, তোমার সন্তুষ্টি হাসিলকারী, দ্বীনের খেদমতকারী, সাহাবীদের মতো চরিত্রের অধিকারী এবং সদকায়ে জারিয়াহ-এর গুণাবলিসম্পন্ন এক মানবশিশু।

১২ রবিউল আউয়ালের সুবেহ সাদেকের মুহূর্তে দুনিয়া আলোকিত করে, আমার কোলজুড়ে প্রশান্তির ছোঁয়া দিয়ে সে এলো দুনিয়ায়। আমার বাবার বাসায় জন্ম হয় মুজাহিদের। আমি চারটি সন্তানের মা হয়েছি। প্রসববেদনার কষ্ট অনেক কষ্টের। আল্লাহর অশেষ রহমতের ফলে সবচেয়ে কম সময়ের ব্যবধানে সে ভূমিষ্ঠ হয়েছিল। প্রিয় সময়ে, প্রিয় তারিখে দুনিয়ায় এসেছিল বলে ওর নানা বলেন, নাতির নাম হবে মুজাহিদুল ইসলাম (মুজাহিদ) ইসলামের সৈনিক। আল্লাহ ও রাসূলের পথের সঠিক অনুসারী। আমার চোখের মণি মুজাহিদ শিশু বয়স থেকে খুবই শান্ত প্রকৃতির ছেলে ছিল। কথা বলতে শেখার পর বলতো, আম্মু আমার ক্ষুধা লেগেছে। কাজের তাগিদে যদি আধা ঘণ্টা পরও খাবার দিতাম তাতেই সই। কোনো কান্নাকাটি, চিৎকার চেঁচামেচি, পেছনে পেছনে ঘুর ঘুর করা, বায়না করা স্বভাব ওর শিশুবেলা থেকে এই পর্যন্ত আমি পাইনি। বিরক্ত কাকে বলে, বাবা-মাকে কষ্ট দেয়া কাকে বলে, হে আল্লাহ! তুমি তো সাক্ষী এ ছেলের কাছে তা কোনোদিনই পাইনি। ও বকা খাওয়ার মতো ছেলে ছিল না বলে ওকে কখনো বকাঝকা করিনি, মারিনি। কেউ দুষ্টুমি করে ওকে মারলে ওর চোখে পানি দেখলে ব্যথায় বুকটা মুচড়ে উঠতো। ও কাঁদলে সাথে সাথে আমি কাঁদতাম।

২০০৬ সালের ২৮ অক্টোবর আমার জীবনের সবেচেয় বড় স্মরণীয় দিন, সবচেয়ে বেদনার দিন এবং সবচেয়ে বড় শুকরিয়া আদায়ের দিন। এই দিনে

www.pathagar.com

আমার পরম প্রিয় নাড়িছেঁড়া ধন, রক্তের বাঁধন ছিন্ন করে শাহাদাত বরণ করলো। সে হলো শহীদ মুজাহিদুল ইসলাম। সে ছিল আমার অতিপ্রিয় সন্তান। যাকে যাবে না কোন দিন ভোলা। সে যে অন্তরে থাকবে অতি যতনে। সে ছিল আমার চোখের মণি, কলিজার টুকরা, সাধনার ধন, আত্মারই এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। তার বিহনে আমি যে কিভাবে বেঁচে আছি তা শুধু আমি ও আমার সৃষ্টিকর্তা জানেন। সে শুধু আমার সন্তানই ছিল না, ছিল পরম প্রিয় বন্ধু। আমার জীবনের যত কষ্ট, যন্ত্রণা, বোবাকান্না তা শুধু তার সাথে শেয়ার করেছি, অন্য কারো সাথে নয়। নয় স্বামী, নয় বাবা-মা, নয় কোন আত্মীয়স্বজন। সে ছিল আমার পরামর্শদাতা। আজ সে নেই তাই আমার অব্যক্ত বুকফাটা আর্তনাদ। তার মত ভালো আমলের ভালো ছেলে পরকালে আমি পাবো তো? এই জীবনে তাকে আমি কিছু দিতে পারিনি তাই আল্লাহকে বলি, হে আল্লাহ এই জীবনে যতটুকু পুণ্য করেছি এবং মৃত্যুর আগ মুহূর্ত পর্যন্ত যা পুণ্য অর্জন করবো, তার সবটুকু সওয়াবই আল্লাহ যেন তার আমলনামায় যোগ করে দেন। আমার জন্য আমার পাপগুলো থাক জমা। আমার আল্লাহ যা ভালো মনে করবেন তাই করবেন।

মুজাহিদ বলত, মাগো বেশি বেশি কুরআন পড়ো, তাফসির সহকারে, আমল করার লক্ষ্যে কুরআনকে হৃদয়ে ধারণ করো। কুরআনের বর্ণনা মতে, কী অনুকরণীয়, কী পালনীয়, কী বর্জনীয় সেই মোতাবেক না চললে পরকালে পার পাবে না। যথাসাধ্য চেষ্টা করবে আল্লাহর আনুগত্য পরিপূর্ণরূপে করতে। সে নিয়মিত ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়ন করতো বা পড়তো। আর তাহাজ্জুদের নামাজ পড়তো, মাঝে মাঝে নফল রোজাও রাখতো। রাত্রিবেলা তাহাজ্জুদের নামাজ খুব সুন্দর ও ধীরস্থির গতিতে পড়তো সব সময় প্রার্থনা থাকতো একটাই- আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন কায়েমের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করে শহিদী তামান্না হাসিল করা। মাগো, শহীদ হতে চাইলেই কি শহীদ হওয়া যায়? যায় না মা। শহীদ হতে হলে অনেক বড় ভাগ্য লাগে, সত্যিকারার্থে আমার কি সেই ভাগ্য আছে মা, মাগো শহীদ হলে কর্মফলের কোন হিসাব দিতে হয় না, কোন শাস্তি হয় না কবরে, জাহান্নামে যেতে হয় না। শাহাদাত হলে সরাসরি জান্নাতে যাওয়া যায়। মানুষ ইচ্ছা করলে কি শাহাদাত বরণ করতে পারে? পারে না মা, পারে না। এর জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে হয়। দ্বীন ইসলামের জন্য জান, মাল ও সময় ব্যয় করতে হয়। নতুবা তোমার কোন কার্য সাধন হবে না মা। সকলের উর্ধ্বে- বাবা-মা, ভাই-বোন, দুনিয়াবি আরাম-আয়েশের ওপর আল্লাহর কথার মূল্য দিতে হবে। তাই বলি আল্লাহ শুন তুমি, মুজাহিদ ছিল খুবই সুন্দর মনের একটা ছেলে।

www.pathagar.com

মুজাহিদের প্রিয় ইসলামী ছাত্র সংগঠনকে আমি আমার দৃষ্টিকোণ থেকে ভাবি- এই সংগঠন হলো একটি সুশোভিত, আলোকিত, ফুলের শক্ত ও মজবুত ঝাড়। যে ঝাড় কখনো ভাঙবে না, ধুমড়ে-মুচড়ে পিষে ফেলা যাবে না। মোট কথা, যাকে কোনদিন নিশ্চিহ্ন করা যাবে না। এই ঝাড়ে অজস্র ফুলকে সঠিকভাবে রাখা হলে, এর শোভা বৃদ্ধি পাবে শতগুণ এবং তা হবে চিরস্থায়ী। এর সুঘ্রাণে মোহিত হবে চারপাশ ও মনোমুগ্ধকর হবে পরিবেশ। এ ঝাড়ের ফুলকে ঠিকভাবে রাখতে জানলে, এ ফুল কখনো পচবে না, দুর্গন্ধ ছড়াবে না এবং কাঁটাও থাকবে না। আর এই ঝাড়ের যে অপরূপ আলো তার আলোয় সকল আঁধার কেটে যে দ্যুতির বিচ্ছুরণ ছড়াবে, তা পূর্ণিমার উজ্জ্বল আলোকেও হার মানিয়ে যাবে। তাতে সকলেই বিমোহিত হবে, সে আলোর এমনই গুণ যে নিজেকে আলোকিত করে, পরিবারকে আলোকিত করে, সমাজকে আলোকিত করে ও বিশ্বকে সকল আঁধার মুক্ত করে আলোয় উদ্ভাসিত করে। সেই ফুলের ঝাড়ের অজস্র অসংখ্য ফুলের মাঝখানে আমার সন্তান মুজাহিদ হলো তরতাজা ফুটন্ত এক রক্ত গোলাপ, যার সৌন্দর্য ও সুঘ্রাণ ইতিহাস হয়ে থাকবে চিরদিন চির অম্লান।

মুজাহিদের অসমাপ্ত কাজগুলো যেন পূর্ণতায় রূপ দিতে পারি সেই সুস্থতা, যোগ্যতা ও আমল দান করুন আল্লাহ। আল্লাহ আপনার পছন্দনীয় পথে আমাদের সকলকে কবুল করুন। আমিন।

শহীদ ফয়সালের মায়ের অনুভূতি "ফয়সাল আমাদের জন্য প্রেরণা"

সেই ভয়াবহ ২৮ অক্টোবর আমাদের মাঝে আসছে, মনে হলেই অন্তরটা কেঁপে ওঠে। সন্তান হারানোর দৃশ্য এবং ফাহাদকে মারাত্মক আহত অবস্থায় হাসপাতালে, সেই হৃদয়বিদারক দৃশ্যটা ভোলার মত নয়, যা অন্তরকে সব সময় ব্যথিত করে, শরীরটা দুর্বল হয়ে যায়। ফয়সালকে হারিয়ে আর স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসা 'মা' হয়ে আমার পক্ষে এটা সম্ভব নয়। স্বামীকে হারিয়েছি অসময়ে আবার সন্তনকেও মানুষ মারতে পারবে এটা আমার কল্পনাতীত। সবচেয়ে প্রিয় সন্তানটি ছিল খুবই নরম স্বভাবের, রাগ, গোস্বা, হিংসা-বিদ্বেষ কিছুই তার ছিল না। এমন ছেলেকে লগি-বৈঠা দিয়ে জীবনে শেষ করে ফেলা এটা মানুষের কাজ নয়, এরা নরপশু, ওরা কিলার, ওদের মায়ামমতার লেশমাত্র নেই। ক্ষমতার লোভে অন্ধ হয়ে সেদিন মুজাহিদ, শিপন, মাসুম, রফিক, আরও কতজনকে ওরা পিটিয়ে হত্যা করেছে এবং শত শত মানুষকে করছে যখম। সেই আওয়ামীলীগ আবার ক্ষমতায় এসেছে। হত্যা, সন্ত্রাস, চাঁদবাজি আর দেশের অর্থ লুটপাট এটাই ওদের কাজ। ওরা এখন আবার ২০২১ সালের প্ল্যান-প্রোগ্রাম করছে। আবারও ক্ষমতায় থাকার জন্য একটার বদলে দশটা লাশ ফেলবে। শেখ হাসিনা

www.pathagar.com

নিজের সন্তানদের তো লন্ডন-আমেরিকায় রেখেছে। আর অপরের সন্তানদের বেলায় হুমকি একটার বদলে দশটা লাশ। ওদের তো পরের সন্তানদের প্রতি মায়া লাগে না। দুর্নীতি, সন্ত্রাস আর লুট করে সম্পদের পাহাড় বানানোই ওদের রাজনীতি। এই অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং সত্য ও সুন্দরের পথ দেখানোর জন্য আসছে ছাত্রশিবির। এই ছাত্রশিবিরকেই সহ্য করতে পারে না আওয়ামী সন্ত্রাসীরা। তাই ওরা বারবার এই শিবির কর্মীদের খতম করে ওদের রাজত্ব টিকিয়ে রাখতে চায়। এই দলেরই নিবেদিতপ্রাণ আমার প্রিয় সন্তান আবদুল্লাহ আল-ফয়সাল। স্বভাবে-চরিত্রে অতুলনীয় বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিল। আল্লাহর পছন্দনীয় সবদিক থেকে সুন্দর বান্দাটিকেই তার কাছে নিয়ে গেলেন। শহীদদের স্বভাবটা এরকমই হয়ে থাকে। আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন ওদেরকে শাহাদাতের সর্বোচ্চ মর্যাদা দান করুন। শহীদ মালেক থেকে শুরু করে যত সন্তান শাহাদাত বরণ করেছে তাদের সবার জন্যই আল্লাহর কাছে এই প্রার্থনা করি।

আল্লাহ কুরআনে বলেছেন, "তোমরা ওদের মৃত বলো না ওরা জীবিত, আল্লাহর পক্ষ থেকে রিজিকপ্রাপ্ত কিন্তু তোমরা অনুধাবন করতে পার না।"

আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি– আল্লাহ যেন আমাদের প্রিয় সন্তানগুলোকে শাহাদাতের সর্বোচ্চ মর্যাদা দিয়ে ওদের রিজিক দান করেন। সেই ২৮ অক্টোবরের ভয়াবহ দিনে শহীদ মুজাহিদ, শিপন, মামুন, ফয়সাল, রফিক সবাইকে শাহাদাত বরণ করতে হয়েছে। ওদের কী অপরাধ ছিল! শুধু এটুকু অপরাধ যে, ওরা দ্বীনের পতাকাকে সমুন্নত করতে চেয়েছিল। ওরা অন্যায় দমন এবং ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে ছিল বদ্ধপরিকর। এ জন্য তারা জীবনকে বিলিয়ে দিতেও কার্পণ্য করেনি।

এরপর গত বছর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে শহীদ হতে হয় মাসুদ বিন হাবিব ও মুজাহিদকে। আওয়ামী হায়েনারা মানুষের জীবন শেষ করতে কোনো পরওয়া করে না। আমার ছেলে ফাহমিদ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, এই আন্দোলনের সদস্য। অনেক ঘাত-প্রতিঘাত পেরিয়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিল। ওর কাছ থেকে মাসুদ বিন হাবিব সম্পর্কে জানলাম। ইংরেজি শেষ বর্ষের ছাত্র। অত্যন্ত মেধাবী একজন ছেলে ছিল মাসুদ বিন হাবিব। গান, কৌতুক ইত্যাদিতে অনেক পারদর্শী ছিল। একজন অসাধারণ সন্তানকে হারালো তার বাবা-মা। শহীদদেরকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন খাঁটি মানুষ হিসেবে দুনিয়াতে পাঠিয়েছিলেন।

আমিও এই আন্দোলনের নগণ্য একজন কর্মী। সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের বাধা দানের জন্যই এই সংগঠন। সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা যেই দলটি করবে তাদের অনেক সংগ্রাম করেই এই দলে টিকে থাকতে হয়। তাদেরকে

www.pathagar.com

শয়তান ধোঁকায় ফেলতে চায়। মধ্যপন্থী মানুষদের সত্যপথে টিকে থাকার জন্য আল্লাহর কাছে সার্বক্ষণিক সাহায্য এবং আপ্রাণ চেষ্টা-সাধনা চালিয়ে যেতে হবে। সত্যপথের সৈনিকদের সত্যকে প্রতিষ্ঠার জন্য যেভাবে সংগ্রাম করবে সেভাবে নিজেকেও সত্যপথে টিকিয়ে রাখতে হবে। শত লোভ-লালসা সামনে আসবে; কিন্তু সেদিকে যাওয়া যাবে না। পূর্বের ইতিহাস অনুসরণ করতে হবে। নবীজি ﷺ এবং সাহাবাদের জীবনের দিকে তাকাতে হবে। আর তা না করলে জিহাদের ময়দানে মৃত্যু বরণ করেও মুনাফিক হিসেবে পরিগণিত হব। আমি এ ব্যাপারে নিজেকেও প্রশ্ন করি, আমাদের হতে হবে সেই রকম মুজাহিদ-মুজাহিদা, যারা আল্লাহর নেয়ামতপ্রাপ্ত হয়েছেন।

ইসলামী ছাত্রশিবিরকে আমি খুবই পছন্দ করি, যে পথে আমার প্রাণপ্রিয় সন্তানেরা জীবন দিয়েছেন। সত্যের সৈনিক ওরা, ওরা দ্বীনের মুজাহিদ, সত্য-ন্যায়ের অতন্দ্র প্রহরী। আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, আল্লাহ তোমাদের এই প্রচেষ্টাকে কবুল করুন এবং আমাদেরকেও আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এই পথের জন্য কবুল করুন। আমিন।

শহীদ মাসুমের মায়ের অনুভূতি– "বেদনাবিধুর আটাশে অক্টোবর"

আল্লাহপাকের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ। যাদেরকে উপাধি দেয়া হয়েছে 'আশরাফুল মাখলুকাত' অর্থাৎ সৃষ্টির সেরা জীব। তারা আল্লাহপাকের সবচেয়ে প্রিয় সৃষ্টি। তাই তারা যেন শয়তানের প্ররোচনায় বিভ্রান্ত হয়ে না যায় সে জন্য গাইডলাইন হিসেবে আল-কুরআনকে দিয়েছেন। আল্লাহ বলেছেন, যারাই আমার কুরআন অনুসরণ করবে না তারা ধ্বংস হয়ে যাবে। আমাদের প্রিয়নবী হজরত মুহাম্মদ ﷺ তাঁর বিদায় হজের বাণীতে বলেছেন, 'তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত ধ্বংস হবে না, যতক্ষণ পর্যপ্ত আল্লাহর কুরআন ও আমি রাসূলের সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরে থাকবে।'

আমরা যদি নিজেকে মুসলিম দাবি করি এবং মুসলিম হিসেবে মরতে চাই তাহলে আল্লাহর হুকুম ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাতকে অনুসরণ করা আমাদের জন্য অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়।

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির এমন একটি সংগঠন যারা দেশের ছাত্রসমাজকে কল্যাণের পথে আহ্বান জানায়, ছাত্রসমাজকে সৎ কাজের আদেশ দেয় এবং অসৎ কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখে। লেখাপড়ার পাশাপাশি কুরআন-হাদিসের চর্চা করে এবং আমল করে। এমন একটা সুন্দর দলের তুলনা অন্য কোন দলের সাথে মিলে না। এরা মানুষকে নামাজি ও ভদ্র বানায়। এই বাংলাদেশের বুকে কেউ তাদের বিরুদ্ধে কোন প্রকার অপকর্মের প্রমাণ দেখাতে পারবে না।

www.pathagar.com

আল্লাহর রহমতে এই সংগঠন একজন ছাত্রকে পিতামাতার চক্ষুশীতলকারী সন্তান হিসেবে সমাজে উপহার দেয়।

এই সংগঠনই করতো শহীদ সাইফুল্লাহ মুহাম্মদ মাসুম, শহীদ গোলাম কিবরিয়া শিপন, শহীদ মুহাম্মদ মুজাহিদুল ইসলাম ও শহীদ রফিক, শহীদ ফয়সাল। তারা তাদের এলাকার শ্রেষ্ঠ সন্তান হিসেবে সুপরিচিত ছিল। তাদের কথা মনে হলে এখনো তাদের এলাকার লোকেরা চোখের পানি ফেলেন। সেদিন যারা পল্টনে শহীদ হায়েছেন তাদের চরিত্র হুবহু একই রকম ছিল। মাসুম শিশুকাল থেকে (৬-৭ বছর বয়স) নামাজ পড়তো জামাতের সাথে। ছোটবেলায় খেলা করছে– বললাম, আজান হয়েছে মসজিদে যাও। সাথে সাথে খেলা ছেড়ে মসজিদে চলে যেত। কোন প্রকার অবহেলা করতো না। রোজার বেলায়ও তাই করতো। ৫-৬ বছর বয়স থেকে রোজার প্রতি আকর্ষণ ছিল তীব্র। পাল্লা দিয়ে রোজা রাখতো চাচাতো ভাই-বোনদের সাথে। সাইফুল্লাহ কোন দিন কারো সাথে খারাপ ব্যবহার করতো না। সে খুবই ধৈর্যশীল ছিল। একটা ছোট ঘটনা মনে পড়ে– আমাদের বাসার সামনে ফুলের গাছ লাগিয়েছিল সখ করে। গাছে ফুল ধরেছে। বাড়ির ভাড়াটিয়ার ছোট একটি মেয়ে ফুল ছিঁড়ে ফেলেছে। মাসুম সাথে সাথেই দেখে ফেলেছে এবং মেয়েটির হাত ধরে তাকে জিজ্ঞেস করেছে, পেছনে মেয়েটির মা লুকিয়ে লুকিয়ে দেখছে ঘটনাটি কী দাঁড়ায়। এদিকে মেয়েটির সাথে মাসুম শখের ফুল ছেঁড়ার কারণে কোন প্রকার দুর্ব্যবহার তো করেইনি বরং তাকে আদর করে বুঝিয়ে দিয়ে বিদায় দিয়েছে। মাসুম শহীদ হওয়ার পর সবার কাছে সেই মহিলা কেঁদে কেঁদে বলেছেন, এমন সুন্দর তার আচরণ ছিল। আমার মেয়েটিকে ভেবেছিলাম মারবে বা বকাঝকা করবে; কিন্তু মাসুমের ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম।

অভাবীদের অভাব দূর করার ব্যাপারে সে ছিল তৎপর। এক গরিব ছাত্রের ভর্তির টাকার ব্যবস্থা করে নিজের প্রিয় পছন্দের জামাটি পরিয়ে দিয়ে তাকে মাদ্রাসায় ভর্তি করিয়ে দিয়েছিল শহীদ মাসুম।

ছাত্রদেরকে পয়সা ছাড়া পড়াতো। প্রতি বছর নতুন বই কিনে দিতাম। বছর শেষে সেই বইগুলো বিনা পয়সায় গরিব ছাত্রদেরকে দিয়ে দিত। শুধু বইয়ের বেলায় নয়, সব ব্যাপারেই যেমন শখের খেলনা– আমেরিকা থেকে তার মামা তার জন্য এনেছিল, সেই খেলনা ইসলামের পথে ছেলেদেরকে আনার জন্য এবং ভাব জমানোর জন্য দেখা গেল সে দিয়ে দিয়েছে। পয়সা খরচ করে ছোট ছাত্র ভাইদেরকে খাওয়াতো। বাড়িতে ডাবগাছ, আমগাছ ও বরইগাছ আছে। সেখান থেকে ফল পেড়ে তাদেরকে নিয়ে খাওয়া-দাওয়া করতো। এলাকার প্রত্যেকটি ছেলের জন্য অন্য রকম একটা টান ছিল তার।

www.pathagar.com

সংগঠনে সময় দিত বেশি। মাঝে মাঝে আমি বকা দিতাম পড়াশোনার জন্য। কিন্তু নিয়মিত পড়াশোনা করতো। তার একটা সুন্দর রুটিন ছিল। লেখাপড়ায়ও মেধাবী ছিল। মতিঝিল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ থেকে এসএসসিতে প্রথম বিভাগ ৩টি লেটারসহ ও বিএএফ শাহীন কলেজ থেকে এইচএসসি পাস করে ইংলিশে অনার্সে ভর্তি হয়েছিল। কিন্তু খুব তার পেরেশানি ছিল ইংল্যান্ডে গিয়ে পড়াশোনা করার। কারণ সেখানে তার প্রিয় খালা তার জন্য সব ব্যবস্থা করে রেখেছিল। কিন্তু সেই আশা আওয়ামী হায়েনারা পূরণ হতে দিল না।

শহীদ মাসুমের ভেতরে কখনো অলসতা স্থান পেতে পারেনি। সংগঠনের কাজের বেলায় ছিল সে সদাতৎপর। রাত জেগে পোস্টারিং ও দেয়াল লিখনের কাজ সে করেছে নির্ভয়ে। সাথীদের নিয়ে নিজের হাতে চুলায় গাম তৈরি করে সারারাত না ঘুমিয়ে এসব কাজ করতো। শত কাজের মাঝেও যখনই দায়িত্বশীল ডাকতেন সব কাজ ফেলে দিয়ে তাতে সাড়া দিত। মোট কথা সংগঠনের জন্য সে ছিল নিবেদিতপ্রাণ। পাড়ার দুষ্টু ও চঞ্চল ছেলেদেরকে খেলাধুলার মাধ্যমে সংগঠনে ভেড়ানোর চেষ্টা করতো। এর জন্য নিয়মিত খেলাধুলায় তাদের সাথে সময় দিত। কিছু ছেলে ফজরের নামাজ পড়ার বেলায় অবহেলা করতো বলে ফুটবল খেলার প্রলোভন দেখিয়ে তাদের ঘুম থেকে উঠিয়ে ফজর নামাজ পড়ার ব্যবস্থা করতো শহীদ মাসুম।

সুন্দর কবিতা লিখতে পারতো। সিগারেট নিয়ে, জন্মভূমি বাংলাদেশকে নিয়ে সাড়া জাগানোর মতো কবিতা লিখেছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় সেই কবিতাগুলো বন্যার সময় হারিয়ে গিয়েছে বিধায় উল্লেখ করতে পারলাম না। শহীদ মাসুম অনেক সুন্দর গান করতে পারতো। এলাকার বিভিন্ন প্রোগ্রামে স্টেজে সুন্দর সুন্দর গান গেয়ে শুনাতো সবাইকে। শহীদ মাসুম সুন্দর সুরে কুরআন তেলাওয়াত করতো। এক কর্মী বোন সকালবেলা আমার সাথে দেখা করার জন্য আমাদের বাসায় এসেছিলেন। মাসুম সামনের রুমে বসে কুরআন তেলাওয়াত করছিল। সেই সময় বাইরে থেকে তার কুরআন তেলাওয়াতের সুর শুনে কর্মী বোনটি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। ও শহীদ হওয়ার পর সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এক পর্যায়ে এ কথাটি উল্লেখ করেছিলেন বোনটি। ও বেঁচে থাকতে এত কিছু খেয়াল করতাম না। চলে যাওয়ার পর এখন ওর সব গুণ চোখের সামনে ভেসে উঠছে। এখন ওর প্রতিটি আচরণ স্মৃতি হয়ে মনে নাড়া দেয়। আর ওর হারানো ব্যথা সহ্য করতে কষ্ট হয়। ও ছিল সমাজসেবী বালক। কারো কোন অসুখের খবর কানে এলে সোজা হাসপাতালে গিয়ে হাজির হতো। রক্ত দেয়া থেকে শুরু করে রাত জেগে সেবা করা পর্যন্ত দায়িত্ব পালনে সে ছিল তৎপর।

এমন চক্ষুশীতলকারী সন্তান ছিল মাসুম। সে শুধু মায়েরই চক্ষুশীতলকারী সন্তান ছিল না। সারা এলাকার মুরব্বিদের নজরকাড়া একজন সন্তান ছিল। তাকে

www.pathagar.com

আওয়ামী-সন্ত্রাসীরা মেরে ফেলল এ কথাটি এখনো এলাকাবাসী সহ্য করতে পারছে না। যার বিরুদ্ধে জীবনে একটি নালিশ ছিল না কারো, সেই ২ নভেম্বরে তার শাহাদাতের খবরে দূর-দূরান্ত থেকে ঢাকার বাইরের জেলা থেকে মাদারটেক বাগানবাড়িতে ১৩০/১৬ নম্বর বাসায় সবাই এসে ভিড় করেছিল শেষবারের মতো একনজর দেখার জন্য। লক্ষণীয় হলো, সে ঢাকার বাইরে যেখানে বেড়াতে গিয়েছিল সেখানকার লোকদের সাথে এমন সুন্দর আচরণ করতো যে, তারা তাকে ভুলতে পারতো না। শহীদ মাসুম খেলায় সুন্দর সুন্দর প্রাইজ নিয়ে ঘরে ফিরতো। মেডেল, কাপ, কাঁচের প্লেট। এখনো সব কাঁচের প্লেট স্মৃতি হিসেবে যত্ন করে রেখে দিয়েছি। শিবির দায়িত্বশীলরা এলে সেগুলো তখন ব্যবহার করে মনে তৃপ্তি পাই। ও আল্লাহর কাছে চলে যাওয়ার পর এখন বুঝি কী সম্পদ হারিয়েছি। ওকে আমি একটি মুহূর্তের জন্যও ভুলতে পারি না। এই পৃথিবীতে সব সুখ আছে। এই সুখের ভেতরেও প্রতিটি মুহূর্তে হৃদয়ের ক্ষতস্থানে ব্যথা অনুভূত হয়। সেই মাসুমকে ছাড়া এক মুহূর্তও থাকতে পারতাম না। মাসুম ছাড়া আমার কোনকিছু ভাল লাগতো না। সেই মাসুমকে ছাড়া আমি চোখের পানিকে সাথী কওে বেঁচে আছি। সব আছে মাসুম নেই। দেখতে দেখতে চারটি বছর পূর্ণ হলো। রক্তাক্ত ২৮ অক্টোবরে চারটি বছর পাও হয়ে গেল। কিন্তু মাসুম শিপন, মুজাহিদ ও ফয়সালদের হত্যার কোন বিচার হলো না।

বর্তমান সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে ২৮ অক্টোবরের নৃশংস হত্যাকাণ্ডটি ঘটানো হলো। শেখ হাসিনার ছাত্রলীগের অপকর্মের অসংখ্য ঘটনা আছে তবে একটা ঘটনা উল্লেখ না করে পারছি না। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন নামাজি ছেলেকে শিবিরকর্মী মনে করে ধরে এনে রাতে অকথ্য নির্যাতন চালানো হয়েছে তার ওপর। তার পিঠের চামড়া উঠিয়ে ফেলা হয়েছে, নামাজি ছেলের লজ্জাস্থানে সিগারেটের আগুনে দিয়ে পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। নির্যাতিত অবস্থায় সেই নামাজি ছেলে পানি খেতে চেয়েছিল বলে তার মুখের মধ্যে প্যান্টের চেইন খুলে প্রস্রাব খাইয়ে দিয়েছিল শেখ হাসিনার ছাত্রলীগের সোনার ছেলেরা। ছেলেটির অপরাধ হলো– সে নামাজ পড়ে। তার সোনার ছেলে ১০০ মেয়েকে ধর্ষণ করে সেঞ্চুরি পালন করে মিষ্টি বিতরণ করেছিল এ কথা দেশবাসীর জানা আছে।

শেখ হাসিনার হুকুমে আমাদের সন্তানরা নিহত হয়েছে তার সোনার ছেলেদের লগি-বৈঠার আঘাতে। শেখ হাসিনা কোনভাবে অস্বীকার করতে পারবেন না সে এতগুলো খুনের আসামি। তার বক্তৃতাগুলো ক্যাসেটে রেকর্ড হয়ে আছে। তিনি বলেছিলেন, লগি-বৈঠা নিয়ে আস।' যার ফলশ্রুতিতে আমরা মায়েরা আমাদের সন্তানগুলো হারিয়েছি।

www.pathagar.com

এ কারণে হত্যা মামলা দায়ের করা হয়েছিল। এই মামলার বিচার বিগত সরকার করেনি। বিদেশী প্রভুদের সহায়তায় ক্ষমতায় বসে সরকারি শক্তিতে হত্যা মামলা প্রত্যাহার করে নিল। তার দ্বারা কখনো ভাল কাজ হবে বলে আশা করা যায় না। ক্ষমতায় এসে তার ফলশ্রুতি হিসেবে ৫৭ জন সেনা অফিসারকে হত্যা করা হলো। সেনা অফিসাররা বারবার প্রধানমন্ত্রীর কাছে সাহায্য চাওয়ার পরও প্রধানমন্ত্রী কোন ব্যবস্থা নিলেন না। তার মানে তিনিও এ হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত। শেখ হাসিনা আইনের কথা বলেন বড় গলায়। বিভিন্ন জায়গায় বক্তৃতা বিবৃতি দেন; কিন্তু সরকারি ক্ষমতাবলে ২৮ অক্টোবর খুনের মামলা প্রত্যাহার করে নিয়ে প্রমাণ করলেন তিনি কতটুকু আইনের ঊর্ধ্বে। আমরা দেশবাসী আইনকে শ্রদ্ধার চোখে দেখি। আইন হলো সব কিছুর ঊর্ধ্বে। আইনের ঊর্ধ্বে কেউ যেতে পারে না। আইনের কাছে কে প্রধানমন্ত্রী, কে রাষ্ট্রপতি বিচার বিবেচ্য নয়। আইনের চোখে যে দোষী হবেন তাকে আইনের শাসন মেনে নিতে হবে। এটা হলো স্বাভাবিকতা। কিন্তু শেখ হাসিনা আইনের শাসনের অবমাননা করে একটা বড় ধরনের অপরাধ করেছেন। এই অপরাধের শাস্তি হওয়া উচিত। আমরা বাদিরা দুর্বল, এখন আমাদের জন্য কোন মানবাধিকারবাদী এগিয়ে আসছে না। যখন সন্ত্রাসীরা মারা যায় তখন মানবাধিকারবাদীরা চেঁচামেচি করতে থাকে। কিন্তু যেভাবে নামাজি, ভদ্র, চরিত্রবান ছেলেদের পিটিয়ে মারা হলো এ ব্যাপারে মানবাধিকার কর্মীদের কোনো আওয়াজ এ পর্যন্ত বের হলো না। দিন-দুপুরে সচেতন মানুষের সামনে শেখ হাসিনা যেই ঘটনাটি ঘটালেন তা বিশ্বাসী ভুলবে না। কাল হাশরে এই বিশ্ববাসী তার বিরুদ্ধে সাক্ষী হিসেবে নির্যাতিত মানুষের পাশে দাঁড়াবে। আল্লাহপাক অবশ্যই তার বিচার করবেন। আল্লাহর কাছে যে মামলা দিয়ে রেখেছি পুত্রহারা, স্বামীহারা পিতৃহার মানুষের প্রতিদিনের প্রতি মুহূর্তে চোখের পানি আল্লাহর দরবারে জমা হচ্ছে। কেউ চিরদিন দুনিয়ায় থাকবে না।

এই জন্য আল্লাহর কাছে শুকরিয়া জানাই আমরা শহীদের মা হতে পেরেছি। কারণ একজন শহীদ কাল হাশরে ৭০ জনকে শাফায়াত করতে পারবেন, যাদের জন্য জাহান্নাম অবধারিত ছিল। এই ঘটনার কারণে আমাদের ছেলেরা কত বড় মর্যাদা লাভ করেছেন এর শুকরিয়া আদায়ের শেষ নেই।

ইসলামের দুশমনরা মাসুম, শিপন, মুজাহিদদের হত্যা করে ইসলামী ছাত্রশিবিরের কাজকে বন্ধ করে রাখতে পারেনি। ওরা নেই, দুনিয়ায় ওদের হারানো শোককে শক্তিতে রূপান্তরিত করে শত শত মাসুম, শিপন, মুজাহিদ এগিয়ে আসছে ওদের শূন্যস্থান দখল করার জন্য। এই ইসলামী কাফেলার স্রোতকে দুনিয়ার কোনো শক্তি রোধ করতে পারবে না। আল্লাহর পথে বাধা

www.pathagar.com

দিতে গিয়ে তারাই ধ্বংসের অতল গহ্বরে তলিয়ে যাবে ফেরাউন ও নমরূদের মত।

এই আটাশে অক্টোবরে নতুন করে শহীদদের আত্মদানের কথা স্মরণ করে আমাদের দ্বীন কায়েমের পথ চলা হোক আরো বেগবান। আর চোখের পানি নয়, আওয়ামী হায়েনাদের বিষাক্ত ছোবল থেকে দেশের ঈমানদার জনগণকে রক্ষা করার দায়িত্ব আজ আমাদের অর্থাৎ জামায়াতে ইসলামী ও ছাত্রশিবিরের ওপর। আল্লাহপাক দায়িত্ব পালনের তাওফিক দান করুন। আমিন।

শহীদ হাফেজ গোলাম কিবরিয়া শিপন-এর মায়ের অনুভূতি "আমার প্রত্যাশা"

শহীদ হাফেজ গোলাম কিবরিয়া শিপন চাঁদপুর জেলার মতলব থানায় ১৪ আগস্ট রোববার জন্মগ্রহণ করে। ছোটবেলা থেকে খুব বেশি চঞ্চল কিংবা খুব বেশি চুপচাপ- এ দুয়ের মাঝামাঝি সে ছিল। সে কোন বিষয়ে আমাদেরকে ঝামেলা কিংবা পাওয়ার জন্য জোরাজুরি করতো না।

পড়াশোনার প্রতি ছিল তার যথেষ্ট আগ্রহ। তার এই আগ্রহ দেখে আমি এবং তার বাবা সিদ্ধান্ত নিই তাকে হাফেজ বানাবো। পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত গোড়ান নাজমুল হক সিনিয়র মাদ্রাসা থেকে পড়ার পর হেফজখানায় আমরা তাকে ভর্তি করিয়ে দিই। হেফজ শেষ করে তামিরুল মিল্লাত মাদ্রাসায় সপ্তম শ্রেণিতে ভর্তি হয়। এখান থেকে দাখিলে ১১তম স্থান অধিকার করে। মানুষের সাথে সে খুব সহজেই মিশে যেত। হাসি এবং গল্পের মাধ্যমে যেকোন আসরকে প্রাণবন্ত করতে শিপনের জুরি ছিল না। মানুষের যেকোন বিপদ কিংবা সমস্যা সমাধানে সে দ্রুত সাড়া দিত। যেমন এক ছেলের অ্যাপেন্ডিসাইটিসের ব্যথা উঠলে তাকে ঢাকা মেডিক্যালে ভর্তির পর দেখা গেল তার ওষুধের টাকা নেই। সে তার নিজের পকেটের টাকা দিয়ে ঐ ছেলের ওষুধ কিনে দেয় এবং সারারাত তার বিছানার পাশে থেকে শুশ্রূষা প্রদান করে ভোরে পায়ে হেঁটে বাসায় ফিরে। এলাকার এক বৃদ্ধ লোকের কাছ থেকে ছিনতাইকারীরা টাকা পয়সা ছিনিয়ে নিলে ঐ লোকটিকে ৩০ টাকা রিকশা ভাড়া দিয়ে তার নির্দিষ্ট ঠিকানায় পৌঁছে দেয়। এলাকায় সে এতই ভাল হিসেবে পরিচিত ছিল যে, ৪ বছর যাবৎ মহিলাদের মাঝে সে তারাবির ইমামতি করেছিল এবং মসজিদে তারাবি পড়িয়েছে এক বছর। সরকারি বিজ্ঞান কলেজে অর্থ সম্পাদকের দায়িত্ব পালনকালে তার আচরণে মুগ্ধ হয়ে হিন্দু ছেলেরা পর্যন্ত বায়তুলমালে অর্থ প্রদানের আগ্রহ প্রকাশ করত।

www.pathagar.com

শহীদ হওয়ার আগের বছর ২০০৫ সালে গোড়ানের এক বাড়িতে তারাবির ইমামতি করে।

শিপন এলাকার অনেক ছেলেকে কুরআন শরিফ পড়তে শিখিয়েছে। এলাকার এক ছেলের মা একদিন আফসোস করে বলছিলেন, শিপন বলেছিল আমার ছেলেকে কুরআন শেখাবে। সেও রাজি হয়েছিল; কিন্তু তাকে এখনও কুরআন শেখাতে পারিনি।

যে গরিব ছেলেদের বাবা টাকা দিতে পারত না তাদেরকে সে টাকা ছাড়াই পড়াতো। এলাকার ছেলেরা খারাপ হয়ে যাচ্ছে তাদেরকে ভাল করতে হবে এই চিন্তায় সে সারাক্ষণ ব্যস্ত ছিল। সে সবাইকে মসজিদে নামাজ এবং কুরআনের আলোকে জীবন গড়ার তাগিদ দিতে ব্যতিক্রম আয়োজনের মাধ্যমে তাদেরকে দাওয়াত পৌঁছাতো। যেমন– ব্যায়াম, ফুটবল, ক্রিকেট টুর্নামেন্টের আয়োজন। ফজরের নামাজের সময় ছেলেদেরকে নামাজের জন্য ডাকতো। ভোরে যেন কেউ না ঘুমায় সে জন্য শহীদ মাসুম তাদেরকে সাথে নিয়ে মাঠে খেলতে যেতো।

বাসায় ওর কারণে কেউই মুখ ভার করে রাখতে পারত না। সে থাকা অবস্থায় তাকে অবশ্যই কথা বলতে হবে বা হাসতে হবে। কারণ তার একটি অভ্যাস ছিল কৌতুকের মাধ্যমে সবাইকে আনন্দ দেয়া। এই জিনিসটা আমার কাছে খুব ভাল লাগতো। সে আমাকে কাছে ডেকে বসে বলতো, আমার কথা এখন শুনেন না, এমনও দিন আসবে কেউ আপনাকে ডাকবে না।

এলাকায় ছাত্রদের মাঝে দাওয়াতি কাজের কারণে এলাকার প্রভাবশালী কিছু ব্যক্তি তার প্রচণ্ড বিরোধিতা করে এবং তাকে হুমকি প্রদান করলেও সে তাদেরকে ইফতারের দাওয়াতের মাধ্যমে তাদের সাথে সম্পর্ক তৈরির চেষ্টা করেছে। তারা দাওয়াতে সাড়া না দেয়ায় খোঁজ নিয়েছে কেন তারা এল না। এভাবে আল্লাহ্ তাকে সবার মাঝে একটি সুন্দর মানুষ হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠা করে নিষ্পাপ হিসেবে তার দরবারে নিয়েছেন।

শহীদ হওয়ার কয়েকদিন আগে এক গরিব ছেলেকে ঈদের পাঞ্জাবি এবং তার বাড়িতে সেমাই চিনি পাঠায় সে। এক অসুস্থ রোগীকে রক্ত দিয়ে সে অনেক দুর্বল হয়ে পড়ে, তার পরও আমি বললাম, তুমি রক্ত দিলে কিন্তু তোমার শরীর তো দুর্বল। সে বলল, আপনি যেমন আমার মা, আমার জন্য আপনার যেমন কষ্ট লাগে, তারও তো এরকম কষ্ট লাগে। রক্তের কারণে যদি সে বেঁচে যায় তবুও তো ভালো। নিজে রক্ত দেয়ার পাশাপাশি অন্যকেও উৎসাহী করত রক্ত দেয়ার ক্ষেত্রে।

www.pathagar.com

আজ আমার একটাই প্রত্যাশা- শিপন যে রকম কৌশলে দ্বীনের দাওয়াত দিত, সবাই যেন সে রকম কৌশলে এবং মানুষের উপকারের মাধ্যমে দ্বীনের দাওয়াত সকলের কাছে পৌঁছায়। আর আমার শিপনকে যেরকম নিষ্ঠুর ও নির্মমভাবে নির্যাতনের মাধ্যমে শহীদ করা হয়েছে আমার ছেলে কুরআনে হাফেজকে তারা খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তার দাঁত পর্যন্ত শহীদ করেছে- তাই আমি এই হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই এবং ভবিষ্যতে আর কোনো মায়ের বুক যেন এভাবে খালি না হয় এবং কোন সন্তানকে যেন এভাবে না মারা হয়।

শহীদ রফিকুল ইসলাম-এর মায়ের অনুভূতি
"আমি শহীদের গর্বিত মা"

আমার তিন ছেলে ও দুই মেয়ের মধ্যে সবার বড় মো: রফিকুল ইসলাম। আমার বড় বোনের কোন সন্তান না থাকায় আমাদের পরিবারে তাকে নিয়ে সবাই ব্যস্ত থাকত। এমনকি রফিকুলের বয়স যখন ২ বছরের একটু বেশি, তখনও সে মায়ের দুধ ছাড়েনি, সে বয়সেই তার নানা ও তার খালা তাকে নিয়ে যান এবং আদর যত্নে নিজেদের কাছে রেখে দেয়। এর পর আমার কোলজুড়ে আসে দ্বিতীয় ছেলে ওহাব। এভাবেই সময়ের ব্যবধানে খালার কোলেই বড় হতে থাকে রফিকুল। স্বামী ও সন্তানহীনা তার খালা তাকে নিয়ে বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখতে থাকেন। আর রফিকুল তার নানা-নানী এবং খালার আদরে থাকতেই পছন্দ করত; কিন্তু এ আদর বেশিদিন তার কপালে ছিল না। মাত্র ৫ বছর বয়সে তার নানী ও ৭ বছর বয়সে নানা ইন্তেকাল করেন। এর পর খালার বাসায় থেকেই তার স্কুলজীবন শুরু হয়। তারপর সে মাঝে মাঝে আমাদের কাছে এসে থাকত আর চলে যেত। রফিকুল যখন দশম শ্রেণির ছাত্র তখন থেকেই আমরা জানতে পারি সে ইসলামী ছাত্রশিবিরের সাথে জড়িত হয়েছে। শিবির করার পর থেকেই তার মাঝে আমরা অনেক পরিবর্তন দেখতে পাই। কিছু দিনের জন্য বাড়িতে এলেই আমাকে সে সময় দিত, নামাজ পড়তে বলত, গ্রামের মানুষ ঝগড়া করলে সে আমাদের সেখান থেকে দূরে থাকতে বলত। অভাবের সংসারে তার ছোট ভাই ওহাবকে তখন আমরা ঢাকায় সোয়েটার কোম্পানিতে পাঠিয়ে দিই। এদিকে আমার বড় বোন রফিকুলকে পড়াশোনা করাতে থাকে। ২০০৬ সালের ২৮ অক্টোবর। ঈদের ছুটিতে আমার বোন ও দুই ছেলেকে কাছে পেয়ে খুবই খুশিতে ছিলাম। আমরা জানতাম না যে, সেই দিন কুড়িগ্রাম শহরে মিছিল আছে। আমরা সবাই সেদিন বাড়ির পাশে জমিতে কাজ করছিলাম। কিন্তু এর মধ্যে রফিকের মাঝে একটু তাড়াহুড়া লক্ষ্য করলাম। সে বাড়িতে এসে বলল আমাকে এক্ষুণি খালার বাড়িতে যেতে হবে আমাকে ভাত দাও। আমরা জানতাম না সে কিসের জন্য এত তাড়াহুড়া করছে? আমি তাকে ভাত খেতে দিলাম তার

www.pathagar.com

ধরে আনা মাছ, পছন্দের হাঁসের গোশত ও ডাল দিয়ে। আমি আর তার খালা দু'জনে পাশে বসে তাকে খেতে দিলাম। সে সেদিন অনেক ভাত খেয়েছিল। সে খেতে খেতে তার খালাকে বলল- দেখছো আম্মা কত সুন্দর করে মাছ ভাজতে পারে? আর ডালটাও কত সুন্দর? কে জানতো, সেটাই তার জীবনের শেষ খাবার? খাওয়া শেষ করে রফিকুল যখন চলে যাচ্ছে তখন ওর খালা ও আমি বাড়ি থেকে অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এলাম। আমরা হয়তো আরো যেতাম; কিন্তু তার বাধায় আর যাইনি। কিন্তু যতক্ষণ সে চোখের আড়াল হয়নি ততক্ষণ আমরা দুই বোন তার দিকে তাকিয়েছিলাম। আর দেখলাম সে কিছু দূর যাচ্ছে আর পেছনে ফিরে আমাদের দেখছে। কে জানত যে, সেটাই তার শেষ দেখা? কে জানত যে, সেটাই তার শেষ বিদায় মুহূর্ত। আমি জানি না কেন তাকে বিদায় দেয়ার পর থেকে আমার আর ভালো লাগছিলো না। আর জানতাম না কেনই বা একটা কাক গাছের ডালে বসে শুধু চিৎকার করছিলো। আর যখন বুঝতে পারলাম আমার কলিজার টুকরা রফিকুল আর নেই, তারপরের স্মৃতিগুলো প্রকাশ করার মতো ভাষা আমার নেই। কিভাবেই বা তা বর্ণ অক্ষরে প্রকাশ সম্ভব? আমার ছেলেকে হারানোর দু-একদিন পর এক রাতে ঘুমের মাঝে আমার ছেলে আমার সাথে দেখা করতে এলো। আমি তার সাথে কথা বললাম। আমি বললাম 'তুই না মরে গেছিস?' সে বলল- 'আম্মা, এ কথা আর কক্ষণো তুমি বলবে না। আমি মরে যাইনি, আমি শহীদ হয়েছি।' হ্যাঁ সে ইসলামের জন্যই শহীদ হয়েছে, আর আমি তার গর্বিত মা। রফিকুলের শাহাদাতের প্রায় এক মাস পর একদিন রাতে আমি এশার নামাজ না পরেই ঘুমিয়ে যাই। হঠাৎ দেখি রফিকুল একটা লাঠি হাতে বাড়িতে এসেছে। আর আমাকে বলছে আম্মা তুমি নামাজ পরেছো? আমি বললাম না। তখন সে চলে গেল। তাকে আর খুঁজে পেলাম না। এভাবে আমার সন্তান আমাকে আল্লাহর কাছে চলে যেয়েও আমাকে নামাজের খোঁজ নিয়েছিলো। রফিকুলের শাহাদাতের পর শিবিরের ছেলেরা এসে আম্মা আম্মা বলে ডাকে; কিন্তু রফিকুল তো একদিনও আমাকে ডাকে না। আমি জানি রফিকুল আর আসবে না। আমাকে আম্মা বলেও ডাকবে না। তাই শিবিরের ছেলেদের মাঝেই খুঁজে নেয়ার চেষ্টা করি আমার রফিকুলকে। আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ- আমার ছেলে যেন শাহাদাতের সর্বোচ্চ মর্যাদা লাভ করে। আমার ছেলের কোন অপরাধ ছিল না। সে এলাকার ছেলেদের কুরআন শেখাতো, নামাজ পড়াতো। এতো সুন্দর সোনার টুকরো ছেলেকে যে আওয়ামী হায়েনারা আঘাতের পর আঘাতে আমার বুক খালি করিয়েছে আমি তাদের বিচারের অপেক্ষায় আছি। যদি দুনিয়ায় দেখে যেতে নাও পারি তবে অবশ্যবই সবচেয়ে বড় ন্যায়বিচারক মহান আল্লাহর দরবারে বিচার দেখবো ইনশাআল্লাহ। আমিন।

www.pathagar.com

শহীদ আব্দুল মালেক (রহ.)

একজন মানুষ এ ভূবনে স্ব-মহিমায়, জ্ঞানে, ধ্যানে, চিন্তা-চেতনায় কত উজ্জ্বল ভাস্বর হতে পারে শহীদ আব্দুল মালেক তারই এক জ্বলন্ত উদাহরণ হয়ে থাকবে অনাগত পৃথিবীর কাছে। একটি জাতির মেরুদণ্ড হলো শিক্ষা, সেই ইসলামী শিক্ষা আন্দোলনের অগ্রনায়ক, বীর সেনানী শহীদ আব্দুল মালেক। একটি উন্নত নৈতিক চরিত্র সম্পন্ন যুব-ছাত্রসমাজ ছাড়া একটি জাতির এগিয়ে যাওয়া অসম্ভব। এরাই জাতির মূল চালিকা শক্তি। শহীদ আব্দুল মালেক সেটি উপলব্ধি করেছেন বলেই তিনি শিক্ষাব্যবস্থার গোড়াপত্তনের ভিত্তি আবিষ্কার করেছেন, সে লড়াইয়ে বিলিয়ে দিয়েছেন নিজের প্রাণ। এদেশ ঋণী হয়ে থাকবে শহীদ আব্দুল মালেকের আত্মরক্ষার কাছে যুগের পর শতাব্দীর পর শতাব্দী। বিশেষ করে আজকের আধুনিকতার নামে নব্য জাহিলিয়াতের যাঁতাকলে পিষ্ট তরুণ প্রজন্মকে শহীদ আব্দুল মালেক দিয়েছেন এক অনন্য পথের দিশা। তাই আজকের নতুন প্রজন্মের কাছে শহীদ আব্দুল মালেক একটি প্রেরণা, একটি বিশ্বাস, একটি আন্দোলন, একটি ইতিহাস, একটি মাইলস্টোন। শহীদ আব্দুল মালেককে হত্যা করে ইসলামী আদর্শকে স্তব্ধ করা যায়নি। বরং এক মালেকের রক্ত বাংলার ৫৬ হাজার বর্গমাইলের মধ্যে ছড়িয়ে একটি আন্দোলনের জন্ম দিয়েছে। লাখ-কোটি মালেক আজ একই আদর্শের ছায়াতলে সমবেত। সুতরাং শহীদ আব্দুল মালেকের খুনীরা আজ অভিশপ্ত, ঘৃণিত এবং পরাজিত। জাতি তাদের ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছে।

মূলত ইংরেজরা সুকৌশলে চিন্তার বিভ্রান্তি ও বিভাজন সৃষ্টির জন্যই সাধারণ শিক্ষা ও ধর্মীয় শিক্ষা এই দুই ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা চালু করে গিয়েছিল। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়কে মাস্টার এবং ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা মাদরাসা থেকে মোল্লা তৈরির একটি ব্যবস্থা ইংরেজ সরকার প্রবর্তন করেন। লক্ষ্য ছিল জাতির উন্নতি অগ্রগতির মূল স্রোত থেকে মুসলমানদের আলাদা রাখা। অথচ আজাদী লাভের পর পরই প্রয়োজন ছিল দুই বিপরীতধর্মী শিক্ষা ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে একটি বহুমুখী সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা। সরকারি এই ভ্রান্তনীতির কারণেই শিক্ষা সংস্কারের বিষয়টি একটি জাতীয় ইস্যুতে পরিণত হয়। পাকিস্তান আমল থেকেই অনেকগুলো কমিশন গঠিত হয়। এসব শিক্ষা কমিশনের কোনো রিপোর্টে জাতীয় আদর্শ ইসলামের প্রতিফলন ঘটেনি। পক্ষান্তরে সেক্যুলার, নাস্তিক্যবাদী ও ধর্মবিমুখ সমাজতন্ত্রীরা মুসলিম জাতিসত্তার বিলোপ সাধন করে সেক্যুলারিজম বা ধর্মহীনতা চাপিয়ে দেয়ার জন্য সর্বাত্মক পদক্ষেপ গ্রহণ করে। যে ষড়যন্ত্র এখনো অব্যাহত। আজকের মতো সে সময়েও রাম-বাম আর সেক্যুলারিস্ট বুদ্ধিজীবীদের ইসলাম ধর্ম আর মুসলমানদের বিরোধিতা করা

www.pathagar.com

একটি কর্মসূচিতে পরিণত হয়। তা স্পষ্ট হয় ১৯১২ সালের ২ ফেব্রুয়ারি ভারত সরকার ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দিলেন তখন। এই ঘোষণা হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার করে। শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। মুসলমানরা শিক্ষিত হয়ে উঠলে মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াবে, তখন আর তাদের সেবাদাস করে রাখা যাবে না। এই ভয়ে রবীন্দ্রনাথের মতো মনীষী পর্যন্ত এর বিরোধিতা করেন। ১৯১২ সালের ২৮ মার্চ কলকাতায় গড়ের মাঠে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করে তারা সভা করলো। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বয়ং বিশ্বকবি। তার মুসলমান প্রজারা শিক্ষিত হয়ে উঠলে জমিদারের শাসন ও শোষণ চালানো হয়ত বাধাগ্রস্ত হবে, এই ভয়ে তিনি চাননি মুসলমানরা শিক্ষিত হয়ে উঠুক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে হিন্দু সংবাদপত্রগুলো বিষোদগার করতে থাকে। বাবু গিরীশচন্দ্র ব্যানার্জী, ড. স্যার রাম বিহারী ঘোষ এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর স্যার আশুতোশ মুখার্জীর নেতৃত্বে বাংলার এলিটগণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে ১৮ বার স্মারকলিপিসহকারে তদানীন্তন ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জের ওপর চাপ সৃষ্টি করেছিলেন। বড়লাটের কাছে এই বলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে যুক্তি প্রদর্শন করলেন যে, পূর্ব বাংলার মুসলমানগণ অধিকাংশই কৃষক। অতএব, বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করলে তাদের কোনো উপকার হবে না। ঢাকার হিন্দুরা পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরোধিতা করতে লাগলেন। 'এ হিস্ট্রি অব ফ্রীডম মুভমেন্ট' গ্রন্থে তারই উল্লেখ আছে।

কিন্তু সকল ষড়যন্ত্র আর বিরোধিতা ছাপিয়ে প্রাচ্যের অক্সফোর্ড এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, আর ইসলামী শিক্ষা আন্দোলনের অগ্রপথিক এখন শহীদ আব্দুল মালেক। সুতরাং শহীদ আব্দুল মালেক আজ একটি সফল আন্দোলনের নাম। একটি প্রেরণার বাতিঘর। যে ঘরে আশ্রয় নেয়া তরুণ-যুবক, বৃদ্ধ-বনিতা সবার উপলব্ধি আর শূন্যতা যেখানে, শহীদ আবদুল মালেক ১৯৬৯ এর ২ আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিপা আয়োজিত মুক্ত আলোচনা সভায় Milton প্রদত্ত শিক্ষার সংজ্ঞাটির বিশ্লেষণ করেছেন ঠিক এভাবেই- Harmonious development of body, mind and soul কখনো কোনো আদর্শের ভিত্তি ছাড়া হতে পারে না।' এই উচ্চারণ এখন জাতীয় শ্লোগানে পরিণত হয়েছে। সেই কালজয়ী শ্বাসত বিধান আল-ইসলাম। সেরা দায়ীর উজ্জ্বল নজির স্থাপন করেছেন শহীদ আব্দুল মালেক। আজকের আধুনিক পৃথিবী এ কথাই প্রমাণ করছে যে মানুষের শান্তির জন্য প্রধান হুমকি অনুন্নয়ন ও দরিদ্রতাই নয় বরং অনৈতিকতাও একটি বড় সমস্যা। Morality, Manner বা Ethics. আর সেই জিনিস মানুষের মধ্যে কেবলমাত্র জাগ্রত করতে পারে ইসলামী শিক্ষা। পশ্চিমারা

www.pathagar.com

তার গগণচুম্বী উন্নতি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দূরতিক্রম্য অগ্রযাত্রা সত্ত্বেও মানবিকতার এক করুণ সঙ্কট (Crisis) মোকাবেলা করছে। Education does not necessary mean mare acquisition of Degrees and Diplomas. It emphasizes he need for acquisition of knowledge to life a worthy life. শিক্ষার উদ্দেশ্য শুধুমাত্র কিছু ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা অর্জন নয় বরং সম্মানজক জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন।'

আমরা শিক্ষাব্যবস্থাকে ধর্ম ও নৈতিকতাবিহীন একটি কারখানায় পরিণত করেছি। ধর্মবোধ তথা স্রষ্টার প্রতি আনুগত্যই মানুষকে দায়িত্ববোধ সম্পন্ন, কর্তব্যনিষ্ঠ, ন্যায়পরায়ণ, সৎকর্মশীল, জবাবদিহিতা ও বিনয়ী হতে শেখায়। বিখ্যাত মনীষী Sir Stanely Hull-এর মতে, 'If you teach your children three 'R' : Reading, Writing and Arithmetic and leave the fourth 'R' : Religion, then you will get a fifth 'R' : Rascality.' অর্থাৎ 'যদি আপনি আপনার শিশুকে শুধু তিনটি 'R' (Reading, Writing, Arithmetic) তথা পঠন, লিখন ও গণিতই শেখান কিন্তু চতুর্থ 'R' (Religion) তথা ধর্ম না শেখান তাহলে এর মাধ্যমে আপনি একটি পঞ্চম 'R' (Rascality) তথা নিরেট অপদার্থই পাবেন।

আলবার্ট সিজার তার Teaching of Reference of or Life গ্রন্থে শিক্ষা সংক্রান্ত আলোচনা রাখতে গিয়ে বলেছেন, 'Three kinds of progress are significant. These are progress in knowledge and technology, progress in socialization of man and progress in spirituality. The last one is the most important'. তার ভাষায় 'আধ্যাত্মিকতার বিকাশই হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।' তাহলে আমরা সামগ্রিকভাবে বলতে পারি যে, শিক্ষার ল্য হচ্ছে আমাদের আত্মার বিকাশ, আধ্যাত্মিকতার বিকাশ, মানসিক বিকাশ। শিক্ষা মানুষকে মনুষ্যত্ব দান করে, মানুষ হিসেবে গড়ে তোলে, চরম সভ্যতায় উন্নীত করে, পরম আলোকে পৌঁছে দেয়। শহীদ মালেক সেদিন ক্ষুরধার তথ্য ও যুক্তিপূর্ণ উপায়ে ইসলামী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেছেন।

মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেছেন,"মানুষ কি মনে করেছে, আমরা ঈমান এনেছি এ কথা বললেই তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে আর তাদের পরীক্ষা করা হবে না?" আব্দুল মালেক শহীদ তাঁর জীবনের প্রতিটি পরতে পরতে সেই পরীক্ষাই দিয়ে গেছেন। সারাটা জীবন কষ্ট করেছেন। আর্থিকভাবে খুবই অসচ্ছল একটি সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে বগুড়া জেলায় এই ক্ষণজন্মা নক্ষত্র আবির্ভূত হয়েছিল। জীবন-যাপনের অতি প্রয়োজনীয় উপকরণ থেকেও তিনি ছিলেন বঞ্চিত। কিন্তু তিনি ছিলেন মোহমুক্ত। সেই কচি বয়সে

www.pathagar.com

তাঁর মায়ের কোলে থাকার পরিবর্তে তিনি বাড়ি থেকে অনেক দূরে লজিং থেকেছেন। দীর্ঘ পথ পায়ে হেঁটে আর সাতরিয়ে স্কুলে যেতে হয়েছে তাকে। ক্ষুধার যন্ত্রণা, অমানুষিক পরিশ্রম কিংবা দুঃখ-কষ্টের দিনযাপন কোনো কিছুই পিচ্ছিল করতে পারেনি তাঁর চলার পথ। "অহংকার হচ্ছে আল্লাহর চাদর" প্রিয়নবী ﷺ-এর এই হাদীসের বাস্তব উদাহরণ ছিলেন শহীদ আব্দুল মালেক। তাঁর বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রেষ্ঠত্ব সত্ত্বেও মনের দিক থেকে ছিলেন একেবারেই নিরহঙ্কার। এসএসসি, ও এইচএসসিতে মেধা তালিকায় স্থান আর ঢাবি সেরা ছাত্রের পোশাক বলতে ছিল একটি কমদামী সাদা পাজামা ও পাঞ্জাবী যাতে ইস্ত্রির দাগ কেউ কখনো দেখেছে বলে জানা যায় না। শহীদ আব্দুল মালেক প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতেন তাঁর কর্মীদের। সে ভালোবাসা ছিল নিখাদ নিঃস্বার্থ। জনাব ইবনে মাসুম লিখেছেন "তিনি ছিলেন তাদের দুঃখ-বেদনার সাথী। তাঁর এই আন্তরিকতার জন্য অনেক কর্মীর কাছে তিনি ছিলেন অভিভাবকের মতো। কর্মীর যোগ্যতাকে সামনে রেখে উপদেশ দিতেন, অনুপ্রেরণা যোগাতেন প্রতিভা বিকাশে। ভাবতে অবাক লাগে, প্রতিটি কর্মী সম্পর্কে তিনি নোট রাখতেন। প্রতিটি কর্মীর ব্যাপারে নিজের ধারণা লেখা থাকতো তাঁর ডাইরিতে। এমনিভাবে ভাবতেন তিনি কর্মীদের নিয়ে। ফলে কর্মীদের কাছে তিনি ছিলেন প্রিয় মালেক ভাই, একজন অভিভাবক, একজন নেতা।" মালেক ভাই হয়ত ক্লাস করছেন, সময় পেলে পড়ছেন। এরপর আন্দোলনের কাজের জন্য বিভিন্ন জায়গায় ছুটে চলছেন। রাতে হয়তো পোস্টারও লাগাচ্ছেন কর্মীদের সাথে। আবার অনেক সময় পোস্টার লাগাবার পর অন্যান্যদের কাজ শেষ করার পূর্ব পর্যন্ত একটু সময় পেতেন, তখন সিঁড়িতে ঠেস দিয়ে অথবা পীচঢালা নির্জন পথে একটু বসে বিশ্রাম নিতেন।" নূর মুহাম্মদ মল্লিক লিখেছেন,- "সারাদিন কাজ করে রাতের বেলায় তাঁর নিজের হাতে কান্ত শরীরে সেই একমাত্র পাজামা পাঞ্জাবী ধোয়া রুটিন কাজের কথা। কোনো এক রাতে সেটি ধোয়া সম্ভব হয়নি বলে সকালে ধোয়া পাঞ্জাবী আধা ভেজা অবস্থায় গায়ে জড়িয়ে মালেক ভাই গিয়েছিলেন মজলিসে শূরার বৈঠকে যোগ দিতে। মালেক ভাইয়ের পোশাক যেমন সাধাসিধে ছিল, দিলটাও তেমন সাধাসিধে শুভ্র মুক্তার মত ছিল। প্রাণখোলা ব্যবহার তাঁর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।" প্রতিকূল পরিবেশকে নিজের অনুকূলে নিয়ে আসা নেতৃত্বের যোগ্যতার অন্যতম উপাদান। আর প্রতিকূলতাকে জয় করার নামই তো আন্দোলন। এই কাজের জন্য চাই অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব। শহীদ আব্দুল মালেক ছিলেন তার জীবন্ত ইতিহাস। তার অসাধারণ কর্মকাণ্ডের তুলনা যেন তিনি নিজেই।

www.pathagar.com

ভাষা সৈনিক অধ্যাপক গোলাম আযম লিখেছেন- "শহীদ আব্দুল মালেক তরুণ বয়সেই এমন এক উজ্জ্বল নজির রেখে গেছেন যা এদেশে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদেরকে চিরদিন প্রেরণা যোগাবে। এতগুলো গুণ একজন ছাত্রের মধ্যে এক সাথে থাকা অত্যন্ত বিরল। একজন মেধাবী ছাত্র হিসেবে শিক্ষক ও ছাত্রমহলে তার সুখ্যাতি সত্ত্বেও তার নিকট ছাত্রজীবন থেকে আন্দোলনের জীবনই বেশি প্রিয় ছিল। যথাসম্ভব নিয়মিত ক্লাসে হাজির হওয়াই যেন তার জন্য যথেষ্ট ছিল। পরীক্ষায় ভাল করার জন্য তার মধ্যে কোনো ব্যস্ততা ছিল না। ওটা যেন অতি সহজ ব্যাপার ছিল। ক্লাসের বাইরে তাঁকে ইসলামী আন্দোলন ছাড়া অন্য কোনো চিন্তাধারা বা আলাপ-আলোচনা করতে বড় একটা দেখা যেত না। তার সহপাঠী ও সহকর্মীরা তাকে পরীক্ষায় খুব ভাল ফল করার দিকে মনোযোগী হওয়ার পরামর্শ দিলে মৃদু হেসে বলতেন, বেঁচে থাকার প্রয়োজনে ডিগ্রি নিতে হবে যাতে আয়-রোজগারের একটা পথ হয়। কিন্তু ওটাকে জীবনের চরম লক্ষ্য বানিয়ে নিতে চাই না। খুব ভাল রেজাল্টের ধান্ধা করলে ক্যারিয়ার গড়ে তুলবার নেশায় পেয়ে বসবার আশঙ্কা আছে। আব্দুল মালেকের শাহাদাত আর পরবর্তী শাহাদাতের তুলনা করলে এটাই দেখি একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির শাহাদাতের ফলে যে ধরনের প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, ঐ ধরনের প্রতিক্রিয়া পরবর্তীদের ক্ষেত্রে হয়নি। আন্দোলন যখন শক্তি সঞ্চয় করেছে মাত্র তখন একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির শাহাদাত আন্দোলনের শক্তি বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছিল।" আর আজকের এ সময়ে শহীদ আবদুল কাদের মোল্লার শাহাদাত বিশ্বমুসলিম উম্মাহর প্রেরণার উচ্চতর মিনার রচনা করতে সক্ষম হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ।

১৯৬৯ সালে ইসলামী ছাত্রসংঘের এ সাংগঠনিক ক্রান্তিকালে শহীদ আব্দুল মালেকের ভূমিকা সম্পর্কে জনাব মতিউর রহমান নিজামী বলেন, "দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের সবাই স্বীকার করেছেন, ব্যাপারটা আমাদের সাংগঠনিক শৃঙ্খলার সম্পূর্ণ পরিপন্থি। কিন্তু একে স্থায়ীভাবে প্রতিহত করার জন্য কোনো পদক্ষেপ নিতে কেউই সাহস পাচ্ছে না। আমার কাছে ব্যাপারটা অত্যন্ত পরিষ্কার ছিল। ঢাকা এবং পূর্ব-পাক সংগঠনের নেতৃত্বকে দুর্বল এবং অসহায় মনে করে সংগঠনকে ক্ষতিগ্রস্ত করার মানসে কিছুসংখ্যক অ-কর্মী কর্মী সেজে এ অপচেষ্টা চালাচ্ছে। বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিয়ে এগুলো দমন করার জন্য যখন দায়িত্বশীল কর্মীদের রাজী করাতে পারিনি, তখন দায়িত্ব ছেড়ে সরে পড়ার মনোভাব আমার প্রবল হয়েছিল। 'আমার হাতে সংগঠন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আগে আমি সরে পড়ি, তারপর যাদের ওপর দায়িত্ব আসবে তারা পারলে সংগঠনকে বাঁচাবে নতুবা নিজেরাই দায়ী হবে' এমন বাজে চিন্তা আমার মধ্যে একাধিকবার এসেছে। সংগঠন জীবনে এ ছিল আমার সবচেয়ে দুর্বল মুহূর্ত। আব্দুল মালেকের একক

www.pathagar.com

হস্তক্ষেপে সেদিন দরবেশী কায়দায় এহেন শয়তানী ওয়াসওয়াসা থেকে আমি রক্ষা পেয়েছিলাম।”

শহীদ আব্দুল মালেক ছিলেন একটি চলমান ইনসাইক্লোপিডিয়া। তিনি মনে করতেন জানতে হলে প্রচুর অধ্যয়নের কোনো বিকল্প নেই। শহীদ আব্দুল মালেক এ বিষয়ে আমাদের সকলের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ। আন্দোলনী কর্মকাণ্ডের শত ব্যস্ততা মালেক ভাইয়ের জ্ঞানার্জনের পথে কোনো বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। এমনকি আর্থিক সঙ্কট সত্ত্বেও তিনি নাশতার পয়সা বাঁচিয়ে বই কিনতেন, সংগঠনের এয়ানত দিতেন। অথচ তাঁর রেখে যাওয়া এই দেশের ইসলামী আন্দোলনের অধিকাংশ নেতা-কর্মীই এক্ষেত্রে দুঃখজনকভাবে পিছিয়ে আছেন। শ্রদ্ধেয় কৃতী শিক্ষাবিদ ড. কাজী দীন মুহাম্মদ-এর স্মৃতিচারণ থেকে আমরা জানতে পারি, শত ব্যস্ততার মাঝেও জ্ঞানপিপাসু আব্দুল মালেক দীন মুহম্মদ স্যারের কাছে মাঝে-মধ্যেই ছুটে যেতেন জ্ঞানের অন্বেষায়। ইসলামী আন্দোলন করতে হলে নানা বিষয়ে জ্ঞান থাকতে হয়। কুরআন, হাদীস, অর্থনীতি, রাজনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, ব্যাংকিং-বীমা, সমাজনীতি, বিচারব্যবস্থা, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ইত্যাদি মরহুম আব্বাস আলী খান এ প্রসঙ্গে এক স্মৃতিচারণমূলক প্রবন্ধে বলেন : “বিশ্ব পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁর পাকা হাতের লেখা পড়তাম মাসিক পৃথিবীতে। বয়স তখন তাঁর উনিশ-বিশ বছর। একেবারে নওজোয়ান। কিন্তু তার লেখার ভাষা ও ভঙ্গী বিশ্ব পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁর তীক্ষ্ণ ও গভীর জ্ঞান তাঁর প্রতি এক আকর্ষণ সৃষ্টি করে।” জনাব কামারুজ্জমান লিখেছেন– রাতে ঘুমানোর আগে দেখতাম মালেক ভাই ইংরেজি একটি ম্যাগাজিনের পাতা উল্টাচ্ছেন। আবার কিছু কিছু নোট করছেন। তিনি মাসিক পৃথিবীতে চলমান বিশ্ব পরিস্থিতির ওপর লিখতেন। বুঝলাম সেই লেখার জন্য মালেক ভাই প্রস্তুতি নিচ্ছেন। তখন থেকেই বিদেশী ম্যাগাজিন পড়ার ব্যাপারে আমার মধ্যে আগ্রহের সৃষ্টি হয়। মালেক ভাইয়ের অনেক স্মৃতি আমাদের তাড়িয়ে বেড়ায়।

যুগে-যুগে নবী-রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে আজমাইন, আর সত্যপথের পথিকদের যে কারণে বাতিলরা হত্যা করেছে ঠিক একই কারণে শহীদ আব্দুল মালেক, শহীদ আবদুল কাদের মোল্লা, সাইয়েদ কুতুব আর হাসাল আল-বান্নাকে হত্যা করা হয়েছে। তারা সারা পৃথিবীর মানুষের প্রেরণা। তারা মরেও অমর। তারা এক অনন্য জীবনের সন্ধান পেয়েছে, সেই অনন্ত জীবনের নাম শাহাদাত। চিঠিতে তিনি স্পষ্ট করে সেই নিঃস্বার্থ ও নির্মোহ সিদ্ধান্তের কথাই বলেছেন শহীদ আব্দুল মালেক,“বাইরের পৃথিবীতে যেমন দ্বন্দ্ব চলছে তেমনি আমার মনের মধ্যেও চলছে নিরন্তর সংঘাত। আমার জগতে আমার জীবনে আমি খুঁজে নিতে চাই এক

www.pathagar.com

কঠিন পথ, জীবন-মরণের পথ। মায়ের বন্ধন ছাড়া আমার আর কিছুই নেই। বৃহত্তর কল্যাণের পথে সে বন্ধনকে ছিঁড়তে হবে। কঠিন শপথ নিয়ে আমার পথে আমি চলতে চাই। আশির্বাদ করবেন। সত্য প্রতিষ্ঠার এ সংগ্রামে যেন আমার জীবনকে আমি শহীদ করে দিতে পারি। আমার মা এবং ভাইরা আশা করে আছেন আমি একটা বড় কিছু হতে যাচ্ছি। কিন্তু মিথ্যা সেসব আশা। আমি বড় হতে চাইনে, আমি ছোট থেকেই সার্থকতা পেতে চাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা ছাত্র হয়ে বিলেত ফিরে যদি বাতিলপন্থীদের পিছনে ছুটতে হয় তবে তাতে কি লাভ?

জাতির এই শ্রেষ্ঠ সন্তানের বিদায়ে কেঁদেছে গোটা জাতি। দলমত নির্বিশেষে সবাই এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ ও তীব্র নিন্দা জানিয়েছে। সে সময়ের সংবাদ পত্র তার সাক্ষী। মরহুম শেখ মুজিবুর রহমানসহ সকল জাতীয় নেতারা নিন্দা ও ক্ষোভ জানিয়েছিল। শহীদ আব্দুল মালেকের জানাজার পূর্বে আবেগ-আপ্লুত কণ্ঠে বলেছিল- "শহীদ আব্দুল মালেকের পরিবর্তে আল্লাহ যদি আমাকে শহীদ করতেন তাহলে আমি নিজেকে ধন্য মনে করতাম। শহীদ আব্দুল মালেকের শাহাদাতী তামান্নার তীব্রতা প্রতিধ্বনিত হয়েছে সাবেক লজিং মাস্টার জনাব মহিউদ্দিন সাহেবের কাছে লেখা চিঠির ভাষায়- "জানি, আমার কোনো দুঃসংবাদ শুনলে মা কাঁদবেন। কিন্তু উপায় কি বলুন? বিশ্বের সমস্ত শক্তি আল্লাহর দেয়া জীবন বিধানকে পৃথিবীর বুক থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা করছে। আমরা মুসলমান যুবকরা বেঁচে থাকতে তা হতে পারে না। হয় বাতিলের উৎখাত করে সত্যের প্রতিষ্ঠা করবো, নচেৎ সে চেষ্টায় আমাদের জীবন শেষ হয়ে যাবে। আপনারা আমায় প্রাণভরে আশির্বাদ করুন, জীবনের শেষ রক্তবিন্দু দিয়েও যেন বাতিলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে পারি। কারাগারের নিরন্দ্র অন্ধকার, সরকারি যাঁতাকলের নিষ্পেষণ আর ফাঁসির মঞ্চও যেন আমাকে ভড়কে দিতে না পারে।" শহীদ আব্দুল মালেকের হত্যাকারীদের বিচার এখনো হয়নি। এই দুনিয়ার আদালতে তাদের বিচার না হলেও আল্লাহর আদালত থেকে তারা রেহাই পাবে না এটাই আমাদের বিশ্বাস। শহীদ আব্দুল মালেকের খুনীরা অনেকেই এখন রাষ্ট্রযন্ত্রের অনেক গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় অধিষ্ঠিত। শহীদ আব্দুল মালেকের হত্যার প্রতিশোধ তার উত্তরসূরিরা এই জমিনে কালেমার পতাকা উড্ডীন করার মাধ্যমে গ্রহণ করবে, ইনশাল্লাহ। হে! আরশের মালিক, শহীদ আব্দুল মালেকসহ সকল শহীদদের জান্নাতুল ফেরদাউস দান করুন।

www.pathagar.com

মরহুম অধ্যাপক গোলাম আযম (রহ.)

বিশ্ব ইসলামী আন্দোলনের অন্যতম প্রাণপুরুষ, জামায়াতে ইসলামীর সাবেক আমীর, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামী চিন্তাবিদ, ভাষাসৈনিক ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপকার, মজলুম মানবতার বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর, জননেতা অধ্যাপক গোলাম আযম। আজ তিনি নিজেই একটি ইতিহাস, একটি আন্দোলন, একটি চেতনা আর বিশ্বাসের স্মৃতির মিনার হয়ে আমাদের মাঝে দণ্ডায়মান। অধ্যাপক গোলাম আযম একটি জাগরণ, একটি বলিষ্ঠ নেতৃত্বের নাম। একটি চেতনা ও বিশ্বাসের গগণজোয়ারী কণ্ঠস্বর। মেধা ও নৈতিকতার সমন্বয়ের একটি সম্ভাবনাময় দেশগড়ার চেতনার অগ্রপথিক। বিবিসি বাংলায় বলা হয়, ৯২ বছর বয়স্ক গোলাম আযমের শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ার কারণে ২২ অক্টোবর বুধবার বিকেল থেকেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালের আইসিইউতে ছিলেন তিনি। ২৩ অক্টোবর বৃহস্পতিবার রাত ৯টার পর তাকে লাইফ সাপোর্টে রাখা হয়েছে বলে খবর আসে। রাত ১০টার দিকে তিনি মারা যান বলে জানিয়েছে তার পরিবার। তবে ঘোষণা আসে রাত ১২টার দিকে। বার্তা সংস্থা রয়টার্সের খবরে বলা হয়, সমালোচকরা বলে থাকেন যে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জামায়াতকে লক্ষ্য করে এবং বিরোধী দলকে দুর্বল করতে ট্রাইব্যুনালকে ব্যবহার করছেন। মানবাধিকার সংস্থাগুলো বলেছে, ট্রাইব্যুনালের কার্যক্রম আন্তর্জাতিক মানদণ্ড পূরণে ব্যর্থ হয়েছে। (নয়া দিগন্ত)।

অধ্যাপক গোলাম আযম একজন সৎ, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, খ্যাতিমান অহিংস রাজনৈতিক নেতা, যিনি আন্তর্জাতিকভাবে শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত। তিনি মুসলিম উম্মাহর একজন অভিভাবক। তথাকথিত যুদ্ধাপরাধী বিচারের নামে ৯০ বছর বয়স্ক এ প্রবীণ রাজনীতিবিদকে আমৃত্যু সাজা প্রদান করে আইনের শাসন ও মানবাধিকার প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে দেশে-বিদেশে। সর্বশেষ তাঁর কারাগারে ইন্তিকাল, জানাযায় লাখ লাখ মানুষের উপস্থিতি দেশে-বিদেশে অসংখ্য গায়েবানা জানাযা তাঁর ভক্ত-অনুরক্তদের আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ– সবমিলে এক শক্তিশালী গোলাম আযম আবির্ভূত হয়েছে। মনে হচ্ছে এটি তাঁর বিদায় নয়, পুনর্জন্ম এক গোলাম আযম। এই গোলাম আযম বেঁচে থাকবেন মানুষের মাঝে অনন্তকাল। পৃথিবী যতোদিন থাকবে আল্লাহর দ্বীনের সৈনিকরা তাঁর জন্য দোয়া করতে থাকবেন। তাহাজ্জুদে জায়নামাজ বিছিয়ে আর বায়তুল্লাহর গিলাফ ধরে অনেকেই কাঁদছে তাঁর জন্য। রাষ্ট্রীয় জাঁতাকলে পিষ্ট, দীর্ঘ কারাবরণের মধ্যদিয়ে দেশে-বিদেশে তিনি মানুষের হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছেন। ভাষার জন্য আত্মত্যাগ স্বীকার করেও ভাষার মাসেও তিনি থেকেছেন বন্দী। এটি আমাদের ব্যর্থতা, জাতির জন্য লজ্জাজনক। এটি মানবাধিকারের লঙ্ঘন। বৃদ্ধবয়সে

www.pathagar.com

একাকি নিভৃতে কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ ছিলেন তিনি। জীবনের শেষ সময়গুলো এ জাতি তাঁর শেষ উপদেশ থেকে বঞ্চিত হয়েছে, বঞ্চিত হয়েছে তাঁর পরিবার, তরুণ সমাজ এবং তাঁর ভক্তরা। অসংখ্যবার বাথরুমে পড়ে পায়ের চামড়া উঠে যাওয়া এবং তাঁর কষ্টের খবর কাঁদায় দেশে-বিদেশে অনেক ভক্ত ও অনুরক্তকে। হাজারো ষড়যন্ত্রের মোকাবেলায় তাঁর বয়োবৃদ্ধ সফল সহধর্মিণী এবং গোটা পরিবারের ধৈর্য, প্রজ্ঞা আর হৃদয় নিংড়ানো চৌকস উপস্থাপনা এবং আবেগধর্মী বিবৃতি, লেখনি, সাক্ষাৎকার, অধ্যাপক গোলাম আযমের আদর্শ পরিবার গঠনের দিকটিও চলে এসেছে জাতির সামনে। জানাযার পূর্বে তাঁর প্রিয় সন্তান (অবসরপ্রাপ্ত) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আব্দুলাহিল আমান-আল আযমীর হৃদয়স্পর্শী আবেগপূর্ণ বক্তব্য, দাফন পরবর্তী মোনাজাত অধ্যাপক গোলাম আযমের অনুসারীদের এই ব্যথাতুর সময়েও আশান্বিত করেছে। মনে হচ্ছে যোগ্য পিতার যোগ্য উত্তরসূরি ছায়া-গোলাম আযম আলোর প্রদীপ ছড়াচ্ছেন। আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ, তিনি যেন সন্তানদের তাঁর যোগ্য উত্তরসূরি হিসেবে কবুল করেন।

এই জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের একজন ভাষাসৈনিক অধ্যাপক গোলাম আযম। স্বমহিমায় উদ্ভাসিত একজন মানুষ। নিজ যোগ্যতা বলে তার ঐতিহাসিক স্বাক্ষর তিনি নিজেই। তিনিই তার উপমা। সময়ের সাড়াজাগানো ছাত্রনেতা গোলাম আযম। বিশ্বের অসংখ্য দেশে তাঁর কেয়ারটেকার ফর্মুলা সমাদৃত। তিনি একজন সফল রাষ্ট্রবিজ্ঞানী। তিনি একজন যোগ্য সংগঠক। তিনি নিজে অনেক উত্থান পতনের সাক্ষী। এই মেধাবী, চৌকস ও অভাবনীয় নেতৃত্বের গুণাবলিসম্পন্ন, ক্ষণজন্মা মানুষ ১৯২২ সালে ঢাকার লক্ষ্মীবাজারে নানার বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। ম্যাট্রিক ও ইন্টারমিডিয়েট ঢাকা থেকে পাস করেন তিনি। স্কুল-কলেজের গণ্ডি পেরিয়ে প্রাচ্যের অক্সফোর্ড হিসেবে খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএ এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এমএ পাস করেন।

অধ্যাপক গোলাম আযমের ইন্তিকালের খবর প্রভাবশালী আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় বেশ ফলাও করে প্রচার করা হয়েছে। এসব খবরে তাকে জামায়াতে ইসলামীর আধ্যাত্মিক নেতা হিসেবে অভিহিত করা হয়। এএফপি, এপি ও রয়টার্সের মতো বার্তা সংস্থা, বিবিসি, ভয়েস অব আমেরিকা ও আলজাজিরার মতো টিভি চ্যানেল এবং বিশ্বখ্যাত সংবাদপত্র দি গার্ডিয়ান। গার্ডিয়ানের খবরে বলা হয়, গত বছর তাকে ৯০ বছরের কারাদণ্ড দেয়া হয়েছিল। জামায়াতে ইসলামী দাবি করে, তার বিচার ছিল রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। আলজাজিরার খবরে বলা হয়েছে, বর্তমানে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ আন্তর্জাতিক যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনাল গঠন করেছে এবং প্রধান বিরোধীদল বিএনপি এর বিরোধিতা করেছে। আরব নিউজে

বলা হয়েছে, ১৯৯০ সালে বাংলাদেশে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর তিনি 'কিংমেকারের ভূমিকা' পালন করে বিএনপিকে ক্ষমতায় এনেছিলেন। তবুও তাঁর ইন্তিকালে বিএনপি একটি শোকবাণীও দেয়নি। বিবিসির খবরে বলা হয়, যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনালে তার বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ আনা হয়েছিল, তিনি সেগুলো অস্বীকার করেছিলেন। তার সমর্থকরা মনে করেন, এসব অভিযোগ ছিল রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

অধ্যাপক গোলাম আযমের জানাযা এখন 'টক অব দ্যা ক্যান্ট্রি'। জাতীয় নেতাদের মধ্যে কার জানাযায় এযাবতকালে সর্বোচ্চ সংখ্যক মানুষের সমাগম হয়েছে এবং কার জানাযায় সর্বনিম্ন মানুষের সমাগম হয়েছে এ নিয়ে। 'অধ্যাপক গোলাম আযমের চতুর্থ ছেলে সাবেক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আব্দুলাহিল আমান আল-আযমী পিতার জানাযায় ইমামতি করেন। জানাযার আগে উপস্থিত লাখো মানুষের উদ্দেশে তিনি সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। এ সময় সেখানে আবেগঘন এক পরিবেশের সৃষ্টি হয়। অনেকে কান্নায় ভেঙে পড়েন তখন। আমান আযমী বলেন, পৃথিবীর ক্ষণজন্মা মানুষদের একজন অধ্যাপক গোলাম আযম। আমার পিতাকে মিথ্যা মামলায় এক হাজার ১৬ দিন তালাবন্দি করে রাখা হয়েছে। এর প্রতিটি দিন আমার পিতার জন্য, আমার পরিবারের প্রতিটি সদস্যের জন্য ছিল বেদনার। আমার পিতা সারাজীবন আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করে গেছেন। এটাই ছিল তার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। আপনারা অধ্যাপক গোলাম আযমকে ভালোবাসেন না– আপনারা ভালোবাসেন দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য একনিষ্ঠভাবে নিবেদিত একজন কর্মী গোলাম আযমকে। তার বিদায় মানে ইসলামী আন্দোলনের বিদায় নয়। এদেশে আরও লাখো লাখো গোলাম আযম তৈরি হবে ইনশাআল্লাহ, যারা একদিন এদেশের মাটিতে ইসলামের বিজয় পতাকা ওড়াবে, ইসলামকে বিজয়ী করবে।'

প্রফেসর গোলাম আযম এক জীবন্ত কিংবদন্তি। অধ্যাপক গোলাম আযম বিশ্বব্যাপী উচ্চারিত একটি আওয়াজ। এই সাহসী বীরপুরুষ প্রত্যক্ষভাবে ভাষা আন্দোলনে শরীক হন। রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে হরতাল পালিত হয়। হরতাল সফল করতে অধ্যাপক গোলাম আযম ডাকসুর জিএস হিসেবে ছাত্রদের সংগঠিত করেন। আজ আমরা একবারও কি ভেবে দেখেছি? ভাষা শহীদ আর ভাষা সৈনিকদের আমরা যথাযোগ্য মর্যাদায় ভূষিত করতে পেরেছি? পেরেছি তাদের যথাযথ সম্মান করতে? জীবনের শেষ সময়গুলোতে রাষ্ট্রীয়ভাবে এই ভাষাসৈনিকের ওপর চালানো হয়েছে অমানষিক নির্যাতন। এটি ছিল অমানবিক!! মানবাধিকারের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। বিশ্বের ইতিহাসে সম্ভবত ভাষার জন্য জীবন দেয়ার ইতিহাস আমরাই কায়েম করতে সক্ষম হয়েছি। আবার বিশ্বের ইতিহাসে

www.pathagar.com

সম্ভবত আমরাই প্রথম যারা একজন ভাষাসৈনিককে কারাগারে আবদ্ধ করে রেখেছি আমৃত্যু। ১৯৭৩ সালে তৎকালীন সরকার অন্যায়ভাবে তার জন্মগত নাগরিকত্ব অধিকার হরণ করলেও পরবর্তীতে ১৯৯৪ সালে, সুপ্রিম কোর্টের সর্বসম্মত রায়ে নাগরিক অধিকার ফিরে পান এবং তার বিরুদ্ধে আনীত সকল অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হয়। পরে নতুনকরে সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে আবার সেই একই অভিযোগের অবতারণা করা হয়েছে। স্বাধীন বাংলাদেশে ত্রিশ বছর জামায়াতে ইসলামীর রাজনীতিতে থেকে সর্বশেষ স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণকারী পদের ও ক্ষমতার প্রতি নির্লোভ একজন বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ অধ্যাপক গোলাম আযম। উপমহাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের অনেক স্মরণীয় ঘটনার সাথে সরাসরি জড়িত এ প্রবীণ মজলুম জননেতা ও বিজ্ঞ রাজনীতিবিদ।

জীবনের শেষ সময়েও এ সংগ্রামী নেতা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র আর অপপ্রচারের শিকার হয়েছেন। ষড়যন্ত্রকারীরা মিথ্যার কালো পর্দার আড়ালে তার স্বর্ণোজ্জ্বল অনেক অবদানকে ঢেকে রাখার অপপ্রয়াস চালাচ্ছে নিরন্তনভাবে। বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রফেসর গোলাম আযম সবচেয়ে আলোচিত ব্যক্তিত্ব। ১১ জানুয়ারি ২০১২ কারাগারে যাওয়ার আগে জাতির উদ্দেশে দেয়া বক্তব্যে তিনি বলেন- ১৯৮০'র দশকে এবং ১৯৯০ সালে এরশাদবিরোধী আন্দোলনে এবং ১৯৯৪ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত কেয়ারটেকার সরকারের দাবিতে বিএনপির বিরুদ্ধে আন্দোলনে জামায়াত ও আওয়ামী লীগ যুগপৎ আন্দোলন করেছিল। সকল আন্দোলনকারী দলের লিয়াজোঁ কমিটি একত্রে বৈঠক করে কর্মসূচি ঠিক করতো। তখন তো কোনো দিন আওয়ামী লীগ জামায়াত নেতৃবৃন্দকে যুদ্ধাপরাধী মনে করেনি। ফেব্রুয়ারি ১৯৯১-এর নির্বাচনের পর সরকার গঠনের জন্য আওয়ামী লীগ জামায়াতের সহযোগিতা প্রার্থনা করে আমার নিকট ধরণা দিয়েছিল। আওয়ামী লীগের নেতা আমির হোসেন আমু সাহেব জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল মুজাহিদ সাহেবের মাধ্যমে আমাকে মন্ত্রী বানাবার প্রস্তাবও দিয়েছিলেন। তখনও তো আওয়ামী লীগের মনে হয়নি যে, জামায়াতে ইসলামী যুদ্ধাপরাধী! পরবর্তীতে, আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরী জামায়াতের সমর্থন লাভের আবদার নিয়ে যখন আমার সাথে সাক্ষাৎ করেন, তখনও তো তাদের দৃষ্টিতে জামায়াত নেতৃবৃন্দ 'যুদ্ধাপরাধী' ছিল না। আমি জীবনে চারবার জেলে গিয়েছি। জেল বা মৃত্যুকে আমি ভয় পাই না। আমি আল্লাহ ছাড়া কাউকেই ভয় পাই না। শহীদ হওয়ার জজবা নিয়েই ইসলামী আন্দোলনে শরিক হয়েছি। মিথ্যা মামলায় ফাঁসি দিলে শহীদ হওয়ার মর্যাদা পাবো ইনশাআল্লাহ।' বিশ্বনন্দিত মজলুম নেতার এই সাহসী ও দৃঢ় উচ্চারণ এখন বিশ্ব মুসলিম

www.pathagar.com

উম্মাহর পথের দিশা। আল্লাহ তায়ালা তাকে শাহাদাতের মর্যাদা নসিব করুন। বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লা, অধ্যাপক গোলাম আযমের রাজনৈতিক সেক্রেটারি ছিলেন। দুজনই আল্লাহর কাছে পাড়ি জমিয়েছেন। একে অন্যকে ভালোবাসতেন প্রাণভরে। দুজনের মৃত্যুই হয়েছে বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ১০টার পর। হযরত সহল বিন হানিফ থেকে বর্ণিত হয়েছে। 'রাসূলুলাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি খালেস অন্তঃকরণে আল্লাহর কাছে শাহাদাতের বাসনা করে, সে ব্যক্তি বিছানায় মারা গেলেও আল্লাহ তাকে শহীদের মর্যাদা দেবেন। অধ্যাপক গোলাম আযম সেই মর্যাদায় ভূষিত হবেন ইনশাআল্লাহ।

অধ্যাপক গোলাম আযম কখনও এমপি, মন্ত্রী কিছুই হননি সুযোগ থাকার পরও। ব্যক্তিগত খুঁটিনাটি, চাওয়া-পাওয়া বৃহত্তর স্বার্থে তার ত্যাগ এমন বহু বাস্তবতা এখন দৃশ্যের অন্তরালে। যিনি ক্ষমতায় না থেকেও ক্ষমতাসীন সকলের অপবাদের দায়ভার কাঁধে পড়েছে। যিনি দেশ, জাতি ও মানবতার কল্যাণে সবসময় ভূমিকা রেখেছেন; কিন্তু তার বিনিময়ে সব সরকার থেকে উপহার পেয়েছেন কারাবরণ। বিশ্বজুড়ে তার অসম্ভব খ্যাতি, তাকে নিয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে কৌতূহলের শেষ নেই। তাঁর আত্মনির্মাণ এবং বিকাশের ক্ষেত্রে বেশকিছু চিন্তা হিসেব-নিকেশ ছিল সুদূরপ্রসারী। বিশেষ করে ভারতের আগ্রাসন ও অধিপত্যবাদের ক্ষেত্রে অধ্যাপক গোলাম আযমের ৪২ বছর পূর্বের ভাবনা আজকের সবচেয়ে সত্য ও বাস্তবতা। এখন আমাদের নতুন প্রজন্মকে ভাবিয়ে তুলছে তাঁর জীবদ্দশায়। এ আরেক গোলাম আযম আমাদের মাঝে উপস্থিত। অধ্যাপক আযম দেশে-বিদেশে সমাদৃত ও প্রশংসিত একটি নাম। ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ্য বইয়ে তার ফর্মুলায় অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং রাজনৈতিক চেতনায় সংকীর্ণ শেখ হাসিনার পক্ষে এমন গোলাম আযমকে মানা খুবই অসম্ভব। তার উদ্ভাবন, চিন্তা, আবিষ্কার তাকে টিকিয়ে রাখবে শতাব্দী থেকে শতাব্দী।

ব্যক্তি গোলাম আযম নিজেকে এমনভাবে গঠন করেছেন, তাঁর ব্যক্তিত্ব, নেতৃত্ব, কথাবার্তা, চলন, বলন প্রতিটি ক্ষেত্রেই তিনি ছিলেন প্রিয় নবী রাসূলে করীম ﷺ-এর একনিষ্ঠ অনুসারী। বাইরে এবং ভেতরে মিলিয়ে তিনি নিজেকে গড়ে তুলেছেন একটি প্রতিষ্ঠানরূপে। অধ্যয়ন, অধ্যবসায়, সময়জ্ঞান সবকিছু মিলিয়ে তিনি ছিলেন সত্যিই ব্যতিক্রম। অধ্যাপক গোলাম আযমকে খুব কাছে থেকে যে কয়েকজন তাদেরই একজন তাঁর পার্সোনাল সেক্রেটারি নাজমুল ইসলাম। আবেগআপ্লুত কণ্ঠে তিনি বলেন- বাইরে এবং ভেতরে মিলিয়ে একজন মানুষ কতটুকু স্বচ্ছ, পরিচ্ছন্ন ও সাধামাটা হতে পারেন তাঁর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত অধ্যাপক গোলাম আযম নিজেই। যাকে জামায়াত অফিস থেকে যে খামে করে চিঠি দেয়া হতো, তিনি সেই ইনভিলাপ ফেরত দিয়ে বলতেন, নাজমুল এটি ফেরত দিও

এটা জামায়াত অফিসের সম্পদ। গোলাম আযম সাহেব সামান্য অদূরে তাঁর কোনো নিকটাত্মীয়ের বাসায় সংগঠনের গাড়ি নিয়ে গেলে এসে বলতেন যে, গাড়ির তেলের টাকা আমি দিব কারণ এটা আমার ব্যক্তিগত কাজ। জনশক্তির জন্য তিনি ছিলেন একজন অভিভাবক, একজন শিক্ষক এবং একজন উত্তম দায়ী। ব্যক্তিগত রিপোর্ট পর্যালোচনায় তিনি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতেন ফজরের নামাজ জামায়াতে আদায় করাকে। আর ফজরের আগে কুরআন-হাদিস অধ্যয়নের প্রতি। তিনি বলতেন যে, ফজরের নামাজ যে জামায়াতে আদায় করতে পারে না সে আল্লাহর দ্বীনের মুজাহিদ হবে কিভাবে?

অধ্যাপক গোলাম আযম নাগরিকত্ব পাওয়ার পর দেশব্যাপী সফরের অংশ হিসেবে লক্ষ্মীপুরের জনসভায় তাঁর আগমনকে কেন্দ্র করে বিরাট এক উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। তাঁর আগমনে প্রতিরোধের ঘোষণাও আসে আওয়ামী-বামদের পক্ষ থেকে। ঐ জনসভার স্বেচ্ছাসেবক হওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। সারারাত জাগ্রত থাকার পর ফজরের নামাজের জামায়াতে দেখি অধ্যাপক গোলাম আযম ফজরের জামায়াতে নিজেই উপস্থিত। মসজিদেই শৃঙ্খলা বিভাগের কর্মীদের উদ্দেশে তিনি কথা বলবেন বলে ঘোষণা দেয়া হলো। নামাজ শেষে তিনি এসে আসন গ্রহণ করলেন। আমার সেদিন মনে আছে তাঁকে প্রথম দেখায় তাঁর সুন্দর চাকচিক্যময় উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো হাসিপূর্ণ সালামের জবাব মুহূর্তের মধ্যেই আমাদের সকল ক্লান্তি-বেদনা দূরীভূত হয়ে গেল। একজন নেতার চাহনি, মুখের ভাষা, হাস্যোজ্জ্বল চেহারা কর্মীদের কিভাবে উদ্দীপ্ত করতে পারে স্যারকে প্রথম দেখা সেই থেকে বুঝেছি। এ যেন মনে হচ্ছে এক যাদুর আকর্ষণ। বাইরে থেকে অনেকেই তাঁকে দেখতে পারছিলো না। অনেকেই উঁকি দিয়ে দেখার চেষ্টা করছে। তখন তিনি হেসে উঠে বললেন, আমার চেয়ারটি এমন জায়গায় রাখ যেন সবাই আমাকে দেখতে পায়। কারণ সকল শ্রোতাই বক্তাকে দেখতে চায়। এজন্যই মানুষ রেডিওর ভেতরের ব্যক্তিকে দেখা যায় না জেনেও রেডিওর দিকে তাকিয়ে থাকে। সে তরুণ বয়সের প্রথম দেখা অধ্যাপক গোলাম আযম। গোলাম আযমের চারিত্রিক যাদুর প্রভাবে সেদিন যে আকৃষ্ট হয়েছিলাম, সর্বশেষ তাঁর একান্ত খাস কামরায় স্ট্যাডি সার্কেলের একজন নগণ্য ডেলিগেট হিসেবে আজ নিজেকে সবচেয়ে বেশি ধন্য মনে হয়।

২৮ অক্টোবরে শহীদ মুজাহিদুল ইসলামের নানা বীর মুক্তিযোদ্ধা মনসুর আহমদ জামায়াতে ইসলামীর প্রচণ্ড বিরোধী ছিলেন। নানা আমাদের বলতেন, আমি কিন্তু গোলাম আযমের জালে আটকা পড়া জামায়াত কর্মী। পরবর্তীতে নানা রুকন হয়েছেন। তিনি বলতেন– গোলাম আযমের প্রতি আমার ক্ষোভের কারণ হলো, আমার দুই ভাই মুক্তিযুদ্ধে শাহাদাতবরণ করেছেন। আমি একদিন শুক্রবার

www.pathagar.com

জুমার নামাজ আদায় করতে মগবাজার কাজী অফিস মসজিদে যাই। টার্গেট গোলাম আযমকে দেখা, যিনি এত মানুষ খুন করেছেন বলে একশ্রেণির লোক প্রচারণা চালায় তাকে স্বচক্ষে দেখতে মনে চাইছে! এরপর মসজিদে অধ্যাপক গোলাম আযম যখন খুতবা দিতে দাঁড়ালেন, তখন আমি তাঁর নূরানী চেহারার দিকে তাকিয়ে এক মুহূর্তের মধ্যে বলে ফেললাম এই লোক আর যাই করুক মানবতাবিরোধী অপরাধ করতে পারেন না। তাঁর বিরুদ্ধে যা বলা হচ্ছে তা কাল্পনিক, ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

অধ্যাপক গোলাম আযম যখন তাঁর লিখিত বক্তব্য দিতে লাগলেন তখন আমি হতবাক হয়ে শুনতে লাগলাম এবং ভাবলাম যে, একজন জেনারেল শিক্ষিত মানুষ কুরআন-হাদীসের ওপর কতটা দক্ষ হলে এভাবে নিজের তৈরি করা লিখিত খুতবা দিতে পারেন? সেখান থেকে আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে আসলাম আমি জামায়াত ইসলামীতে যোগ দেবো। অধ্যাপক গোলাম আযম ছিলেন মানুষ তৈরির কারিগর। তিনি ছিলেন মাওলানা মওদূদীর সাহচার্যে গড়ে ওঠা ইসলামী আন্দোলনের এক উজ্জ্বল প্রদীপ। জামায়াতে ইসলামী, ইসলামী ছাত্রশিবির, মহিলা জামায়াত, ছাত্রীসংস্থার নেতৃত্ব তৈরির জন্য পরিচালনা করতেন স্ট্যাডি সার্কেল। সে সার্কেলের একজন সদস্য হয়ে আজ নিজেকে অনেক সৌভাগ্যবান মনে করি। একান্ত নিভৃতে তাঁর সান্নিধ্যে সাহচার্য এবং স্নেহ-ভালোবাসা আজ আমাদের কাঁদায়। স্ট্যাডি সার্কেলের সেই ছোট কামরায় তাঁর ইন্তিকালের পর প্রায় ৩২ ঘণ্টা আমি কাটিয়েছি। চেয়ারগুলো আগের মতোই পড়ে আছে, লাইব্রেরিটি আগের মতোই সাজানো। সবকিছুই আছে আগের মতোই; কিন্তু সকলের প্রিয় মানুষ অধ্যাপক গোলাম আযম নেই!!

অধ্যাপক গোলাম আযম সত্যিই নেতৃত্বের একটি উঁচু মিনার। জামায়াতের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে একবার ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের অধিবেশনে তিনি সাবেক আমীরে জামায়াত হিসেবে প্রধান অতিথি হয়ে আসলেন। এসেই তিনি আমীরে জামায়াতের চেয়ারটিকে হাত দিয়ে একপাশে রেখে অন্য আরেকটি চেয়ারে বসলেন। বসেই বললেন, জানো এই চেয়ারটিতে বসিনি কেন? কারণ এটি আমীরে জামায়াতের। আনুগত্য হলো যিনি চেয়ারে থাকেন তাঁর। আমি নিজেও এখন তাঁর জনশক্তি। তিনি হেসে-হেসে একথাগুলো বলছেন আর আমরা বিস্ময়করভাবে আনুগত্যের সংজ্ঞা শিখছি। আনুগত্য একেই বলে। এজন্যই হয়ত তিনি আমীরে জামায়াত যেন তাঁর নামাজের জানাযা পড়ান সেই ওসিয়ত করে গেছেন। অধ্যাপক গোলাম আযম স্যারের অনেক স্মৃতিই আজ আমাদের অনেককে কাঁদায়। ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণের পর স্যারের সাথে দেখা করতে কাজী অফিসের তাঁর নিজ বাসভবনে হাজির হয়েছি।

www.pathagar.com

জড়িয়ে ধরে কপালে চুমু খেয়ে বলেছিল এ দায়িত্ব অনেক কঠিন। কারণ এ দায়িত্ব পালন একমাত্র নবী-রাসূল ﷺ-এর পক্ষেই পালন করা সম্ভব। দোয়া করি আল্লাহ যেন তোমাদের এ দায়িত্ব পালন সহজ করে দেন। আরেক বার ২১ ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে আমরা স্যারের জন্য ভাষাসৈনিকের স্বীকৃতি ক্রেস্ট উপহার দিতে গেলে তিনি বললেন, তোমরা তো ভাষাসৈনিক বলছো; কিন্তু রাষ্ট্র তো এটা স্বীকার করে না। আমি আমার জীবনের কোনো কাজে কারো স্বীকৃতি বা উপহারের জন্য করিনি। আমার প্রতিটি কাজের প্রতিদান একমাত্র আল্লাহর কাছে কামনা করি।

প্রিয় পাঠকবৃন্দ, সবমিলিয়ে আজ আমাদের মাঝে এমন এক গোলাম আযম উপস্থিত যার প্রজ্ঞা, লেখনি, চিন্তা, রাজনৈতিক অন্তর্দৃষ্টি, ক্ষমা, মহানুভবতা, নিয়মানুবর্তিতা, ধৈর্য এবং সহনশীলতার মতো যাবতীয় মহৎ গুণাবলির বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মাঝে কালোত্তীর্ণ। নির্যাতিত-নিপীড়িত, নিস্পেষিত জনতার অধিকার এবং মর্যাদাবোধ সম্পর্কে এক আবহ তৈরি করতে যার উদাহরণ নিকট অতীতে বিরল। একবিংশ শতাব্দীর উষালগ্নে মানবাধিকার, গণতন্ত্র, ইসলাম, জাতিগত অধিকার এবং সচেতনতা, পারস্পরিক মর্যাদাবোধ নিয়ে বিশ্ব যখন চরম সংকটের মোকাবিলা করছে, ঠিক তেমনি একটি মুহূর্তে নিজের কর্মমহানুভবতার মাধ্যমে তিনি স্বমহিমায় এখন এক প্রতীকে রূপে-রূপায়িত ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য। বাংলার বুকে লাখ-কোটি মানুষ এখন ইসলামের পতাকাতলে সমবেত। পঞ্চান্ন হাজার বর্গমাইল তার পদচারণায় মুখরিত হয়ে দ্বীন কায়েমের চেতনায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। যারা জীবন দিতে জানে কিন্তু মাথানত করে না এক আল্লাহ ছাড়া কারো কাছে, তারা চিরদিন গোলাম আযমকে মনে রাখবে, চিরদিন ভালোবাসবে, সম্মান করতে থাকবে নিজের গরজে। তার সহজ-সাবলীল উপস্থাপনা, লেখনী, বক্তব্য মানুষকে ইসলামের পথে উজ্জীবিত করবে শতাব্দীর পর শতাব্দী। অনাগত যুবকের জন্য তিনি হবেন নতুন পথের দিশা এবং ঘটবে নব উত্থান। বিশেষ করে তরুণ সমাজকে আকৃষ্ট করেছে তাঁর আদর্শ। বিশ্বের সর্ববৃহৎ ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের গোড়াপত্তন তিনিই করেছেন। তাঁর সন্তানের বক্তব্য ছিল- 'এক গোলাম আযমের বিদায়ের মধ্যে এদেশে হাজারো গোলাম আযমের জন্ম হয়েছে।' সত্যি তাই হবে ইনশাআল্লাহ।

যাকে শ্রদ্ধা পেতে রাষ্ট্রের কোনো আইনের প্রয়োজন পড়বে না, তিনি মানুষের হৃদয়ে থাকবেন শতাব্দীর পর শতাব্দী। অধ্যাপক গোলাম আযমের জানাযায় কারো অনুপস্থিতি আর শোকবাণী দেয়া না দেয়া কিছুই আসে যায় না তাঁর। অধ্যাপক গোলাম আযমের অর্জন করার আর কিছুই নেই। তিনি এই পৃথিবীর সংকীর্ণ ধরা ছেড়ে মহান চিরন্তন জান্নাতের দিকে পাড়ি জমিয়েছেন। আমরা যারা

www.pathagar.com

শোকবাণী-শহীদ মিনার আর জানাযার মতো মর্মস্পর্শী স্থানে উপস্থিতি নিয়ে সংকীর্ণ রাজনীতি করি, তাদেরও চিন্তা করা উচিত। অধ্যাপক আযমের সবচেয়ে বড় সফলতা হচ্ছে বাংলাদেশের বৃহৎ রাজনৈতিক দলগুলো বিভিন্ন সময় তার সহযোগিতা ও পরামর্শ নিয়েছে তার কাছে উপস্থিত হয়ে। অধ্যাপক গোলাম আযমের উদ্ভাবিত কেয়ারটেকার সরকার চালুর বিষয়টি এমন সময় উপযোগী ও যুক্তিপূর্ণ ছিল যে, বাংলাদেশে বড় দুই দলের প্রধান শেখ হাসিনা আর বেগম খালেদা জিয়া রাজপথে আন্দোলন করেছেন বর্তমানেও করছেন। সুতরাং এ জাতির শত অনৈক্যের মাঝে অধ্যাপক গোলাম আযমের দেয়া ফর্মুলা কেয়ারটেকার ইস্যুতে জাতিকে একবার হলেও তিনি ঐক্যবদ্ধ করতে পেরেছেন। হে জাতীয় বীর, আপনাকে বিনম্র সালাম ও অভিনন্দন। এ জাতি আপনার সাথে ইনসাফপূর্ণ আচরণ করতে পারেনি, এজন্য আমাদের ক্ষমা করবেন প্লিজ।

১১ জানুয়ারি ২০১২ আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে হাজির হতে যাওয়ার পূর্বে তিনি দেশবাসীর উদ্দেশে প্রদত্ত একটি বক্তব্যে কয়েকটি লাইন দিয়ে লেখাটির ইতি টানছি। তিনি লিখেছেন- 'আমার দীর্ঘ ৫০ বছরের কর্মজীবনে সারাদেশে ব্যাপক সফর করেছি। জনগণের মধ্যেই বিচরণ করেছি। উন্নত নৈতিক চরিত্রে ভূষিত হওয়ার জন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করেছি। মানবতাবিরোধী যেসব অপরাধের অভিযোগ আমার বিরুদ্ধে তোলা হচ্ছে তা কখনো জনগণ বিশ্বাস করবে না। আমাকে ফাঁসি দিলেও জনগণ আমাকে আল্লাহর সৈনিক হিসেবেই গণ্য করবে ইনশাআল্লাহ। পরিশেষে বলতে চাই, দেশের মানুষের দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের জন্য আমি নিজের সারাজীবন উৎসর্গ করেছি। আত্মপ্রচার বা আত্মপ্রতিষ্ঠা কখনোই চাইনি। এ দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে আমিই একমাত্র কর্মক্ষম থাকা অবস্থায় দলীয় প্রধানের পদ থেকে অবসর নেয়ার মতো নজির সৃষ্টি করেছি। কোনো প্রতিদান বা স্বীকৃতি কারো কাছে কোনোদিন চাইনি; এখনো চাই না। আমার জন্য আমার আল্লাহই যথেষ্ট। তবে আফসোস, দেশ এবং জাতির জন্য যা চেয়েছি তা দেখে যেতে পারবো কিনা। দোয়া করি, আল্লাহ এই দেশকে এবং দেশের মানুষকে হেফাযত করুন, দেশের স্বাধীনতা, অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করুন। আল্লাহ তাআলা দেশের মানুষকে দুনিয়ার কল্যাণ ও আখিরাতের মুক্তি দান করুন। আমীন। আপনাদের নিকট দোয়া চাই। আল্লাহ তাআলা যেন আমার নেক আমলগুলো মেহেরবানী করে কবুল করেন, যাবতীয় গুনাহখাতা মাফ করেন এবং আখিরাতে সাফল্য দান করেন। এবং জান্নাতুল ফেরদাউস নসিব করেন।

www.pathagar.com

শহীদ মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী (রহ.)

মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী ছিলেন বিশ্বনন্দিত ইসলামী আন্দোলনের অন্যতম নেতা, মুসলিম উম্মাহর বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর, আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন বিশিষ্ট ইসলামিক স্কলার, থিংকার, লেখক-গবেষক, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমীর, ও সাবেক একজন সফল মন্ত্রী। তিনি ছিলেন আল্লাহ প্রদত্ত অসংখ্য মেধার একটি প্রস্ফুরণ। অসংখ্য আলেম ও ইসলাম প্রিয় জনগণের রুহানি উস্তাদ ছিলেন মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী। ২০১৫ সালে আমেরিকার বিখ্যাত "দ্যা রয়েল ইসলামিক স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ সেন্টার" প্রকাশিত তালিকায় বিশ্বের ৫০০ জন প্রভাবশালী মুসলিম ব্যক্তির তিনি অন্যতম। মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী ছিলেন ব্যক্তিগত জীবনে অত্যন্ত ভদ্র, মার্জিত, পরিশীলিত, মৃদুভাষী এক অসাধারণ ইসলামী ব্যক্তিত্ব। নরমদিল, অমায়িক ব্যবহার, ও স্বচ্ছ চিন্তার অধিকারী, সরল জীবন-যাপনে অভ্যস্ত এই মানুষটি কখনো কারো সাথে রূঢ় আচরণ করেছেন কিংবা কাউকে সামান্য কোন কটু কথা বলে আঘাত দিয়েছেন এমন কোন নজির নেই। সুদীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছরের রাজনৈতিক জীবনে দেশবাসীর কল্যাণে নিবেদিত মাওলানা নিজামীর ব্যক্তিত্ব দেশবাসীর হৃদয়ে তাদের প্রিয় নেতা স্থান করে নিয়েছে। জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনে মাওলানা নিজামীর বলিষ্ঠ ভূমিকা বাংলাদেশের মর্যাদাকে বহির্বিশ্বের কাছে উজ্জ্বল করেছে। তিনি ছিলেন দূর্নীতিমুক্ত ও ইনাসফভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণের সংগ্রামে অগ্রসেনানী।

একটি জাতির ইতিহাসে কতগুলো দিন থাকে যা বেদনা বিদুর ও কলঙ্কময়। এ দিনগুলো কালো অধ্যায়ে ঢাকা। যা যুগের পর যুগ, শতাব্দীর পর শতাব্দী জাতিকে শিহরিত করে। তেমনই একটি দিন ২০১৬ সালে ১০ মে দিবাগত রাতটি। পৃথিবীর সব নীতি-নৈতিকতা, শিষ্টাচার, ন্যায়বিচার কে উপেক্ষা করে রক্তপিপাসু হায়েনারা বিচারের নামে প্রহসন করে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে হত্যা করেছে আল্লাহর একজন প্রিয় বান্দাহকে। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। যিনি সারা জীবন মানুষকে আল্লাহর দ্বীনের দিকে আহবান করেছেন। একটি সুখি সমৃদ্ধশালী,কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় তাঁর সততা,দক্ষতা দেশপ্রেমের ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত জাতি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করবে।

জুলুম-নির্যাতন, অন্যায়-অবিচারের মোকাবেলা তিনি জাতির সামনে এখন ধৈর্য ও ইনসাফের প্রতিক। সারা জীবন অন্যায়ের সামনে মাথা না নোয়াবার যে দীক্ষা তিনি দিয়েছেন জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তা পালন করেছেন অক্ষরে-অক্ষরে। বাতিলের কোন চক্রান্ত, ষড়যন্ত্রই তাঁকে কাবু করতে পারেনি। শহীদ মাওলানা নিজামী এখন ১৬ কোটি মানুষের দুরান্ত সাহসের বাতিঘর। যারা তাঁকে স্বাধীনতা

www.pathagar.com

বিরোধী বলে ফাঁসি দিয়েছে তারা নিজেরাও স্বীকার করবেন এ হত্যা শুধু রাজনৈতিক কারণেই। এদেশের তরুন প্রজন্ম শহীদ নিজামীকে জাতির শ্রেষ্ঠ সন্ত ানদের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত করবে। মুসলিম বিশ্বের অনৈক্য আর ক্ষমতার রাজনীতির কারণে অনেকেই খুব উল্লেখযোগ্য ভূমিকাও রাখতে পারেনি। এ দুর্ভাগ্য মুসলিম উম্মাহর। মাওলানা নিজামী কোন ব্যক্তি নন, গোটা মুসলিম উম্মাহর সম্পদ। কিন্তু দুর্ভাগ্য মুসলিম রাষ্ট্রগুলো আজ পাচাটা গোলামের জিগিরে আবদ্ধ। শহীদ নিজামীর বিদায়ে হৃদয়ে রক্তক্ষরণ আর অব্যক্ত বেদনায় অশ্রু বিসর্জিত হচ্ছে।

কিন্তু যার জন্য এত ফরিয়াদ রোনাজারি, আহাজারি তিনি ছিলেন শাহাদাতের পূর্ব পর্যন্ত নিশ্চল,অটল এবং অবিচল। তাঁর মধ্যে ছিলনা কোন উদ্বেগ আর উৎকন্ঠা। বরং কারাগার থেকে দৃঢ়তার সাথে উচ্চারণ করলেন-"জীবন-মৃত্যুর মালিক আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন। মহান আল্লাহ্ আমার মৃত্যুর জন্য যে সময় ও স্থান নির্ধারণ করে রেখেছেন ঠিক সে সময় এবং সে স্থানেই আমার মৃত্যু হবে। তার আগেও নয়, পরেও নয়। আমার মাঝে কোন দুর্বলতা নেই। আমি কোন অন্যায় করিনি। আল্লাহ যদি আমাকে শহিদী মৃত্যু দেন তাহলে সেটা হবে আমার চরম সৌভাগ্য।

আমি আমার পরিবার, সংগঠনের সর্বস্তরের জনশক্তি ও দেশবাসীকে ধৈর্য ধারণ করার আহবান জানাচ্ছি। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন। আমি স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করছি প্রাণের মালিক আল্লাহ। সুতরাং আল্লাহ ছাড়া আর কারো কাছে প্রাণভিক্ষা চাওয়ার প্রশ্নই আসে না। আমি দেশবাসীকে আমার সালাম জানাচ্ছি ও দোয়া চাচ্ছি যাতে আমি জীবনের শেষ মুহুর্ত পর্যন্ত ঈমানের ওপর দৃঢ় ও অবিচল থাকতে পারি। আমি আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টির জন্য যে কোন ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত। আল্লাহ আমার জন্মভূমি এই প্রিয় বাংলাদেশকে ইসলামের জন্য কবুল করুন"।

শহীদ নিজামীর বিরুদ্ধে আনা এ সবই কাগুজে অভিযোগ। যিনি এ সমাজেই বেড়ে ওঠা সর্বজন শ্রদ্ধেয় জাতীয় ব্যক্তিত্ব খেতাবে ভূষিত। দেশের সর্ব বৃহৎ এদেশের জনগণ কখনো তাঁকে ভুলবেনা। অর্ধ শতাব্দী কাল যিনি এ জমিনে আল-কুরআনের আহবান পৌছিয়েছেন দেশের প্রতিটি প্রান্তে-প্রান্তে। মানবতার সেবায় যে জীবন নিয়োজিত করেছেন আর তাঁকে হত্যা করা হয়েছে মানবতা বিরোধী কর্মকান্ডের জন্য!! কি সেলুকাস এ পৃথিবী! কি অদ্ভুত আর বিস্ময়কর আমাদের রাজনীতি! কত নিষ্ঠুর, নোংরা, কলুষিত, ক্ষমতার মোহে দিকভ্রান্ত আওয়ামীলীগের এই নেতিবাচক শিষ্টাচার বহির্ভূত অ-পরাজনীতি! ধিক আজকের সমাজের এ ঘৃণিত বিষবাস্পকে। ধিক্ আওয়ামীলীগের এই অমানবিক, ফ্যাসিস্ট

www.pathagar.com

চরিত্রকে। কিন্তু মনে রাখতে হবে ইতিহাসের চাকা বার-বার ঘুরে আসে। সুতরাং এক মাঘে শীত যায় না, আর আওয়ামীলীগের ক্ষমতাও চিরস্থায়ী নয়।

শহীদ নিজামীকে ন্যায় বিচারের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন, "নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি সুস্পষ্ট প্রমাণসহ এবং তাদের সঙ্গে দিয়েছি কিতাব ও ন্যায়নীতি, যাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করতে পারে।" (৫৭:২৫) অন্যত্র বলা হয়েছে-"আল্লাহ তা'আলা কি বিচারকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বিচারক নন?"(৯৫ঃ৮) হযরত আলী রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু বলেছিলেন- "ক্ষমতাপ্রাপ্ত রাজপুরুষের অত্যাচার ও বিচারাসনে বসে বিচারকের অবিচারের মতো মন্দ কর্ম আর নেই।"

আওয়ামী লীগ গোটা জাতিকে বিভেদ,হিংসা আর অ-মানবিকতার দিকে ঠেলে দিয়েছে। সমাজে আজ গণহত্যাকারী, খুনী, কোটি কোটি টাকার রাষ্ট্রীয় সম্পদ লুণ্ঠনকারী, সশস্ত্র সন্ত্রাসী, দূর্নীতিবাজ, লম্পট, চরিত্রহীনরা যেন সাধু! আর নিরাপরাধীদেরকে রাষ্ট্রযন্ত্র ব্যবহার করে মিডিয়া ট্রায়াল আর বিকৃত উপস্থাপনার মাধ্যমে বানানো হচ্ছে মানবতা বিরোধী! গোয়েবলসীয় সূত্রের আলোকে চলছে সত্যপন্থীদের বিরুদ্ধে এই অসত্য প্রচারণা। আসলে এর শেষ কোথায়.-?

মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী ১৯৯১ এবং ২০০১ সালে মোট দুইবার তিনি বিপুল ভোটে জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। ২০০১-২০০৬ মেয়াদে তিনি বাংলাদেশের কৃষি ও শিল্পমন্ত্রী হিসাবে সর্বমহলে নিজেকে একজন সৎ, দক্ষ ও অমায়িক নেতার আসনে অধিষ্ঠিত করেছেন। তাঁর সাথে কাজ করা ব্যক্তিরা তা একবাক্যে স্বীকার করেছেন। মেধা ও নৈতিকতা সমন্বয়ে একটি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলবার জন্য ছাত্র আন্দোলন থেকে শুরু করে সংগ্রাম করে আসা মজলুম জননেতা জনাব নিজামী। জেল-জুলুম, নির্যাতন আর রক্তাক্ত পথ পাড়ি দিয়ে তিনি অন্যায়ের সামনে মাথা না নোয়াবার প্রতিক।

বাংলাদেশের প্রতিটি গণতান্ত্রিক আন্দোলন, স্বৈরাচার বিরোধী সংগ্রাম, শিক্ষা আন্দোলন, ১/১১ বিরাজনীতিকরণের ষড়যন্ত্র, কেয়ার-টেকার সরকার আন্দোলন, সাম্রাজ্যবাদ ও আধিপত্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন আপোষহীন বীরপুরুষ। মানুষের মৌলিক অধিকার রক্ষা সংগ্রামে জীবন বাজি রেখে সর্বদা সোচ্চার থেকেছেন তিনি। এদেশের মানুষের তাহজীব-তামাদ্দুন, ধর্ম-বর্ণ, নির্বিশেষে সবার অধিকার রক্ষার আন্দোলনে তিনি ছিলেন প্রথম কাতারে এবং তাঁর জীবননাশের চেষ্টাও হয়েছিল অনেকবার। নাস্তিকতাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের রক্তচক্ষু মোকাবেলা করে আসা একজন সংগ্রামী প্রাণপুরুষ তিনি। নীতির প্রশ্নে সদা আপোষহীন এই মানুষটি কেবলমাত্র ইসলামী আন্দোলন করার আপরাধে-ই হত্যা করা হয়েছে।

www.pathagar.com

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, "আর যে ব্যক্তি জেনে বুঝে কোন মুমিনকে হত্যা করে, তার শাস্তি হচ্ছে জাহান্নাম। সেখানে সে চিরকাল থাকবে। তার ওপর আল্লাহ্র গযব ও তাঁর লানত এবং আল্লাহ্ তার জন্য কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা করে রেখেছেন।" (৪ ঃ ৯৩) আজ শহীদ নিজামী হয়ে আছেন অমর! আর হত্যাকারীরা জাহান্নামকেই নিজেদের ঠিকানা বানিয়ে নিয়েছে। যুগের পর যুগ শতাব্দীর পর শতাব্দী দুনিয়াবাসী খুনিদের অভিশাপ দিতে থাকবে।

জন্ম ও শিক্ষা

মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী ১৯৪৩ সালের ৩১ মার্চ পাবনা জেলার সাঁথিয়া উপজেলার মনমথপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মরহুম লুৎফর রহমান খান একজন আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ও খোদাভীরু লোক ছিলেন। নিজগ্রাম মনমথপুর প্রাইমারি স্কুলে তাঁর লেখাপড়ার হাতেখড়ি। এরপর সাঁথিয়ার বোয়ালমারী মাদরাসা হতে পাবনার শিবপুর ত্বহা সিনিয়র মাদরাসা থেকে আলিম পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে সমগ্র বোর্ডে ষোলতম ও ১৯৬১ সালে একই মাদরাসা থেকে ফাজিল পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন।

১৯৬৩ সালে মতিউর রহমান নিজামী অন্যতম শ্রেষ্ঠ দ্বীনি শিক্ষাকেন্দ্র মাদরাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা থেকে মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে কামিল পরীক্ষায় ফিকাহশাস্ত্রে প্রথম শ্রেণিতে দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন। পরবর্তীকালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং ১৯৬৭ সালে কৃতিত্বের সাথে গ্র্যাজুয়েশন ডিগ্রি লাভ করেন।

ছাত্রজীবনেই নেতার ভূমিকায়

১৯৬১ সাল থেকে ইসলামী ছাত্রসংঘের দাওয়াতে সাড়া দিয়ে তিনি ছাত্র আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। ঐ সময় মাদরাসা-ছাত্ররা তাদের দাবি-দাওয়া আদায়ের জন্য আন্দোলন করছিল। ১৯৬২-৬৩ সালে কামিল শেষ বর্ষের মেধাবী ছাত্রনেতা নিজামী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবিসহ মাদরাসা-ছাত্রদের ন্যায্য দাবি আদায়ের আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন।

ছাত্রনেতা নিজামী ১৯৬২-৬৬ সাল পর্যন্ত ইসলামী ছাত্রসংঘের কেন্দ্রীয় অফিস সেক্রেটারি, ১৯৬৬ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান ইসলামী ছাত্রসংঘের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। পরপর তিন বছর তিনি এই দায়িত্ব পালন করেন। এরপর তিনি তৎকালীন অবিভক্ত পাকিস্তান ইসলামী ছাত্রসংঘের কেন্দ্রীয় সভাপতি নির্বাচিত হন। পর পর দু'বছর তিনি এ দায়িত্বে অধিষ্ঠিত থেকে ১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এ দায়িত্ব থেকে বিদায় গ্রহণ করেন।

www.pathagar.com

পারিবারিক জীবন

১৯৭৪ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর শামসুন্নাহারের সাথে বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হন মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী। শামসুন্নাহার নিজামী রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ থেকে এমএসসি ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনিও ছাত্রজীবন থেকে ইসলামী আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছেন। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর মহিলা বিভাগের সেক্রেটারি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী চার ছেলে ও দুই কন্যাসন্তানের জনক।

শহীদ মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর ব্যক্তিত্ব, নেতৃত্ব, প্রজ্ঞা, নিষ্ঠা-আন্তরিকতা ও দেশ প্রেমের মাধ্যমে তিনি হয়ে উঠেছেন একটি সফল প্রতিচ্ছবি। রাষ্ট্র পরিচালনায় মন্ত্রীত্বের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে সততা, দক্ষতা ও দেশ প্রেমের ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তিনি। বাংলাদেশের ইতিহাসে মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী এবং শহীদ আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার যে স্বপ্ন দেখিয়েছেন তা সত্যিই বিরল। যিনি বারবার বিশ্বের গণ্যমান্য ব্যক্তিত্বের তালিকায় স্থান পেয়েছেন নিজ গুণে। এই গৌরব বাংলাদেশের জনগণের।

স্বৈরাচারী আইয়ুববিরোধী আন্দোলনে মাওলানা নিজামী

১৯৬৪ সালে আইয়ুব খান প্রণীত অনৈসলামিক ও অগণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে জামায়াতে ইসলামী সর্বপ্রথম সোচ্চার হয়ে ওঠে এবং তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলে। ইসলামী আন্দোলনকে স্তব্ধ করার লক্ষ্যে সরকার ১৯৬৪ সালের ৬ জানুয়ারি জামায়াতে ইসলামীকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। কিন্তু ইসলামী আন্দোলনের কর্মীরা সরকারি ষড়যন্ত্র ও দমননীতির কাছে মাথা নত না করে COP, DAC, PDM-এর মাধ্যমে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার আন্দোলন পরিচালনা করতে থাকে। এ সময় ইসলামী ছাত্রসংঘ মাওলানা নিজামীর নেতৃতে ৮ দফা দাবিতে স্বৈরাচারবিরোধী গণ আন্দোলন গড়ে তোলে। ১৯৬৯ সালে নুর খান শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টের পক্ষে জনমত গড়তে গিয়ে নিজামীর প্রিয় সাথী মেধাবী ছাত্রনেতা আবদুল মালেক বাম ও সেকুলারপন্থীদের হাতে শাহাদাত বরণ করেন।

সর্বমহলে গ্রহণযোগ্য ছাত্রনেতা

আইয়ুববিরোধী আন্দোলন চলাকালে ছাত্র ইউনিয়নের কর্মী আসাদ নিহত হন। আদর্শিক দ্বন্দ্ব থাকা সত্ত্বেও মাওলানা নিজামী আসাদের জানাজায় উপস্থিত হন। ছাত্র নেতৃবৃন্দের অনুরোধে তিনি জানাজায় ইমামতি করেন। রাজনৈতিক

www.pathagar.com

মতপার্থক্য থাকলেও ব্যক্তিগতভাবে মাওলানা নিজামী ছাত্রনেতা হিসেবে সকলের নিকট সম্মানের পাত্র ছিলেন।

১৯৭০ সালে নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনকারী দলের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না হওয়ার কারণে যে আন্দোলন শুরু হয়, তখন তিনি ছিলেন ছাত্রনেতা। সেই আন্দোলনকে তিনি সমর্থন করেছিলেন। নির্বাচিত নেতা হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে বিনা শর্তে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি জানিয়েছিলেন।

জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান ও নেতৃত্ব প্রদান

ছাত্রজীবন শেষে মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী ১৯৭১ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করেন। তিনি পর্যায়ক্রমে জামায়াতে ইসলামী ঢাকা মহানগরীর আমীর ও কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য হিসেবে ১৯৭৯-১৯৮২ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮৩ সালে তিনি সংগঠনের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি জেনারেল মনোনীত হন এবং ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত এ দায়িত্বে অধিষ্ঠিত থাকেন। ১৯৮৮ সাল থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত একটানা ১২ বছর মাওলানা নিজামী জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

২০০০ সালের ১৯ নভেম্বর মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমীর নির্বাচিত হন। শাহাদাতের পূর্ব পর্যন্ত তিনি এ দায়িত্বে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

ইসলামী আন্দোলনের নেতা হিসেবে হত্যার ষড়যন্ত্র

মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, গণতন্ত্র ও ইসলামের পক্ষে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখার কারণে আধিপত্যবাদ ও নাস্তিকতাবাদী গোষ্ঠী তাঁর বিরুদ্ধে বহুমুখী ষড়যন্ত্র শুরু করে। ১৯৯১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস ও সংঘাত-সংঘর্ষ বন্ধ করে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য তৎকালীন ভাইস চ্যান্সেলর কর্তৃক বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের বৈঠক ডাকা হয়। আমন্ত্রিত হয়ে মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী এই বৈঠকে উপস্থিত হন। এ সময় পূর্বপরিকল্পিতভাবে হত্যার উদ্দেশ্যে তাঁর ওপর নগ্নহামলা চালানো হয়। এ ঘটনায় তিনি মারাত্মকভাবে আহত হন এবং দীর্ঘ সময় চিকিৎসাধীন থেকে সুস্থ হয়ে ওঠেন।

১৯৯৬ পরবর্তী আওয়ামী লীগের শাসনামলে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে আওয়ামী-পুলিশ-বাহিনী সরাসরি তাঁর মতো প্রাজ্ঞ ও প্রবীণ রাজনীতিবিদের ওপর লাঠিচার্জ করার দুঃসাহস প্রদর্শন করে। কিন্তু কোনো হুমকি, আঘাত ও আক্রমণ কখনো তাঁকে বিচলিত করতে পারেনি।

www.pathagar.com

প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন মাওলানা নিজামী

মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী একজন প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন, অসংখ্য আলেম ও ইসলামপ্রিয় জনগণের রুহানি উস্তাদ। দেশে-বিদেশে তিনি বিজ্ঞ ওলামায়ে কেরাম ও স্কলারদের নিকট প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন হিসেবে সমাদৃত। ২০১৫ সালে আমেরিকার বিখ্যাত "দ্য রয়েল ইসলামিক স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ সেন্টার" প্রকাশিত তালিকায় বিশ্বের ৫০০ জন প্রভাবশালী মুসলিম ব্যক্তিত্বের তিনি অন্যতম।

জাতীয় রাজনীতিতে মাওলানা নিজামী

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের প্রতিটি গণ-আন্দোলনে মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। ১৯৮২-৯০ সালে তদানীন্তন স্বৈরশাসকের বিরুদ্ধে আন্দোলনে মাওলানা নিজামী বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দেন। ফলে একাধিকবার তিনি স্বৈরশাসকের আক্রোশের শিকার হন। ৩ জোটের পাশাপাশি জামায়াতের আন্দোলন এবং তাঁর সাহসী নেতৃত্বের কারণে স্বৈরশাসকের বিরুদ্ধে প্রচন্ড গণপ্রতিরোধ গড়ে ওঠে এবং ১৯৯০ সালে জাতি অপশাসনের হাত থেকে মুক্তি লাভ করে।

১৯৯১ সালে জামায়াতে ইসলামী প্রদত্ত ফর্মুলা অনুযায়ী নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচন বাংলাদেশসহ সারাবিশ্বে প্রশংসিত হয়। অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের এই ধারা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে কেয়ারটেকার সরকারের বিধান সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য জামায়াতে ইসলামীর সংসদীয় দলের নেতা হিসেবে সংসদে মাওলানা নিজামী বিল উত্থাপন করেন। পরবর্তীতে সংসদের ভেতরে ও বাইরে জামায়াতে ইসলামীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কারণে কেয়ারটেকার সরকারের বিধান সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৯৬ সাল থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত আওয়ামী দুঃশাসনের বিরুদ্ধে মাওলানা নিজামীর সংগ্রামী ভূমিকা জাতির মধ্যে নতুন প্রাণের সঞ্চার করে। তাঁর নিরলস প্রচেষ্টায় দেশের ইসলামী ও জাতীয়তাবাদী শক্তিসমূহ আওয়ামী দুঃশাসনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়। আওয়ামী লীগ কর্তৃক ইসলাম ও মুসলমানদের ঈমান-আকিদা ধ্বংস, পৌত্তলিকতার প্রচলন, মাদরাসা শিক্ষা বন্ধের চক্রান্ত, কুখ্যাত জননিরাপত্তা আইনের ছদ্মাবরণে বিরোধী দল দমন, স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব ও দেশের অখন্ডতাবিরোধী পার্বত্য কালোচুক্তি, গঙ্গার পানিবন্টন চুক্তির নামে প্রহসন, সর্বোপরি দেশ-জাতিকে ধ্বংসের বহুমুখী অপতৎপরতার বিরুদ্ধে মাওলানা নিজামীর ভূমিকা ছিল অবিস্মরণীয়।

২০০৭ সালের অবৈধ কেয়ারটেকার সরকারের সময়ে তিনি দেশকে বিরাজনীতিকরণ ও ২২ জানুয়ারির নির্বাচন বাতিল ও জরুরি আইন জারির প্রতিবাদে জোরালো ভূমিকা পালন করেন। এ ছাড়াও ফারাক্কা বাঁধ, টিপাইমুখ বাঁধ নিয়ে দেশব্যাপী গড়ে ওঠা আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন মাওলানা নিজামী।

www.pathagar.com

সাহিত্য ও সংস্কৃতির অঙ্গণে মাওলানা নিজামী

মাওলানা নিজামী শৈশবকাল থেকে কল্যাণমুখী সাহিত্য সাংস্কৃতিক ধারার সাথে যুক্ত। তিনি বিভিন্ন জাতীয় ও সাহিত্য সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে নিয়মিতভাবে পৃষ্ঠপোষকতা দান করে সুস্থধারার সাহিত্য-সংস্কৃতির বিকাশে অবদান রেখে আসছেন। জনাব নিজামী নিজেও একজন বড় মাপের সাহিত্যিক। গদ্যশিল্পে তাঁর রয়েছে ব্যতিক্রমী পারঙ্গমতা।

বিদেশে সফর

জনাব নিজামী বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্র, আন্তর্জাতিক সংস্থা, ইসলামী সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের আমন্ত্রণে বিদেশ সফর করেন। এসব সফরে তিনি রাষ্ট্রীয় ও আন্ত র্জাতিক ইসলামী নেতৃবৃন্দের সাথে একান্ত বৈঠকে মিলিত হন। তিনি গ্রেট বৃটেন, আমেরিকা, ফ্রান্স, গ্রীস, জার্মানী, চীন, ইটালী, কানাডা, সৌদি আরব, আরব আমীরাত, কাতার, ওমান, বাহরাইন, কুয়েত, সিংগাপুর, মালয়েশিয়া, জাপান, পাকিস্তান, ইরান, তুরস্কসহ প্রায় অর্ধশত দেশ সফর করেন। এ পর্যন্ত প্রতিবারই সৌদি রয়েল গেষ্ট হিসেবে মর্যাদা পান।

চারদলীয় ঐক্যজোটের শীর্ষ নেতা মাওলানা নিজামী

১৯৯৬ সালে জাতির ঘাড়ে চেপে বসা আওয়ামী দুঃশাসনের বিরুদ্ধে ১৯৯৯ সালের শেষ দিকে গঠিত চারদলীয় ঐক্যজোটের অন্যতম শীর্ষ নেতা ছিলেন মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী। চারদলীয় ঐক্যজোট ২০০১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দুই-তৃতীয়াংশ আসনে বিজয় লাভ করে এবং সরকার গঠন করে। নানা চক্রান্ত-ষড়যন্ত্রকে পরাজিত করে চারদলীয় ঐক্যজোট অটুট রাখা ও শক্তিশালী করার পেছনে মাওলানা নিজামীর বলিষ্ঠ ভূমিকা, অপরিসীম ধৈর্য ও ত্যাগ চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

জাতীয় সংসদে মাওলানা নিজামী

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে জাতীয় সংসদে মাওলানা নিজামীর বুদ্ধিবৃত্তিক, তথ্য-যুক্তিনির্ভর, উপস্থাপনা ও সময়োপযোগী বক্তব্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। একজন দক্ষ পার্লামেন্টারিয়ান হিসেবে তিনি জামায়াতে ইসলামীর সংসদীয় দলনেতার দায়িত্ব পালন করেন। একই সঙ্গে তিনি সংসদের পার্লামেন্টারি ও মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কমিটির সদস্য ছিলেন। গঠনমূলক ও ভারসাম্যপূর্ণ ভূমিকা পালনের কারণে তিনি বাংলাদেশের সংসদীয় রাজনীতির ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

www.pathagar.com

দেশগঠনে অবদান ও জাতীয় উন্নয়নে ভূমিকা

দেশগঠন ও জাতীয় উন্নয়নে মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর ভূমিকা চির স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তিনি সফলতার সাথে কৃষি ও শিল্প মন্ত্রণালয় পরিচালনা করেন। ২০০১-২০০৬ মেয়াদে মন্ত্রী হিসাবে তিনি সততা ও দক্ষতার সাথে সংস্কার ও উন্নয়নমূলক কাজ করেছেন। মন্ত্রী হিসেবে তিনি প্রতিটি চাষির বাড়িতে 'চাষির বাড়ি বাগান বাড়ি' স্লোগানে উন্নয়নমূলক যে যুগান্তকারী মডেল কর্মসূচি গ্রহণ করেন, যার ধারাবাহিকতায় আজও 'একটি বাড়ি একটি খামার' প্রকল্প হিসেবে বিদ্যমান রয়েছে। শিল্পমন্ত্রী হিসেবে তিনি শিল্পখাতে প্রবৃদ্ধি শতকরা ১০.৪৫ ভাগে উন্নীতকরণ, সুষ্ঠুভাবে সার সরবরাহ, বন্ধ শিল্প চালু, সাভারে চামড়া শিল্প নগরী স্থাপনসহ অনেক বৈপ্লবিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। চিনি শিল্পে প্রায় ৭০ কোটি টাকা মুনাফা অর্জনসহ ব্যাপক উন্নতি সাধন করেন মাওলানা নিজামী।

তিনি এ দেশের কৃষিকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। ইতালির রোমে অনুষ্ঠিত বিশ্বখাদ্য সম্মেলন ও থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড রাইস রিসার্চ অরগানাইজেশনের সম্মেলনে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন তিনি। মাওলানা নিজামী কৃষি মন্ত্রণালয়ে অভূতপূর্ব সাফল্য দেখিয়েছেন। তার সততা, দক্ষতা ও একাগ্রতা পুরো সেক্টরকেই প্রভাবিত করে।

তাঁর-ই উদ্যোগে পণ্যের নকল ও ভেজাল প্রতিরোধ এবং বাংলাদেশে উৎপাদিত বিভিন্ন শিল্প ও সেবাসামগ্রী বিশ্বের বিভিন্ন মানপ্রণয়ন ও স্বীকৃতি প্রদানকারী সংস্থাসমূহ কর্তৃক স্বীকৃতি অর্জনের লক্ষ্যে ন্যাশনাল অ্যাক্রিডিটেশন বোর্ড গঠন করা হয়।

মাওলানা নিজামীর হাতের ছোঁয়ায় পাল্টে গেছে সাঁথিয়া-বেড়ার চিত্র। সাঁথিয়া-বেড়ার উন্নয়নের রূপকার তিনি। শুধু সাঁথিয়া-বেড়াই নয়, পাবনার সামষ্টিক উন্নয়নেও রয়েছে তাঁর অনন্য অবদান।

জঙ্গিবাদ দমনে মাওলানা নিজামীর বলিষ্ঠ অবস্থান

চারদলীয় ঐক্যজোট সরকারকে বেকায়দায় ফেলতে দেশবিরোধী শক্তির ক্রীড়নক একটি গোষ্ঠী দেশব্যাপী ইসলাম প্রতিষ্ঠার নামে বোমা হামলা চালায়। অথচ ইসলাম কখনোই কোনরূপ সহিংসতার পথকে সমর্থন করে না। কিন্তু এই গোষ্ঠী পরিকল্পিতভাবে ইসলামের বদনাম রটানোর জন্য এবং দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতির ধারাকে থামিয়ে দেয়ার লক্ষ্যে এ-হামলা পরিচালনা করে। জামায়াতে ইসলামী ও এর আমীর মাওলানা নিজামীর সোচ্চার ভূমিকার কারণে ইসলামের নামে বোমা হামলাকারী এসব ঘাতকদের মুখোশ জাতির সামনে খুলে যায়। চারদলীয় জোট সরকারের সময়েই জেএমবির শীর্ষ নেতারা গ্রেফতার হয়। তাদের বিচারের মুখোমুখি করা হয়।

www.pathagar.com

মাদরাসা শিক্ষার উন্নয়ন

দেশব্যাপী প্রচলিত শিক্ষব্যবস্থার সংস্কার, উন্নয়ন ও মাদরাসা শিক্ষার উন্নয়নে মাওলানা নিজামী পালন করেন আন্তরিক ও দায়িত্বশীল ভূমিকা। কওমি মাদরাসার স্বীকৃতি ও মান প্রদান এবং ফাজিল-কামিলের মান প্রদানের মতো চারদলীয় জোট সরকারের ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের পেছনে মাওলানা নিজামীর তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা সর্বমহলে প্রশংসিত হয়েছে।

আন্তর্জাতিক ইস্যুতে মাওলানা নিজামী

প্রতিটি আন্তর্জাতিক ইস্যুতে মুসলিম উম্মাহর পক্ষে মাওলানা নিজামী অনন্য সাধারণ ভূমিকা পালন করেছেন। বাবরী মসজিদ ভাঙা, বসনিয়া-হারজেগোভিনায় মুসলিম গণহত্যা, ইহুদি রাষ্ট্র ইসরাইল কর্তৃক ফিলিস্তিনি মুসলমানদের সাথে ন্যক্কারজনক আচরণ, লেবাননে বর্বরোচিত ইসরাইলি হামলা নিয়ে মাওলানা নিজামী সময়োপযোগী ও ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছেন।

জার্মান অধ্যাপক হেন্স কিপেনবার্গ 'মহানবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ-কে এক যুদ্ধবাজ ও ইসলামকে জঙ্গি বা রণমুখী ধর্ম' অভিহিত করার বিরুদ্ধে ও ডেনমার্কে মহানবী ﷺ-এর ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশের প্রতিবাদে তার প্রদত্ত বক্তব্যের প্রেক্ষিতে জাতীয় সংসদে ঐকমত্যের ভিত্তিতে নিন্দা প্রস্তাব গৃহীত হয়। এটি একটি ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত।

বিশ্ব ইসলামী আন্দোলনের নেতা মাওলানা নিজামী

বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ইস্যুতে মাওলানা নিজামীর প্রজ্ঞাপূর্ণ ভূমিকা প্রশংসিত হয়েছে। মুসলিম উম্মাহর বিভিন্ন সমস্য নিয়ে ২০০২ সালের ২৭ মার্চ মুসলিম দুনিয়ার বিখ্যাত চিন্তাবিদ ও দার্শনিক ডক্টর ইউসুফ আল কারযাভীর নেতৃত্বে মধ্যপ্রাচ্যের দশজন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা নিজামীর সাথে সাক্ষাৎ করেন।

মাওলানা নিজামী একাধিকবার রাবেতা আল আলম আল ইসলামীর সম্মেলনে যোগদান করেন। তিনি মুসলিম ওয়ার্ল্ড লিগ (রাবেতা), সেন্ট্রাল কো-অর্ডিনেশন কমিটির স্থায়ী সদস্য ছিলেন। মাওলানা নিজামীসহ মুসলিম বিশ্বের ৫২ জন বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ও বুদ্ধিজীবী আরব ও মুসলিম বিশ্বের জনগণের প্রতি ইসরাইলি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সম্মিলিত আহবান জানান।

২০০৩ সালের ১৫-১৭ অক্টোবর চীনে অনুষ্ঠিত Sustained Elimination of Iodine Deficiency Disorder শীর্ষক সম্মেলনের তৃতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী।

www.pathagar.com

২০০৬ সালে মাওলানা নিজামী ইংল্যান্ডের শীর্ষ বৈদেশিক ও কূটনৈতিক নীতিনির্ধারণী বিশেষজ্ঞ ফোরাম 'চেথম হাউজের' আমন্ত্রণে 'বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ইসলামী রাজনৈতিক দলসমূহ : জামায়াতের ভূমিকা' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন। বৈঠকে তিনি এ-সংক্রান্ত একটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

উল্লেখ্য, চেথম হাউজ ব্রিটেনের অন্যতম শীর্ষ নীতিনির্ধারণী বিশেষজ্ঞ ফোরাম, যেখানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শীর্ষ নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রেখে থাকেন। মাওলানা নিজামী প্রথম বাংলাদেশী নেতা, যিনি চেথম হাউজের আমন্ত্রণে সেখানে বক্তব্য রাখেন।

মুসলিম উম্মাহ তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য ২০০৯ সালের ইউএসএ ভিত্তিক "দ্য রয়েল ইসলামিক স্ট্র্যাটিজিক স্টাডিজ সেন্টার" কর্তৃক বিশ্বের শীর্ষ ৫০ জন ব্যক্তিত্বের মধ্যে মাওলানা নিজামীকে নির্বাচন করেন।

তিনি বহুবার সৌদি বাদশাহর রয়েল গেস্ট হিসেবে পবিত্র হজ পালন করেন।

লেখক ও চিন্তাবিদ নিজামী

মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী সংগঠনের দায়িত্ব পালন ও রাজনৈতিক ব্যস্ততার মাঝেও ইসলামী সাহিত্য ও গবেষণায় মৌলিক চিন্তার আলোকে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন।

বাল্যকাল থেকেই লেখালেখির প্রতি মাওলানা নিজামীর ঝোঁক ছিল। তিনি বিভিন্ন ম্যাগাজিন, সাপ্তাহিক ও দৈনিক পত্রিকায় নিয়মিত লেখালেখি করতেন। তাঁর সৃজনশীল ও গবেষণাধর্মী এবং তথ্যসমৃদ্ধ লেখা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রাজনৈতিক ও ইসলামী আন্দোলনের বিভিন্ন ব্যস্ততার মাঝেও তাঁর ৬১টি বই প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর ক্ষুরধার লেখনি, সুনিপুণ বক্তব্য এদেশের তরুণ সমাজকে আলোড়িত করবে কালের পর কাল। তিনি এদেশের ইসলাম প্রিয় জনতার মনে জাগরুক থাকবেন সদা সর্বদা। ব্যাক্তি,পরিবার, সমাজ,রাষ্ট্র প্রতিনিয়ত তাঁর সুনিপুন লেখনি চিন্তা,বক্তব্যে খুঁজে পাবে পথের দিশা। এদেশের তরুণ প্রজন্ম নিজেদের গরজেই শহীন নিজামীকে ভালবাসবে অনন্তকাল।

অন্যায়ভাবে বারবার গ্রেফতার মাওলানা নিজামী

২০০৭ সালের অবৈধ তত্ত্বাবধায়ক সরকার অন্যায়ভাবে মাওলানা নিজামীকে গ্যাটকো মামলায় ২০০৮ সালের ১৮ মে দিবাগত রাতে গ্রেফতার করে। আইনি লড়াইয়ের মাধ্যমে তিনি ওই বছর ১৫ জুলাই মুক্তি লাভ করেন। এর কয়েক মাস পর ১০ নভেম্বর বড় পুকুরিয়া কয়লা খনি মামলায় বিশেষ জজ আদালতে হাজির হতে গেলে জামিন না দিয়ে তাঁকে কারাগারে পাঠিয়ে দেয়া হয়। হাইকোর্ট তাকে ১২ নভেম্বর জামিন দিলে তিনি ১৬ নভেম্বর কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করেন।

www.pathagar.com

২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর একটি প্রশ্নবিদ্ধ নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার। ২০১০ সালের ২৯ জুন মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীকে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতের বানোয়াট-ঠুনকো অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়। ৯টি হয়রানিমূলক মামলায় জড়ানো হয় মাওলানা নিজামীকে। এসব মামলায় তাকে ২৪ দিন রিমান্ডে নেয়া হয়। একটি রাজনৈতিক দলের প্রধান ও শীর্ষ স্থানীয় আলেমকে রিমান্ডে নিয়ে মানসিক নির্যাতনের ঘটনা দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে করেছে কলঙ্কিত।

অন্যান্য মামলায় জামিন পাওয়ার পরও সরকার হীন উদ্দেশ্যে কথিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় ২০১০ সালের ২ আগস্ট তাঁকে গ্রেফতার দেখায়।

কথিত মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার

রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য ২০১০ সালে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল গঠন করে সরকার জামায়াত নেতৃত্বকে সাজা দেয়ার আয়োজন সম্পন্ন করে। ১৯৭৩ সালের আইনে সংশোধন এনে দলীয় তদন্ত সংস্থার মাধ্যমে মিথ্যা অভিযোগ ও সাজানো সাক্ষী দিয়ে কথিত মানবতাবিরোধী বিচারের রাজনৈতিক উদ্যোগ গ্রহণ করে। এই বিচারের জন্য প্রণীত আইন ও বিধিমালা নিয়ে শুরু থেকেই দেশে-বিদেশে বিশেষজ্ঞগণ গুরুতর প্রশ্ন তুলেছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধাপরাধবিষয়ক বিশেষ দূত স্টিফেন জে র‍্যাপ, আইনজীবীদের বিশ্বের সর্ববৃহৎ সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল বার অ্যাসোসিয়েশন, অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, হিউম্যান রাইট্স ওয়াচসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব ও সংস্থা এ নিয়ে আইন সংশোধনের জন্য নানা সুপারিশও দিয়েছে। কিন্তু সরকার তাতে কর্ণপাতই করেনি। সরকার তাঁর রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে চিরতরে শেষ করে দেয়ার জন্য জাতীয় নেতৃবৃন্দকে একের পর এক হত্যা করেই চলছে। ইতোমধ্যে এক সাংবাদিক সম্মেলনে সরকারের অ্যাটর্নি জেনারেল স্বীকার করেছেন, রাজনৈতিক সিদ্ধান্তেই বিচার হচ্ছে।

রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে হত্যার জন্যই আইন

যুদ্ধাপরাধের জন্য প্রণীত আইনটি নিজেই ন্যায়বিচারের পথে সবচেয়ে বড় বাধা। এটি মূলতঃ এমনভাবে প্রণয়ন করা হয়েছে যাতে রাষ্ট্রপক্ষ সবক্ষেত্রেই আইনি পন্থায় বেআইনি সুবিধা লাভ করতে পারে। ট্রাইব্যুনাল গঠন থেকে শুরু করে তদন্ত, বিচারক নিয়োগসহ সাক্ষ্যগ্রহণ এমনকি ফাঁসি কার্যকর করা পর্যন্ত সব ক্ষেত্রেই এ বিশেষ সুবিধার প্রতিফলন ঘটেছে। আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইন, ১৯৭৩-এর ৬ নং ধারা অনুযায়ী সরকার চাইলে এক বা

www.pathagar.com

একাধিক ট্রাইব্যুনাল গঠন করতে পারবে। যেখানে সরকার নিজেই বাদি সেখানে ট্রাইব্যুনাল গঠন ও বিচারক নিয়োগের এখতিয়ার সরকারের হাতে থাকায় নিরপেক্ষ ট্রাইব্যুনাল গঠন বা ন্যায়বিচার কোনটি-ই সম্ভব না। পাশাপাশি ট্রাইব্যুনাল চাইলে দ্রুত বিচারের স্বার্থে কোনো সাক্ষ্য ছাড়াই বিচারকার্য সম্পন্ন করতে পারবে আবার চাইলে রায় দেয়ার জন্য একজন সাক্ষীর সাক্ষ্যই পর্যাপ্ত মনে করতে পারবে।

শুধু তাই নয়, দেশীয় আদালতে বিচার হলেও সাক্ষ্য আইন ও ফৌজদারি কার্যবিধির মত মৌলিক আইনগুলোকে বাতিল করে পত্রিকায় ছাপানো খবর বা প্রবন্ধ, সাময়িকী, সিনেমা, টেপ রেকর্ডারসহ সব ধরনের অনির্ভরযোগ্য প্রমাণপত্র গ্রহণের এখতিয়ার আদালতের রয়েছে, যা ন্যায়বিচারের পথকে বন্ধ করে দিয়েছে। যখন একজন বিচারকের স্কাইপ কেলেঙ্কারি জনসাধারণের নিকট প্রকাশ পায় তখনই স্পষ্ট হয়ে যায় যে এটি মূলতঃ বিচারের নামে প্রহসনের নাটক ছাড়া আর কিছুই নয়।

২১ নং ধারায় বলা হয়েছে যে, শুধু আসামিপক্ষ রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করতে পারবে। আইনটি এরকম ছিল কারণ তারা নিশ্চিত ছিল যে, আদালত অভিযুক্তদের ফাঁসি দেবে। কিন্তু পক্ষপাতদুষ্ট বিচারক নিয়োগ দেয়ার পরও যখন শহীদ আবদুল কাদের মোল্লাকে শুধু যাবৎজীবন কারাদন্ড দেয়া হয় তখন বিচারকি হত্যা নিশ্চিত করার জন্য ধারাটি সংশোধন করে রাষ্ট্রপক্ষকেও আপিল করার অধিকার দিয়ে সংশোধনীর ভূতাপেক্ষ কার্যকারিতা প্রদান করা হয়, যা ছিল পৃথিবীর ইতিহাসে এক নজিরবিহীন ঘটনা। তখন বুঝার আর বাকি থাকে না যে, এটি আসলেই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত আইনের মাধ্যমে একটি বিচারকি হত্যার আয়োজন ছাড়া আর কিছুই নয় এবং এর সর্বশেষ শিকার মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী। এ দীর্ঘ বিচারপ্রক্রিয়ার প্রতিটি ধাপে মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীসহ সকল ইসলামী নেতৃবৃন্দ তাদের ন্যায়বিচার পাওয়ার মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হন।

রাজনৈতিক কারণেই এই বিচার -

সরকার যুদ্ধাপরাধ বা মানবতা বিরোধী অপরাধের বিচারকে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে দমনের হাতিয়ার হিসেবেই গ্রহণ করেছে। এই বিচারের জন্য প্রণীত আইন ও বিধিমালা নিয়ে দেশে বিদেশে প্রশ্ন উঠেছে। এর স্বচ্ছতা ও গ্রহণযোগ্যতা নিয়েও দেশী বিদেশী বিশেষজ্ঞগণ প্রশ্ন তুলেছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের যুদ্ধাপরাধ বিষয়ক বিশেষ দূত ষ্টিফেন জে র‍্যাপ, এ্যামনেষ্টি ইন্টারন্যাশনাল, হিউম্যান রাইট্স ওয়াচসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব ও সংস্থা এ নিয়ে নানা সুপারিশও দিয়েছে। কিন্তু সরকার কোন

www.pathagar.com

কর্ণপাতই করেনি। বরং তারা কখনও বলছে, এটা দেশীয় ট্রাইব্যুণাল, আবার কখনও বলছে, আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল, আবার কখনও বলছে, আন্তর্জাতিক মানের দেশীয় ট্রাইব্যুণাল। আর আইনজ্ঞগণ স্পষ্টই বলেছেন, এই ট্রাইব্যুনালের না দেশীয় মান আছে, আর না আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন। কারণ একটাই আওয়ামীলীগ ক্ষমতাকে চিরস্থায়ী করার লক্ষ্যে আদর্শিক প্রতিপক্ষকে যেকোন মূল্যে দমন করতে দ্বিধা করছেনা যদিও তা আইন, নীতি-নৈতিকতা ও সভ্যতা ভব্যতা ও মানবিকতা পরিপন্থী হোক না কেন।

যেসব মিথ্যা, বানোয়াট ও কাল্পনিক অভিযোগের ভিত্তিতে মাওলানা নিজামীকে ফাঁসির মতো সর্বোচ্চ দন্ডে দন্ডিত করা হলো তা ন্যায়বিচারের ইতিহাসকে কলঙ্কিত করেছে। কারণ ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধকালীন বিভিন্ন অপরাধের তদন্তে স্বাধীনতাত্তোর গঠিত বিভিন্ন তদন্ত কমিশনের চূড়ান্ত রিপোর্ট এবং সরকারি নথিতে কোথাও তাঁর নাম ছিল না। ট্রাইব্যুনাল গঠনের পূর্ব পর্যন্ত তথাকথিত মিথ্যা অভিযোগে সারা বাংলাদেশে তাঁর বিরুদ্ধে কোনো মামলা তো দূরে থাক একটি জিডি পর্যন্ত করা হয়নি। ১৯৯২ থেকে ১৯৯৬ সময়ে শেখ হাসিনা কর্তৃক জনাব নিজামীর পাশে বসে সাংবাদিক সম্মেলন করাসহ কেয়ারটেকার সরকারপদ্ধতি প্রতিষ্ঠার দাবিতে যুগপৎ আন্দোলনের কর্মসূচি প্রণয়নে জামায়াত নেতৃবৃন্দের সাথে আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দের অনেক বৈঠক হয়েছে। এমনকি ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকারগঠনে ও দলীয় প্রেসিডেন্ট প্রার্থীর পক্ষে সমর্থন চেয়ে তাদের দলের সিনিয়র নেতাদেরকে জামায়াতে ইসলামীর নেতৃবৃন্দের কাছে পাঠিয়েছিলেন। তখন নিশ্চয়ই মাওলানা নিজামী রাজাকার ও যুদ্ধাপরাধী ছিলেন না? অনেকে বলে থাকেন, আওয়ামী লীগের সাথে থাকলে সঙ্গী, বিরোধী হলেই জঙ্গি-যুদ্ধাপরাধী!

মূলত মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর অপরাধ হলো, তিনি ইসলামী আন্দোলনের নেতা ছিলেন, ছিলেন নীতির প্রশ্নে আপোষহীন। তাঁর রাজনীতি ছিল ব্যক্তি ও দলীয় সঙ্কীর্ণতার ঊর্ধ্বে। তিনি ছিলেন দেশের জনগণ ও মুসলিম উম্মাহর স্বার্থের পক্ষে। বাংলাদেশকে যারা তাঁবেদার রাষ্ট্র বানাতে চায় তাদের অবৈধ স্বার্থ হাসিলের পথে মাওলানা নিজামী ও তাঁর দল জামায়াতে ইসলামীকে তারা প্রধান বাধা হিসেবে ধরে নিয়েছে। সে জন্য পরিকল্পিতভাবে সর্বজন শ্রদ্ধেয়, গণমানুষের প্রাণপ্রিয় এ নেতাকে, সম্পূর্ণ রাজনৈতিক প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে মিথ্যা অভিযোগ ও সাজানো সাক্ষীর ভিত্তিতে প্রহসনের বিচারের মাধ্যমে হত্যা করেছে। জাতিসংঘ থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক আইন বিশেষজ্ঞ, মানবাধিকার সংগঠন, শীর্ষ ইসলামী ব্যক্তিত্ব, বিভিন্ন দেশের সমালোচনা ও ফাঁসি কার্যকর না করার অনুরোধ উপেক্ষা করে নির্মমভাবে তাঁকে হত্যা করে জুলুমবাজ

www.pathagar.com

সরকার। তাঁর মতো পরিচ্ছন্ন ও বর্ষীয়ান একজন রাজনীতিবিদের রাষ্ট্রীয় হত্যাকান্ডের শিকার হয়ে বিদায় নেয়া সত্যিই উদারতা ও সম্প্রীতিতে বিশ্বাসী বাংলাদেশের নাগরিকদের জন্য বেদনাবিধুর, লজ্জাজনক ও দুঃখজনক। মাওলানা নিজামীর এই ফাঁসি মুসলিম উম্মাহর দেহে যে ক্ষতের সৃষ্টি করেছে, তা বর্তমান আওয়ামী সরকার কর্তৃক পরিকল্পিত এক অমার্জনীয় ও নজিরবিহীন ভুল সিদ্ধান্ত হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে শতাব্দীর পর শতাব্দী।

মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী ট্রাইব্যুনালে যা বললেন-

আমি আদালতকে স্পষ্ট বলে দিতে চাই, "১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন আমার ভূমিকা রাজনীতির বাইরে অন্য কোন কিছুর সাথে জড়িত ছিল না। রাজনৈতিকভাবে আমরা নির্বাচিত প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি করেছি। জামায়াতে ইসলামীও সে দাবি করেছে ইসলামী ছাত্রসংঘও একই দাবি করেছে। আমি মনে করি যদি দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ জরুরী নির্বাচনের ফলাফল অনুযায়ী ক্ষমতা হস্তান্তর করা হত তাহলে ইতিহাসের এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটত না। সেই নির্বাচনের ক্ষমতা হস্তান্তরের পথে কে বাধা সৃষ্টি করেছিল? কারা বাধা সৃষ্টি করেছিল? জামায়াতে ইসলামী ক্ষমতা হস্তান্তরের পথে বাধা সৃষ্টি করার মত একটি কথা বলেছিল এমন কোন প্রমাণ কেউ দিতে পারে না। ইসলামী ছাত্রসংঘের সভাপতি হিসেবে ভূট্টো সাহেবের কথার প্রথম প্রতিবাদ আমি করেছিলাম। ক্ষমতা হস্তান্তরের পথে বাধা সৃষ্টি করেছিলেন জুলফিকার আলী ভূট্টো সাহেব। জেনোসাইডের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল যে কারণে তার সাথে আমাদের কোন সংশ্লিষ্টতা নেই।

মাননীয় আদালত, ২০০১ সালের নির্বাচনের পর মন্ত্রী হবার কারণে আর একটু রাগ হয়েছিল, আমীরে জামায়াত নির্বাচিত হওয়ার পর আমি বেশি নজরে আসি, মন্ত্রী হওয়ার পর আর একটু বেশী নজরে আসি। কিন্তু আমি আপনার নিকট পরিষ্কার বলতে চাই মন্ত্রী হয়ে দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের বিপক্ষে বা স্বার্থের বিপক্ষে কোন কাজ করিনি। মাননীয় আদালত, কোন সরকারই শেষ সরকার নয় এবং দুনিয়ার কোন বিচারই শেষ বিচার নয়, এই বিচারের পরেও আর একটি বিচার হবে। আমাকে, আপনাকে, সকলকেই সেই বিচারের সম্মুখীন হতে হবে। এই বিচারের জন্য কিভাবে সাক্ষী যোগাড় করা হয়েছে, কিভাবে বাদী বানানো হয়েছে, কিভাবে ইনভেস্টিগেশনের নামে একটি প্রতিহিংসা পরায়ণ রাজনীতি চরিতার্থ করার জন্য হিংসাত্মক অভিযান চালানো হয়েছে।

একটি হাদীস হলো-একজন লোকের মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শুনল তাই বলে দিল। রাসুলুল্লাহ ﷺ এর এই কথার ভিত্তিতে

www.pathagar.com

শোনা কথা কোন মামলা-মকদ্দমায়, কোন বিচারে প্রমাণ হিসেবে গৃহীত হতে পারে না। দ্বিতীয় হাদীসটি হল বিচারকের দায়িত্ব কর্তব্য ও মর্যাদা সম্পর্কে, বিচারক তিন শ্রেণীর-প্রথম শ্রেণীর বিচারক, যারা হক উদঘাটন করে, উপলব্ধি করে হকের পক্ষে রায় দেয় তারা জান্নাতী, আর এক শ্রেণী হল যারা হক বুঝবে কিন্তু রায় দেবে বিপরীত, তারা জাহান্নামী, আরেকটা শ্রেণী যারা না বুঝে রায় দেবে তারাও জাহান্নামী। আমি প্রাণ খুলে দোয়া করি, আপনারা এই ট্রাইব্যুনালের দায়িত্বে আছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ভাষায়, আল্লাহ আপনাদের প্রথম শ্রেণীর বিচারক হওয়ার তাওফীক দান করুন এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় শেণীভুক্ত হওয়া থেকে হেফাজত করুন।"

আমীরে জামায়াত মাওলানা নিজামীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের কিছু গুরুত্বপূর্ণ অসঙ্গতি

- আল বদর কমান্ডার হিসেবে বুদ্ধিজীবী হত্যার দায় চাপানো হয়েছে। কিন্তু ১৯৭১ সালের যত পত্রিকা এবং গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্ট আছে, তার কোথাও আল বদর বাহিনীর সাথে মাওলানা নিজামীর দূরতম কোনো সম্পর্ক আছে বলে প্রমাণ নেই। এসব পত্রিকা ও গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্ট সরকার পক্ষই আদালতে দাখিল করেছিল।
- সাক্ষী শ্যামলী নাসরিন চৌধুরী ও সালমা হক বলেছেন, ১৯৭১ সালের পত্রিকায় দেখেছেন মাওলানা নিজামী আল বদর বাহিনীর প্রধান, কিন্তু সরকারপক্ষের দাখিল করা ১৯৭১ সালের কোনো পত্রিকায়ই এ ধরনের খবর নেই। এ ব্যাপারে আদালতের যুক্তি, পত্রিকায় না থাকলেও তারা ২ জন যেহেতু সমাজের সম্মানিত ব্যক্তি, ধরে নিতে হবে তারা পত্রিকায় দেখেছেন।
- বলা হয়েছে ছাত্রসংঘ মানেই আল বদর। যেহেতু মাওলানা নিজামী ছাত্রসংঘের প্রধান ছিলেন, সেহেতু তিনি পদাধিকার বলে আল বদর বাহিনীরও প্রধান। মাওলানা নিজামী ছাত্রসংঘের প্রধান ছিলেন ১৯৭১ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর। এর পর থেকে তিনি ছাত্রসংঘে ছিলেন না। বুদ্ধিজীবী হত্যার ঘটনা সেপ্টেম্বরের পরে হয়েছে। সেই হত্যাকান্ডের দায় দায়িত্ব তার ওপর চাপানো হয় কিভাবে?
- এ ব্যাপারে আদালত বলেছেন, মাওলানা নিজামী ৫ বছর ছাত্রসংঘের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। তাই তিনি ছাত্রসংঘ থেকে অবসর নিলেও একদিনে তাঁর এই সম্পর্ক শেষ হয়ে যায় না। এর চেয়ে খোঁড়া অজুহাত আর কী হতে পারে?

www.pathagar.com

- বুদ্ধিজীবী হত্যাকান্ড নিয়ে দুইজন মহিলা সাক্ষী বলেছেন, তাদের স্বামীকে যারা ধরে নিয়ে যায়, তারা বলেছে, হাইকমান্ড নিজামীর নির্দেশে তারা ধরে নিয়ে যাচ্ছে। এ দু'টি ঘটনা নিয়ে মামলা হয়। বুদ্ধিজীবী হত্যাকান্ড নিয়ে এ রকম আরো ৪০টিও বেশি মামলা হয়েছিল। এসব মামলার কোথাও মাওলানা নিজামীর নাম তখন আসেনি। ওই দুই মহিলা সাক্ষী তাদের স্বামীদের হত্যাকান্ডের বর্ণনা দিয়ে বিভিন্ন গণমাধ্যমে অসংখ্যবার সাক্ষাৎকার দিয়েছেন। একজন সাক্ষী তার স্বামীর হত্যাকান্ড নিয়ে বই লিখেছেন। আরেকজন শাহরিয়ার কবিরের মতো চরম জামায়াতবিদ্বেষী মানুষের বইয়ে তার স্বামীর হত্যাকান্ড নিয়ে বিশদ বর্ণনা দেন। এ সবের কোথাও তারা এ ঘটনার সাথে মাওলানা নিজামীর দূরতম কোনো সম্পর্ক ছিল, তা বলেনি। এমনকি এ মামলার তদন্ত কর্মকর্তার কাছেও তারা মাওলানা নিজামীর নাম বলেনি। শুধুমাত্র রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে তারা আদালতে এসে প্রথমবারের মতো মাওলানা নিজামীর নাম বলে।

  এ ব্যাপারে আদালত বলেন, হয়তো এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেছে, অথবা ভুলবশত বলার পরও লিখেনি। যেখানে মাওলানা নিজামী একমাত্র আসামি, সেখানে তার ব্যাপারে তদন্ত কর্মকর্তার জিজ্ঞেস করতে ভুলে যাওয়া বা লিখতে ভুলে যাওয়ার কথা বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে?

- ১৯৭১ সালে মাওলানা নিজামী পরিচিত ছাত্রনেতা ছিলেন, তিনি সে সময় বাংলাদেশের যে স্থানেই গিয়েছেন, পত্রপত্রিকায় রিপোর্ট এসেছে। এমনকি সরকারের গোপন গোয়েন্দা রিপোর্ট, যা সরকার আদালতে দাখিল করেছে, সেখানেও বর্ণিত রয়েছে। ১৯৭১ সালে তিনি পাবনা গিয়েছেন, এ মর্মে কোনো রিপোর্ট পত্রিকায়ও আসেনি। গোয়েন্দা রিপোর্টেও ছিল না। এমনকি কট্টর জামায়াতবিদ্বেষী ড. এম এ হাসান তার লিখিত বই 'যুদ্ধাপরাধ গণহত্যা ও বিচারের অন্বেষণ' চার্জে বর্ণিত পাবনার ঘটনাসমূহের বিস্তারিত বর্ণনা দিলেও কোথাও মাওলানা নিজামীর নাম উল্লেখ করেননি। সরকার ১৯৭২ সালে পাবনা জেলার রাজাকার, আল বদর ও স্বাধীনতাবিরোধীদের যে তালিকা তৈরি করে, সেখানে কোথাও মাওলানা নিজামীর নাম নেই। এ ব্যাপারেও আদালত বলেন যে, ১৯৭২ সালে প্রস্তুতকৃত রাজাকার, আল বদরের প্রাথমিক তালিকা ছিল, সেখানে সমস্ত রাজাকার, আল বদরের নাম থাকা জরুরি নয়। এটা কি বাস্তবসম্মত যুক্তি হতে পারে? কেননা, এই মামলায় মাওলানা নিজামীকে রাজাকার আল বদরদের নেতা হিসেবে চিত্রায়িত করা হয়েছে। এমনকি দাবি করা হয়েছে, পাকিস্তানি আর্মি তার কথায় অপরাধ সংঘটিত করতো।

www.pathagar.com

এটা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয় যে, সরকার পক্ষের দাবি সত্য হলে, এমনকি প্রাথমিক তালিকায় তার নাম থাকবে না।

সর্বোপরি ১৯৮৬ সালের আগে, প্রথমবারের মতো জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে জনপ্রিয় ইসলামী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে তিনি আত্মপ্রকাশ করেন, তার আগে কোথাও কোন পত্রিকা/বই, মামলার নথিতে আল বদর প্রধান বা সদস্য অথবা বুদ্ধিজীবী হত্যাকান্ডের সাথে জড়িত অথবা পাবনা বা ঢাকায় ১৯৭১ সালে সংঘটিত কোনো অপরাধের সাথে জড়িত বলে কোথাও মাওলানা নিজামীর নাম আসেনি।

প্রধান বিচারপতি অ্যাটর্নি জেনারেলকে উদ্দেশ্য করে যা বললেন

মাওলানা নিজামীর আপিল শুনানিতে প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহা অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলমকে বেশ কিছু প্রশ্ন করেন। এতে তিনি জিজ্ঞেস করেন, নিজামীর সরাসরি জড়িত থাকার বিষয়ে আপনাদের কাছে তো কোনো প্রমাণ নেই। এতে তাঁকে ফাঁসি দেয়া যাবে কি? প্রধান বিচারপতি অ্যাটর্নি জেনারেলের কাছে জানতে চান, "এটা কি কারেক্ট যে ১৯৮৬ সালের আগে নিজামী সাহেবের বিরুদ্ধে নাকি কিছুই নেই? আমাদেরকে একটা কিছু দেখান যেটা ১৯৮৬ সালের আগে প্রকাশিত।" অ্যাটর্নি জেনারেল কোনো কিছু দেখাতে ব্যর্থ হন।

এ সময় প্রধান বিচারপতি বলেন, মানবতাবিরোধী অপরাধ সংঘটিত হয়েছে এবং হত্যাও সংঘটিত হয়েছে এ বিষয়গুলো তো নিজামীর আইনজীবীরা স্বীকার করেছেন। কিন্তু নিজামী সরাসরি হত্যা, ধর্ষণে জড়িত ছিলেন এমন কোনো প্রমাণ আপনাদের কাছে আছে? প্রধান বিচারপতি আবার প্রশ্ন করেন, মানবতাবিরোধী অপরাধে সরাসরি অংশগ্রহণ না থাকলে তাঁকে ফাঁসি দেয়া যাবে কি?[৯১]

রায়ে মাওলানা নিজামীর আইনজীবীর প্রতিক্রিয়া

খন্দকার মাহবুব হোসেন

মৌলিক অধিকারবিহীন, অসাংবিধানিক ও একটি কালো আইনে বিশেষ উদ্দেশ্যে মানবতাবিরোধী অপরাধের এবং নিজামীর বিচার হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন তাঁর আইনজীবী খন্দকার মাহবুব হোসেন। ৫ মে রায় ঘোষণার পর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় সাংবাদিকদের তিনি এসব কথা বলেন। খন্দকার মাহবুব হোসেন বলেন, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল আইনটি করা হয়েছিল ১৯৫ জন পাকিস্ত

[৯১] সূত্র : শীর্ষ নিউজ, এনটিভি অনলাইন ০৭ ডিসেম্বর ২০১৫

www.pathagar.com

ানি সেনার বিচারের জন্য। কিন্তু মূল হোতাদের বাদ দিয়ে তাদের সহযোগীদের বিচার করা হচ্ছে। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এর মূল্যায়ন করবে। এখনো বলছি ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন যে এই আইনে বিচার সঠিক হয়েছিল কি না। তিনি বলেন, এই আইনে এমন কিছু বিধান আছে যা আমাদের সাক্ষ্য আইন ও ফৌজদারি কার্যবিধি কার্যকর না। তিনি বলেন, এখানে সাক্ষী দেয়া হয় শোনা কথার ওপর ভিত্তি করে। তাই এই শিখানো সাক্ষীর ভিত্তিতে যখন যার বিরুদ্ধে খুশি মিথ্যা অভিযোগ আনা হয়।

ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাক[৯২]

মাওলানা নিজামী রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের শিকার তাঁর রক্ত বৃথা যেতে পারে না। আজ থেকে ৬ বছর আগে ২৯ জুন ২০১০ সালে ধর্ম অবমাননার মামলায় মাওলানা নিজামীকে গ্রেফতার করা হয়। তারপর তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধের অভিযোগ আনা হয়, এটা বিশ্বের ইতিহাসে নজিরবিহীন। মাওলানা নিজামীকে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার মাধ্যমে হত্যা করা হয়েছে। বিশ্বের ইতিহাসে অনেক যুদ্ধাপরাধের বিচার হয়েছে নুরেমবার্গ থেকে সিওরালিয়ন কিন্তু মাওলানা নিজামী ৪০ বছর দেশে থাকার পরও কেউ কোনো দিন যুদ্ধাপরাধের অভিযোগ আনেননি। সরকার আইন ভঙ্গ করেছে এবং মানবাধিকার লঙ্ঘন করেছে।[৯৩]

'যে রাতে আব্বু জান্নাতের পাখি হয়ে চলে গেলেন'

-ডা. নাঈম খালেদ

মাগরিবের কিছু আগে কারা কর্তৃপক্ষ ফোন করে মিঠু ভাইকে (আমার শহীদ পিতার ব্যক্তিগত সহকারী) জানালেন সন্ধ্যা সাতটার মধ্যে পরিবারের সদস্যরা যেন সাক্ষাতের জন্য জেলগেটে চলে আসে। এটা শেষ সাক্ষাৎ কিনা কারা কর্তৃপক্ষ তা স্পষ্ট করে বলতে অস্বীকার করে। অনেকটা অনিশ্চয়তার মধ্যেই আমরা বাসা থেকে তিনটি গাড়িতে করে কেন্দ্রীয় কারাগারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেই। সাংবাদিকদের ভিড় ও নিরাপত্তা বেষ্টনী পার হয়ে আমরা ২৬ জন কেন্দ্রীয় কারাগারের ভেতরে প্রবেশ করি। সেখানে কারা প্রশাসনের ইস্যু করা চিঠি রিসিভ করে বুঝতে পারলাম এটাই আমাদের আব্বুর সাথে বিদায়ী সাক্ষাৎ। নিরাপত্তা তল্লাশি শেষে আমাদের নিয়ে যাওয়া হলো কনডেম সেলে আব্বুর কক্ষে। সেলটির নাম রজনীগন্ধা। সেলের সর্বশেষ কক্ষ ৮ নম্বর প্রকোষ্ঠে আব্বু ছিলেন। রুমটি জানালা বিহীন, দৈর্ঘ্যে প্রস্থে আনুমানিক ৮/৮ ফিট, একদিকে লোহার গরাদ দিয়ে ঘেরা আর তার সামনে ছোট একটি আধো অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রাঙ্গণ।

---

[৯২] শহীদ মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর প্রধান আইনজীবী।

[৯৩] সূত্র: মাওলানা নিজামীর শাহাদাতের পর লন্ডনের আলতাব আলী পার্কে অনুষ্ঠিত গায়েবানা জানাজায় দেয়া বক্তব্য।

www.pathagar.com

রুমের ভেতরে সবুজ একটি জায়নামাযে বসে আব্বু আমাদের উল্টাদিকে কেবলামুখী হয়ে দোয়া করছিলেন। শান্ত ও স্পষ্ট উচ্চারণে আরবিতে দোয়া করছিলেন, খুব উচ্চৈঃস্বরেও না আবার খুব নিচুস্বরেও না। প্রতিটি বাক্যের মাঝে স্বভাব সুলভ একটু বিরতি। ঠিক যেমনটা আমরা আমদের ছোট বেলা থেকে দেখে আসছি। পাশে হালকা বাদামি রঙের একটি বাচ্চা বিড়াল বসা। যেন উনার সাথে আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ জানাচ্ছে। মুয়াজ (উনার তিন বছর বয়সী নাতী) সিঁড়ি বেয়ে উঠে লোহার গরাদ ধরে বলল, "দাদু দরজা খোলো আমরা আসছি"। আব্বু শান্তভাবে মোনাজাত শেষ করে উঠে দাঁড়ালেন। আমাদের দেখে লোহার গরাদের কাছে এসে বললেন, "তোমরা আসছো? এটাই তাহলে শেষ দেখা?"

আমার বোন একটু আবেগপ্রবণ হয়ে বললেন, "আল্লাহ চাইলে এটা শেষ দেখা না-ও হতে পারে।" এর পরে একটু আবেগঘন পরিবেশের সৃষ্টি হলে উনি সবাইকে শান্ত থাকতে বললেন, সবর করতে বললেন। উনি শিকের ওপার থেকেই সবার সাথে হাত মেলালেন। উনার পরনে ছিল সাদা সুতি পাঞ্জাবি আর লুঙ্গি। গ্রীষ্মের ভ্যাপসা গরমে আর জানালাবিহীন রুমের কারণে উনার পাঞ্জাবিটি ঘামে ভেজা, কিন্তু মুখটা প্রশান্ত; কষ্ট বা উদ্বেগের লেশমাত্র নেই। দেখে কে বলবে একটু পরে উনার ফাঁসি দেবে এই জালিম সরকার।

শিকের ভেতর থেকে সবাই উনাকে দেখতে পাচ্ছিলাম না, উনিও সবাইকে দেখতে পাচ্ছিলেন না। উপস্থিত কারা কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করায় উনারা গেট খুলতে রাজি হলেন। আব্বু আঙ্গিনায় এসে আমাদের মাঝখানে একটি সাদা পাস্টিকের চেয়ারে বসলেন। প্রথমেই তিনি তার স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে সবার খোঁজ খবর নিলেন। এরপরই তিনি তার অবস্থান পরিষ্কার করে বলেন, "আমাকে জেল সুপার রিভিউ খারিজ সংক্রান্ত রায় পড়ে শুনানোর পর জানতে চান আমি রাষ্ট্রপতির কাছে ক্ষমা ও প্রাণ ভিক্ষা চাইবো কিনা। আমি তাদেরকে বলেছি আমি কোন অন্যায় করিনি, ক্ষমা চাওয়ার অর্থই হল দোষ স্বীকার করে নেয়া, সুতরাং ক্ষমা চাওয়ার প্রশ্নই আসে না। আর জীবন-মৃত্যুর মালিক একমাত্র আল্লাহ তায়ালা, তাই মানুষের কাছে প্রাণ ভিক্ষা চেয়ে ঈমান হারা হতে চাই না।"

আজ বিকেলে (১০ মে, ২০১৫) ডিআইজি প্রিজন এসে আমি যে রাষ্ট্রপতির কাছে প্রাণ ভিক্ষা চাই না তা লিখিতভাবে দিতে বলেন। আমি স্পষ্ট ভাষায় লিখে দেই যে আমি ক্ষমাও চাইবো না, প্রাণভিক্ষাও চাইবো না।"

এসময় সেখানে এক আবেগঘন পরিবেশের সৃষ্টি হয়। আব্বু সবাইকে সবর করার ও শক্ত থাকার নসিহত করছিলেন। উনার চোখে আমি কোন পানি দেখিনি। আবার উনাকে আবেগহীন রুক্ষও মনে হয়নি। মনে হচ্ছিল যেন এক

www.pathagar.com

প্রশান্ত আত্মা অপেক্ষা করছেন তার মহান রবের সাথে সাক্ষাতের জন্য। এরপর আম্মু ছাড়া আমরা সবাই আঙ্গিনা থেকে বের হয়ে আসি যাতে আব্বু আম্মুর সাথে একান্তে কিছু কথা বলতে পারেন।

আম্মু আব্বুকে সাহস যোগাচ্ছিলেন শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত শক্ত থাকার ব্যাপারে আর আল্লাহর কাছে শাহাদাতের উচ্চ মর্যাদার কথা বলছিলেন। আম্মু আরও বলেন আমরা আল্লাহর কাছে সাক্ষ্য দেব তুমি সৎ ও নেককার বান্দাহ ছিলে। তুমি কোন অন্যায় করোনি।

অন্যদিকে আব্বু আম্মুকে বলেন আজ থেকে তুমি ওদের বাবা ও মা দুটোই। তোমার মাঝে যেন ওরা আমাকে দেখতে পায়। আর তুমিও আমাদের সন্তানদের মাঝে আমাকে খুঁজে পাবে।

এরপর আমরা ভাইবোনেরা আবার ভেতরে যাই। আব্বু আমাদেরকে বলেন, "তোমরা ভাইবোনেরা মিলেমিশে থাকবে, আল্লাহ ও রাসূলের ﷺ পথে চলবে, মায়ের খেদমত করবে। তোমরা তোমাদের মায়ের মাঝেই আমাকে খুঁজে পাবে। আর তোমাদের আম্মা যেন তোমাদের মাঝে আমাকে খুঁজে পায়। তোমরা তোমাদের আব্বুকে যেভাবে দেখেছো সেটাই মানুষকে বলবে, আমার ব্যাপারে বাড়তি কথা বলা থেকে বিরত থাকবে। আমরা বয়স এখন ৭৫ বছর, আমার সহকর্মীদের অনেকেই আমার মত লম্বা হায়াত লাভ করেনি, তোমরা তোমাদের বাবাকে দীর্ঘদিন পেয়েছ, হায়াত মাউত আল্লাহর হাতে, আমার মৃত্যু যদি আল্লাহ আজকে রাতেই লিখে রেখে থাকেন তাহলে বাসায় থাকলেও মৃত্যু হত। সর্বাবস্থায় আল্লাহর প্রতি সুধারণা রাখবে আর শুকরিয়া আদায় করবে"।

এরপর আমরা আমাদের সন্তানদেরকে আব্বুর কাছে নিয়ে বলি আব্বু দেখেন আপনার তিন নাতীর নাম আপনার নামের সাথে মিল রেখে রাখা। দোয়া করবেন যেন তারা আপনার মত হতে পারে। আব্বু বলেন, "দোয়া করি ওরা যেন আমার চেয়েও অনেক বড় হয়, নবীর সাহাবাদের মত হয়।"

তখন তিনি একটা ঘটনা বললেন। একজন বড় আলেম তার সন্তানকে জিজ্ঞেস করেছিল তুমি কি হতে চাও? সে বলল, আমি তোমার মত বড় আলেম হতে চাই। তখন আলেমটি কাঁদতে শুরু করল। কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করলে আলেম বলেন, আমিতো হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর মত হতে চেয়েছিলাম আর এখন দেখ হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আর আমার মধ্যে কত ব্যবধান। এখন তুমি যদি আমার মত হতে চাও তবে তুমি কতদূর যেতে পারবে ভেবে দেখ।"

"মোমেন (মেঝো ছেলে) তো আমার থেকেও বড় আলেম, আমি অনেক বিষয়ে তার কাছ থেকে রেফারেন্স নেই।"

www.pathagar.com

আমরা বলি "আমরা তো আপনার জন্য কিছুই করতে করতে পারিনি"। উনি বললেন, "ফয়সালার মালিক আল্লাহ, তোমরা তো শুধু চেষ্টাই করতে পার। আমার চেয়ে বয়সে ছোট অনেক সাথীই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। আল্লাহ তো আমাকে অনেক আগেই দুনিয়া থেকে নিয়ে যেতে পারতেন। কোন যুদ্ধ না করেও যদি আল্লাহ শহীদী মর্যাদা দিতে চান সেটাতো পরম সৌভাগ্যের ব্যাপার।"

এরপর আব্বু ভিন্ন প্রসংগে যান। বিশেষ করে যারা তার জন্য, অন্যান্য নেতৃবৃন্দের জন্য সর্বোপরি ইসলামী আন্দোলনের জন্য কষ্ট করছেন তাদের সবাইকে ধন্যবাদ ও সালাম জানাতে বলেন। সকলের কাছে দোয়া কামনা করেন যেন আল্লাহ তায়ালা তার শাহাদাত কবুল করেন।

তখন আম্মু বলেন, আল্লাহ তোমাকে দুনিয়াতেও সম্মানিত করেছেন, আখেরাতেও সম্মানিত করবেন ইনশাআল্লাহ। আব্বু তখন বলেন, আমি সামান্য অজ পাড়াগাঁয়ের ছেলে। আল্লাহর রহমতে আমার জন্য গোটা দুনিয়া ও বড় বড় আলেমরা উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন, দোয়া করেছেন। আমার মুক্তির ব্যাপারে ওআইসিতে আলোচনা হবে দেখে শেখ হাসিনা ওআইসি সম্মেলনে যায়নি, এগুলোতো পরম সৌভাগ্যের ব্যাপার।

আমরা আব্বুকে বলি, আমাদের জন্য কাল কেয়ামতের দিনে আল্লাহর কাছে সুপারিশ করবেন, যেন আমরা জান্নাতে যেতে পারি। আব্বু বলেন, "তোমরা জান্নাতে যাওয়ার মত আমল কর, তাহলে ইনশাআল্লাহ জান্নাতে যেতে পারবে।"

এরপর আব্বু আমাদের অনুরোধে আল্লাহর কাছে দুহাত তুলে দোয়া করেন। প্রায় ঘন্টাখানেক এই মোনাজাত পর্ব স্থায়ী হয়। আল্লাহর প্রশংসা ও নবীর প্রতি দরূদ পাঠ করার পর প্রথমে প্রায় ২০ মিনিট, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর শিখিয়ে দেয়া মাসনুন দুআ গুলি, যেগুলি আব্বুকে সারা জীবন করতে দেখেছি সেগুলি পাঠ করেন।

অতঃপর তিনি বলেন, "হে আল্লাহ আমি তোমার এক নগণ্য গুনাহগার বান্দাহ, তুমি আমাকে যতটুকু তোমার দ্বীনের খেদমত করার তাওফিক দিয়েছো তা মেহেরবানি করে কবুল করে নাও। আমাকে ইসলাম ও ঈমানের উপর জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত টিকে থাকার তাওফিক দাও আর শাহাদাতের মৃত্যু দান কর। হে আল্লাহ তুমি আমাকে আর আমার বংশধরদেরকে নামায কায়েমকারী বানাও আর আমাকে আমার পিতামাতাকে আর সকল মুমিনদেরকে কাল কিয়ামতের দিনে ক্ষমা কর।

হে আল্লাহ আমাদেরকে পরিপূর্ণ ঈমান দান কর, তোমার উপর সত্যিকারের ভরসা করার তাওফিক দান কর। আমাদের জিহবাকে তোমার সার্বক্ষণিক

www.pathagar.com

জিকিরকারী বানাও। আমরা তোমার কাছে, তোমার ভয়ে ভীত অন্তর, উপকারী জ্ঞান, হালাল প্রশস্ত রিজিক, সুস্থ বুদ্ধি ও দ্বীনের সঠিক বুঝ ভিক্ষা চাচ্ছি। হে আল্লাহ আমাদেরকে মৃত্যুর পূর্বে তওবা করার তাওফিক দাও, মৃত্যুর সময় আরাম দান কর, মৃত্যুর পরে তোমার ক্ষমা লাভ করার তাওফিক দাও ও দোযখের আগুন থেকে রক্ষা কর।

হে আল্লাহ তোমার হালালকৃত জিনিসের মাধ্যমে হারাম থেকে বেঁচে থাকার তাওফিক দাও, তোমার আনুগত্যের মাধ্যমে তোমার নাফরমানি থেকে বেঁচে থাকার তাওফিক দাও আর আমাদেরকে তুমি ছাড়া কারও মুখাপেক্ষী করো না। আল্লাহ্ তোমার নূর দিয়ে আমাদেরকে হেদায়াত দান কর। আমাদের সকল গুনাহ খাতা তোমার সামনে পরিষ্কার, তোমার কাছেই ক্ষমা চাচ্ছি ও তোমার নিকট প্রত্যাবর্তন করছি। ইয়া হান্নান ইয়া মান্নান।"

তিনি আরও দোয়া করেন, "হে আল্লাহ্ তুমি এই দেশকে তোমার দ্বীনের জন্য কবুল করে নাও, এই দেশের জন্য শান্তির ফয়সালা করে দাও। এ দেশকে গুম, খুন, রাহাজানি ও আধিপত্যবাদীদের হাত থেকে রক্ষা কর"। তিনি দেশ ও দেশবাসীর সুখ সমৃদ্ধির জন্যও দোয়া করেন। এই আবেগঘন মোনাজাতের সময় আমার মেয়ে কয়েকজন জেল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর চোখে পানি দেখেছেন বলে পরে আমাকে জানায়।

মোনাজাত শেষে আব্বু মোমেনকে জিজ্ঞাস করেন, তিনি ফাঁসির মঞ্চে লুঙ্গি পরে না পাঞ্জাবি-পায়জামা পরে যাবেন? মোমেন বলে, পাঞ্জাবি-পায়জামা পরে যাবেন।

ব্যক্তিজীবনে একজন চিকিৎসক হওয়ায় আমাকে এর আগে বহু মৃত্যু দেখতে হয়েছে। বহু লোককে দেখেছি রোগে শোকে মৃত্যুর প্রহর গুনতে। আমি দেখেছি তাদের চেহারায় মৃত্যুর ছায়া, কিংবা একটি মুহূর্ত বেশি বেঁচে থাকার আকুতি। কিন্তু আব্বুকে শেষ সাক্ষাতে দেখতে গিয়ে আমি জীবনে প্রথম দেখলাম নির্ভীক একজন জান্নাতী মেহমানকে, তাঁর মহান রবের সাথে মিলিত হওয়ার পূর্ব প্রস্তুতি নিতে। আব্বুর কাছে সুযোগ ছিল রাষ্ট্রপতির কাছে ক্ষমা চাওয়া নিয়ে কালক্ষেপণ করার। মৃত্যুর সময় আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত তা আমরা সবাই জানি। আজ দেখলাম অন্তরে সেই বিশ্বাসকে ধারণ করে কিভাবে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে হয়।

আব্বুর সাথে যারাই মিশেছেন তারাই সাক্ষী দিবেন আব্বু খুবই নরম মনের মানুষ ছিলেন। উনার কাছের ও দূরের সব মানুষের খুঁটিনাটি বিষয়েও খোঁজ খবর রাখতেন। কারও কিছু হলে পেরেশান হয়ে বারবার খবর নিতেন। যেটা সবার প্রতি তার মমতা ও আবেগের বহিঃপ্রকাশ। এর আগে বিভিন্ন সময়ে আমাদের পারিবারিক সাক্ষাৎগুলোতে তিনি প্রায়ই নিজের ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলতেন, আমার মন বেশি নরম, আমি কি শেষ পর্যন্ত শক্ত থাকতে পারব?

www.pathagar.com

এরকম একজন মানুষের নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে সমস্ত জাগতিক মায়া মমতা ও আবেগের ঊর্ধে উঠে শান্ত ও ধীরস্থিরভাবে কথা বলা সত্যিই বিস্ময়কর।

সাক্ষাতের শেষ পর্যায়ে আব্বু জিজ্ঞেস করলেন সাঁথিয়ায় দাফন করতে কে কে যাবে? আমি বললাম আমি আর মোমেন যাব। তিনি তার স্বভাব সুলভ ভঙ্গিতে সাবধানে যেতে বললেন আর মিঠু ভাইকে সাথে রাখতে বললেন। আম্মাকে রাতে সাঁথিয়া যেতে মানা করলেন। মোমেনকে জানাযার নামাযের ইমামতি করতে বললেন। মোমেন প্যান্ট শার্ট পরে ছিল, তিনি বললেন পাঞ্জাবি পরে জানাযা পড়াতে।

আব্বুর শেষ নসিহত-

তিনি সবাইকে কুরআন-হাদীস মেনে চলার ও আল্লাহ ও তার রাসূলের ﷺ পথে চলার উপদেশ দেন। যে কোন পরিস্থিতিতে সবর করার ও আল্লাহর উপর রাজি খুশি থাকতে বলেন। আমার পরিষ্কার খেয়াল নেই উনি এই সাক্ষাতে নামাযের ব্যাপারে আলাদাভাবে বলেছেন কিনা তবে আগের প্রায় প্রতিটি সাক্ষাতে তিনি নামাযের ব্যাপারে বিশেষ তাগাদা দিতেন।

এরপর উনি বলেন আমার অসিয়তগুলো তোমরা আমার লেখা বইগুলোতে পাবে। বিশেষ করে জেলে বসে লেখা দুটি বই- কুরআন হাদীসের আলোকে রাসূল মুহাম্মদ ﷺ ও আদাবে জিন্দেগী এবং আগে লেখা বই কুরআনের আলোকে মুমিনের জীবন' প্রভৃতি বইগুলো পড়তে বলেন।

সবশেষে আমার সবচেয়ে বড়বোন মহসিনা আপাকে বললেন, "আম্মু আমি তোমাকে নিয়ে বেশি চিন্তিত, তুমি আমার মা, আমার সবচেয়ে বড় সন্তান, তোমার মুখেই প্রথম আমি আব্বু ডাক শুনেছি। তুমি শান্ত থেক।" আম্মুকে বললেন, "আমার সোনার টুকরা ৬ ছেলে-মেয়েকে রেখে গেলাম তুমি এদের মাঝেই আমাকে খুঁজে পাবে। তোমরা যাও, আমি তোমাদের যাওয়া দেখি।"

আমরা একে একে হাত মিলিয়ে আমাদের জান্নাতী বাবার কাছ থেকে বিদায় নিলাম। ছোট্ট বিড়ালটিও আমাদের পিছু নিল। শেষ সময়ের দেখা আব্বুর উজ্জ্বল চেহারাটি সারাটি পথ চোখে ভাসছিল। কোথায় যেন শুনেছিলাম some birds are not meant to be caged, their feathers are just too bright.

জেল থেকে বের হয়ে রওয়ানা হলাম সাঁথিয়ার উদ্দেশ্যে, জীবিত বাবাকে রেখে চললাম তার দাফনের প্রস্তুতি নিতে। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সেই হাদীসটি তখন বারবার মনে পড়ছিল, যখন তোমরা কোন বিপদ মুসিবতে পড়বে তখন স্মরণ কর সবচেয়ে বড় মুসিবতের কথা। সেটা হবে আমাকে হারানোর মুসিবত। (ইবনে মাজাহ)। এই উম্মত রাসূলুল্লাহ ﷺ কে হারানোর কষ্ট সহ্য করেছে। এই উম্মত সবই সহ্য করতে পারবে। রাব্বানা আফরিগ আলাইনা সাবরাও ওয়া সাব্বিত আকদামানা ওয়ানসুরনা আলাল কাওমিল কাফিরিন।[৯৪]

[৯৪] লেখক: শহীদ মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর মেঝো ছেলে।

www.pathagar.com

আমি প্রস্তুত

পরিবারের সাথে শেষ সাক্ষাতের সময় সবাইকে নিয়ে মোনাজাত শেষে মাওলানা নিজামী তার ছেলে ব্যারিস্টার নাজিব মোমেনকে জিজ্ঞেস করেন, তিনি ফাঁসির মঞ্চে লুঙ্গি পরে না পাঞ্জাবি-পায়জামা পরে যাবেন? মোমেন বললেন, পাঞ্জাবি-পায়জামা পরে যাবেন। আল্লাহর প্রিয় বান্দা, মর্দে মুজাহিদ মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী শাহাদাতের অমিয় সুধা পান করার প্রেরণায় কতটা ব্যাকুল ছিলেন, তা এখান থেকেই স্পষ্ট বুঝা যায়। পরিবারের সদস্যদের বিদায় দিয়ে মহান রবের পানে যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে থাকেন মাওলানা নিজামী। জল্লাদরা যখন তার কক্ষের সামনে যায়, তিনি বললেন, 'আমি প্রস্তুত'। কখন ফাঁসি কার্যকর হবে? এখানেই শেষ নয়, ফাঁসির মঞ্চে ওঠে ফাঁসি কার্যকরের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহর একত্বের ও রিসালাতে মুহাম্মদীর সাক্ষ্য "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" উচ্চস্বরে উচ্চারণ শেষ হলে সর্বশেষ মাবুদের দরবারে তাঁর আকুতি ছিলো, "হে আল্লাহ আমাকে শহীদ হিসেবে কবুল করে নিন"। একজন মর্দে মুজাহিদ ও ইসলামের বীর সিপাহসালার হিসেবে নিজের অনুসৃত আদর্শ ও জীবন-কর্ম সম্পর্কে কতটা দৃঢ় আস্থা ও নিঃসংশয় থাকলে ফাঁসির মঞ্চ থেকে মাত্র কয়েক গজ দূরে দাঁড়িয়ে এভাবে পরিবারের সদস্যদেরকে প্রয়োজনীয় গাইড লাইন দেয়া যায় এবং নিজের অভীষ্ট লক্ষ্যে অর্থাৎ জান্নাতের পথে অত্যন্ত ধীরস্থীর শান্ত মেজাজে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব। এ যেন মহান আল্লাহ তা'য়ালা আল-কুরআনে জান্নাতি মানুষের যে নমুনা উপস্থাপনা করেছেন, তারই বাস্তব প্রতিচ্ছবি। নিঃসন্দেহে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, মহান আল্লাহ তা'য়ালা মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীকে শহীদি মর্যাদা দিয়ে জান্নাতের সর্বোচ্চ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেছেন। মহান আল্লাহ তা'য়ালার বাণী হলো- "যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়, তাদেরকে তোমরা মৃত বলো না বরং তার জীবিত। কিন্তু তোমরা তা উপলব্ধি করতে পারো না।" (বাকারা- ১৫৪)

আল্লাহ তায়ালার ঘোষণা, "এরা তাদের মুখের ফুঁ দিয়ে আল্লাহর নূরকে নিভিয়ে দিতে চায়। অথচ আল্লাহর ফয়সালা হলো তিনি তার নূরকে পূর্ণরূপে বিকশিত করবেন। কাফেররা তা যতই অপছন্দ করুক না কেন।" (সফ- ৮) তারা ইসলামী নেতৃবৃন্দকে হত্যা করে ইসলামী আন্দোলনকে দমন করতে চায়। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী জুলুম-নির্যাতনের স্টিম রোলার চালিয়ে ইসলামী আদর্শবাদী আন্দোলন কিংবা তার অনুসারীদেরকে দমানো যায় না। বরঞ্চ নির্যাতন-নিপীড়নের ফলে আন্দোলনের কর্মীদের ঈমান আরো মজবুত হয় এবং আন্দোলন আরো বেগবান ও তীব্র গতি পায়। তাই মাওলানা নিজামীকে হত্যা করে এদেশ থেকে তাঁর আদর্শকে নিঃশেষ করা যাবে না। শহীদদের শাহাদাতের

www.pathagar.com

সাক্ষ্যকে বহন করে এগিয়ে নিয়ে চলবে শহীদের সাথীরা। দেশবাসীকে সাথে নিয়ে এদেশে ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার কাজকে আরো বেগবান করার মধ্য দিয়ে শহীদ মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর প্রতিটি ফোঁটা রক্তের বদলা নিতে হবে।

অশ্রুসিক্ত ভালোবাসায় প্রিয় নেতার বিদায়

রায় কার্যকরের নির্বাহী আদেশ ১০ মে সন্ধ্যায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে কারাগারে পাঠানো হয়। রাত ১২টা ১০ মিনিটে মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী মহান রবের পানে চলে যান। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। রাত ১টা ৩০ মিনিটে কারা কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে শহীদ নিজামীর লাশবাহী অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে রওনা করে তার গ্রামের বাড়ির উদ্দেশে। সকাল ৬টা ৪০ মিনিটে লাশবাহী বহর পৌঁছে সাঁথিয়ার মনমথপুরে জন্মভূমিতে। সেখানে পূর্ব থেকেই উপস্থিত ছিলেন তার পরিবারের সদস্যগণ ও হাজারো শোকাহত জনতা। শহীদ নিজামীর কফিনবাহী গাড়ির বহর বাড়িতে পৌঁছলে সেখানে এক হৃদয়বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হয়। সাধারণ মানুষ তাদের নেতাকে এক নজর দেখার জন্য আকুতি করতে থাকে এবং ঢুকরে কেঁদে ওঠে। কিন্তু মানুষের এই কান্না আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হৃদয় গলাতে পারেনি, ফলে শেষবারের মত তাদের প্রিয় নেতার মুখ দেখতে পারেনি সাধারণ জনতা। তাদের সমস্বরের কান্নায় মনমথপুরের আকাশ বাতাস ভারি হয়ে ওঠে। উপস্থিত জনস্রোত সামলাতে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকেও হিমশিম খেতে হয়।

তারপর কফিনবাহী অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে যাওয়া হয় বাড়িসংলগ্ন মনমথপুর কবরস্থানে। সেখানে পূর্ব থেকেই অপেক্ষমান হাজার হাজার মানুষ সারিবদ্ধ হয়ে জানাযায় দাঁড়িয়ে যায়। সকাল ৭টায় অনুষ্ঠিত জানাযায় হাজার হাজার মানুষ শরিক হন। জানাযা শেষ হওয়ার সাথে সাথেই আইনশৃংখলা বাহিনীর লোকেরা লাশ নিয়ে যায় কবরস্থানে। বাঁধভাঙা জোয়ারের মতো সাধারণ মানুষ কবরস্থানে ঢুকে পড়তে চাইলে আইনশৃংখলা বাহিনী তাদের বাধা দেয়। তাদের বাধা উপেক্ষা করে হাজার-হাজার মানুষ কবরস্থানে প্রবেশ করে। শতবাধা বিপত্তি উপেক্ষা করে দাফনের পর একই স্থানে ২৬ বার গায়েবানা জানাযা অনুষ্ঠিত হয়, যা ইতিহাসে বিরল।

দেশে-বিদেশে জানাযা

মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর গায়েবানা জানাযা দেশে বিদেশে বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত হয়। এসব জানাযায় লাখ লাখ জনতা অংশগ্রহণ করে। কেন্দ্রীয়ভাবে ১১ মে জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমে একাধিক গায়েবানা জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত তৌহিদী জনতা মাওলানা নিজামীর জন্য চোখের

www.pathagar.com

পানি ফেলে আল্লাহর কাছে তাঁর শাহাদাতের মর্যাদা কামনা করেন। গায়েবানা জানাযা শেষ হওয়ার পর মুসল্লিরা শ্লোগান দিতে দিতে ও ভি চিহ্ন দেখিয়ে মসজিদ থেকে বের হয়ে যান। এ ছাড়া দেশের প্রতিটি জেলা ও বিভিন্ন উপজেলা, জনপদে গায়েবানা জানাযা অনুষ্ঠিত হয়।

দেশের বাইরে মসজিদে হারাম, মসজিদে নববী, জেদ্দা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্ক, মিশিগান, ব্রুকলেন, লন্ডনের আলতাব আলী পার্ক, তুরস্কের আঙ্কারা, ইস্তাম্বুল, ওমান, বাহরাইন, কাতার, মালয়েশিয়া, কুয়েত, জাপান, অস্ট্রেলিয়ার সিডনি, কানাডার মন্টিয়াল, দক্ষিণ আফ্রিকা, পাকিস্তান, কাশ্মিরসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শহীদ মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর মাগফেরাত কামনায় অসংখ্য গায়েবানা জানাযা অনুষ্ঠিত হয়।

আল্লাহ বলেন- "যারা আল্লাহর ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান এনেছে তারাই তাদের রবের কাছে 'সিদ্দীক' ও 'শহীদ' বলে গণ্য। তাদের জন্য তাদের পুরস্কার ও 'নূর' রয়েছে। আর যারা কুফরী করেছে এবং আমার আয়াতকে অস্বীকার করেছে তারাই দোযখের বাসিন্দা। (৫৭:১৯) হযরত উম্মে হারেসা বিনতে সারাকা থেকে বর্ণিত, "তিনি হুজুর ﷺ এর দরবারে এসে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি কি হারেসা সম্পর্কে কিছু বলবেন না? জঙ্গে বদরের পূর্বে একটি অজ্ঞাত তীর এসে তাঁর শরীরে বিঁধে যায় এবং তিনি শহীদ হন। যদি তিনি জান্নাতবাসী হয়ে থাকেন তাহলে আমি সবর করবো, অন্যথায় প্রাণ ভরে কাঁদব। হুজুর ﷺ জবাব দিলেন, হারেসার মা, বেহেশতে তো অনেক বেহেশতবাসীই রয়েছেন, তোমার ছেলে তো সেরা ফেরদাউসে রয়েছেন।" আনাস (রা) থেকে বর্ণিত নবীজি বলছেন, বালা মুসিবত অর্থাৎ পরীক্ষা যত কঠিন হবে, তত বড় পুরস্কার প্রদান করা হবে। (যদি বান্দা বিপদ মুসিবতে দিশেহারা হয়ে সত্যের পথ থেকে সরে না যায়।)

হযরত রাশেদ বিন সা'দ জনৈক সাহাবী থেকে বর্ণনা করেছেন। কোনো এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! কবরে সকল মুমিনের পরীক্ষা হবে, কিন্তু শহীদের হবে না, এর কারণ কী? হুজুর ﷺ জবাবে বললেন, "তার মাথার ওপর তলোয়ার চমকানোই তার পরীক্ষার জন্য যথেষ্ট।"

ঈমান-ইলম, আমল, সংগঠন পরিচালনা শহীদ মাওলানা নিজামী ছিলেন মাওলানা মওদূদীর-ই প্রতিচ্ছবি ধীশক্তিসম্পন্ন। শহীদ মাওলানা নিজামী স্থির চিন্তার ব্যক্তিকে বিশ্ববাসী দেখেছে ২৮ অক্টোবর ২০০৬ পল্টনের রক্তাক্ত প্রান্তরে। এমনই এক দিনে মাওলানা মওদূদীর সম্মেলনে যখন হামলা চালানো হয়েছিল। মাওলানা মওদূদীকে লক্ষ্য করে যখন মুহুর্মুহু গুলি করা হচ্ছিল তখন সবাই বসে পড়ল। আর চিৎকার করে সবাই বলল, মাওলানা বসুন বসুন! সেদিন

www.pathagar.com

তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বললেন, আমিই যদি বসে যাই তাহলে দাঁড়িয়ে থাকবে কে? তার আল্লাহর প্রতি অগাধ তাওয়াক্কুল সেদিন সবাইকে উজ্জীবিত করেছিল। ঠিক তেমনি ২৮শে অক্টোবর ১৪ দলের সন্ত্রাসীদের মুহুর্মুহু গুলির আওয়াজ স্তব্ধ করতে পারেনি শহীদ মাওলানা নিজামীর দৃঢ় কদমকে। অসংখ্য ভাইয়ের শাহাদাত, আহত, রক্তাক্ত জমিনে দাঁড়িয়েও শহীদ মাওলানা নিজামীর কণ্ঠ ছিল তেজোদীপ্ত। ছিলেন আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুলে ভরপুর। ছিলেন পাহাড়ের মতো অটল এবং অবিচল। সে দিন যেন মাওলানা মওদূদীরই প্রতিচ্ছবি-ই দেখেছি।

শাহাদাতের পর এলাকাবাসীর অভিমত

শহীদ মাওলানা নিজামীর সাথেই পড়াশুনা করতেন মাওলানা আব্দুল হাই বাচ্চু, সাবেক অধ্যক্ষ, পুষ্পপাড়া কামিল মাদ্রাসা। তিনি কান্নাজড়িতকণ্ঠে বলেন, মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী অত্যন্ত ভাল মানুষ ছিলেন। ছাত্রজীবনে ৭ বছর আমরা এক সঙ্গে ছিলাম। তিনি নিয়মিত তাহাজ্জুদ নামাজ পড়তেন, মসজিদে আজান হওয়ার সাথে সাথে জামাতের সাথে নামাজ পড়তেন।

শহীদ নিজামীর বাল্যবন্ধু মনমথপুর গ্রামের আব্দুল বারি খাঁ (৮০)। তিনি বলেন, তিনি কখন উচ্চবাক্যে কথা বলেননি, সহজ সরল মানুষ, রাগ ছিল না। যেসব অভিযোগের ভিত্তিতে হত্যা করা হলো তা আমি বিশ্বাস করি না। একই গ্রামের মো: রইছ উদ্দিন (৮৪) বলেন, নিজামী মাটির মানুষ ছিলেন, সে কারো ক্ষতি করেনি, ক্ষতি করতেও পারে না। ষড়যন্ত্রমূলকভাবে তাকে হত্যা করা হয়েছে।

চোমরপুর গ্রামের মো: আমিন উদ্দিন (৬৯) বলেন, মতিউর রহমান নিজামী সৎ, চিন্তাশীল, মেধাবী ও সহনশীল মিষ্টিভাষী মানুষ ছিলেন। অল্পতে তুষ্ট থাকতেন, তাঁর বিরুদ্ধে এ অভিযোগ আমার বিশ্বাস হয় না। কোনাবাড়িয়ার মাওলানা সাহাব উদ্দিন (৭২) বলেন, নিজামী সাহেব অত্যন্ত ভদ্র, নরম সৎ ও সুন্দর আচরণের মানুষ ছিল। আমার জীবনে তাকে কোন সন্ত্রাসী বা অন্যায় কর্মকান্ডের সাথে জড়িত থাকতে দেখিনি। সে মানুষের জন্য নিবেদিত প্রাণ ছিল।

বীর মুক্তিযোদ্ধা খন্দকার নাছির উদ্দিন নাছির বলেন, মাওলানা নিজামী, এ দেশের সত্যিকারের একজন দেশপ্রেমিক, ইসলামী চিন্তাবিদ। যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে তাকে পাবনাতে কোনদিন দেখা যায়নি, তার নামও শুনা যায়নি। পাবনাবাসী ও পাবনার সকল মুক্তিযোদ্ধা তা জানে। তিনি সাঁথিয়া উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স তৈরি করে দেন।

বীর মুক্তিযোদ্ধা অ্যাডভোকেট হামিদুর রহমান বলেন, আমি ছাত্রজীবন থেকে তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে চিনি, তিনি আমার বড় ভাইয়ের সহপাঠী ছিলেন। তিনি ছাত্রজীবন থেকেই সত্যনিষ্ঠ ন্যায়পরায়ণ ও ছাত্রনেতা ছিলেন। স্বাধীনতাযুদ্ধের

www.pathagar.com

সময় পর্যন্ত তাকে কোনদিন সাঁথিয়া পাবনা দেখিনি। যুদ্ধের পরে তার সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়, তিনি অসাধারণ মানুষ ছিলেন। তার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করা হয়েছে, তা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও সাজানো।

সাঁথিয়ার বিষনু রানী বলেন, নিজামী সাহেব প্রকৃত পক্ষে ভাল মানুষ ছিল, যুদ্ধের সময় সে কারো কোন ক্ষতি করেনি এবং সে রাজাকার ছিল না।

সুভাস চন্দ্র শীল (৬৫) বলেন, মতিউর রহমান নিজামীকে আমি দীর্ঘদিন যাবৎ চিনি। ব্যক্তি হিসেবে ভাল মানুষ ছিলেন।

আর্ন্তজাতিক পরিমন্ডলে প্রতিক্রিয়ার ঝড়

জাতিসংঘ

মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর মৃত্যুদন্ড কার্যকরের আগে পরে গভীর উদ্বেগ জানায় জাতিসংঘ। জাতিসংঘের মহাসচিবের স্পোকস্ম্যান স্টিফেন ডুজার্স গভীর উদ্বেগ জানিয়ে বলেন, মহাসচিব বরাবরই মৃত্যুদন্ডের বিরুদ্ধে তার অবস্থান ঠিক রেখেছেন।

তুরস্ক ও ওআইসি

মৃত্যুদন্ড কার্যকর না করার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট ও ওআইসির চেয়ারম্যান রজপ তায়েপ এরদোগান। তিনি বলেছিলেন, আজ বাংলাদেশে ৭৫ বছর বয়সী একজন মুজাহিদের বিরুদ্ধে ফাঁসির দন্ড দেয়া হয়েছে। যিনি এ পৃথিবীতে কোন ধরনের অপরাধ করে থাকতে পারেন বলে আমরা বিশ্বাস করি না। তারপরও মৃত্যুদন্ড কার্যকর করায় তুরস্ক বাংলাদেশ থেকে রাষ্ট্রদূত প্রত্যাহার করে নেয়। তুরস্কের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে তীব্র নিন্দা জানানো হয়।

পাকিস্তান

পাকিস্তানের সংসদে নিন্দা প্রস্তাব উত্থাপন করা হয় এবং এ বিষয়টি জাতিসংঘ এবং ওআইসিতে উত্থাপনের আহ্বান জানানো হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন

মাওলানা নিজামীর ফাঁসির দন্ডাদেশ স্থগিত করতে মার্কিন কংগ্রেসের টম লেন্টাস হিউম্যান রাইট্স কমিশন আহ্বান জানায়। বিচারে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণের অনুপস্থিতি ও স্বচ্ছতা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের টম লেন্টাস হিউম্যান রাইট্স কমিশন এ আহ্বান জানায়। মাওলানা নিজামীর বিচারপ্রক্রিয়া সুস্পষ্টত মানসম্মত হয়নি বলে উদ্বেগ জানিয়েছিলেন মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের যুদ্ধাপরাধ ও বৈশ্বিক অপরাধের বিচারবিষয়ক বিভাগের সাবেক বিশেষ দূত স্টিফেন জে র‍্যাপ।

www.pathagar.com

বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থা

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল বার বার বিচারের ত্রুটি নিয়ে কথা বলে আসছে। তারা মনে করে, নৃশংসতাকে ত্রুটিপূর্ণ বিচারপ্রক্রিয়া দিয়ে ভোলানো ঠিক হবে না। সাজা স্থগিত করে আন্তর্জাতিক ন্যায্য বিচারের মানদন্ড অনুযায়ী স্বাধীন তদন্ত করার আহ্বান জানায় ইংল্যান্ডের বার হিউম্যান রাইটস কমিটি। নিন্দা জানিয়েছেন পাকিস্তানের মানবাধিকার কর্মী আসমা জাহাঙ্গীর, যিনি ২০১৩ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছ থেকে বাংলাদেশের বন্ধু হিসেবে পুরস্কার পাওয়া চার পাকিস্তানির একজন। তিনি বলেন, নিজামী ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। মৃত্যুদন্ড কার্যকরের মাধ্যমে বাংলাদেশকে ব্যাপকভাবে বিভাজিত করবে। এ ছাড়াও নিন্দা জানিয়েছে, হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (এইচআরডব্লিউ), বার হিউম্যান রাইটস কমিটি ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস, ইসলামিক হিউম্যান রাইটস কমিশন (IHRC), নো পিচ উইদাউট জাস্টিজ (NPWJ), রাইটার ইউনিয়ন অব তার্কি। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের আরো যেসব সংগঠন নিন্দা জানিয়েছে- মিশরের মুসলিম ব্রাদারহুড, জামায়াত-ই-ইসলামী পাকিস্তান, জামায়াত-ই-ইসলামী হিন্দ, তুরস্কের সাদাত পার্টি, ফিলিস্তিন উলামা পরিষদ, মালয়েশিয়ার আবিম ও পাস পার্টি, তুরস্কের সর্ববৃহৎ ছাত্রসংগঠন এনাতোলিয়ান ইয়ুথ অ্যাসোসিয়েশন, মুসলিম উম্মাহ নর্থ আফ্রিকা, ইসলামিক সার্কেল অব নর্থ আমেরিকা প্রভৃতি সংগঠন ও সংস্থা।

আন্তর্জাতিক ইসলামী স্কলার

মাওলানা নিজামীর মৃত্যুদন্ড কার্যকর না করতে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছিলেন আল্লামা ইউসুফ আল কারযাভী। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক তারিক রমাদান, ইসলামিক স্কলার হারুন ইয়াহিয়া, ইসলামিক স্কলার ওমর সুলাইমান, জাস্টিস ত্বাকী ওসমানী, হিজবুল মুজাহিদিন ব্রাজিলের প্রখ্যাত আলেম শায়খ রুদ্রিগোয়েজ প্রমুখ।

আন্তর্জাতিক মিডিয়ার গুরুত্বসহকারে সংবাদ প্রচার

আল জাজিরা, বিবিসি, নিউ ইয়র্ক টাইমস, ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, দ্যা গার্ডিয়ান, রয়টার্স, হাফিংটন পোস্ট, এবিসি নিউজ, ডন পাকিস্তান, মুসলিম মিরর, নিউজ উইক মিডল ইস্ট, ভয়েস অব আমেরিকা, ওয়ার্ল্ড বুলেটিন, ট্রিবিউন এক্সপ্রেস, সিএনএন, এনডিটিভি, টাইমস অব ইন্ডিয়া, নাউ নিউজসহ বিশ্ব মিডিয়ায় খবরটি গুরুত্বসহ প্রচার করা হয়।

নেতাকর্মী ও দেশবাসীর উদ্দেশে শহীদ নিজামী

শহীদ মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর ১০ নসিহত আমাদের জন্য পাথেয় হয়ে থাকবে।

১. অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যেতে হবে।

২. মু'মিন কখনো হতাশ হয় না।

www.pathagar.com

৩. জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দায়ী ইলাল্লাহ হিসেবে কাজ করে যেতে হবে।
৪. বাতিলের গভীর ষড়যন্ত্র ও বিদ্যমান সমস্যা বুদ্ধিবৃত্তিক উপায়ে মোকাবেলা করতে হবে।
৫. সন্ত্রাসবাদ ঠেকাতে গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত রাখতে হবে।
৬. মহিলাদের আত্মগঠন ও চরিত্রগঠনের দিকে মনোযোগী হতে হবে।
৭. ইসলামী আন্দোলনে নেতৃত্বের সঙ্কট হবে না। পরিস্থিতি যতো কঠিন হবে ততো দক্ষ ও যোগ্য নেতৃত্ব গড়ে উঠবে।
৮. আমার বয়স হয়েছে, যে কোন সময় মৃত্যু আসবেই। আমি শাহাদাতের মৃত্যু চাই।
৯. আমার শাহাদাত পরিবর্তনের সূচনা করবে ইনশাআল্লাহ।
১০. দেশবাসীর কাছে দোয়া চাই। সবাইকে সালাম জানাই। যদি দুনিয়ায় আর দেখা না হয়, ইনশাআল্লাহ আবার দেখা হবে জান্নাতে।"

যুগে যুগে নবী-রাসূল ও সত্যপন্থীদের ওপর জেল-জুলুম, অত্যাচার-নির্যাতন, নিপীড়ন হয়েছে নানাভাবে, নানা কৌশলে। কিন্তু কোন দলন নিপীড়নই ইসলামী আন্দোলনের পথচলা থামিয়ে দিতে পারেনি, এখনও পারবে না ইনশাল্লাহ। ইতিহাস বলে শহীদের রক্ত বৃথা যায় না। শহীদের রক্তের সিঁড়ি বেয়ে বিজয় আসবেই।

তিবরানীতে হযরত মুয়াজ বনি জারুন রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত একটি হাদীস যাতে বলা হয়েছে যে, ইসলামের রাজনৈতিক অবস্থা যখন বিকৃত হয়ে যাবে, তখন বিপথগামী শাসকরা কর্তৃত্বশীল হবে এবং তারা সমাজকে ভ্রান্ত পথের দিকে নিয়ে যাবে। তাদের নির্দেশ মেনে চললে জনগণ গোমরাহ হয়ে যাবে। আর তাদের নির্দেশ অমান্য করলে তারা তাদের হত্যা করবে। এ কথা শোনার পর লোকেরা জিজ্ঞেস করলো তারপর তারা কি করবে, তিনি বললেন : সে সময়ে তোমাদেরকে হযরত ঈসার সহচরগণ যা করছিল তাই করতে হবে। তাদেরকে করাত দিয়ে চিরে ফেলা হয়েছে। শূলে চড়ানো হয়েছ, তবুও তারা বাতিলের কাছে আত্মসর্মপণ করেননি।

তাইতো কবি বলেছেন–

"ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয় গান,
আসি অলক্ষ্যে দাঁড়ায়েছে তারা দেবে কোন বলিদান।"

হে! আরশের মালিক মহান পরওয়ারদেগার তোমার গোলামকে তুমি শাহাদাতের সর্বোচ্ছ মর্যাদা দিয়ে জান্নাতের মেহমান হিসেবে কবুল কর। তাঁর রেখে যাওয়া অসমাপ্ত কাজ আমাদেরকে আন্জাম দেয়ার তাওফিক দাও। শহীদের রক্তের বিনিময়ে এ জমিনে দ্বীনের পতাকা উড্ডীন করে দাও। আমাদেরকেও তাঁর পথে কবুল কর। আমীন।

www.pathagar.com

শহীদ আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ (রহ)

বাংলাদেশের ইতিহাসে আরেকটি কালো অধ্যায়ের সংযোগ করলো অবৈধ আওয়ামী জালিমশাহী সরকার। ২২ নভেম্বর ২০১৫ দিনটি কালো দিন হিসেবে চিন্হিত হয়ে থাকবে। এই দিন দু'জন দেশ প্রেমিক নাগরিককে হত্যা করা হল। পৃথিবীতে আজ অসংখ্য জায়গায় আইনের দোহাই দিয়ে মানবাধিকার লজ্ঝিত হচ্ছে। এখন বাংলাদেশ সেই ভয়ঙ্কর সময়টি অতিক্রম করছে। দার্শনিক সক্রেটিসকে হ্যামলক বিষ প্রয়োগে হত্যার রায় দিয়েছিল আদালতেই। জ্যোতির্বিজ্ঞানী গ্যালিলিওকেও ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয় আদালতের নির্দেশেই। হাজার বছর পর এসে প্রমাণিত হয়েছে আদালতের দুটি রায়ই ভুল রায় ছিল। পৃথিবীর ইতিহাসে হয়ত একদিন এই হত্যাকান্ডের ক্ষেত্রেও তাই প্রমাণিত হবে। এজন্য অধ্যাপক ম্যাকলোয়েন চার্লস বলেছেন, "আমার মতে ইতিহাসের কোন যুগেই কোন ব্যক্তি রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে এত কঠিন বিপদের সম্মুখীন হয়নি, প্রশাসনের সামনে বিচার বিভাগ কখনো এতটা অসহায়ত্ব বোধ করেনি।" বেকন বলেছিল- "আইনের মাধ্যমে অত্যাচার করার চেয়ে বড় অত্যাচার আর নেই।"সেই অত্যাচারের শিকার হয়েছেন জনাব আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ।

পৃথিবীর সকল নীতি-নৈতিকতা, মানবাধিকারকে উপেক্ষা করে যাকে হত্যা করা হয়েছে তিনি- একজন রাজনীতিবিদ, প্রতিথযশা শিক্ষাবিদ, লেখক, ইসলামী ব্যক্তিত্ব, সাবেক মন্ত্রী ও জতীয় নেতা। বিশ্বের কোটি-কোটি মানুষের হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসা আর চোখের অশ্রু সিক্ত হয়ে আমাদের প্রাণ-প্রিয় নেতা আমাদের মাঝ থেকে বিদায় নিয়েছেন। বাংলার মানুষের কাছে শহীদ আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ একটি বিপ্লবী নাম, একটি আন্দোলন, একটি ইতিহাস, একটি আপোষহীন সংগ্রামের প্রতিচ্ছবি হিসেবে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। এ জাতি শ্রদ্ধার সাথে ইসলামী আন্দোলনের এই সিপাহসালাকে হৃদয়ের আবেগ আর ভালোবাসায় সিক্ত করবে শতাব্দী থেকে শতাব্দীকাল। এই ভূখন্ডে বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রাম, প্রতিটি গণতান্ত্রিক ও স্বৈরাচারী বিরোধী সংগ্রামে শহীদ মুজাহিদের নাম স্বর্নাক্ষরে লেখা থাকবে। শহীদ মুজাহিদ ছিলেন আধিপত্যবাদ ও সাম্রাজ্যবাদী চেতনার বিপরীতে একটি বলিষ্ঠ কন্ঠস্বর। ট্রাইবুনালের রায় শুনে তিনি বলেছিলেন, "সরকার রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দিয়ে, যে শাস্তির ব্যবস্থা করেছে তার জন্য আমি মোটেই বিচলিত নই। আমি আল্লাহর দ্বীনের উদ্দেশ্যে আমার জীবন কুরবান করার জন্য সব সময় প্রস্তুত আছি।" তাঁর এই সাহসী উচ্চারণ থেকে তরুণ প্রজন্ম, এদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষার চেতনা খুঁজে পাবে।

www.pathagar.com

বাংলার জমিনে নাস্তিকতা ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীর রক্তচক্ষু মোকাবেলা করে তৃণমুল থেকে গড়ে উঠে আসা একজন সংগ্রামী প্রাণপুরুষ। নীতির প্রশ্নে সদা আপোষহীন এই মানুষটিকে কেবলমাত্র ইসলামী আন্দোলন করার অপরাধেই আজ হত্যা করা হয়েছে। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, "তাদের অপরাধ, তারা মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর উপর ঈমান এনেছে।" আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন, "আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে, তাদেরে মৃত মনে করো না, প্রকৃত পক্ষে তারা জীবন্ত, কিন্তু তাদের জীবন সম্পর্কে তোমরা অনুভব করতে পারো না" (২ ঃ ১৫৪)। প্রিয় রাসুল ﷺ বলেছেন, "শাহাদাত লাভকারী ব্যক্তি নিহত হবার কষ্ট অনুভব করে না। তবে তোমাদের কেউ পিঁপড়ার কামড়ে যতটুকু কষ্ট অনুভব করো, কেবল ততটুকুই অনুভব করে মাত্র।" (তিরমিযী)

এই ক্ষণজন্মা, মহান ব্যক্তিত্বের জন্ম ১৯৪৮ সালের ১ জানুয়ারি। তাঁর পিতা প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবীদ মাওলানা আব্দুল আলীর কাছে প্রাথমিক শিক্ষা লাভের মধ্যে দিয়ে শিক্ষার হাতেখড়ি। শহীদ মুজাহিদের পিতা মাওলানা আব্দুল আলী একজন ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক নেতা হিসেবে আজও ফরিদপুরসহ গোটা অঞ্চলের মানুষের নিকট শ্রদ্ধার পাত্র। ১৯৬২-১৯৬৪ সাল পর্যন্ত প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যও (এমপিএ) নির্বাচিত হয়েছিলেন। শহীদ আলী আহসান মোহাম্মাদ মুজাহিদ ফরিদপুর ময়জুদ্দিন স্কুল শিক্ষাজীবন শুরু করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং সর্বশেষ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএ ডিগ্রী লাভ করেন।

ছাত্র জীবনে এই মেধাবী চৌকস সচেতন মানুষটি ছাত্র-সমাজের অধিকার আদায়ের লড়াইয়ে শীর্ষে থেকে ছাত্রসংঘের প্রাদেশিক সভাপতি নির্বাচিত হন। কর্মজীবনেও রেখেছেন গৌরবজ্জল ভূমিকা। শহীদ আলী আহসান মোহাম্মাদ মুজাহিদ জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ঢাকা মহানগরীর আমীর, সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল ও লিয়াজো কমিটির প্রধান, শাহাদাতের পূর্ব পর্যন্ত সেক্রেটারী জেনারেল হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

আলী আহসান মোহাম্মাদ মুজাহিদ বাংলাদেশের গনতান্ত্রিক ও স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন এবং কেয়ারটেকার সরকার প্রতিষ্ঠা সহ প্রতিটি গনতান্ত্রিক আন্দোলনেও তিনি কার্যকর ভুমিকা পালন করেছেন। শহীদ মুজাহিদ সমাজকল্যানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করা কালীন সময়ে তিনি বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রেখেছেন। তিনি বিভিন্ন সময়ে জেল, জুলুম এবং নির্যাতনের স্বীকার হয়েছেন। এক এগারো সরকার তথাকথিত দূর্নীতি মিথ্যা মামলা দিয়েও তাঁদের বিরুদ্ধে কোন দূর্নীতি আবিস্কার করতে পারেনি। কারণ দূর্ণীতিমুক্ত বাংলাদেশ গড়া যাদের মিশন এবং ভিশন। যারা আল্লাহর নিকট প্রতিটি কর্মের জবাবদিহির চেতনা লালন করেন তারা কি দূর্ণীতি করতে পারে?

www.pathagar.com

শহীদ মুজাহিদ ছিলেন ক্ষুধা-দারিদ্র মুক্ত একটি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার অনুপম কারিগর। মন্ত্রী হয়ে বাংলাদেশের ইতিহাসে কায়েম করেছেন সততা, ইনসাফ, সত্যবাদিতার উজ্জল উদাহরণ। আত্নত্যাগ, আন্তরিকতা, নিষ্ঠার মাধ্যমে দেশ প্রেমের স্বাক্ষর রেখেছেন প্রতিটি ক্ষেত্রে। জনগণের মধ্যে জাগিয়ে তুলেছেন একটি সম্ভাবনাময় বাংলাদেশ গড়ে তোলার স্বপ্ন। তাঁদের ঐতিহাসিক ভূমিকা দেশে-বিদেশে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। তাই ষড়যন্ত্র আর কুটকৌশলের মধ্যে দিয়ে চলতে থাকে রাষ্ট্রীয় আয়োজনে হত্যা করার ঘৃন্য চক্রান্ত।

শহীদ মুজাহিদকে হত্যা করে আওয়ামীলীগ নতুন করে আবার হিংসা-বিদ্বেষের বীজ বপল করলো। যা দেশের ঐক্য ও সংহতির জন্য মোটেও কল্যাণকর নয়। বি. সি. ওায় বলেছে- "ক্ষমতা সবচেয়ে বড় মদের নেশার মতো। যাকে একবার পেয়ে বসে তাকে জীবনে শেষ করে দেয়।" আওয়ামী লীগ আজ অবৈধভাবে ক্ষমতায় থাকার নেশায় মত্ত হয়ে শহীদ মুজাহিদকে হত্যা করেছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, "আর যে ব্যক্তি জেনে বুঝে মুমিনকে হত্যা করে, তার শাস্তি হচ্ছে জাহান্নাম। সেখানে সে চিরকাল থাকবে। তার ওপর আল্লাহর গযব ও তাঁর লানত এবং আল্লাহ তার জন্য কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা করে রেখেছেন।" (৪ ঃ ৯৩)

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিজের বিবেককে যদি প্রশ্ন করেন, আপনি কি জামায়াত নেতাদেরকে মানবতাবিরোধী অপরাধের কারণে হত্যা করেছেন? আমার মনে হয় উত্তর হবে, না! কারণ এখন জামায়াত আপনার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ বলেই এই হত্যাকান্ড। এক সময় শহীদ মুজাহিদ সাহেব আপনার রাজনৈতিক মিত্র ছিলেন। রাজপথে আন্দোলন সংগ্রামে ছিলেন একত্রে। একান্ত নিভৃত্তে ডেকে রাজনৈতিক শলা-পরামর্শও করেছেন জামায়াত নেতাদের সাথে, তাই নয় কি? তাই ইবনে মুয়াইদ বলেছে- "হিংসুক ব্যক্তি সর্বদা তিন প্রকার কষ্টে নিপতিত থাকে-আত্নদহন, মানুষের ঘৃণা এবং আল্লাহর গজব।" আর ডন জুয়ান বলেছে- "হিংসা দিয়ে কখনো হিংসাকে হত্যা করা যায় না।" আওয়ামীলীগ ঘরে-ঘরে হিংসা বিদ্বেষের বিষবাষ্প ছড়াচ্ছে। এ খেলা যেন আমাদের ললাটে পরাধীনতার কবজ জুলিয়ে দেয়।

শহীদ আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ ভাইয়ের অসংখ্য কর্মই এখন স্মৃতি। অনেকের মত আমিও অত্যন্ত কাছ থেকে এই প্রিয় মানুষটিকে দেখেছি। মুজাহিদ ভাই ছিলেন নীতির প্রশ্নে আপোষহীন। কিন্তু তিনি ছিলেন যেমন কঠোর তেমনি উনার হৃদয়টা ছিলো অনেক নরম প্রকৃতির। আমি তাঁর চরিত্রের মধ্যে হযরত ওমর ফারুক (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) চরিত্রের ছাপ দেখতে পেয়েছি। বিশেষ করে দেশের সমস্ত ক্যাম্পাসে যখন ইসলামী ছাত্রশিবির ছাত্রলীগের সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের শিকার, নেতা-কর্মীদের উপর অবর্ণনীয় নির্যাতনের বর্ণনা শুনার পর অনেক দিন তাঁর

www.pathagar.com

চোখে আমি পানি দেখেছি! তিনি ছাত্রশিবিরকে হৃদয় দিয়ে ভালোবাসতেন। তারপরও তিনি সব সময় ছাত্রশিবিরকে সৎ জীবন যাপন ও ধৈর্যের পরামর্শ দিতেন এবং বলতেন, "তোমরা কোন বাড়াবাড়ি করো না, তাহলে আল্লাহর সাহায্য পাবে।"

মুজাহিদ ভাই আত্মপর্যালোচনার ব্যাপারে ছিলেন আপোষহীন। ক্যাম্পাসের কোন ঘটনা শুনলেই তিনি বলতেন, "তোমাদের কোন ভুল, কোন বাড়াবাড়ি ছিল কিনা তা আগে খতিয়ে দেখ।" সময়ানুবর্তিতায় তিনি ছিলেন ব্যতিক্রম। মুজাহিদ ভাইয়ের সাথে কোন মিটিং থাকলে তিনিই আগে উপস্থিত হতেন। তিনি যে মিটিং এ মেহমান থাকতেন সেখানেও তিনি দেরিতে উপস্থিত হয়েছেন বলে আমার জানা নাই।

ব্যক্তি জীবনে অল্পে তুষ্ট, নির্লোভ, পরোপোকারী, দৃঢ়চেতা, ছিলেন শহীদ মুজাহিদ। জীবন-যাপন করতেন অত্যন্ত সাদা-সিধেভাবে। অনেক সময় জামায়াতের কেন্দ্রিয় অফিসে গিয়ে দেখতাম, ফ্লোরে মাদুর ফেলে তিনি বিশ্রাম নিচ্ছেন। পোশাক আশাকেও তিনি অত্যন্ত সিম্পল। অনেক সময় দেখেছি তার গায়ের ফুতোয়া ছেঁড়া। আমরা তাকালে হাসতো আর বলতো অল্পে তুষ্ট জীবন লালন করতে শিখ। তাহলে জীবনে টেনশন ফ্রি থেকে হালাল পথে থাকতে সহজ হবে। কত মানুষ আছে যাদের একটা জামাও নেই। একবেলা খেতে পায় না। তাদের কথা আমাদের ভাবতে হবে। দেশের মানুষের মুক্তির জন্য সারাজীবন সংগ্রাম করেছেন তিনি।

শহীদ আলী আহসান মুজাহিদ ভাই খুব সাদামাটা জীবন যাপন করতেন। একদিন তিনি আমাকে বললেন রেজাউল তোমরা কি ফুটপাত থেকে অল্প দামে জামা কিন? আমি বললাম মুজাহিদ ভাই বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবনে কিনেছি, এখন অবশ্য খুব একটা কেনা হয়না। তিনি বললেন অল্প দামে জামা-কাপড় কিনবা তাহলে সাধারণ মানুষের জীবনকে উপলব্ধি করতে পারবা। আর বাকী টাকা দিয়ে যার প্রয়োজন তাকে সহযোগিতা করতে পারবা। শহীদ মুজাহিদ ব্যক্তি জীবনে তিলে তিলে নিজের জীবনকে গড়ে তুলেছেন। কৃতচ্ছতা সাধন করে রাষ্ট্রীয় খরচের ক্ষেত্রেও অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর দু'মন্ত্রী দলীয় কাজে সরকারী গাড়ি ব্যবহার করতেন খুব কমই। সরকারী সফরে গিয়ে দলীয় লোক নিয়ে বিরাট খরচের বোঝা না বাড়িয়ে সরকারী কর্মকর্তাদের নিয়ে খেতেন জামায়াত অফিসে। বাঁচিয়ে দিতেন সরকারী টাকা। তাদের সাথে দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তিরা আজও তাঁদের এ সততার স্বাক্ষী। আবার দলীয় কাজে সফরে গিয়ে সরকারী সুযোগ-সুবিধা নিতেন না তারা। তাঁর স্ত্রী বলেছেন, স্ত্রী হিসেবে আমিও স্বাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি সম্পুর্ন

www.pathagar.com

নির্দোষ। আমার স্বামী ঘরে বাইরে, ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে আল্লাহর রহমতে অত্যন্ত স্বচ্ছ ও সৎ জীবন যাপন করেছেন।

২০০৯ সালে আমি ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রিয় সভাপতি থাকাকালে তুরস্কের ইস্তাম্বুলে অনুষ্ঠিত একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগ দান করি। সম্মেলনে বিশ্বের প্রায় ৬৮ রাষ্ট্রের ছাত্র যুব প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনের অতিথি হিসেবে আধুনিক তার্কির রূপকার সাবেক প্রধানমন্ত্রী নাজিম উদ্দিন এরবাকান এসেছিলেন। নাজিম উদ্দিন এরাবানকে ছাত্রশিবিরের পক্ষ থেকে ক্রেস্ট প্রদান করার সময় তিনি ধন্যবাদ জানিয়ে উচ্ছাসের সাথে বললেন, ইয়েস ইউর লিডার মি.নিজামী, মি.মুজাহিদ! তখন নিজেকে অনেক ধন্য মনে করলাম। বুঝতে আর বাকী নেই নাজিম উদ্দিন এরবাকান সত্যই হৃদয় দিয়ে বাংলাদেশের ইসলামী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দকে ভালোবাসেন। এভাবে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে আমাদের নেতৃবৃন্দ দ্বীনের দাওয়াত পৌছিয়েছেন। আজ আওয়ামী রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে কালো কাপড় দিয়ে সব অর্জনকে ঢাকতে চায়। এটি কি সম্ভব?

যে আইন দিয়ে জামায়াত নেতাদের হত্যা করছে, সেই আইন পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে আলোচিত, সমালোচিত, বিতর্কিত ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত, কালো আইন হিসেবে খ্যাত। আন্তর্জাতিক বার এসোসিয়েশন, মানবাধিকার সংগঠন, সংস্থা এবং দেশীয় ও আন্তর্জাতিক মিডিয়ার রিপোর্টে যে আশঙ্কা করা হয়েছে যে, "সরকার তার পরিচিত প্রতিপক্ষ এবং রাজনৈতিক শত্রুদেরকে দমন করতেই এ বিচারকে ব্যবহার করছে"। জামায়াত নেতাদের হত্যার মধ্যে দিয়ে তা চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হয়েছে। তাই ভলতেয়ার বলতেন-"অস্ত্রের জোরে তুমি সারা পৃথিবী জয় করতে পার, কিন্তু পারবে না একটা গ্রামের মানুষেরও মন বশীভূত করতে"। তথাকথিত বিচারের ক্ষেতে আজ আওয়ামী লীগ সেই নীতিই অবলম্বন করছে। শহীদ মুজাহিদের মৃত্যুদন্ডে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ আন্তর্জাতিক সংস্থা ও ব্যক্তিত্ব তাদের উদ্বেগ অব্যাহত রেখেছে।

অথচ এই মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা ট্রাইবুনালে জেরার সময় স্বীকার করেছেন, বাংলাদেশের কোথাও ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে সংঘটিত কোনো অপরাধের সাথে তিনি জনাব মুজাহিদ সম্পৃক্ত ছিলেন তার সুনির্দিষ্ট কোন প্রমাণ তার হাতে নেই। সম্পূর্ণ ধারনার ও ঢালাও অভিযোগের ভিত্তিতে একজন নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। যাকে ফাঁসি দেয়া হয়েছে তিনি জানতেই পারলেন না কি অপরাধে তাঁকে হত্যা করা হলো।

আল্লাহ তায়ালা বলেন, "যে অন্যায়ভাবে কোন ব্যক্তিকে হত্যা করলো, সে যেন গোটা মানব জাতিকে হত্যা করলো।" রাসুল ﷺ বলেছেন, "বিচারক তিন ধরনের- দুই ধরনের জাহান্নামী এক ধরনের জান্নাতী। যে সত্য জেনেও অন্যায়

www.pathagar.com

বিচার কার্য করে সে জাহান্নামী, যার বিচার কার্যের জ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও বিচার কার্য করল সে জাহান্নামী। আর যে সত্যকে জানলো এবং সে অনুযায়ী বিচার রায় দিল সে জান্নাতি (ইবনে মাজাহ)। বিচারের সাথে মিথ্যা সাক্ষ্যদানকে তিনি শিরকের সমতুল্য বড় গুনাহ বলে উল্লেখ করেছেন। যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়, মিথ্যা সাক্ষ্যদানে উদ্বুদ্ধ করে এবং জেনে-বুঝে এর পক্ষাবলম্বন করে এরা সবাই মুশরিক ও জালেম। জাহান্নাম ই তাদের ঠিকানা।" আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা বর্ণিত হাদিসে বলা হয়েছে, 'মুসলমানদের ওপর থেকে শাস্তি যতটা পারো রহিত করো। তাকে অব্যাহতি দেয়ার সুযোগ থাকলে অব্যাহতি দাও। কেননা শাসকের জন্য ভুলক্রমে শাস্তি দেয়ার চেয়ে ভুলক্রমে মাফ করা উত্তম।'

আওয়ামীলীগ হয়তো মনে করেছে যুদ্ধাপরাধের বিচারের মাধ্যমে জামায়াত নেতৃবৃন্দকে একের পর এক হত্যা করে ইসলামী আন্দোলনকে নিশ্চিন্‌হ করে দিবে। কিন্তু আল্লাহর ঘোষণা-"তারা মুখের ফুৎকারে আল্লাহর আলো নিভিয়ে দিতে চায়। আল্লাহ তাঁর আলোকে পূর্ণরূপে বিকশিত করবেন যদিও কাফেররা তা অপছন্দ করে।" (৬১ ঃ ৮)

তথাকথিত এই বিচারের নামে আওয়ামীলীগ তার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ দমনের নোংরা খেলায় নেমেছে তা এখন দিবালোকের মত স্পষ্ট। রাষ্ট্র পরিচালনায় জামায়াতের অংশগ্রহণ, দু'মন্ত্রীর জনপ্রিয়তা, জনসমর্থন ও সাংগঠনিক মজবুতি আওয়ামী বাম শিবিরকে দিশেহারা করে ফেলেছে। মনে রাখতে হবে, রাজনৈতিক হিসাব কখনো দুয়ে দুয়ে চারের পরিবর্তে অন্য কিছুও হয়। সে বার্তা উপজেলা নির্বাচনেই জামায়াতকে সমর্থন দেয়ার মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে।

তাছাড়া মিশরের কুখ্যাত প্রেসিডেন্ট জামাল আব্দুন নাসের, মুসলিম ব্রাদারহুডের নেতা সাইয়েদ কুতুব, হাসান আল বান্নাকে হত্যা করে তাদের আদর্শকে স্তব্ধ করতে পারেনি। বর্তমানে ইখওয়ানের মুর্শিদে আম ড.বদি, প্রথম নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ড.মুরসী সহ শীর্ষ নেতাদের ফাঁসির রায় দিয়ে জুলুম-নিপীড়নের সব অস্ত্র ব্যবহার করেও দমাতে পারেনি। বরং অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলকারী পশ্চিমা মদদপুষ্ট জালিম শাসক সিসি সম্প্রতি বৃটেন সফরে গিয়ে প্রকাশ্যভাবে বলতে বাধ্য হয়েছে যে, ব্রাদারহুড প্রকাশ্যে রাজনীতি করতে পারবে। মূলত স্বৈরাচাররা জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শক্তি দিয়ে ক্ষমতায় টিকে থাকতে চায়। কিন্তু ইতিহাস স্বাক্ষী এটি সম্ভব হয়নি।

মুমীনের জীবনে সবচেয়ে বড় সফলতা শাহাদাতের মৃত্যু। এটি কোন মৃত্যু নয়, এ যেন নতুন জীবনের সূচনা। একেকজন শহীদের সাহসী উচ্চারণ আজ মুসলিম উম্মাহর পাথেয়। শহীদ মুজাহিদ বলেছেন, "আমি আল্লাহকে হাজির নাজির জেনে বলছি, আমার বিরুদ্ধে আনীত সকল অভিযোগ শতভাগ মিথ্যা ও

www.pathagar.com

বানোয়াট। ১৯৭১ সালের যুদ্ধকালীন সময়ে কোন ধরনের অপরাধের সাথে আমি সম্পৃক্ত ছিলাম না। শুধুমাত্র ইসলামী আন্দোলন করার অপরাধে এত বছর পরে আমার বিরুদ্ধে এই মিথ্যা অভিযোগ সাজানো হয়েছে। প্রতিদিন বাংলাদেশে শত শত লোক স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করে। এসব মৃত্যুর সাথে ফাঁসির আদেশের কোনো সম্পর্ক নেই। কখন, কার, কিভাবে মৃত্যু হবে সেটা একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই নির্ধারণ করেন। আল্লাহর সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের কোনো সাধ্য কারো নেই। সুতরাং ফাঁসির আদেশে কিছু যায় আসে না। আমি মৃত্যুদন্ড বহাল রাখার ঘোষণায় উদ্বিগ্ন নই।

শহীদ পরিবারের সদস্যরা তাদের প্রিয়জন হারানোর বেদনায় জ্বলতে থাকবে প্রতিদিন, প্রতিক্ষণ, প্রতিটি মুহূর্ত। মহান রবের দরবারে সন্তান হারা মায়ের আহাজারি, স্বামী হারা স্ত্রীর ফরিয়াদ,বাবা হারা সন্তানদের অশ্রু বিসর্জন। আর প্রতিরাতে তাহাজ্জুদের নামাজ শেষে চোখের পানি কি কোনই কাজে আসবেনা? একদিন তারা পাবেন এই রোনাজারির পুরস্কার। শহীদেরা ৭০ জন ব্যক্তিকে সুপারিশ করে জান্নাতে নিতে পারবে। শহীদের রক্ত বিন্দু ঝরতেই তাকে মাফ করে দেয়া হয় এবং জান্নাতে যে তার আবাসস্থল, তা চাক্ষুস দেখানো হয়। এই হত্যাকান্ডের বিচার দুনিয়ার আদালতে না হলেও আল্লাহর আদালত থেকে খুনিরা রেহাই পাবে না। আল্লাহ তায়ালা বলেন, “যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে তোমরা মৃত মনে করো না, বরং তারা জীবিত।”

আদর্শের লড়াইয়ে যারা পরাজিত, তারা আজ হিংস্রতা, পৈশাচিকতা, জগণ্য, মিথ্যা, বানোয়াট, নোংরামি আর কুটকৌশল দিয়ে এই জাতির বীর সৈনিকদের অবদানকে কুলষিত করতে পারবে কি? দেশে-বিদেশে, খানায়ে কাবার আর মসজিদে নববীতে লক্ষ কোটি মানুষের কান্নার আওয়াজ আর জানাযায় উপস্থিতি আওয়ামীলীগ কি বার্তা পাচ্ছে! আওয়ামীলীগের জিঘাংষা আর ক্ষোভ হয়তো আরো বাড়বে। কারণ অনেকের বাবার নামাজের জানাযায় ১৮/১৯ জন উপস্থিত ছিল! এত অপপ্রচার, নোংরামি, ভন্ডামী, আর তামাশা করেও লাখো জনতার গগণবিদারি কান্না, শ্রদ্ধা আর ভালোবাসায় সমাহিত হওয়াও কি ঠেকাতে পেরেছে সরকার? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে ভালোবাসেন তখন তিনি ফেরেশতাদের ডেকে বলেন, দুনিয়ার মানুষকে জানিয়ে দাও তারাও যেন আমার এ বান্দাহকে ভালোবাসে।

এই জনপদে মরহুম অধ্যাপক গোলাম আযম, শহীদ মুজাহিদ, শহীদ কামারুজ্জামান, শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লা ইসলামী আন্দোলনের যে বীজ বপন করেছেন, তা বিকশিত হয়ে গড়ে উঠেছে একটি তরুণ প্রজন্ম। তাদের নিরলস কর্ম, বক্তৃতা আর লেখনীর মাধ্যমে এই দেশের মানুষ তাদেরকে নিজ গড়জেই

www.pathagar.com

সম্মান করতে থাকবে। জাতি তাদের ঐতিহাসিক অবদানকে মূল্যায়ন করবে শতাব্দীর পর শতাব্দী। এই বীর সেনানীদের ভালোবাসতে থাকবে আর ঝড়াতে থাকবে চোখের পানি। পৃথিবীর প্রান্তে-প্রান্তে প্রতিনিয়ত তাদের জন্য দোয়া করবে বিশ্ব মানবতা। আর খুনী অভিশপ্তদের ঘৃণা করতে থাকবে অনন্তকাল।

এই প্রহসনের বিচারের মাধ্যমে জাতি নতুন করে আবার জানলো সত্য ইতিহাস। জামায়াত নেতৃবৃন্দ কোন মানবাতবিরোধী অপরাধ করেনি। তাঁদের প্রধান আইনজীবী ব্যারিষ্টার আব্দুর রাজ্জাক বলেন, "একজন আইনজীবি হিসেবে আমি বলতে চাই, মানবতাবিরোধী অপরাধে যে চারজনকে ফাঁসি দেয়া হয়েছে আন্ত র্জাতিক মানসম্পন্ন আইনের অধীনে বিচার হলে, তাদের কারোরই ফাঁসি হতো না। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় যেভাবে বিচার করতে বলেছে, সেভাবে বিচার করা হলে কারোরই ফাঁসি হতো না বলে আমি মনে করি। সকলেই মুক্তি পেতেন।"

শহীদ আলী আহসান মোহাম্মাদ মুজাহিদ শেষ দেখায় স্ত্রী তামান্না-ই জাহানকে ধৈর্য ধরতে এবং শান্ত থাকতে বলেছেন। তাঁর পুত্র আলী আহমেদ মাবরুর বলেন, বিদায় বেলায় আব্বাকে একেবারেই শান্ত স্বাভাবিক দেখা গেছে। তবে প্রেসিডেন্টের কাছে ক্ষমা প্রার্থনার বিষয়ে তিনি বেশ রিঅ্যাক্ট করেছেন। তিনি বলেছেন, জীবনের শেষ দিনও সরকার আমাকে নিয়ে জঘন্য মিথ্যাচার করেছে। এর চেয়ে বড় জুলুম আর কি হতে পারে! শহীদ মুজাহিদ স্বজনদের বলেছেন, আমি কোন অপরাধ করিনি। সরকার আমার কোন অপরাধ প্রমান করতে পারেনি। তবু বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করেছি সাক্ষ্যপ্রমান বিহীন এমন ঢালাও অভিযোগ দিয়ে মৃত্যুদন্ড দিয়েছে। যে অপরাধের কোন প্রমান নেই সে অপরাধের (?) জন্য ক্ষমা চাইবো কেন। মুজাহিদ বলেছেন, প্রেসিডেন্টের কাছে প্রাণ ভিক্ষার বিষয়টি প্রচার করে সরকার আমাকে কাপুরুষ হিসেবে দেশ জাতি এমনকি বিশ্ববাসীর কাছে প্রমান করতে চেয়েছিল। কিন্তু যারা আমাকে চিনে, আমার নীতি আদর্শ সম্পর্কে অবগত, তারা কখনো এসব বিশ্বাস করবেনা। ক্ষমা প্রার্থনার নাটক করে সরকার দেশবাসী বিশেষ করে আমার দলের লোকদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছে। হাশরের ময়দানে দেখা হবে স্ত্রীকে এমন শান্তনা দিয়ে বিদায়ের শেষ মুহূর্তে মুজাহিদ বলেছেন, সংসার জীবনে তোমার মত ভাল স্ত্রী পেয়ে স্রষ্টার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। প্রতি উত্তরে শহীদ মুজাহিদ স্ত্রী তামান্না-ই জাহান স্বামীকে একজন ভাল এবং নির্দোষ মানুষ হিসেবে প্রশংসা করেন।"

দ্বীনের সে অকুতোভয় সৈনিক তাঁর সার্বিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে পালন করেছেন আপোষহীন ভূমিকা। কোন শক্তির কাছেই তিনি মাথা নত করেননি। আজ আমাদের প্রিয় নেতা শহীদ মুজাহিদ ভাই সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। কোনো এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল

www.pathagar.com

ﷺ! কবরে সকল মুমিনের পরীক্ষা হবে, কিন্তু শহীদের হবে না, এর কারণ কী? হুজুর ﷺ জবাবে বললেন, তার মাথার ওপর তলোয়ার চমকানোই তার পরীক্ষার জন্য যথেষ্ট।'

আল্লাহর দ্বীনের দায়ী হিসেবে সারা বাংলাদেশে নয়, বরং ছুটে বেড়িয়েছেন পৃথিবীর অনেক প্রান্তে। মিথ্যা কালিমা আর ষড়যন্ত্রের কালো কাপড় কি সেই আলোচ্ছটাকে আবৃত করতে পারে? যেই শির আজন্ম এক পরওয়ারদিগার ছাড়া কারো কাছে নত হয়নি, ফাঁসির আদেশে সেই শির দুনিয়ার কোন শক্তির কাছে নতি শিকার করতে পারে?

জনাব মুজাহিদের বিরুদ্ধে আনীত যুদ্ধাপরাধের অভিযোগের অসাড়তা

ক. ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় জনাব মুজাহিদের বয়স ছিল ২৩ বছর। তিনি তখন ছিলেন ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ের একজন ছাত্র ।

খ. ১৯৭১ সালে এই অঞ্চলের মুসলমানদের শোষনের উদ্দেশ্যে ভারত যে আগ্রাসন চালায় জনাব মুজাহিদ তার বিরুদ্ধে অসংখ্য বক্তব্য-বিবৃতি প্রদান করেন। তিনি সেই সব বিবৃতিতে পাকিস্তানের নারকীয় গনহত্যারও নিন্দা জানান।

গ. জনাব মুজাহিদ সেই সময় ছাত্রসংঘের একজন নেতা হিসেবে ছাত্র আন্দোলনেই সক্রিয় ছিলেন এবং বেসরকারী একটি ছাত্র সংগঠন হিসেবে ছাত্রসংঘের পক্ষে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অপকর্মে অংশ নেয়ার কোন সুযোগ ছিল না।

ঘ. জনাব মুজাহিদের পিতা মাওলানা আব্দুল আলী ১৯৭১ সালে বৃহত্তর ফরিদপুর জেলায় জামায়াতের আমীর ছিলেন। মাওলানা আব্দুল আলী জামায়াতের প্রার্থী হিসেবেই ১৯৬২-৬৪ সালে প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। ইসলাম অনুরাগী হওয়ায় তাকে জেলা শান্তি কমিটিতে স্থান দেয়া হয়। তিনি শান্তি কমিটির সদস্য হিসেবেই বরাবরই পাকিস্তানের দখলদার সেনাদের হত্যা, লুণ্ঠন ও ধর্ষনের প্রতিবাদ করেছিলেন।

ঙ. সেই সময়ে ফরিদপুর জেলার সেনা কমান্ডার মেজর আকরাম কোরেশীর নেতৃত্বে একবার শান্তি কমিটির বৈঠক চলাকালে তিনি প্রকাশ্যে পাকিস্তান সেনাদের অন্যায় অপকর্মের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখেন। তার এই ভুমিকায় অসুন্তষ্ট হয়ে মেজর কোরেশী তাকে সেই বৈঠক থেকে বহিস্কার করেন। ঐ মিটিং থেকে বের হয়েই মাওলানা আব্দুল আলী স্থানীয় অম্বিকা ময়দানে গিয়ে উপস্থিত জনগনের সামনে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর তীব্র সমালোচনা করেন।

www.pathagar.com

চ. বিশেষ করে ১৯৭১ সালের ২১ এপ্রিল ফরিদপুর শহরে প্রবেশের সময় পাক সেনারা যে লুণ্ঠন ও হত্যাকান্ড চালায় তার তীব্র নিন্দা জানান তিনি। । ঐতিহাসিক সত্য হলো, শান্তি কমিটির ঐ মিটিং থেকে বের হয়ে আসার পর তিনি আর কখনো তাদের কোন কার্যক্রমে অংশ নেননি। ফরিদপুরের সন্তান হওয়ায় বঙ্গবন্ধু আগে থেকেই মাওলানা আব্দুল আলীকে চিনতেন। মাওলানা আব্দুল আলীর কীর্তিমান কর্মকান্ডকে শ্রদ্ধা জানিয়ে জেলা প্রশাসন তার নামে একটি সড়কের নামকরন করে। শুধু তাই নয়, বঙ্গবন্ধুসহ অসংখ্য কীর্তিমান ব্যক্তিদের সাথে মাওলানা আব্দুল আলীর ছবিও জেলা জাদুঘরে ঝুলানো হয় যা এখনো বিদ্যমান রয়েছে।

ছ. উপরের বর্ননায় জনাব মুজাহিদের পিতা মাওলানা আব্দুল আলীর যে মহান ব্যক্তিত্বের অবয়ব তুলে ধরা হয়েছে, তা থাকার পরও ঐ জেলায় তারই ছেলে যিনি একজন সামান্য ছাত্রনেতা- তার পক্ষে এধরনের অপরাধ সংঘঠন করার সুযোগ নেই। যদি জনাব মুজাহিদ সত্যিই এই ধরনের ঘৃন্য অপরাধ করতেন তাহলে সেই খবর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঠিকই জানতে পারতেন আর এই ধরনের অভিযোগের সত্যতা থাকলে জেলা প্রশাসনও মাওলানা আব্দুল আলীর ছবি জেলা জাদুঘরে টানাতে পারতেন না কিংবা তার নামে সড়কের নামকরনও করতে সাহস পেত না।

জ. প্রথমত দালাল আইনে অভিযুক্ত ৩৭, ৪৭১ জনের তালিকায় জনাব মুজাহিদের কোন নাম ছিল না। অপরদিকে এই সাধারন ক্ষমা ঘোষনার পরও বঙ্গবন্ধু প্রায় দেড় বছর ক্ষমতায় ছিলেন। কেউ এই তার বিরুদ্ধে অপরাধের সাথে সম্পৃক্ত থাকার কোন অভিযোগ জনাব মুজাহিদের বিরুদ্ধে উপস্থাপন করতে পারেনি।

ঝ. ১৯৭১ সালে নানাবিধ কারণে জামায়াতে ইসলামী ও ছাত্রসংঘ মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহন করতে পারেনি। একজন সাধারন ছাত্রনেতা হিসেবে এ সিদ্ধান্ত গ্রহনে আমার কোন ভূমিকা ছিল না। ছাত্র সংগঠনের দায়িত্বশীল হিসেবে মূল আন্দোলনের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত সমর্থন করেছি মাত্র। পাকিস্তানের পক্ষে বা বাংলাদেশের বিপক্ষে যুদ্ধ করেনি। তদানীন্তন জামায়াত নেতাদের সাথে আলাপ করে বুঝেছি তারা অন্তত দুটি মূখ্য কারণে উল্লিখিত সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।

১. ভারতের আধিপত্য ও আগ্রাসনের ভয়ে এবং

২. জনসংখ্যার দিক দিয়ে পৃথিবীর বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্রের পক্ষে আবেগ থাকার কারণে

www.pathagar.com

আনীত অভিযোগের ব্যপারে জনাব মুজাহিদ ট্রাইবুনালে নিম্নক্ত বক্তব্য প্রদান করেন

১. আমি কখনো পলাতক ছিলাম না। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর প্রকাশ্যে চলাফেরা করেছি। সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে আমি ফরিদপুরে বায়তুল মোকাদ্দেম মসজিদ কমপ্লেক্স, ইয়াতীম খানা ও নারায়নগঞ্জে স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছি। অথচ বাংলাদেশের কোথাও আমার বিরুদ্ধে কোন মামলা হয়নি, জিডি হয়নি। অপরাধী বা অভিযুক্তের কোন তালিকাতেই আমার নাম নেই।

২. ১৯৭১ সালে আমি ছাত্র ছিলাম। স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ নিতে না পারলেও ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় দিবস থেকেই স্বাধীন বাংলাদেশের সেবায় আত্ম নিয়োগ করেছি।

৩. ৩টি কারনে আমাকে অপরাধীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়েছে।

ক) যুদ্ধাপরাধ ইস্যুর জন্মদাতা আওয়ামী লীগ নয়। যারা এর নেপথ্যে মূল শক্তি, তারা ইসলামী রাজনীতি তো বটেই, সংবিধানে বিসমিল্লাহ্ শব্দটি পর্যন্ত বরদাশত্ করতে নারাজ। আর আমি ইসলামী রাজনীতি করি।

খ) বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী একটি শক্তিশালী গনতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল। দিন দিন এর শক্তি বাড়ছে, জনপ্রিয়তা বাড়ছে। আমি তার একজন নেতা, এখন সেক্রেটারী জেনারেল।

গ) আর আওয়ামী লীগ ক্ষিপ্ত হয়েছে বিএনপির সাথে জোট করার জন্য। রাজনৈতিক মেরুকরনে আওয়ামী লীগ বিরোধী শিবিরে থাকার কারনে।

৪. তদানীন্তন জামায়াত নেতৃবৃন্দ পাকিস্তান আন্দোলন করেছেন। মরহুম শেখ মুজিবুর রহমান সাহেব নিজেও। তারা সকলেই পাকিস্তান এক রেখেই সমস্যার সমাধান চেয়েছিলেন। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পর্যন্ত নির্বাচনের ফলাফলের ভিত্তিতে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য শেখ সাহেব আলোচনা চালিয়েছিলেন। অধ্যাপক গোলাম আজম নির্বাচনে বিজয়ী শেখ সাহেবের নেতৃত্বে ক্ষমতা হস্তান্তরের অব্যহত দাবী জানিয়ে আসছিলেন।

৫. ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারী বাংলাদেশের নেতা ও আর্কিটেক্ট শেখ মুজিব দেশে ফেরেন। প্রকৃতপক্ষে এ দিনই স্বাধীন বাংলাদেশের সূচনা যাত্রা। কারন তার ব্যক্তিত্বই বাংলাদেশকে ভারতীয় বাহিনী মুক্ত করেছিল।

৬. মাননীয় আদালত, আপনারা ভাল করেই জানেন যে, আমি জন্মসূত্রে বাংলাদেশের নাগরিক। অন্যদিকে ১৯৭৩ সালের এই আইনটি প্রনয়ন করা হয়েছিল পাকিস্তানী ১৯৫ জন সামরিক কর্মকর্তার বিচারের জন্য। ফলে আমি দারুনভাবে গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে স্বীকৃত ও আরোপিত

www.pathagar.com

অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছি। অর্থাৎ এ বিচারে আমার জন্মগত অধিকার কেড়ে নেয়া হয়েছে। ফৌজদারী দন্ডবিধি অনুযায়ী সর্বোচ্চ অপরাধীকে দেয়া অধিকার ও সুযোগটুকুও আমাকে দেয়া হয়নি। তাই বিচারের কাঠগড়ায় আজ আমি অসহায় ও মজলুম।

৭. আপনি আমার চেয়ে ভাল করেই জানেন যে, প্রমানের অভাবে অপরাধী ছাড়া পেতে পারে। কিন্তু কোন অবস্থাতেই নিরপেক্ষ কাউকে শাস্তি দেয়া যায় না। ন্যায় বিচারের এ ভিত্তিটিই বাংলাদেশের আইনে, ইসলামী আইনে এবং আন্তর্জাতিক আইনে স্বীকৃত।

৮. আমাদের বিরুদ্ধে মামলার নেপথ্য শক্তি খুবই চৌকস। অভিযোগনামা এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে এবং ভাষা এমনভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে যাতে আওয়ামী লীগ ক্ষিপ্ত হয়। প্রতিবেশী দেশের সাথে আমাদের সম্পর্ক বিনষ্ট হয় এবং আমাদের দেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের সামাজিক রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতুত্ব বিভ্রান্ত হয় এবং আমাদের প্রতি বিরাগভাজন হয়।

৯. আল্লাহকে ভয় করি। আদালতে আখিরাতের জবাবদিহিতাকে ভয় করি। সবাইকে ফাঁকি দেয়া যায়, কিন্তু আল্লাহকে ফাঁকি দেয়া যায় না। আনীত অভিযোগ সত্য হলে স্বীকার করে নিতাম। এটাই কুরআন হাদীসের শিক্ষা। তাই আমি দৃঢ়তার সাথে ঘোষনা করছি আল্লাহ স্বাক্ষী, আমিম ১০০% নির্দোষ, আমার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ সম্পুর্ন মিথ্যা, বানোয়াট ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রনোদিত।

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক আইনী ও মানবাধিকার সংস্থার প্রতিক্রিয়া:

এই বিচার শুরু হওয়ার পর থেকেই জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশন, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, আন্তর্জাতিক বার এসোসিয়েশন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধাপরাধ বিষয়ক দূত স্টিফেন জে র‍্যাপ, আন্তর্জাতিক যুদ্ধাপরাধ বিশেষজ্ঞ স্টিভেন জে কিউসি, টবি ক্যাডম্যান, জন ক্যামেগ, এমনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, বৃটিশ প্রখ্যাত আইনবীদ লড কার্লাইল, লর্ড এ্যাভিবুরি, মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ, সন্টার ফর জাস্টিস এন্ড একাউন্টিবিলিটি (সিজেএ), আন্তর্জাতিক আইন ও বিচার বিষয়ক সংস্থা নো পিস উইদাউট জাস্টিস এবং 'নন ভায়োলেন্ট রেডিক্যাল পার্টি, ট্রান্সজেকশনাল এবং ট্রান্সপার্টি'-এনআরপিটিটিসহ বিভিন্ন সংস্থা সমালোচনা করেছেন। তারা এই আইনকে ত্রুটিপূর্ন, বিচারকে পক্ষপাতদুষ্ট উল্লেখ করে একে আন্তর্জাতিক মান সম্মত করার পক্ষে জোর দাবী জানান।

www.pathagar.com

মুজাহিদের মৃত্যুদন্ড কার্যকর স্থগিত করতে লর্ড কারলাইলের আহ্বান প্রতিশোধমূলক ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত বিষয় সমর্থনযোগ্য নয়

বিচার প্রক্রিয়া নিয়ে উদ্বেগ জানিয়ে আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদের মৃত্যুদন্ড কার্যকর স্থগিত করার আহ্বান জানিয়েছেন যুক্তরাজ্যের হাউস অব লর্ডস এর সদস্য লর্ড কারলাইল। গত শুক্রবার দেয়া এক বিবৃতিতে তিনি পুরো বিচার প্রক্রিয়া নিয়ে স্বাধীন তদন্তের আহ্বান জানিয়েছেন, যে বিষয়ে উদ্বেগ দিনের পর দিন বেড়েই চলছে।

বিবৃতিতে তিনি বলেন, ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধে সংগঠিত ঘটনার বিচার অবশ্যই সমর্থনযোগ্য। কিন্তু সেই প্রক্রিয়ায় যদি ন্যায় বিচার না হয়, প্রতিশোধ গ্রহণের বিষয় যুক্ত থাকে এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়, তাহলে তা সমর্থনযোগ্য হতে পারে না।

তিনি বলেন, মুজাহিদ দোষী সাব্যস্ত হয়েছে এবং এমন এক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তিনি মৃত্যুদন্ডের মুখোমুখি, যা কঠোর সমালোচনাযুক্ত। তিনি বলেন, যেখানে শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদন্ড দেয়া হয়, সেখানে সুস্পষ্টভাবে সেই প্রক্রিয়া এমন মানদন্ডে হতে হবে, যা সমালোচনার ঊর্ধ্বে থাকবে।

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চুক্তি, বিশেষ করে ইন্টারন্যাশনাল কভেন্যান্ট অন সিভিল এবং পলিটিক্যাল রাইটস-আইসিসিপিআর এবং ইউনিভার্সাল ডিক্লারেশন অফ হিউম্যান রাইটস এর অনুস্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে তিনি বাংলাদেশকে বিচারের মূলনীতিগুলো অনুসরণের আহ্বান জানান।

বিবৃতিতে তিনি মুজাহিদের মামলার কথা উল্লেখ করে বলেন, 'এটা দেখে মনে হচ্ছে বাংলাদেশে কোন বিচার নেই এবং এগুলো রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও প্রতিশোধমূলক।'

ফাঁসি কার্যকর করায় ক্ষুব্ধ পাকিস্তান

বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধের দায়ে দু'জন বিরোধী নেতার মৃত্যুদন্ডকার্যকর করার কয়েক ঘণ্টা পর পাকিস্তান সরকার গভীর উদ্বেগ ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। ইসলামাবাদে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে আজ রোববার প্রকাশিত এক বিবৃতিতে পাকিস্তান সরকারের পক্ষ থেকে এই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা হয়।

তুরস্ক

তুরস্কের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, মৃত্যুদন্ড প্রাপ্ত সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরী ও আলী আহসান মোহাম্মাদ মুজাহিদের ফাঁসি কার্যকর হওয়ার ঘটনায় তারা অত্যন্ত মর্মাহত। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, তুরস্ক এরইমধ্যে মৃত্যুদন্ড প্রথা বাতিল করেছে একং তারা বিশ্বাস করে এ ধরনের

www.pathagar.com

পদ্ধতি অবলম্বন করে অতীতের ক্ষত প্রশমন করা যাবে না।তুরস্ক মনে করে ভ্রাতৃপ্রতিম বাংলাদেশের উচিৎ সমাজকে ঐক্যবদ্ধ রাখার জন্য মৃত্যুদন্ডের পরিবর্তে অন্য কোনও পদ্ধতি অবলম্বন করা।

একই সাথে এ হত্যা কান্ডের প্রতিবাদ জানায় নির্যাতিত সংগঠন ইখওয়ানুল মুসলিম, জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান, প্যালেস্টাইন স্কলার ফোরাম, ইউর জন লেমবর্টি।

দাফন ও স্থানীয়দের প্রতিক্রিয়া

সারাদিন কবরস্থানে মানুষের ঢল-ফরিদপুরে ৫টি জানাযা অনুষ্ঠিত

নিজের প্রতিষ্ঠিত মাদরাসা ও মসজিদের পাশেই চিরনিদ্রায় শায়িত হলেন মুজাহিদ

জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদের কফিনবাহী গাড়ির বহর ভোর ৬:৩০ মিনিটে ফরিদপুরে তার নিজ বাড়ি পশ্চিম খাবাসপুরে পৌঁছায়। প্রশাসনের কড়াকড়ির মধ্যেও হাজারো মানুষ ছুটে আসে এই প্রিয় নেতাকে এক নজর দেখার জন্য। তবে চারিদিকে র‍্যাব, পুলিশ ও আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর অতি বাড়াবাড়ির কারণে তারা জানাযায় শরিক হতে পারেননি। তারপরেও পূর্ব থেকে মাদরাসায় সমবেত হাজারো মানুষ জানাযায় শরিক হন। তাকে নিয়ে আসা আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা মাত্র ২০ মিনিটের মধ্যে জানাযা এবং দাফন সম্পন্ন করার জন্য সময় বেধে দেন। তড়িঘড়ি করে এর মধ্যেই তা সমাধা করতে হয়। জানাযায় ইমামতি করেন শহীদ আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদের বড় ভাই আলী আফজাল মোহাম্মদ খালেছ। পরে আরো ৪টি গায়েবানা জানাযা অনুষ্ঠিত হয় একই জায়গায়।

যেখানে তার নিজের প্রতিষ্ঠিত মাওলানা আব্দুল আলী ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত আইডিয়াল ক্যাডেট মাদরাসা ও মসজিদ সেখানেই তার নিজের ইচ্ছা অনুসারে দাফন করা হয়। এই মাদরাসায় তিনি জীবিত থাকাকালীন ফরিদপুর আসলেই নামায পড়তেন এবং ছাত্র শিক্ষকদের খোঁজ খবর নিতেন। প্রতি রমযানে এই মসজিদেই তিনি ইতেকাফ করতেন। জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম যেমনটি বলেছিলেন মসজিদেরই পাশে আমার কবর দিও ভাই, যেন গোরে থেকেও মোয়াজ্জিনের আজান শুনতে পাই। জাতীয় নেতা আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদের কবর সেই মসজিদের পাশে, সাথে আরো আছে মাদরাসা যেখানে প্রতিদিনে রাতে হচ্ছে পবিত্র কুরআনের চর্চা ও দ্বীনী শিক্ষা। এমন সৌভাগ্য কয়জনেরই বা হয়।

www.pathagar.com

মাওলানা আব্দুল আলী ফাউন্ডেশন পরিচালিত মাদরাসা মাঠে লাশ পৌঁছানোর পর সেখানেই তার প্রথম নামাযে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। প্রশাসনের তাড়াহুরার কারণে দাফন শেষে সংক্ষিপ্ত দোয়া অনুষ্ঠিত হয়। তবে বাইরে অপেক্ষমান হাজারো মানুষের দাবির প্রেক্ষিতে জেলা জামায়াতের আমীর প্রফেসর আব্দুত তাওয়াব ঘোষণা করেন যে, বেলা ১০টায় গায়েবানা জানাযা অনুষ্ঠিত হবে। তার আগে জনতাকে পাশ কাটিয়ে লাশবাহি এ্যাম্বুলেন্স ভিতরে প্রবেশ করলে অপেক্ষমান নারী, পুরুষ নির্বিশেষে ঠুকরে কেঁদে ওঠেন। তাদের কান্নায় ভারি হয়ে ওঠে খাবাসপুরের আকাশ বাতাস। তাদের প্রিয় নেতাকে শেষ দেখার সুযোগ না দেয়ায় আফসোস করেন আবাল বৃদ্ধ বনিতা সর্ব বয়সি মানুষ। লাশ দাফনের পর আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা বেরিকেট তুলে নিলে চতুর্দিক থেকে হাজার হাজার মানুষ ভিড় জমায় কবরের কাছে। বেলা ১০টায় যখন মাদরাসা প্রাঙ্গণ লোকে লোকারন্ন তখন গায়েবানা জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। এতে ইমামতি করেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগরীর নায়েবে আমীর মাওলানা আব্দুল হালিম। জানাযার পূর্বে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন শহীদ আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদের ছোট ছেলে আলী আহমেদ মাবরুর। এ ছাড়াও জানাযায় শরিক হন ফরিদপুর জেলা জামায়াতের সাবেক আমীর অধ্যাপক দেলোয়ার হোসেন, জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি বদরুদ্দিন মোল্লা।

আলী আহমেদ মাবরুর তার সংক্ষিপ্ত আবেগঘন বক্তব্যে বলেন, আমার বাবা আপনাদের এলাকার সন্তান। আপনারা তাকে চেনেন, জানেন, তিনি কখনো কারো অনিষ্ঠ করেন নাই। তার বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দিয়ে বিচারের নামে হত্যা করা হয়েছে। তিনি জালিম সরকারের চরম জুলুমের শিকার। আপনারা সবাই দোয়া করবেন আল্লাহ যেন তাকে শাহাদাতের মর্যাদা দান করেন। তিনি আরো বলেন, শুধু বিচার নিয়ে নয়, ফাঁসি কার্যকর করার আগে প্রাণ ভিক্ষার নামে সরকার আর এক নাটক করেছে। তিনি স্পষ্টভাবে গত রাতে আমাদেরকে বলেছেন যে, তিনি প্রাণ ভিক্ষা চাননি। প্রাণ ভিক্ষা দেয়ার মালিক রাষ্ট্রপতি নন, সর্বশক্তিমান আল্লাহ। প্রাশাসনের অতি চাপাচাপির কারণে তিনি নিজ হাতে রাষ্ট্রপতির কাছে যে চিঠি লিখেছেন তাতে বিচারের অসঙ্গতি, আইসিটি আইনের মৌলিক অধিকার হরণকারী বিধি এবং পক্ষপাতমূলক বিচারের প্রসঙ্গ তুলে ধরেছেন মাত্র। তিনি সংবিধান প্রদত্ত মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। এই কথাগুলো তিনি নিজ হাতে লিখেছেন। কোন প্রাণ ভিক্ষা চাননি।

সকাল ১০টায় জানাযার পরেও গতকাল রোববার সারাদিন হাজার হাজার মানুষ আসতে থাকে আব্দুল আলী ফাউন্ডেশন পরিচালিত মাদরাসা প্রাঙ্গণে শহীদ আলী

www.pathagar.com

আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদের কবর জিয়ারত করতে। অধিক লোক সমাগমের কারণে জেলা জামায়াতে ইসলামী আরো তিনটি গায়েবানা জানাযার আয়োজন করেন। এই জানাযাগুলো যথাক্রমে সকাল ১১:৩০ মিনিটে, বাদ যোহর ও বাদ আসর অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিটি জানাযায় বিপুল সংখ্যক মানুষের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। প্রতিটি জানাযায় শেষে দোয়া অনুষ্ঠিত হয়। এ ছাড়াও সারাদিনই চলতে থাকে কবর জিয়ারত ও দোয়া।

আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ যে কত বড় মাপের মানুষ ও নেতা ছিলেন তার প্রমাণ মেলে গতকাল রোববার সারাদিন হাজারো মানুষের উপস্থিতি ও তাদের বুকফাটা আর্তনাদ ও দোয়ার মাধ্যমে। যে মানুষটা কখনো কাউকে কষ্ট দেননি সবার মঙ্গল চেয়েছেন এবং সবার মঙ্গলের জন্য কাজ করেছেন সেই মানুষটিকে কেন এভাবে ফাঁসি দেয়া হল সে প্রশ্ন সকলের। ফরিদপুরের পুরো বাতাসই যেন গতকাল সারাদিন ছিল ভারি। এই মাটির শ্রেষ্ঠ সন্তানকে হারালো ফরিদপুরবাসি। আর জাতি হারালো একজন সৎ, দৃঢ়চেতা, সাহসী, দেশপ্রেমিক জাতীয় নেতাকে। তিনি ৫ বছর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সমাজকল্যাণ মন্ত্রী থাকাকালে ৫ টাকার দুর্নীতি করেছেন এমন কোন প্রমাণ নেই। তিনি সারা দেশের মানুষের দুঃখ দুর্দশা লাঘবের জন্য গোটা দেশ ঘুরে বেড়িয়েছেন। আজ নিয়তির নির্মম পরিহাস যে, তাকেই জুলুমের শিকার হতে হলো।

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল সাবেক মন্ত্রী আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ ফিরে গেছেন আল্লাহর কাছে যার কাছ থেকে তিনি এসেছিলেন। জন্ম নিলে একদিন মৃত্যুকেও বরণ করতে হয়। এই মহাসত্য সকলের জানা। তারপরেও কিছু কিছু মৃত্যু মানুষের বিবেককে করে জাগ্রত, মানুষকে নতুন করে ভাবতে শেখায়। কি তার অপরাধ? কেন তাকে ফাঁসির দড়িতে ঝুলতে হলো? তিনি কি সত্যিই কোন প্রকার মানবতাবিরোধী অপরাধের সাথে জড়িত ছিলেন? না এটা বিশ্বাস করার কোন কারণ নেই। হ্যাঁ বিশ্বাস করার আছে এটাই যে, আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ একজন সত্যিকার অর্থেই মর্দে মুজাহিদ, তিনি আল্লাহর রাহে নিবেদিত একজন পরীক্ষিত সৈনিক। তিনি এই জমিনে আল্লাহর দ্বীন কায়েমের জন্য সারাটি জীবন ছিলেন নিবেদিত। এটাই তার অপরাধ! তাই জীবন দিয়ে শিখিয়ে গেলেন কিভাবে হাসতে হাসতে, কালেমা পড়তে পড়তে দৃঢ়পদে ফাঁসির মঞ্চে এগিয়ে যেতে হয়।

অশীতিপর এক বৃদ্ধ এসেছিলেন গায়েবানা জানাযায়। অঝোরে কেঁদেছেন মুজাহিদের রুহের মাগফেরাতের জন্য। তার চোখের পানি মুখ থেকে গড়িয়ে শ্বেতশুভ্র দাড়ি ভিজে টপ টপ করে পড়ছিল পাঞ্জাবিতে। কথা হয় তার সাথে এই প্রতিবেদকের। তিনি কোনভাবেই কান্না থামাতে পারছিলেন না। কথা বলছিলেন

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

স্বজনদের সর্বশেষ প্রতিক্রিয়া

পরিবার ও সন্তানদের প্রতি মুজাহিদের শেষ পরামর্শ ও অসিয়ত

-আলী আহ্মাদ মাবরুর

২১ নবেম্বর রাত ৮টা। আমি তখন পুরানা পল্টনস্থ আইনজীবীদের চেম্বারে। পরিবারের বাকি সবাই উত্তরাস্থ বাসভবনে। হঠাৎ বাসা থেকে ফোন- আমাদেরকে মানে পরিবারকে নাকি শেষ সাক্ষাতের জন্য যেতে বলেছে। ডেপুটি জেলার শিরিন আমার বড় ভাই আলী আহমেদ তাজদীদকে ফোন দিয়ে রাত ৯টার মধ্যে কারাগারে পৌঁছতে বলেছে। আমি সাথে সাথে তাদেরকে বললাম, আমি তো কাছেই আছি। আপনারা জলদি বের হন। আমি সাথে সাথে সংগঠনের সবাইকে অবহিত করলাম এবং তাদের কাছ থেকে কিছু জানার চেষ্টা করলাম; শেষ সাক্ষাতে কোনো পরামর্শ আছে কি না। আইনজীবীদেরকেও জানালাম। তারপর অযু করে কারাগারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলাম।

আমাদের পরিবার ও আত্মীয় স্বজনের মোট ২৫ জন সদস্য সেদিন কারাগারে গিয়েছিলাম। রাত ১১টার দিকে আমরা সেখানে পৌঁছাই। ঢোকার পরে প্রয়োজনীয় তলাশি শেষে রাত ১১-২০ মিনিটে মৃত্যুদ-প্রাপ্ত আসামীদের সেল রজনীগন্ধায় পৌঁছাই। রজনীগন্ধায় সেলের একেবারে ডানকোনায় ৮নং সেলে আব্বা থাকছেন। এর আগেও শহীদ আব্দুল কাদের মোলা ও শহীদ মুহাম্মাদ কামারুজ্জামানও সেই ঘরটিতেই ছিলেন। আমরা গত কয়েক মাসেও সেখানেই আব্বার সাথে সাক্ষাৎ করেছি। আমার আগে আব্বার এক নাতি, আমার আম্মা আর বোন আব্বার ঘরে পৌঁছান। আমি ৪ নম্বর ব্যক্তি হিসেবে পৌঁছাই, সাথে অন্যরাও। আমি ধারণা করেছিলাম, যেহেতু এতো লোক যাচ্ছি শেষ সাক্ষাৎ; কাজেই আব্বা হয়তো আমাদের জন্য তৈরি হয়েই বসে থাকবেন। কিন্তু আমরা রুমের বাইরের করিডোরে বা রুমের ভেতরে দাঁড়ানো কোনো অবস্থাতেই আব্বাকে পেলাম না। ভেতরে তাকিয়ে দেখি, আব্বা শুয়ে আছেন। পরে বুঝলাম গভীর ঘুমে আছেন। ডান দিকে কাত হয়ে গালের নীচে হাত দিয়ে সবসময় যেভাবে ঘুমাতে দেখেছি সেভাবেই তিনি ঘুমাচ্ছেন। গায়ের ওপর কাঁথা নেই, ছোট রুমের মাটিতে জায়নামাযের ওপর শুয়ে আছেন। মাথার নীচে কোনো বালিশও নেই। আমার বোন, আমরা সবাই আব্বা আব্বা বলে ডাকছি। আর আমার ভাইয়ের ছেলেরা ডাকছে দাদা দাদা বলে। কিন্তু আব্বার কোনো সাড়া নেই। যেন ঘুমের সাগরে তলিয়ে আছেন তিনি। এভাবে প্রায় মিনিট খানেক ডাকাডাকির পর আব্বা একটু গুঙ্গিয়ে বললেন, কে কে? তারপর আমাদের দেখে বললেন, "ও তোমরা এসছো। এতো রাতে কি ব্যাপার? তোমাদের কি কারা কর্তৃপক্ষ ডেকেছে? এটা কি শেষ সাক্ষাৎ?" ততক্ষণে তিনি উঠে বসেছেন।

www.pathagar.com

"আমাকে তো জেল কর্তৃপক্ষ কিছু জানায়নি। তাওয়াক্কালতু আলাল্লাহ।" কিছুটা সময় তিনি বসেই থাকলেন। মনে হলো গভীর ঘুম থেকে উঠার জন্য, পাশাপাশি আমাদের উদ্দেশ্যে তার দিকনির্দেশনাগুলো গুছানোর জন্য আল্লাহর সাহায্য চাইছেন।

আমরা তাকে উত্তর দিলাম, জ্বী আব্বা, আমরা আমাদের শহীদ হতে যাওয়া বাবার কাছে এসেছি। আমরা আমাদের গর্বের ধনের কাছে এসেছি। আমার বোন বললো, আমরা আমাদের মর্যাদাবান পিতার সাথে দেখা করতে এসেছি। আমাদেরকে ওরা আজ শেষ বারের জন্য আপনাকে দেখার জন্য ডেকেছে। তিনি এভাবে বসে থাকলেন কিছুক্ষণ। বসে বসেই আমাদের কথা শুনলেন। আম্মা বললেন, উঠে এসো। সব শুনে তিনি বললেন, "ও আচ্ছা, আলহামদুলিল্লাহ।"

বেশ কিছুক্ষণ পর তিনি উঠলেন, দাঁড়ালেন। ফিরোজা রং এর গেঞ্জী, সাদা নীলের স্ট্রাইপ পড়া পায়জামা পড়েছিলেন তিনি। কিছুক্ষণ স্যান্ডেল খুঁজলেন। পরে খুঁজে পেয়ে স্যান্ডেল পড়ে আমাদের সামনে দাঁড়ালেন। বললেন, "কে কে এসছো, কয়জন, আমিই একটু দেখি।" সেই সময় লাইটের আলো কম থাকায় ভেতর দিকে ভাল দেখা যাচ্ছিলো না। সেলের লোহার দরজার বাইরে নেটের দরজা লাগানো ছিল। পরে আমার বড় ভাই সেই দরজাটি খুলে দিলেন। আমরা পরিবারের সদস্যরা আগে একে একে সালাম দিলাম, তারপর আত্মীয়রা। আমার বড় ভাইরা প্রত্যেকের নাম বলে দিচ্ছিলেন যে, যারা সেদিন সাক্ষাতে গিয়েছিল। কিন্তু আব্বা বললেন, "দাঁড়াও আমিই দেখে নেই।" তারপর সবাই একটু জোরে নিজেদের নাম বলে উপস্থিতি জানান দিলেন। কিন্তু আব্বা আলাদা আলাদা করে প্রত্যেককে কাছে ডেকে তাদের সাথে হাত মিলাতে শুরু করলেন। একে একে সবাই শিকের ভেতর দিয়ে হাত মেলালেন। প্রত্যেকের সাথে তিনি তাদের খোঁজ-খবর নিলেন। যার যা সমস্যা সেটা নিয়েই তিনি আলাপ করলেন। প্রত্যেকে সেল দিয়ে বের হয়ে থাকা তাঁর দুটি হাত ছুয়ে সালাম দিলেন। কেউ বা চুমু দিলেন। শেষ করে বললেন, "কারও সাথে মুসাবাহ করা বাদ যায়নি তো?"

আব্বা দাঁড়ানোর পর আমি নিজ থেকেই একটা সূচনা বক্তব্য দিলাম। বললাম আব্বা আপনি শহীদ হতে যাচ্ছেন। আপনি এর মাধ্যমে নিজেকে ও আমাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে সম্মানিত করে যাচ্ছেন। আপনি আমাদেরকে দুনিয়াতেও সম্মানিত করেছেন, আখিরাতেও সম্মানিত করতে যাচ্ছেন। অতএব মোটেও দুশ্চিন্তা করবেন না। আপনাকে আপনার আব্বা, আমার দাদা মরহুম মাওলানা আব্দুল আলী ইসলামী আন্দোলনের জন্য ওয়াক্‌ফ করে গেছেন। আমি মনে করি এরকম একজন ওয়াকফ হওয়া মানুষের সর্বোত্তম ইতি আজ হতে যাচ্ছে। কেননা আপনি আপনার ছাত্র জীবন, যৌবন, মাঝবয়স সব আন্দোলনের জন্য

www.pathagar.com

ব্যয় করে এখন দ্বীন কায়েমের জন্য গলায় ফাঁসির দড়ি নিচ্ছেন। আপনার শাহাদাতে সবচেয়ে খুশী হবেন আপনার পিতা মরহুম মাওলানা আব্দুল আলী। কেননা আপনি তার রেখে যাওয়া ওয়াদা অনুযায়ী জীবন যাপন করে আজ দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে যাচ্ছেন।

আব্বা এরই মধ্যে উঠে দাঁড়িয়ে সেলের দরজায় স্বভাবসুলভ ভংগিতে লোহার শিক ধরে দাঁড়িয়েছেন। এরপর তিনি প্রথম শব্দ করলেন আলহামদুল্লিাহ। প্রথম কথা বললেন, তোমরা জেনে রাখো, কারা কর্তৃপক্ষ এখনও পর্যন্ত আমাকে জানায়নি যে তারা আজ আমার ফাঁসি কার্যকর করতে যাচ্ছে। এটা কত বড় জুলম?

তখন একটা আবেগঘন পরিবেশের সৃষ্টি হতে যাচ্ছিল। কিন্তু আব্বা বললেন, কান্নাকাটির দরকার নেই। আমি কিছু কথা বলবো।

এরপর তিনি অত্যন্ত স্বভাবসুলভ তেজদীপ্ত বলিষ্ঠ কণ্ঠে, মাথা উচু করে অনেকটা ভাষণের ভংগিমায় শুরু করলেন, "নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসুলিহিল কারীম।" উপস্থিত অন্যরা তখনও একটু আবেগ প্রকাশ করছিল, আব্বা আবারও বললেন, "নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসুলিহিল কারীম। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন, আসসালাতু আসসালামু আলা সাইয়্যেদুল মুরসালীন। ওয়ালা আলিহী ওয়া সাহবিহী আজমাইন। আম্মা বা'আদ। আল্লাহ তায়ালার কাছে শুকরিয়া। জেল কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ যে তারা এই সাক্ষাতের সুযোগ করে দিয়েছেন। জেল কর্তৃপক্ষ আসলে অসহায়। তারা তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী এই পর্যন্ত আমাকে যথেষ্ট সম্মান দিয়েছেন এবং আমার সাথে ভাল ব্যবহার করেছেন। তারা আমাকে একটি লিখিত আবেদনের জন্য যথেষ্ট পীড়াপীড়ি করেন এবং বলেন এটা না হলে তাদের অসুবিধা হয়ে যাবে। এক পর্যায়ে তারা বলেন, আপনার যা বক্তব্য আছে তাই লিখে দেন। আর সেই কারণেই এটা বলার পর আমি কনসিকুয়েন্স বুঝেও আমি তাদের সুবিধার জন্য একটি লিখিত আবেদন দিয়েছি।"

আমি প্রশ্ন করলাম, আব্বু আপনি ঐ চিঠিতে আসলে কি লিখেছেন?

উত্তরে তিনি বললেন, "আমি রাষ্ট্রপতিকে লিখেছি, আইসিটি এ্যাক্ট, যদিও এটা দেশে বিদেশে বিতর্কিত ও সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক তারপরও এই বিচারের সময় আমাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সীমিত সুযোগ দেয়া হয়েছে। আমার ক্ষেত্রে ফৌজদারি আইন, স্বাক্ষ্য আইন প্রযোজ্য ছিল না। সংবিধান স্বীকৃত নাগরিক অধিকার থেকে আমাকে বঞ্চিত করা হয়েছে।

আমাকে ট্রাইবুনাল ৬ নং চার্জে মৃত্যুদন্ড দেয়নি। তারা চার্জ ১ কে চার্জ ৬ এর সাথে মিলিয়ে চার্জ ৬ এ মৃত্যুদন্ড দিয়েছে। আপিল বিভাগ আমাকে চার্জ ১ থেকে

www.pathagar.com

বেকসুর খালাস দিয়েছে। চার্জ ৬ এ তারা আমার মৃত্যুদন্ড বহাল রেখেছে। অথচ ট্রাইবুনাল শুধু চার্জ ৬ এর জন্য আমাকে মৃত্যুদন্ড দেয়নি।

এই চার্জে স্বাক্ষী মাত্র একজন। সে বলেনি, যে কোন বুদ্ধিজীবীকে আমি হত্যা করেছি। কোন বুদ্ধিজীবি পরিবারের সন্তানও এসে বলতে পারেনি যে, আমি কোন বুদ্ধিজীবিকে মেরেছি এবং কোনো বুদ্ধিজীবি পরিবার আমার রায়ের পরও দাবি করেনি যে, তারা তার পিতা হত্যার বিচার পেয়েছেন। আমার অপরাধ হিসেবে বলা হয়েছে যে, আমি নাকি আর্মী অফিসারদের সাথে বসে পরামর্শ দিয়েছি। কিন্তু যে স্বাক্ষী এসেছে সেও বলেনি যেম আমি কবে কোন আর্মি অফিসারের সাথে কোথায় বসে এই পরামর্শ করলাম?

স্বাক্ষী বলেছে আমাকে, নিজামী সাহেব ও অধ্যাপক গোলাম আযমকে দেখেছে। সে আমাদের চিনতো না। পরে আমাদের নাম শুনেছে। অথচ এই অভিযোগটি গোলাম আযমের সাহেবের বিরুদ্ধে আনাই হয়নি। নিজামী ভাইকে যাবজ্জীবন দিয়ে শুধু আমাকে মৃত্যুদন্ড দেয়া হয়েছে।

আমি নিশ্চিত যে, আমার মৃত্যুদন্ডের রায় কনফার্ম করে তারপর আমার বিরুদ্ধে বিচারের নামে প্রহসন শুরু করা হয়েছে। (আমরা সকলে তখন চিৎকার করে বললাম শেম)

আমাকে আমার পরিবার, সংগঠন ও দেশবাসীর কাছে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য, কাপুরুষ প্রমাণ করার জন্য দিনভর রাষ্ট্রীয়ভাবে এই মিথ্যাচারের নাটক করা হয়েছে। এই জালিম সরকারের কাছে ক্ষমা চাওয়ার প্রশ্নই আসে না। (এই সময় তার কণ্ঠে প্রচন্ড রাগ ও ক্ষোভের সুর প্রকাশ পায়)। আমি নির্দোষ, নির্দোষ এবং নির্দোষ। আমাদের আজ তারা অন্যায়ভাবে হত্যা করতে যাচ্ছে।

কত বড় স্পর্ধা তাদের যে, তারা মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার করার দাবি করে। অথচ তাদের নিজেদের ভেতর মানবতা নেই। তারা ঘুমন্ত অবস্থায় একজন মানুষকে মধ্যরাতে তুলে তার পরিবারের সদস্যদের নিয়ে এসে বলে এই তাদের শেষ সাক্ষাৎ এবং এরপরও তাদের ফাঁসি কার্যকর করা হবে।

তারা সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর মতো লোককেও একইভাবে মাঝরাতে তুলে তার পরিবারের সাথে সাক্ষাতের জন্য ডেকেছে। এটা কেমন মানবতা? আমার মতো তিনিও বিচারিক প্রক্রিয়ার যাবতীয় ত্রুটি ও অসংগতি নিয়ে ইংরেজিতে রাষ্ট্রপতিকে চিঠি লিখেছেন।

তোমরা শুনে রাখো, তোমরা চলে যাওয়ার পর আজ যদি আমার ফাঁসি কার্যকর করা হয় তাহলে তা হবে ঠান্ডা মাথায় একজন নিরীহ মানুষকে হত্যা করা। তোমরা প্রতিহিংসাপরায়ন হবে না। তোমাদের কিছুই করতে হবে না। আজ

www.pathagar.com

আমার মৃত্যুদন্ড কার্যকর করার পর এই অন্যায় বিচারিক প্রক্রিয়ার সাথে যারা জড়িত তাদের প্রত্যেকের বিচার আল্লাহর দরবারে শুরু হয়ে যাবে, বিচার শুরু হয়ে গেছে। তোমাদের কারও কিছু করতে হবে না।

তোমাদেরকে আজ আমি আমার সত্যিকারের জন্ম তারিখ বলি। আমাদের সময় জন্মতারিখ সঠিকভাবে লিখা হতো না। আমাদের শিক্ষকেরাই ছাত্রদের জন্ম তারিখ বসিয়ে দিতেন। আমার সত্যিকারের জন্ম তারিখ বলি। আমার জন্ম ১৪ আগস্ট, ১৯৪৭, ২৭ রমযান। আমার চেয়ে শেখ হাসিনা মাত্র ১ মাসের ছোট। তিনি আমাকে ভালভাবেই চিনেন। তিনি ভাল করেই জানেন আমি কোনো অন্যায় করিনি কেননা তার সাথে সাথে আমার দীর্ঘ আন্দোলনের ইতিহাস।

আমি পবিত্র মক্কা নগরীতে ওমরাহ করেছি অসংখ্যবার। আর আল্লাহর রহমতে হজ্ব করেছি ৭ থেকে ৮ বার। আমার বাবার কবর পবিত্র নগরী মক্কায় জান্নাতুল মাওয়াতে। সেখানে তার কবর উম্মুল মুমেনীন খাদিজার রাদিআল্লাহু আনহা পাশে, বেশ কয়েকজন সাহাবীর কবর আছে আলাদা ঘেরাও করা, তার ঠিক পাশে। সেখানে অনেক নবী রাসুলদের কবরও আছে। আমি এই পর্যন্ত যতবার ওমরাহ করেছি, যাদেরকেই সাথে নিয়েছি তাদের প্রত্যেককেই সেই কবর দেখানোর চেষ্টা করেছি।"

আব্বার ছোট ভাই আলী আকরাম মো: ওজায়ের তখন স্বাক্ষ্যে বললেন, নয়া ভাই, আমাকেও আপনি নিয়ে গেছেন। (উল্লেখ্য আব্বার সব ভাই-বোনেরা তাকে নয়া ভাই বলেন। ফরিদপুরের আঞ্চলিক ভাষায় চতুর্থ ভাইকে নয়া ভাই বলা হয়)

আব্বা আবার বললেন, "আমার তো ইচ্ছা হয়, আব্বার পাশে গিয়ে আমি থাকি, (একটু হেসে বলেন) তবে এখন সেটা বললে তো জেল প্রশাসন একটু বিপদে পড়েই যাবে। যাক এই ব্যাপারে আমি তো আমার বড় ছেলেকে দায়িত্ব দিয়েছি, সেই সবার সাথে আলাপ করে ঠিক করে নেবে। সেটাই ঠিক বলে মনে করি।"

এর মাঝেই মেঝ ছেলে তাহকীককে ডিউটিরত ডেপুটি জেলার বার বার সময় নিয়ে ইংগিত করছিল। আমার মেঝ ভাই তাই আব্বাকে জানায় যে, আর ৫ মিনিট সময় আছে। জেল প্রশাসন তাই বলছে। আব্বা তখন তাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনারা আমাকে চিনেন। জানেন। দেখেছেনও। আজকে আমি আপনাদের কাছ থেকে আরেকটু মানবিক আচরণ আশা করি। আমি আমার জরুরী কথা হয়ে গেলে ১ মিনিটও বেশি নিবো না।

তখন উপস্থিত সুবেদার জানান, স্যার আমরা স্বাক্ষ্য দিচ্ছি আপনি আমাদের সহযোগিতা করেছেন সব সময়, আমরাও আপনার সম্মান রাখার চেষ্টা করেছি।

www.pathagar.com

এরপর আব্বা আবার শুরু করলেন, "এখানে আমার সন্তানেরা আছো। এখন আমি আমার পরিবারের জন্য কিছু কথা বলবো।

তোমরা নামাযের ব্যাপারে খুবই সিরিয়াস থাকবা।

তোমরা সব সময় হালাল রুজির উপর থাকবা। কষ্ট হলেও হালাল রুজির উপর থাকবা। আমি ৫ বছর মন্ত্রী ছিলাম, ফুল কেবিনেট মন্ত্রী ছিলাম। আল্লাহর রহমতে, আল্লাহর রহমতে, আল্লাহর রহমতে আমি সেখানে অত্যন্ত স্বচ্ছতার সাথে, পরিশ্রম করে আমার দায়িত্ব পালন করেছি। কেউ আমার ব্যপারে বলতে পারবে না যে আমি অন্যায় করেছি। অনেক দুর্নীতির মধ্যে থেকেও আমার এই পেটে (নিজের শরীরের দিকে ইংগিত করে) এক টাকার হারামও যায়নি। তোমরাও হালাল পথে থাকবা। তাতে একটু কষ্ট হলেও আল্লাহ বরকত দিবেন।

আত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক সিলাই রেহীমি। আত্মীয় স্বজনের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করে মিলে মিশে চলবে। আত্মীয়দের মধ্যে অনেকেই নামায পড়বে, অনেকেই কম। কেউ কেউ হালাল উপার্জনের ব্যপারে অত্যধিক কড়া হবে আবার কেউ কেউ একটু দুর্বল থাকবে। শরীয়তে দুই রকম। আজিমাত এবং রুকসাত। আজিমাত হলো খুবই কড়া, কোনো অবস্থাতেই সে হারামের কাছে যাবে না। আর রুকসাত হলো পরিবেশ ও পরিস্থিতির জন্য একটু ঢিল দেবে। তাই আত্মীয়দের মধ্যে কারও আয়ে সমস্যা থাকবে, কারও নামাযে দুবর্লতা থাকবে। তাই আমাদের দায়িত্ব হলো তাদেরকে সঠিক পথে আনার জন্য সবার সাথে সম্পর্ক ঠিক রেখে মিলে মিশে চলা। আমি সব সময় এভাবে চলেছি এবং তাতে ভাল ফল পেয়েছি। হাদীসে আছে, আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক ছিন্নকারী ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।

প্রতিবেশীর হক আদায় করবে। আমার ঢাকার বাসা, ফরিদপুরের বাড়ির প্রতিবেশীদের সাথে ভাল ব্যবহার করবে।

আমার উত্তরার বাসার ব্যাপারে তো আমি আগেই লিখে দিয়েছি। মৌলিক কোনো চেঞ্জ দরকার নেই। শুধু প্রয়োজন অনুযায়ী মূল ভিত্তি ঠিক রেখে তোমরা সুবিধা মতো এদিক ওদিক চেঞ্জ করে নিও। ফরিদপুরের বাড়ি নিয়েও যেভাবে বলে দিয়েছি, সেভাবেই তোমরা কাজ করবে। আমাদের ভাই-বোনদের মধ্যে সম্পত্তি নিয়ে কখনো কোনো ঝামেলা হয় নাই। তোমরাও মিলেমিশে থাকবে। এসব নিয়ে কোনো সমস্যা করবানা। শান্তির জন্য কাউকে যদি এক হাত ছাড়তেও হয়, তাতেও কোনো ঝামেলা করবে না, মেনে নিবে।

বেশি বেশি করে রাসূল ﷺ-এর জীবনী ও সাহাবীদের জীবনী পড়বে। আমি জানি তোমরা পড়েছো, কিন্তু তাও বার বার পড়বে। বিশেষ করে 'পয়গম্বর-এ-

মোহাম্মদী', 'মানবতার বন্ধু হযরত মোহাম্মদ ﷺ', 'সীরাতে সারওয়ারে আলম', 'সীরাতুন্নবী', 'সীরাতে ইবনে হিশাম', 'রাসুলুল্লাহর বিপ্লবী জীবন'।

আর সাহাবীদের জীবনীর উপরও ভাল বই আছে। আগে পড়েছো জানি, তাও তোমরা পড়ে নিও।

আমি আমার সন্তানদের উপর সন্তুষ্ট। তোমাদের ভুমিকার ব্যপারে সন্তুষ্ট।

দেখো আমি এখানে পেপার পত্রিকা নিয়মিত পাই না। তারপরও আমি যা চাই, যা ভাবি তোমরা তা করে ফেলো। যেমন আজকের সকালের প্রেস কনফারেন্স। এটা অনেক ভাল হয়েছে। আমাকে ছাড়াই তোমরা যে পরামর্শ করে এতো সুন্দর একটা কাজ করে ফেলেছো, তাতে আমি অনেক খুশী হয়েছি। আসলে হৃদয়ের একটা টান আছে। আমি এখান থেকে যা ভাবি তোমরা কিভাবে যেন তাই করে ফেলো। তোমরা এভাবেই বুদ্ধি করে মিলে মিশে পরামর্শ করে কাজ করবে।

আইনজীবীদেরকে আমার ধন্যবাদ ও দোয়া দেবে। তারা অনেক পরিশ্রম করেছেন। তাদের ভূমিকার ব্যপারে আমি সন্তুষ্ট। আইনজীবীরা যেভাবে পরিশ্রম করেছে, অবিশ্বাস্য। ওনারা যদি টাকা নিতো তাহলে ৫-১০ কোটি টাকার কম হতো না। কিন্তু তারা অলমোস্ট বিনা পয়সায় সাহসিকতার সাথে এই আইনী লড়াই চালিয়ে গেছেন।

আমার বিশ্বাস, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্রশিবিরের মতো এতো বড় নেয়ামত দুনিয়াতে আর একটিও নেই। আমার জানামতে এই সংগঠন দুটি পৃথিবীর মধ্যে সেরা সংগঠন। এই সংগঠনের ব্যপারে আমি সন্তুষ্ট। গত কয়েক বছরে অনেক নেতাকর্মী শহীদ হয়েছেন, হাজার হাজার নেতাকর্মী আহত হয়েছেন, আমার মতো জেলখানায় আছে কয়েক হাজার মানুষ। বিশেষ করে ইসলামী ছাত্রশিবির বিগত ৫ বছরে যে ভূমিকা রেখেছে, যে সেক্রিফাইস করেছে তা অতুলনীয়। আমার শাহাদাৎ এই দেশে ইসলামী আন্দোলনকে সহস্রগুণ বেগবান করবে এবং এর মাধ্যমে জাতীয় জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন নিয়ে আসবে ইনশালাহ।"

তিনি বলেন, "আমার বিরুদ্ধে যারা স্বাক্ষী দিয়েছেন, তাদের মধ্যে দু'জন ছাড়া বাকি সবাই দরিদ্র। তারা মূলত অভাবের তাড়নায় এবং বিপদে পড়ে মিথ্যা স্বাক্ষ্য দিতে বাধ্য হয়েছেন। আমি তাদের সবাইকে মাফ করে দিলাম, তোমরাও তাদের প্রতি কোনো ক্ষোভ রাখবা না।

তোমাদের আম্মাকে দেখে শুনে রাখবে। সে আমার চেয়ে ভাল মুসলমান, ভাল মনের মানুষ। এই ব্যাপারে আমি স্বাক্ষ্য দিচ্ছি। তিনি কৃতজ্ঞচিত্তে তার সম্মানিত শ্বশুড়-শাশুড়িকে স্মরণ করেন।" আম্মা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন,

www.pathagar.com

শ্বাশুড়ি তো মায়ের মতোই। আপনি আমাকে যেভাবে স্নেহ করেছেন, তার কোনো তুলনা হয় না।

তারপর তিনি বললেন, "আমার জানামতে শহীদের মৃত্যুতে কষ্ট হয় না। তোমরা দোয়া করবে যাতে আমার মৃত্যু আসানের সাথে হয়। আমাকে যেন আল্লাহর ফেরেশতারা পাহাড়া দিয়ে নিয়ে যান।

এরপর তিনি উপস্থিত সবাইকে নিয়ে দোয়া করেন। মুনাজাতের মধ্যে তিনি জালিমের ধ্বংস চেয়েছেন। পরিবারের জন্য আল্লাহকে অভিভাবক বানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, আল্লাহ যেন তার রহমতের চাদর দিয়ে তার পরিবারকে ঢেকে রাখেন।"

ছোট মেয়ে আদরের তামরীনাকে তিনি মা বলে সম্বোধন করেন। তাকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, "ওখানে আমার মা, বাবা, ছোট ভাই শোয়ায়েব এবং বড় মেয়ে মুমতাহিনা আছে। শোয়ায়েব অত্যন্ত ভাল মনের মানুষ ছিল এবং আব্বার খুব কাছাকাছি ছিল।"

আমার বোন তখন বলে, আব্বা একটু পরেই মুমতাহিনা (বড় মেয়ে, যে আড়াই বছর বয়সে অসুস্থতায় মারা যায়) আপনাকে রিসিভ করতে আসবে। মেঝ ভাই বললেন ফুল হাতে আসবে ইনশাল্লাহ। আর তখন আম্মা বললেন, তুমি আমার পক্ষ থেকে ওকে আদর করে দিও।

আমার বড় ভাই তাজদীদ তখন বললেন, আপনি তো শহীদ হতে যাচ্ছেন। জান্নাতে শহীদের প্রবেশের সময় অনেকের জন্য আপনার সুপারিশ করার সুযোগ থাকবে। আপনি সেই তালিকায় আমাদের রাখবেন।

তারপর পুত্রবধূদের উদ্দেশ্য করে আব্বা বললেন, "আমার বউমাদের আমি সেভাবে আদর করতে পারিনি। বউমা'রাতো মাইয়া (মেয়ে)। আমাদের বাংলা ভাষায় তো সেভাবেই বলে, বউ-মা। এই সময়, তিনি সকল পুত্রবধূর বাবা-মা'র খোঁজ খবর নেন এবং তাদের প্রত্যেককে তার পক্ষ থেকে সালাম জানান। পুত্রবধূদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, "আমি তোমাদের প্রতি সেভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারিনি। বিশেষ করে ছোট বউমা জেরিনকে আমি খুব একটা সময় দিতে পারিনি। কেননা ওর বিয়ের কয়েকদিন পরেই তো আমি এখানে চলে আসি। এই সময় তিনি সকল পুত্রবধূকে উদ্দেশ্য করে বলেন, আমি তোমাদের প্রতি ঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারিনি। তোমরা আমাকে ক্ষমা করে দিও।

ঠিক একইভাবে আমার মেয়ে জামাই ফুয়াদ আর মেয়েকেও আমি সেভাবে সময় দিতে পারিনি। ওদেরকে নিয়ে একবেলাও একত্রে খাবার খাওয়ারও সুযোগ হয়নি। এই সময় তিনি মেয়ে জামাইকে উদ্দেশ্য করে বলেন, বাবা তোমার

www.pathagar.com

ভূমিকায় ও দায়িত্ব পালনে আমি সন্তুষ্ট। তোমার মা বাবাকে আমার সালাম পৌঁছে দেবে।" প্রতিউত্তরে মেয়ে জামাই বলেন, আব্বু আপনি আমাকে যে দায়িত্ব দিয়েছেন তা আমি যথাযথভাবে পালন করার চেষ্টা করবো।

জেল কর্তৃপক্ষের সহযোগিতার প্রতি তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তাদের উদ্দেশ্যে বলেন, "আপনাদের সাথে আমার কোনো ভুল আচরণ হলে আপনারা আমায় মাফ করে দেবেন।" নারায়ণগঞ্জ ও ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে তার সেবকদের তিনি কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেন এবং তার নিজের পিসির টাকাগুলো সেবকদের প্রয়োজন মাফিক বন্টন করে দেন এবং সেই ব্যাপারে জেল কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

নিজামী সাহেব ও সাইদী সাহেবসহ আরও যারা আছেন সবাইকে তিনি সালাম পৌঁছে দিতে বলেন।

দেশবাসীকে তিনি সালাম দেন এবং সকলের কাছে দোয়া চান। সর্বশেষে তিনি তার শাহাদাত কবুলিয়াতের জন্য দোয়া করেন। এরপর তিনি সকলের সাথে একে একে হাত মিলিয়ে বিদায় জানান।

তারপর আমরা তার রুম থেকে বেরিয়ে আসলাম। সেই যে আসার পথে ঘুরে তাকে দেখে আসলাম, সেটাই আমার বাবার শেষ জীবন্তকালীন ছবি। যা কোনদিন ভুলতে পারবোনা। ভুলে যাবো না ইনশাল্লাহ। ভুলে যাওয়া সম্ভবও নয়। এই অসম্ভব স্বচ্ছ মনের মানুষটির জন্য আপনারা দোয়া করবেন। প্রাণভরে দোয়া করবেন।[৯৫]

হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে সারা দেশে শান্তিপূর্ণ হরতাল কর্মসূচি পালন করে জামায়াতে ইসলামী

জনাব আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ বাংলাদেশের রাজনীতিতে সর্বদাই এক আলোচিত ব্যক্তিত্ব ছিলেন। বাংলাদেশের ইতিহাস থেকে তাঁর নাম কখনো মুছে ফেলা সম্ভব নয়। প্রতিটি গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও মানবতার মুক্তি আন্দোলনে তিনি আপোষহীন ভূমিকা পালন করেছেন। পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনের স্বার্থের চাইতে দল এবং দেশের স্বার্থই ছিল তাঁর কাছে গুররুত্বপূর্ণ। তিনি আরো স্মরণীয় হয়ে থাকবেন- তার বিরুদ্ধে সরকারি ষড়যন্ত্র ও তাঁকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করার কারণে। তাঁর বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছিল তা রাষ্ট্রপক্ষ প্রমাণ করতে পারেনি। তার বিবুদ্ধে দায়ের করা মামলাটি পর্যালোচনা করলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, তার বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট কোন অভিযোগ নেই। বিনা

[৯৫] লেখক ঃ আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদের পুত্র।

www.pathagar.com

অভিযোগে একজন মানুষকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা ইতিহাসে নজিরবিহীন। জনাব মুজাহিদ সরকারি ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত এবং প্রতিহিংসার নির্মম শিকার হয়ে তাঁর জীবন দিয়ে প্রমাণ করেছেন তিনি কত বড় মজলুম। বাংলাদেশের জনগণের মনের মনির কোঠায় তিনি চিরদিন বেঁচে থাকবেন। রাষ্ট্রীয় অবিচারের ঘটনা অবহিত হয়ে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তাঁর প্রতি আরো শ্রদ্ধাশীল হবে। আর ষড়যন্ত্রকারী ও হত্যার পরিকল্পনাকারীদেরকে ধিক্কার এবং নিন্দা জানাবে।

বাংলার আকাশ, বাতাস নির্যাতিতের করুণ ফরিয়াদে প্রকম্পিত। জালিমের নখরে তিক্ত-বিষাক্ত প্রতিটি জনপদ। কিন্তু তারপরও কি সত্য পথের সৈনিকেরা ভিত? না, বরং প্রতিটি মুমিন এই বিপদ সংকুল পথ পাড়ি দেয়াকে নিজের ঈমানী দায়িত্বের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেই এগিয়ে চলছে। এই রকম কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছে সকল নবী-রাসুল ﷺ-কে। যুগে-যুগে যারাই সেই পদাংক অনুসরন করবে, তাদের প্রত্যেককেই একই পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে এটাই স্বাভাবিক। এ পরীক্ষা কোন কারণে আসেনি। এটি চিরন্তন। মুমিনরা যদি আল্লাহর ওপরে তাওয়াক্কুল করে দৃঢ়তার সাথে এগিয়ে যেতে পারে তাহলে আল্লাহর সাহায্য অবধারিত।

শহীদের রক্ত আর মজলুমের চোখের পানি কখনো বৃথা যায় না। রাসুল ﷺ মুয়ায رضي الله عنه কে বললেন, হে মুয়ায! মাযলুমের দোয়া থেকে ভীত থাকবে, কারণ মাযলুম যখন আল্লাহর নিকট দোয়া করে তখন তার এবং আল্লাহর মাঝে কোন পর্দা থাকেনা। সুতরাং জেল-জুলুম, নির্যাতন, হত্যা, ফাঁসি আমাদের জীবনে নতুন হলেও ইসলামী আন্দোলনে তা একেবারেই পুরাতন। তাই আসুন, শোককে শক্তিতে পরিণত করে শহীদের রেখে যাওয়া অসমাপ্ত কাজ বাস্তবায়ন করে গড়ে তুলি একটি সুখী সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ। মহান পরওয়ারদিগার শহীদ আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ সহ সকলকে শাহাদাতের সর্বোচ্চ মর্যাদা দান করুন। আমীন।।

www.pathagar.com

শহীদ মুহাম্মদ কামারুজ্জামান (রহ.)

শহীদ মুহাম্মদ কামারুজ্জামান একটি নাম, একটি আন্দোলন ও একটি বিস্ময়কর প্রতিভা। যুগ নয়, শতাব্দীর ক্ষণজন্মা ইসলামী আন্দোলনের এক অগ্রসেনানী মুহাম্মদ কামারুজ্জামান। প্রাচ্যের অক্সফোর্ড হিসেবে খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সেরা মেধাবী ছাত্র তিনি। যিনি একাধারে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমন্বয়ে একটি সমৃদ্ধ বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছেন। মেধাবীদের সাহসী ঠিকানা শহীদী কাফেলা ইসলামী ছাত্রশিবিরের মত একটি ছাত্র আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম হিসেবে ঐতিহাসিক অবদান রেখেছেন। নেতৃত্ব দিয়েছেন সে আন্দোলনের সিপাহসালারের। তাঁর ক্ষুরধার লেখনির মাধ্যমে এদেশের মানুষ সমাজ, সভ্যতা ও পাশ্চাত্যের নানা অসঙ্গতির ইতিহাস জানতে সক্ষম হয়েছে। দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে গুণগত পরিবর্তন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার লড়াইয়ে তিনি অন্যতম। দেশে-বিদেশে সভা-সেমিনারে তাঁর ব্যতিক্রমধর্মী উপস্থাপনা সেক্যুলার ও বামপন্থীদের ইসলামী আন্দোলনের ব্যাপারে জিঘাংসা বাড়িয়ে দিয়েছে। সেখান থেকেই শুরু হয় হত্যার পরিকল্পনা। রাজনীতিতে জনাব কামারুজ্জামান সাহচর্য লাভ করেছেন মরহুম অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেবের। বিভিন্ন ক্ষেত্রে পারদর্শীতা অর্জনে খুব অল্প সময়ে খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে তাঁর। মূলত যারা আদর্শের লড়াইয়ে পরাজিত তারাই ইসলামী আন্দোলনকে স্তব্ধ করতে চায়। হত্যা, গুম, অপহরণ এবং বিচারের নামে রাষ্ট্রীয়ভাবে হত্যার ভিন্ন অপকৌশল চালিয়ে যাচ্ছে। জনাব মুহাম্মদ কামারুজ্জামানের মেধা, যোগ্যতা, নেতৃত্বের গুণাবলি ও নিজ নির্বাচনী এলাকায় জনপ্রিয়তায় আতঙ্কিত হয়েই প্রতিপক্ষরা তৈরি করছে তাঁকে হত্যার গভীর নীল নকশা ।

পৃথিবীর সকল নীতি-নৈতিকতা, মানবাধিকারকে উপেক্ষা করে আওয়ামী লীগ শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লাকে হত্যার পর আবার জনাব কামারুজ্জামানকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছ। তিনি একাধারে একজন রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, লেখক, ইসলামী ব্যক্তিত্ব, সদালাপী প্রাণপুরুষ। বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসা আর অশ্রুশিক্ত চোখে জায়নামাজ ভাসাচ্ছে এই প্রিয় মানুষটির জন্য। আজ যেন হত্যা করা হয়েছে মানবাধিকার, সত্যপন্থা, কল্যাণ, সুন্দর আর ন্যায়ের প্রতিককে। কলুষিত করা হচ্ছে সত্য, সুন্দর, বিনয়, নম্রতা আর ভদ্রতাকে। জনাব কামারুজ্জামান নিজেই তাঁর দীর্ঘ সাফল্যমণ্ডিত কর্ম, বুদ্ধিদীপ্ত পথের আবিষ্কারক। মুহাম্মদ কামারুজ্জামান ১৯৫২ সালের ৪ জুলাই শেরপুর জেলার বাজিতখিলা ইউনিয়নের মুদিপাড়া গ্রামে এক ধর্মপ্রাণ মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

www.pathagar.com

রাজনৈতিক ময়দানে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের পাশাপাশি শহীদ মুহাম্মদ কামারুজ্জামান বাংলাদেশের রাজনীতি, ইসলামী সংগঠন ও আন্দোলন, গণতন্ত্র ও তার বিকাশ, নির্বাচন, গণমাধ্যম, সমাজ সংস্কৃতিসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রচুর চিন্তা ও গবেষণা করেছেন। তিনি বাংলাদেশে অবাধ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠাসহ ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠা ও তার কৌশল নিয়ে বেশ কয়েকটি মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং সেই বইগুলো পাঠকমহলে বেশ সমাদৃত হয়েছে।

জন্ম ও শিক্ষা জীবন

শহীদ মুহাম্মদ কামারুজ্জামান ১৯৫২ সালের ৪ জুলাই শেরপুর জেলার বাজিতখিলা ইউনিয়নের মুদিপাড়া গ্রামে এক ধর্মপ্রাণ মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা মরহুম ইনসান আলী সরকার ও মাতা মরহুমা সালেহা খাতুন।

তিনি কুমরী কালিতলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশুনার পর শেরপুর জিকেএম ইন্সটিটিউশনে ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি হন। তিনি প্রথম শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত বরাবরই প্রথমস্থান অধিকার করেছেন। অষ্টম শ্রেণিতে তিনি আবাসিক বৃত্তি পান। ১৯৬৭ সালে জিকেএম ইন্সটিটিউশন থেকে ৪টি বিষয়ে লেটারসহ এসএসসি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন এবং আবাসিক বৃত্তি লাভ করেন। পুরো শেরপুরে একজন ভাল ছাত্র হিসেবে তিনি পরিচিত ছিলেন। এছাড়াও তিনি ছাত্রজীবন হতেই একজন বিনয়ী, ভদ্র, অমায়িক মানুষ হিসেবে সর্বজনবিদিত। ১৯৬৭-৬৯ সেশনে জামালপুর আশেক মাহমুদ কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণিতে অধ্যয়ন করেন; কিন্তু দেশে '৬৯-এর গণআন্দোলন শুরু হওয়ায় পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকেন। ১৯৭১ (১৯৭২ সালে অনুষ্ঠিত) সালে মোমেনশাহী নাসিরাবাদ কলেজ থেকে এইচএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৭৩ (১৯৭৪ সালে অনুষ্ঠিত) সালে ঢাকা আইডিয়াল কলেজ থেকে ডিস্টিংশনসহ বিএ পাস করেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগে মাস্টার্সে ভর্তি হন। সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের আবাসিক ছাত্র হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবৃত্তি লাভ করেন। ১৯৭৬ সালে কৃতিত্বের সাথে সাংবাদিকতায় এমএ পাস করেন।

শহীদ মুহাম্মদ কামারুজ্জামান ১৯৭৭ সালে নুরুন্নাহারের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তিনি ৫ সন্তানের জনক। তারা হলেন হাসান ইকবাল ওয়ামী, হাসান ইকরাম ওয়ালী, হাসান জামান ওয়াসী, হাসান ইমাম ওয়াফী, আহমদ হাসান সাফী।

www.pathagar.com

ছাত্র রাজনীতি

শেরপুরের বিশিষ্ট ইসলামী ব্যক্তিত্ব মরহুম কাজী ফজলুর রহমানের আহ্বানে জিকেএম ইন্সটিটিউটে নবম শ্রেণির ছাত্র থাকাকালীন তিনি ইসলামী ছাত্র আন্দোলনে যোগ দেন। কলেজে পা দিয়েই তিনি ছাত্র রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে পড়েন। ১৯৭৭ সালে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি প্রথম ঢাকা মহানগরীর সভাপতি এবং পরে সেক্রেটারি জেনারেল মনোনীত হন। ১৯৭৮ সালের ১৯ এপ্রিল ভারপ্রাপ্ত সভাপতি এবং একমাস পরই নির্বাচনের মাধ্যমে সেশনের বাকি সময়ের জন্য কেন্দ্রীয় সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৭৮-৭৯ সালেও শিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি হিসেবে পুনঃনির্বাচিত হন। বিশ্ব মুসলিম যুব সংস্থা (ওয়ামী) এবং বাংলাদেশ সরকারের যুব মন্ত্রণালয়ের যৌথ উদ্যোগে ১৯৭৯ সালে মৌচাক স্কাউট ক্যাম্পে আন্তর্জাতিক ইসলামী যুব সম্মেলন আয়োজন করা হয়। এতে তিনি প্রধান সংগঠকের দায়িত্ব পালন করেন।

উল্লেখ্য, এই সম্মেলনে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট শহীদ জিয়াউর রহমান উদ্বোধনী অধিবেশনে প্রধান অতিথি ছিলেন।

সাংবাদিকতা

ছাত্রজীবন শেষে মুহাম্মদ কামারুজ্জামান সাংবাদিকতাকেই পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন। ১৯৮০ সালে তিনি বাংলা মাসিক 'ঢাকা ডাইজেস্ট' পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদক হিসেবে কাজ শুরু করেন। ১৯৮১ সালে তাকে সাপ্তাহিক 'সোনার বাংলা' পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। মাত্র ১ জন পিয়ন ও ১ জন কর্মচারী নিয়ে যাত্রা শুরু করে সোনার বাংলা। সামরিক স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে সোনার বাংলায় ক্ষুরধার লেখনীর কারণে এরশাদের শাসনামলে পত্রিকাটির প্রকাশনা নিষিদ্ধ হয়। 'সোনার বাংলা' রাজনৈতিক কলাম ও বিশ্লেষণ বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করে এবং পত্রিকাটি দেশের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক সাপ্তাহিকের মর্যাদা লাভ করে। কারাগারে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মুহাম্মদ কামারুজ্জামান পত্রিকাটির সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

এছাড়া তিনি সম্পূর্ণ নিজস্ব উদ্যোগে কতিপয় ব্যক্তির সহযোগিতায় একটি ব্যতিক্রমধর্মী সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন 'নতুন পত্র' প্রকাশ করেন, অবশ্য এ পত্রিকাটির প্রকাশনা বর্তমানে বন্ধ রয়েছে। মুহাম্মদ কামারুজ্জামান ১৯৮৩ সাল থেকে ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত দশ বছর দৈনিক সংগ্রামের নির্বাহী সম্পাদকের দায়িত্বও পালন করেন। মুহাম্মদ কামারুজ্জামান জাতীয় প্রেস ক্লাবের একজন সদস্য এবং ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সদস্য ছিলেন। ১৯৮৫-৮৬ সাল পর্যন্ত তিনি অবিভক্ত বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন- বিএফইউজে'র কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচিত সদস্য ছিলেন।

www.pathagar.com

জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান

পেশাগত দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি ১৯৭৯ সালে মুহাম্মদ কামারুজ্জামান জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করেন, একই বছর তিনি জামায়াতের রুকন (সদস্য) হন। ১৯৮১-৮২ সালে তিনি কিছুদিনের জন্য ঢাকা মহানগরী জামায়াতের জয়েন্ট সেক্রেটারি ছিলেন। ১৯৮২ সাল থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯২ সালে তাকে জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেলের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। জামায়াতের কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক কমিটি ও লিয়াজোঁ কমিটির সদস্য হিসেবে বিগত স্বৈরাচার এরশাদ বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনে ১৯৮৩-৯০ পর্যন্ত তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৯৩-৯৫ সাল পর্যন্ত তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে তার ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য।

জামায়াতে ইসলামীর সিনিয়র সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মুহাম্মদ কামারুজ্জামান জামায়াতের নির্বাহী কমিটি, কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা, কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ ও বিভিন্ন কমিটির সদস্য এবং আন্তর্জাতিক বিষয়ক সেক্রেটারি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসায় পর গঠিত চারদলের কেন্দ্রীয় লিয়াজোঁ কমিটির অন্যতম শীর্ষ নেতা হিসেবে তার অবদান উল্লেখযোগ্য। ইসলামী ও জাতীয়তাবাদী শক্তির ঐক্য প্রচেষ্টায় তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। এজন্য দলীয় রাজনীতি ছাড়াও বিভিন্ন ফোরামে সভা-সমাবেশ, সেমিনার-সিম্পোজিয়ামে তার সক্রিয় উপস্থিতি বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়।

বিদেশ ভ্রমণ

জননেতা মুহাম্মদ কামারুজ্জামান বহু দেশে ভ্রমণ করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে সৌদি আরব, ইরান, নেপাল, ভারত, পাকিস্তান, থাইল্যান্ড, হংকং, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কানাডা, ফ্রান্স, সুইডেন, জাপান, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ কোরিয়া, আস্ট্রেলিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ইতালী, জার্মানী, তুরস্ক, ইয়ামেন, ব্রুনাই, বাহরাইন ও কুয়েত।

লেখক কামারুজ্জামান

মুহাম্মদ কামারুজ্জামান দেশি বিদেশি বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে কলাম লিখতেন। পত্র-পত্রিকা ও বিভিন্ন জার্নালে তার লেখা প্রকাশিত হয়েছে। তার লিখিত বইগুলো পাঠক সমাদৃত হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো আধুনিক যুগে ইসলামী বিপ্লব, পশ্চিমা চ্যালেঞ্জ ও ইসলাম, বিশ্ব পরিস্থিতি ও ইসলামী আন্দোলন, সংগ্রামী জননেতা অধ্যাপক গোলাম আযম, সাঈদ বদিউজ্জামান নুরসী ইত্যাদি।

www.pathagar.com

শেরপুরের জনগণের ম্যান্ডেট

১৯৮৬ সাল থেকে শেরপুর সদর তথা শেরপুর-১ আসনে জনাব মুহাম্মদ কামারুজ্জামান প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে উল্লেখযোগ্য ভোট পেয়ে আসছেন। সর্বশেষ দুটি সাধারণ নির্বাচনে (২০০১ ও ২০০৮) তিনি খুব অল্প ভোটের ব্যাবধানে হেরে গেলেও ধারণা করা হয় তিনিই প্রকৃত বিজয়ী। কারণ, ঐ দুই নির্বাচনেই আওয়ামী লীগ প্রার্থী তার নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকার ভোট কেন্দ্রগুলো দখল করে ব্যাপক কারচুপির মাধ্যমে বিজয় ছিনিয়ে নেন। এত কিছুর পরও ২০০১-এর নির্বাচনে কামারুজ্জামান ৬৫,৪৯০ ভোট (বিজয়ী আওয়ামী প্রার্থীর প্রাপ্ত ভোট ৮৬,১০১) এবং ২০০৮-এর ডিজিটাল নির্বাচনে ১,১০,০৭০ ভোট পান (বিজয়ী আওয়ামী প্রার্থীর প্রাপ্ত ভোট ১,৩৬,১২৭)। ১৯৭১ সালে শেরপুরের নারকীয় ঘটনাগুলোর প্রত্যক্ষদর্শী মানুষগুলো বেঁচে থাকতে শহীদ কামারুজ্জামানকে এত বিপুল ম্যান্ডেট দেয়া কি কোন অর্থ বহন করে না?

চার্জে আনীত অভিযোগের ঘটনাস্থলসমূহ শেরপুর এখানকার মানুষগুলো দেখে-শুনে বিগত ৪০ বছর ধরে যা জেনে এসেছে; সেখানে যদি শহীদ কামারুজ্জামানের সংশ্লিষ্টতা থাকত, তাহলে শুধুমাত্র ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তায় এমন গণরায় কি সম্ভব?

মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের মেয়ের-জামাই

মুক্তিযুদ্ধের সময় গৌরবময় ভূমিকা পালনকারী পরিবারের মেয়েজামাই মুহাম্মদ কামারুজ্জামান। শেরপুর জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের নির্বাচিত বর্তমান জেলা কমান্ডার, অগ্রণী ব্যাংকের সাবেক এজি এম '৭১ এর রণাঙ্গনের বীর মুক্তিযোদ্ধা নুরুল ইসলাম হিরুর ছোট বোন মিসেস নুরুন্নাহার জনাব কামারুজ্জামানের সহধর্মিনী। আনোয়ার হোসেন মনজু (সম্বন্ধী) স্বনামধন্য অনুবাদক, বাসসের সাবেক চিফ রিপোর্টার, সাবেক বার্তা সম্পাদক : দৈনিক বাংলার বাণী (শেখ ফজলুল হক মনি প্রতিষ্ঠিত ও শেখ ফজলুল করিম সেলিম এমপি সম্পাদিত- এক সময়ে আওয়ামী লীগের মুখপত্র হিসেবে পরিচিত), বর্তমানে আমেরিকা প্রবাসী। আবুল কালাম আযাদ (শ্যালক) ২ বারের ইউ পি চেয়ারম্যান, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী। ছোট শ্যালক মনোয়ার হোসেন বাবুল একজন কৃষিবিদ ও সফল ব্যবসায়ী। শ্বশুর জনাব আজিজুর রহমান ১৯৭১ সালে কৃষি অধিদপ্তরে চাকরি করতেন, যুদ্ধের সময় অনেক মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দিতেন, খাবার দিতেন, সবরকমের সহযোগিতা করতেন। শেরপুরের সাধারণ মানুষের প্রশ্ন কামারুজ্জামান যদি সত্যি সত্যি মুক্তিযুদ্ধের সময় গুরুতর অপরাধে অপরাধী হতেন তাহলে কি ১৯৭৮ সালে এমন একটি মুক্তিযোদ্ধা পরিবারে বিয়ে করতে পারতেন।

www.pathagar.com

বিচারিক কার্যক্রম

২০১৩ সালের ৯ মে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২ এর চেয়ারম্যান বিচারপতি ওবায়দুল হাসানের নেতৃত্বে বিচারপতি মজিবুর রহমান মিয়া ও বিচারক মো. শাহিনুর ইসলাম মুহাম্মদ কামারুজ্জামানকে মৃত্যুদণ্ডের রায় দেয়। ওই রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে ৬ জুন আপিল করেন মুহাম্মদ কামারুজ্জামান। গত বছরের ৫ জুন এ বিষয়ে শুনানি শুরু হয়। ১৭ সেপ্টেম্বর মুহাম্মদ কামারুজ্জামানের পক্ষে আপিলের যুক্তি উপস্থাপন শেষ করেন তার আইনজীবীরা। এরপর ৩ নভেম্বর আপিল বিভাগের তৎকালীন জ্যেষ্ঠ বিচারপতি ও বর্তমান প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহার নেতৃত্বে চার বিচারপতির বেঞ্চ মুহাম্মদ কামারুজ্জামানের মৃত্যুদণ্ড বহাল রেখে সংক্ষিপ্ত আদেশে রায় ঘোষণা করেন।

২০১১ সালের ৫ ডিসেম্বর কামারুজ্জামানের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ (ফরমাল চার্জ) ট্রাইব্যুনালে দাখিল করে প্রসিকিউশন। ২০১২ সালের ১২ জানুয়ারি প্রসিকিউশন কামারুজ্জামানের বিরুদ্ধে পুনরায় আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দাখিল করেন। ৩১ জানুয়ারি আনুষ্ঠানিক অভিযোগ আমলে নেয় ট্রাইব্যুনাল-১। এরপর ১৬ এপ্রিল কামারুজ্জামানের মামলাটি ট্রাইব্যুনাল-১ থেকে ট্রাইব্যুনাল-২ এ স্থানান্তর করা হয়। ১৬ মে ডিফেন্সপক্ষ এবং ২০ মে প্রসিকিউশনের আইনজীবীরা কামারুজ্জামানের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের শুনানি শেষ করেন। এরপর ২০১২ সালের ৪ জুন কামারুজ্জামানের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২। মানবতাবিরোধী অপরাধের সাতটি ঘটনায় অভিযোগ গঠন করা হয়। ২০১২ সালের ১৫ জুলাই থেকে এ বছরের ২০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত কামারুজ্জামানের বিরুদ্ধে তদন্ত কর্মকর্তা (আইও) আব্দুর রাজ্জাক খানসহ প্রসিকিউশনের ১৮ জন সাক্ষ্য দেন। অন্যদিকে কামারুজ্জামানের পক্ষে ২০১৩ সালের ৬ থেকে ২৪ মার্চ পর্যন্ত ৫ জন ডিফেন্স সাক্ষী সাক্ষ্য দিয়েছেন। তারা হচ্ছেন মো. আরশেদ আলী, আশকর আলী, কামারুজ্জামানের বড় ছেলে হাসান ইকবাল, বড় ভাই কফিল উদ্দিন এবং আব্দুর রহিম।

২০১০ সালের ১৩ জুলাই কামারুজ্জামানকে গ্রেফতার করা হয় সুপ্রিম কোর্টের ফটক থেকে। ওই বছরের ২ আগস্ট তাকে মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে গ্রেফতার দেখানো হয়।

রিভিউ আবেদন খারিজ

৬ এপ্রিল মুহাম্মদ কামারুজ্জামানের মৃত্যুদণ্ডের বিরুদ্ধে করা রিভিউ (পুনর্বিবেচনার) আবেদন খারিজ করেন সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ। সংক্ষিপ্ত আদেশে আপিল বিভাগ বলেছেন 'ডিসমিসড'। এর ফলে ট্রাইব্যুনালের দেয়া মৃত্যুদণ্ড বহাল রেখে আপিল বিভাগ আগে যে রায় দিয়েছিল তা বহাল থাকে। পাশাপাশি শেষ হয় মামলার বিচার কার্যক্রমও।

www.pathagar.com

যে কারণে মৃত্যুদণ্ডাশের বিরোধীতা করলেন এক বিচারপতি

গত ১৮ ফেব্রুয়ারি মুহাম্মদ কামারুজ্জামানের আপিলের পূর্ণাঙ্গ রায় সাড়ে তিন মাস পর প্রকাশ হয়। প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহার নেতৃত্বে আপিল বিভাগের চার বিচারপতির স্বাক্ষর শেষে রায়টি প্রকাশ করা হয়। এর মধ্যে জ্যেষ্ঠ বিচারপতি মো. আবদুল ওয়াহ্হাব মিঞা রায়ে ভিন্নমত পোষণ করেন। পূর্ণাঙ্গ রায়টি ৫৭৭ পৃষ্ঠার। রায়ের ৫৭৬ পৃষ্ঠায় ছিল সংক্ষিপ্ত আদেশ। পূর্ণাঙ্গ রায়ের সংক্ষিপ্ত আদেশে বলা হয়েছে- আপিল আংশিকভাবে মঞ্জুর হলো। আপিলকারী মুহাম্মদ কামারুজ্জামানকে প্রথম অভিযোগ থেকে খালাস দেয়া হলো। ২ ও ৭ নম্বর অভিযোগে তার দণ্ড সংখ্যারিষষ্ঠতার ভিত্তিতে বহাল থাকলো। ৩ নম্বর অভিযোগে তাকে সর্বসম্মতভাবে দোষী সাব্যস্ত করা হলো তবে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হলো সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে। ৪ নম্বর অভিযোগে সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে তার সাজা মৃত্যুদণ্ড থেকে কমিয়ে যাবজ্জীবন করা হলো।

আপিলের রায়ে জ্যোষ্ঠ বিচারপতি মো. আবদুল ওয়াহ্হাব মিঞা রায়ে বলেন, আপিল আংশিকভাবে মঞ্জুর হলো। ২, ৪ এবং ৭ নম্বর অভিযোগে আপিলকারী দোষী না হওয়ায় (মুহাম্মদ কামারুজ্জামান) খালাস দেয়া হলো। ৪ নম্বর অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় ট্রাইব্যুনালের দেয়া মৃত্যুদণ্ডের স্থলে যাবজ্জীবন সাজা দেয়া হলো। ২ নম্বর অভিযোগের ক্ষেত্রে প্রসিকিউশন সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণে ব্যর্থ। কারণ দোষী প্রমাণিত না হওয়ায় অভিযুক্তকে খালাস দেয়া হলো। ৩ নম্বর অভিযোগে ট্রাইব্যুনালের দেয়া মৃত্যুদণ্ডের আদেশ সংশোধন করে যাবজ্জীবন সাজা দেয়াই যুক্তিযুক্ত। কারণ ঘটনাস্থলে অভিযুক্তের উপস্থিতি নিয়ে কিছুটা সন্দেহ রয়েছে। ৪ নম্বর অভিযোগের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে, প্রসিকিউশন অভিযোগ প্রমাণ করতে পারেনি। ৭ নম্বর অভিযোগে বলা হয়েছে, এই অভিযোগটিও প্রসিকিউশন সন্দেহাতীত প্রমাণ করতে পারেনি। তদন্ত কর্মকর্তা বলেছেন 'কামারুজ্জামান কোনো কোনো দিন সকালে, কোনো কোনো দিন দুপুরে আবার কোনো কোনো দিন সন্ধ্যার পর ডাক বাংলোর ক্যাম্পে আসতো। যদি তাই হয় তাহলে কিভাবে অভিযুক্ত প্রণিধানযোগ্য আল বদর নেতা হলেন? কিভাবে সাক্ষীরা তাকে দেখেছে এবং ঘটনায় তার সম্পৃক্ততা রয়েছে তা বিশ্বাসযোগ্য নয়। এ বিষয়গুলো আরো বিস্তারিত ট্রাইব্যুনাল বিবেচনা নিতে পারতো। তাই অভিযুক্তকে খালাস দেয়া হলো।

রাষ্ট্রপতি জীবন দেয়ার ও নেয়ার মালিক নন যে তার কাছে প্রাণভিক্ষা চাইবো

মুহাম্মদ কামারুজ্জামানের সাথে ১১ এপ্রিল শনিবার বিকেল ৪টা ১০ মিনিটে পরিবারের সদস্যরা ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাৎ শেষে তার ছেলে হাসান ইকবাল ওয়ামী বলেন, প্রাণভিক্ষা চাওয়া প্রসঙ্গে বাবা বলেছেন,

www.pathagar.com

প্রাণের মালিক আল্লাহ্। রাষ্ট্রপতি জীবন দেয়ারও মালিক নন নেয়ারও মালিক নন যে তার কাছে প্রাণভিক্ষা চাইবো। তিনি বলেন, বাবা বিচলিত নন, আমরা হাসিমুখে বিদায় দিয়ে গেলাম। তার সাথে কোন ম্যাজিস্ট্রেট দেখা করেননি বলেও জানান মুহাম্মদ কামারুজ্জামান। বের হওয়ার সময় বড় ভাই কফিল উদ্দিন সাংবাদিকদের বলেন, আমার ভাই বলেছেন, তাকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হয়েছে। তিনি দেশবাসীর কাছে দোয়া চেয়েছেন।

বড় ছেলে হাসান ইকবাল ওয়ামী বলেন, রাষ্ট্রপতির কাছে প্রাণভিক্ষা চওয়ার প্রশ্নই উঠে না। ক্ষমা চাইবেনতো শুধু আল্লাহর কাছে। তিনি বলেন, আমার বাবার স্বপ্ন ছিল এদেশে ইসলামী শাসন কায়েম হবে। জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্বেই এদেশে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। তিনি বলেন, তার বাবা বলেছেন, তার সাথে বিচারের নামে প্রহসন করা হয়েছে। ১৮ বছরের একজন কিশোরকে মিথ্যা অভিযোগে ফাঁসিয়ে দেয়া হয়েছে। এর বিচারের ভার তিনি আল্লাহর ওপর ছেড়ে দিয়েছেন। তিনি বলেন, বাবার মনোবল দৃঢ় আছে। তিনি দেশবাসীর কাছে দোয়া চেয়েছেন। বাবা বিচলিত নন, আমরা হাসিমুখে বিদায় দিয়ে গেলাম।

উপেক্ষিত জাতিসংঘসহ আর্ন্তজাতিক সংস্থা ও ব্যক্তিদের আহ্বান

মুহাম্মদ কামারুজ্জামানের বিচার ও মৃত্যুদণ্ড সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে জাতিসংঘ, ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ), হিউম্যান রাইটস ওয়াচসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা, মানবাধিকার সংগঠন, আন্তর্জাতিক আইন ও যুদ্ধাপরাধ বিষয়ক বিশেষজ্ঞগণ। ত্রুটিপূর্ণ বিচার প্রক্রিয়ার কারণে মৃত্যুদণ্ডাদেশ কার্যকর না করতে আহ্বান জানিয়েছিল; কিন্তু সরকার তা উপেক্ষা করে শহীদ মুহাম্মদ কামারুজ্জামানকে হত্যা করে।

জাতিসংঘ

মুহাম্মাদ কামারুজ্জামানের ফাঁসি কার্যকর স্থগিত রাখতে আহ্বান জানিয়েছিল জাতিসংঘ। বুধবার জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনারের পক্ষে স্পোকসম্যান রাভিনা সামদানী এ আহ্বান জানান। জেনেভা থেকে দেয়া বিবৃতিতে তিনি বলেন, জামায়াত নেতা মুহাম্মাদ কামারুজ্জামানের ফাঁসির দণ্ড স্থগিত করতে আমরা বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। কামারুজ্জামান বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন। তার বিচার প্রক্রিয়ায় নানা অনিয়ম বিদ্যমান ছিল এবং ন্যায্য বিচার প্রক্রিয়া আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী হয়নি।

বিবৃতিতে বলা হয়, জাতিসংঘের মানবাধিকার অফিস দীর্ঘদিন যাবত বিচারের স্বচ্ছতা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে আসছিল; তাই বাংলাদেশ সরকারের উচিত হবে না মৃত্যুদণ্ডাদেশ কার্যকর করা। ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক ১৬টি রায় দেয়া হয়েছে।

www.pathagar.com

এর মধ্যে ১৪ জনকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়, যার অধিকাংশই বিরোধী রাজনৈতিক দল জামায়াতে ইসলামী ও বিএনপির নেতা। তারা সবাই ১৯৭১ সালে সংঘটিত মানবতা বিরোধী অপরাধ, গণহত্যাসহ বিভিন্ন অপরাধে দণ্ডিত হয়েছেন। এর মধ্যে ২০১৩ সালে আবদুল কাদের মোল্লার মৃত্যুদণ্ডাদেশ কার্যকর করা হয়।

বাংলাদেশ কর্তৃক অনুস্বাক্ষরিত ইন্টারন্যাশনাল কভোন্যান্ট অন সিভিল এন্ড পলিটিক্যাল রাইট্স-এর উদ্বৃতি দিয়ে বিবৃতিতে বলা হয়, মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেয়া বিচারের ক্ষেত্রে বিবেকী ন্যায্য বিচারের নিশ্চয়তা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। যদি অন্যায্য বিচার প্রক্রিয়ার মধ্যদিয়ে মৃত্যু কার্যকর করা হয়, তা হবে মানুষের বেঁচে থাকার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা।

বিবৃতিতে বলা হয়, জাতিসংঘ সব সময়ই মৃত্যুদণ্ডের বিরোধী, এমনকি যেখানে কঠোরভাবে ন্যায্য বিচারের মানদণ্ড অনুসরণ করা হয়েছে এবং অধিকাংশ গুরুতর আন্তর্জাতিক অপরাধ সংঘটিত হয়েছে সে ক্ষেত্রেও।বিবৃতিতে অমানবিক মৃত্যুদণ্ডাদেশ বিলোপকারী দেশের কাতারে শামিল হতে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

ইইউ

মুহাম্মদ কামারুজ্জামানের মৃত্যুদণ্ড বহাল থাকায় প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) ঢাকায় অবস্থিত সংস্থাটির কার্যালয় থেকে গণমাধ্যমে বার্তা পাঠিয়ে ওই প্রতিক্রিয়া জানানো হয়।

বিবৃতিতে বলা হয়, সাজা হিসেবে মৃত্যুদণ্ড কখনোই অপরাধ দমন করতে পারে না; বরং এতে বিচারের উদ্দেশ্য সফল হয় না। আর ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) যে কোনো ধরনের মৃত্যুদণ্ডের বিপক্ষে।

ইউরোপীয় ইউনিয়ন বিবৃতিতে জানায়, এ ধরনের সাজা বৈশ্বিকভাবে বিলুপ্তির জন্য ইইউ ধারাবাহিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। যার পরিপ্রেক্ষিতে ইইউ বাংলাদেশের কর্তৃপক্ষকে আহ্বান জানাচ্ছে, মৃত্যুদণ্ডের মতো সাজা স্থগিত করা হোক।

হিউম্যান রাইটস ওয়াচ

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (এইচআরডব্লিউ) 'ত্রুটিপূর্ণ বিচার প্রক্রিয়ায়' যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে অভিযুক্ত জামায়াতে ইসলামীর সিনিয়র সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মুহাম্মদ কামারুজ্জামানের মৃত্যুদণ্ড স্থগিতের আহ্বান জানায়। এইচআরডব্লিউ'র এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, অবিলম্বে কামারুজ্জামানের মৃত্যুদণ্ডের রায় স্থগিত করা এবং মামলাটি স্বাধীনভাবে পুনর্বিবেচনা না করা পর্যন্ত তা কর্তৃপক্ষের মুলতবি রাখা উচিত।

এতে বলা হয়, ২০১৫ সালের ৬ এপ্রিল বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট মুহাম্মদ কামারুজ্জামানের মৃত্যুদণ্ডের রায় পুনর্বিবেচনার আবেদন খারিজ করে দেয়, যার অর্থ তিনি আসন্ন মৃত্যুদণ্ডের সম্মুখীন।

www.pathagar.com

এইচআরডব্লিউ'র এশিয়া বিষয়ক পরিচালক ব্র্যাড অ্যাডামস বলেন, মৃত্যুদণ্ড একটি অপরিবর্তনযোগ্য ও নিষ্ঠুর শাস্তি। বিচার বিভাগ যখন এ ধরনের শাস্তি যথাযথ ও পূর্ণাঙ্গরূপে পুনর্বিবেচনা করতে ব্যর্থ হন, তখন সেটি আরও গর্হিত পর্যায়ে উপনীত হয়। তিনি আরও বলেছেন, বাংলাদেশের যুদ্ধাপরাধ বিচার কাজ নিরপেক্ষ বিচার প্রক্রিয়া লঙ্ঘনের পুনঃপুনঃ ও বিশ্বাসযোগ্য অভিযোগের মহামারীতে বিপর্যস্ত, যেখানে পক্ষপাতহীন বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা আবশ্যক।

গত সোমবার হিউম্যান রাইটস ওয়াচের নিজস্ব ওয়েবসাইটে 'বাংলাদেশ: সাসপেন্ড ডেথ সেনটেন্স অব ওয়ার ক্রাইমস অ্যাকিউজড' শিরোনামে একটি প্রতিবেদনে এ আহ্বান জানানো হয়।

ব্র্যাড অ্যাডামস বলেন, ১৯৭১ সালে ভয়াবহ যেসব যুদ্ধাপরাধ সংঘটিত হয়েছিল, তার ন্যায়বিচার ও জবাবদিহিতার ব্যাপারে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ দীর্ঘকাল থেকে সমর্থন জানিয়ে আসছে। কিন্তু, এ বিচারসমূহ আন্তর্জাতিক নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থার মানদণ্ডে হওয়া উচিত।

তিনি বলেন, ন্যায়বিচার প্রদানের জন্য সর্বোচ্চ মানদণ্ডের নীতিতে অবিচল থাকা আবশ্যক, বিশেষকরে জীবন যখন বিপনপ্রায়। তিনি বলেন, কামারুজ্জামানের বিচার প্রক্রিয়া যেভাবে পরিচালিত হয়েছে, তাতে সে মানদণ্ডসমূহ অনুসরণ করা হয়েছে, তেমনটা বলা যায় না।

একই সঙ্গে বাংলাদেশে অবিলম্বে মৃত্যুদণ্ড স্থগিত করার দীর্ঘদিনের আহ্বান পুনর্ব্যক্ত করেছে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ। জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক বিশেষজ্ঞ ও জাতিসংঘের বিভিন্ন সংগঠনের মতে, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের সঙ্গে মৃত্যুদণ্ড সঙ্গতিপূর্ণ নয়। ব্র্যাড অ্যাডামস আরও বলেন, বাংলাদেশ সরকারের উচিত আইন কার্যকরের মাধ্যমে মৃত্যুদণ্ড স্থগিত করা এবং যে রাষ্ট্রগুলো ইতোমধ্যেই এ ধরনের বর্বরোচিত রেওয়াজের বিলোপ ঘটিয়েছে, অচিরেই তাদের সঙ্গে যোগ দেয়া।

প্রতিবেদনে বলা হয়, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের (আইসিটি) নির্দেশে ২০১০ সালের জুলাইয়ে কামারুজ্জামানকে গ্রেফতার করা হয়। ১৯৭১ সালে সংঘটিত যুদ্ধাপরাধের বিচারের লক্ষ্যে গঠন করা হয় আইসিটি। ওই যুদ্ধের পর পাকিস্তান থেকে মুক্ত হয় বাংলাদেশ। কিন্তু, জামায়াতে ইসলামীর এ নেতাকে কেন গ্রেফতার করা হলো, সে সম্পর্কে তাকে কোন কারণ জানানো হয়নি। জাতিসংঘের 'ওয়ার্কিং গ্রুপ অন আরবিট্রারি ডিটেনশন' তার গ্রেফতারকে বিধিবহির্ভূত ও আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন হিসেবে চিহ্নিত করে। বিচার চলাকালীন সময়ে বিধিবহির্ভূতভাবে আসামী পক্ষের সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থাপনের

www.pathagar.com

সুযোগকে সীমিত করে দেয়া হয়। প্রত্যক্ষদর্শী ও নথিপত্র উপস্থাপনেও এ সীমাবদ্ধতা কার্যকর ছিল। এভাবে কামারুজ্জামানের বিচার প্রক্রিয়ার আরও কয়েকটি অনিয়মের কথা তুলে ধরা হয় এইচআরডব্লিউ'র প্রতিবেদনে।

লর্ড কারলাইল

যুক্তরাজ্যের হাউস অব লর্ড-এর সদস্য লর্ড কারলাইল মুহাম্মদ কামারুজ্জামানের ফাঁসির দণ্ড স্থগিত করাসহ সরকারের প্রতি ৫ দফা সুপারিশ করেন। তদন্ত ও বিচারিক প্রক্রিয়া নিয়ে স্বাধীন তদন্ত করা, তা সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত মামলার বিচারিক প্রক্রিয়ায় সকল কার্যক্রম স্থগিত, সর্বোচ্চ দণ্ড হিসেবে মৃত্যুদণ্ডের বিধান স্থগিত রাখাসহ আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের সুপারিশ অনুযায়ী সত্যিকার অর্থেই একটি আন্তর্জাতিক মানের ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠা করতে হবে। বিবৃতিতে তিনি বলেন, কামারুজ্জামানের বিচারিক প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছ বিচারিক প্রক্রিয়া ছিল না। আশা করা হয়েছিল রিভিউ গ্রহণ করে ত্রুটিগুলো দূর করা হবে এবং পুনঃবিচারের আদেশ দেয়া হবে। তিনি বলেন, বিচারিক কার্যক্রম নিয়ে হিউম্যান রাইট্স ওয়াচ, নো পিস উইদাউট বর্ডার, জাতিসংঘের ওয়ার্কিং গ্রুপ অন অরবিট্রারী ডিটেনশন, যুক্তরাষ্ট্রের বৈশ্বিক বিচার বিষয়ক বিশেষ দূত স্টিফেন জে র্যাপসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা সমালোচনা করেছে। এই বিশেষজ্ঞদের কোন রাজনৈতিক এজেন্ডা নেই। তারা আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী ন্যায় বিচার নিশ্চিত করতে চায়।

কমনওয়েলথ লই'য়ার্স এসোসিয়েশন

মুহাম্মদ কামারুজ্জামানের ফাঁসির দণ্ড নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে কমনওয়েলথ ল'ইয়ার্স এসোসিয়েশন-সিএলএ। এ সংস্থা সরকারের প্রতি ৪ দফা সুপারিশ করেছে। সুপারিশগুলো হলো, ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক দেয়া সকল সাজা ও বিচার কার্যক্রম অবিলম্বে স্থগিত করা, অনতিবিলম্বে ট্রাইব্যুনালের বিচার প্রক্রিয়া রিভিউ এবং তদন্ত করা, সর্বোচ্চ সাজা হিসেবে মৃত্যুদণ্ডের বিধান স্থগিত রাখা, আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের সুপারিশ অনুযায়ী সত্যিকার অর্থেই একটি আন্তর্জাতিক মানের ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠা করতে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে।

বিবৃতিতে বলা হয়, বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল আইসিটি এর কার্যক্রম দেশীয় আইন যেমন নয়, তেমনি আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ীও হচ্ছে না, যেসব আন্তর্জাতিক চুক্তি ও বিধিতে বাংলাদেশ স্বাক্ষর করেছে। পুরো বিচার প্রক্রিয়াতেই তা রক্ষা করা সম্ভব হয়নি।

লর্ড এভিব্যুরির চিঠি

প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা এইচ টি ইমামের কাছে চিঠি দিয়েছেন যুক্তরাজ্যের হাউজ অব লর্ড-এর সদস্য লর্ড এভিব্যুরি। গত সোমবার দেয়া

www.pathagar.com

চিঠিতে তিনি বলেন, আমি জানি বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্ট মুহাম্মদ কামারুজ্জামানের মৃত্যুদণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে করা রিভিউ পিটিশন খারিজ করে দিয়েছে এবং তা কার্যকর করা হবে।

মুহাম্মদ কামারুজ্জামানের আইনজীবী সূত্রে এ খবর পাওয়া গেছে। চিঠিতে তিনি আরো বলেন, আমি কি মৃত্যুদণ্ডকে আমৃত্যু কারাদণ্ডে পরিবর্তন করতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে সুপারিশ করতে আপনাকে অনুরোধ করতে পারি? আপনি নিশ্চয়ই অবগত আছেন, এর আইনী প্রক্রিয়ায় ত্রুটি নিয়ে, বিশেষ করে মি. কামারুজ্জামান যে অপরাধে অভিযুক্ত হয়েছেন, তার প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীর অনুপস্থিতি। যদি তার মৃত্যুদণ্ডাদেশ কার্যকর করা হয়, তা আন্তর্জাতিকভাবে বাংলাদেশের ভাবমার্যাদা ক্ষুণ্ন করবে।

জীবনের শেষ মুনাজাত

১১ এপ্রিল পরিবারের সদস্যরা শেষ দেখা করতে গেলে তাদের নিয়ে জামায়াত নেতা মুহাম্মদ কামারুজ্জামান কেন্দ্রীয় কারাগারে মোনাজাত করেন বলে তাকে দেখা করতে যাওয়া ২১ জন সদস্যের একজন প্রকাশ করেন। তিনি ফেসবুকে লিখেছেন, "আলহামদুলিল্লাহ। কাঁদতে কাঁদতে গিয়েছিলাম, হাসি মুখেই বিদায় জানিয়ে আসলাম প্রিয়জন প্রিয় নেতাকে। আমার দু চোখ, আমার হৃদয় সৌভাগ্যবান। আমি তাকে কাঁদতে দেখিনি, বরং আমাদেরকেই সান্ত্বনা দিয়েছেন। উনি যখন বিদায় বেলায় আমাদেরকে নিয়ে মোনাজাত করছিলেন বলছিলেন, হে আল্লাহ আমি দেশের জন্য কাজ করেছি ইসলামের জন্য কাজ করেছি, যারা এই অন্যায় বিচার করলেন, এই বিচারে সহযোগিতা করেছে এদের বিচার আপনি দুনিয়াতে এবং আখিরাতে উভয় জায়গায় করেবেন। আমি আমার দুই হাত দিয়ে কোন অন্য কাজ করিনি, আমার মুখ দিয়ে কাউকে গালি দেইনি, আমার সম্পর্কে আপনি ভালো জানেন, আপনি আমাকে শাহাদাতের মর্যাদা দান করুন। আমার পরিবার, স্বজনসহ সকলকে ধৈর্য ধারাণ করার তৌফিক দিন। উনি শেরপুরসহ দেশবাসী এবং বিশ্ববাসীকে সালাম জানিয়েছেন। সকলের কাছে দোয়া চেয়েছেন।"

জান্নাতের পথে

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নির্বাহী আদেশে মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের নামে জামায়াতে ইসলামীর সিনিয়র সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল বিশিষ্ট সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী মুহাম্মদ কামারুজ্জামানকে গত এপ্রিল রাত রাত ১০টা ৩০ মিনিটে হত্যা করা হয়। ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন।

www.pathagar.com

শেরপুরে চির নিদ্রায় শায়িত শহীদ কামারুজ্জামান

শেরপুরে নিজের গড়া এতিমখানার পাশে চিরনিদ্রায় শায়িত হলেন শহীদ মুহাম্মদ কামারুজ্জামান। দাফনের পর থেকেই কবর জিয়ারতের জন্য নামে মানুষের ঢল। কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে গতকাল রোববার ভোরে শহীদ মুহাম্মদ কামারুজ্জমানকে দাফনের পর বেলা বাড়ার সাথে সাথেই হাজার হাজার মানুষ তার কবর জিয়ারত করতে আসেন। দূর-দূরান্ত থেকে আসা লোকজন কামারুজ্জামানের রূহের মাগফিরাত কামনা করে মোনাজাত করেছেন। এ সময় অনেকেই কান্নায় ভেঙে পড়েছেন।

শহীদ মুহাম্মদ কামারুজ্জামানের শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী তার নিজের গড়া শেরপুর সদর উপজেলার কুমরী বাজিতখিলা এতিমখানার পাশেই তাঁকে দাফন করা হয়। গতকাল রোববার ভোর ৫টা ২০ মিনিটে দাফন সম্পন্ন হয়। এর আগে রোববার ভোর ৪টা ৫০ মিনিটে এতিমখানা মাঠে তার নামাযে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। এতে কামারুজ্জামানের আত্মীয়সহ স্থানীয়রা অংশগ্রহণ করেন। আশপাশে হাজার হাজার মানুষ উপস্থিত থাকলেও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কড়াকড়ির কারণে তারা অংশগ্রহণ করতে পারেনি। দাফনস্থলে গণমাধ্যম কর্মীসহ স্থানীয় এলাকাবাসীর প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ ছিল।

রাত ১১টার দিকে সরেজমিনে জেলা সদর থেকে ১০ কিলোমিটার দূরে কুমরী বাজিতখিলা এলাকায় গিয়ে দেখা যায়, বিজিবি, র‍্যাব ও পুলিশসহ আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর বিপুল সংখ্যক সদস্য সেখানে মোতায়েন করা হয়েছে। তিনস্তর বিশিষ্ট নিরাপত্তা বেষ্টনীর মাধ্যমে পুরো এলাকা নিরাপত্তার চাদরে ঢেকে ফেলা হয়। রোববার ভোর ৪টা ১৬ মিনিটে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কড়া নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে কামারুজ্জামানের লাশ কুমরী বাজিতখিলা গ্রামে এসে পৌঁছে। এ সময় তাঁর বড় ভাই মো. কফিল উদ্দিন লাশ গ্রহণ করেন। পরে কুমরী বাজিতখিলা এতিমখানা মাঠে অনুষ্ঠিত নামাযে জানাযায় ইমামতি করেন বাজিতখিলা দাখিল মাদরাসার ভারপ্রাপ্ত সুপার ও কামারুজ্জামানের ভাগ্নি জামাতা মাওলানা আব্দুল হামিদ।

রোববার ভোর ছয়টার দিকে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী নিরাপত্তা শিথিল করলে কামারুজ্জামানের কবরস্থানে হাজার হাজার নারী-পুরুষের ঢল নামে। তাঁরা কামারুজ্জামানের রূহের মাগফিরাত কামনা করে মোনাজাত করেন। এ সময় শোকে কাতর এলাকাবাসীর আহাজারিতে সেখানে হৃদয়বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হয়। এলাকাবাসীর মাতম দেখে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর অনেক সদস্যের চোখও অশ্রুসজল হয়ে ওঠে। দিনভরই দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ আসতে থাকে কবর জিয়ারত করার জন্য।

প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, সারারাত প্রচুর ঝড়-বৃষ্টি উপেক্ষা করে তার গ্রামের বাড়ির পাঁচ বর্গ কিলোমিটারের বাইরে হাজার হাজার মানুষ রাতভর অপেক্ষা

www.pathagar.com

করেও জানাযায় অংশগ্রহণের সুযোগ পাননি। এমনকি ঢাকা থেকে লাশের সাথে যাওয়া গণমাধ্যম কর্মীরাও স্থানীয় বাজিতখিলা বাজারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আটকেছিলেন। রাতে ওই এলাকায় প্রচুর ঝড়-বৃষ্টি হয়। পুরো এলাকা বিদ্যুৎহীন হয়ে পড়ে। ভোর ৪টার দিকে বিদ্যুৎ আসলেও থেমে থেমে বৃষ্টি হচ্ছিল। তারপরও জনসমাগম কমেনি।

কামারুজ্জামানের জন্মভূমি বাজিতখিলা ইউনিয়ন জুড়েই রাতভর শত শত আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য মোতায়েন ছিল।

স্থানীয়রা জানায়, রাত তিনটার দিকে হ্যান্ড মাইকে আওয়াজ আসে যারা জানাযার জন্য এসেছেন তারা সসম্মানে চলে যান। জনতা যেতে না চাইলে পুলিশ বেপরোয়া লাঠি চার্জ শুরু করে। তখন অনেকেই দৌড়ে পাশেই ধানের চাতালে অবস্থান নেন। ইত্যবসরে রাত সোয়া চারটার দিকে শহীদ কামারুজ্জামানের কফিন এসে পৌঁছায় এতিমখানা চত্বরে।

নিকটাত্মীয় ও কিছু গ্রামবাসীর উপস্থিতিতে নামাযে জানাযার পর ৫টা ৪০ মিনিটে উপস্থিত হাজার হাজার জনতার গায়েবানা জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানেও বাধা দেয় আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী। মাঠের পূর্ব অংশের অর্ধেক লোক জানাযায় শরীক হতে পারেনি। মাঝখানে ব্যারিকেড দেয়াছিল। এ সময় জনতা নারায়ে তাকবীর শ্লোগানে আকাশ বাতাশ মুখরিত করে তোলে।

এলাকাবাসী যা বলেন

বাজিতখিলা ইউনিয়নের মধ্যকুমরী গ্রামের মজিবর রহমান (৪০) ও আব্দুল কুদ্দুস বলেন, তারা নামাযে জানাযায় অংশগ্রহণের জন্য অজু করে প্রস্তুতি নিয়েছিলেন; কিন্তু আইনশৃঙ্খলা বাহিনী অনুমতি না দেয়ায় জানাযায় অংশ নিতে পারেননি।

বাজিতখিলা গ্রামের কামরুল ইসলাম বলেন, কামারুজ্জামানের নামাযে জানাযায় অংশগ্রহণের জন্য কয়েক হাজার মানুষ এতিমখানার আশপাশে সমবেত হয়েছিলেন; কিন্তু আইনশৃঙ্খলা বাহিনী তাদের জানাযাস্থলে আসতে দেয়নি।

কুমরী বাজিতখিলা এতিমখানার পরিচালক নূরুল আমিন বলেন, জানাযায় কেবল শতাধিক মানুষ অংশগ্রহণ করার সুযোগ পায়।

কামারুজ্জামানের বড় ভাই আলমাছ আলী (৬৮) কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেন, আমার ভাই কামারুজ্জামান ছিলেন নিরপরাধ ও নির্দোষ। বিচারের নামে তাকে হত্যা করা হয়েছে। এ জন্য যারা দায়ী আল্লাহর কাছে তাদের বিচার চাই।

কামারুজ্জামানের আরেক বড় ভাই মো. কফিল উদ্দিন বলেন, তার (কামারুজ্জামানের) ভাইয়ের শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী মরদেহ কুমরী বাজিতখিলা এতিমখানার পাশে দাফন করা হয়।

www.pathagar.com

গায়েবানা জানাযায় জনতার ঢল

শহীদ মুহাম্মদ কামারুজ্জামানের জন্য জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমসহ দেশে বিদেশে গায়েবানা জানাযা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল রোববার রাজধানীর বিভিন্ন মসজিদ, ময়দান, বিভাগীয় শহরসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে হাজার হাজার জনতার উপস্থিতিতে এ জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমে অনুষ্ঠিত গায়েবানা জানাযার পূর্বে মুসল্লিদের উদ্দেশে জামায়াতের কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য ডা. রেদওয়ান উল্লাহ শাহেদী বলেন, শহীদ কামারুজ্জামানের প্রতি ফোঁটা রক্ত এদেশের মাটিকে ইসলামী আন্দোলনের জন্য উর্বর করবে। তার হত্যা ষড়যন্ত্রে জড়িতদের জনগণের কাঠগড়ায় একদিন দাঁড়াতে হবে। তিনি বলেন, জামায়াত কর্মীরা মহান আল্লাহ ব্যতীত কখনো কারো কাছে মাথা নত করেনি, ভবিষ্যতেও করবে না ইনশাআল্লাহ। হত্যাকাণ্ড, গুম, মামলা ও গ্রেফতার চালিয়ে শহীদী কাফেলার কাজ কেউ বন্ধ করতে পারবে না। সত্যের নিকট মিথ্যার পতন অবশ্যম্ভাবী। মিথ্যা সব সময়ই পরাভূত এবং পরাজিত।

জাতীয় মসজিদে গায়েবানা জানাযা

বাদ যোহর জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমে জামায়াতের সিনিয়র সহকারী সেক্রেটারি মুহাম্মদ কামারুজ্জামানের গায়েবানা জানাযা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে উপস্থিত ছিলেন জামায়াতে ইসলামী কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য ডা. রেদওয়ানউল্লাহ শাহেদী, ঢাকা মহানগরী মজলিসে শূরা সদস্য ও মতিঝিল থানা আমীর কামাল হোসেনসহ হাজার হাজার নেতাকর্মী ও মুসল্লি।

শহীদ কামারুজ্জামানের জন্য দোয়া করার উদ্দেশ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা, সৌদি আরবের জেদ্দা, তুরস্ক, দক্ষিণ আফ্রিকা, পর্তুগালসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গায়েবানা নামাযে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়।

জানাযা ও গায়েবানা জানাযায় বাধা

ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারি জেনারেল ডা. শফিকুর রহমান বিবৃতিতে বলেন, সরকার অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে ফাঁসির দণ্ড কার্যকরের নামে মুহাম্মাদ কামারুজ্জামানকে হত্যা করেছে। এ জালিম সরকার শহীদ কামারুজ্জামানের নামাযে জানাযায়ও মুসল্লীদের অংশগ্রহণে বাধা দিয়েছে। শহীদ কামারুজ্জামানের নামাযে জানাযায় অংশগ্রহণের জন্য হাজার হাজার জনতা ছুটে আসলে রাষ্ট্রের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বেরিকেড দিয়ে নামাযে জানাযায় অংশগ্রহণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। এক পর্যায়ে রাষ্ট্রের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী মুসল্লীদের ওপর গুলি চালানোর ঘোষণা দেয়। অংশগ্রহণকারী মুসল্লীদের মধ্য থেকে কয়েকজনকে গ্রেফতার করে। যে কোনো মৃত ব্যক্তির জানাযায় অংশগ্রহণ ধর্মীয় অধিকার। এ অধিকারে বাধা দিয়ে সরকার তার ইসলাম বিরোধী চরিত্রের মুখোশ উন্মোচন করেছে।

www.pathagar.com

তিনি বলেন, সরকার শেরপুর, খুলনা, বরিশাল ও ফেনীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে শহীদ কামারুজ্জামানের জন্য দোয়া করার উদ্দেশ্যে আয়োজিত গায়েবানা নামাযে জানাযা থেকে নেতা-কর্মীদের গ্রেফতার করে ধর্ম বিরোধী চরিত্রের জঘন্য নজির স্থাপন করেছে। ফেনী জেলার দাগন ভূঁইয়া উপজেলার একটি মসজিদে গায়েবানা নামাযে জানাযার সময় আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীরা মসজিদে হামলা চালিয়ে প্রায় ২৫ জন মুসল্লীকে আহত করেছে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী মুসল্লীদের ওপর বেপরোয়াভাবে হামলা চালায় এবং ৩৫ জনকে গ্রেফতার করে। সরকারের বাধা-বিঘ্ন ও প্রতিবন্ধকতা উপেক্ষা করে সারা দেশে হাজার হাজার মুসল্লী শহীদ কামারুজ্জামানের গায়েবানা নামাযে জানাযায় অংশগ্রহণ করে। তার নিজ এলাকায় ফজরের নামাযের পর থেকে অসংখ্যবার হাজার হাজার জনতা পৃথক পৃথকভাবে গায়েবানা নামাযে জানাযার আয়োজন করে এবং অংশগ্রহণ করে। মুসল্লীদের কান্না ও হাহাকারে তার এলাকায় এক হৃদয়বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হয়। জীবন্ত কামারুজ্জামানের চাইতে শহীদ কামারুজ্জামান অনেক বেশি শক্তিশালী। ইসলামী আন্দোলনের কর্মীরা তাদের জীবনের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে হলেও শহীদ কামারুজ্জামানের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করবে ইনশাআল্লাহ।

জান্নাতের সুবাস ভরা বাজিতখিলায় প্রতিদিন নামে মানুষের ঢল

শহীদ শেরআলী গাজীর এই শতকের উত্তরসূরি শহীদ মুহাম্মদ কামারুজ্জামান ঘুমিয়ে আছেন শেরপুরের কুমরী বাজিতখিলায় তাঁর নিজের গড়া এতিমখানার পাশের মাটির বিছানায়। বর্তমান সরকারের রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার হয়ে গত ১১ এপ্রিল রাত ১০ টা ৩০ মিনিটে ফাঁসির মঞ্চে হাসিমুখে শাহাদাতের মৃত্যুকে বরণ করেছেন ইসলামী আন্দোলনের এই বীর সেনানী। মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার পর শহীদকে দাফনের জন্য কঠোর নিরাপত্তা তৈরি করে সরকারের আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী ঢাকা থেকে শেরপুরের পথে রওনা দিলে গাড়ির বহরের সাথে মিডিয়া কর্মীরাও সামিল হয়েছিলেন। কিন্তু সরকারের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা তাদেরকে শেরপুরের প্রবেশ পথেই আটকে দিয়েছিলো। সরকারের বাড়াবাড়ির কারণে প্রিয়নেতাকে শেষবিদায় জানাতে পারেননি লাখো লাখো ভক্ত। ভক্তি-শ্রদ্ধা আর ধর্মীয় অনুভূতি নিয়ে শহীদের নামাজে জানাজায় শরীক হতে শেরপুরের বিভিন্ন জেলা-উপজেলা ও গ্রাম এবং দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লাখ লাখ মানুষ হাজির হয়েছিলেন শেরপুরে; কিন্তু তাদের আবেগকে গুলি, লাঠি আর জেল-জুলুমের রাষ্ট্রীয়ত্রাসের পদতলে পিষে ফেলা হয়েছে। তাদেরকে জানাজা নামাজের আশপাশে ভিড়তে দেয়া হয়নি। নিরীহ জনগণ পুলিশ বেষ্টনীর বাইরে রাতের আঁধারে যে যেখানে পারেন অবস্থান নিয়ে দূর থেকে শহীদের রূহের মাগফিরাত কামনায় দোয়া করেন। সকালের

www.pathagar.com

সূর্যালোক দেখা দেয়ার সাথে সাথে পিপিলিকার মতো দলে দলে চারদিক থেকে ছুটে আসে বাঁধভাঙা মানুষ। তাদের আহাজারিতে ভারী হয়ে উঠে বাজিতখিলার আকাশ-বাতাস। পরদিন বিবিসিসহ দেশ-বিদেশের অনেক মিডিয়ায় এ খবর প্রচারিত হয়।

কবর যিয়ারতে মানুষের ঢল

নিজ হাতে গড়া শেরপুরের কুমরী বাজিতখিলা এতিমখানার পাশেই চির নিদ্রায় শায়িত আছেন শহীদ মুহাম্মদ কামারুজ্জামান। দাফনের পর থেকেই প্রতিদিনই দূরদূরান্ত থেকে ছুটে আসছে মানুষ কবর যিয়াতের জন্য। আশপাশের অনেকেই সময় পেলেই ছুটে আসেন প্রিয় মানুষটির কবর দেখার জন্য। বিশেষ করে জুমার দিনে মানুষের লাইন বেশ দীর্ঘ। কবর যিয়ারত করতে এসে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন কামারুজ্জামানের ভক্তরা। অনেকে বিশ্বাসই করতে পারছে না, শুধুমাত্র রাজনৈতিক কারণে এমন একজন মানুষকে দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে হলো। ঝোলানে হলো ফাঁসির কাষ্ঠে।

ওই দিন কী হয়েছিল?

ওই দিনে এলাকার অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে শহীদ কামারুজ্জামানের ভাই কফিল উদ্দিন বলেন, বিকেলে কারাগারে আমার ভাইয়ের সাথে শেষবারের মতো দেখা করি। সেখান থেকে বের হয়েই আমি একজনকে সাথে নিয়ে সরাসরি বাড়িতে চলে আসি। এসেই দেখি পুরো এলাকা ঘিরে রেখেছে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী। এতিমখানার সামনের রাস্তায় মানুষ ও যান চলাচল বন্ধ করে দেয়। তিনি জানান, এখন প্রতিদিনই দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে মানুষ আসে। তবে শুক্রবার বেশি আসে। জুমার নামাযের পর সবাই মিলে দোয়া করি।

কামারুজ্জামানের হাতে গড়া বাজিতখিলা এতিমখানার ছাত্র ছিলেন আলমগীর হোসেন। ওখান থেকেই ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশুনা করেন তিনি। পরে আনন্দমোহন কলেজ থেকে পড়াশুনা শেষ করেছেন। তিনি বলেন, আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর কঠোর বেস্টনীর কারণে আশেপাশে হাজার হাজার মানুষ থাকলেও তারা লাশ দেখার জন্য আসতে পারেনি। মাদরাসার সামনের সড়কে যান ও মানুষ চলাচল বন্ধ করে দিয়েছিল। তিনি কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেন, বাবাকে হারানোর পর তার (কামারুজ্জামানের) উৎসাহেই পড়াশুনা করেছি। সামনে এগুতে পারলাম। আমি আমার প্রিয় অভিভাবককে হারিয়ে ফেললাম।

আবদুল হামিদ (ইমাম সাহেব) বলেন, আমি ও আরেকজন লাশ কবরে নামাই। আমি খুশি, আমি শহীদের লাশ কবরে নামাতে পেরেছিলাম। কাফনের কাপড় রক্তে রঞ্জিত ছিল। মুখ দেখার জন্য টেনে খুলি। ওরা দেখতে দিতে চাচ্ছিল না।

www.pathagar.com

আমার পাঞ্জাবীতেও রক্ত লেগেছিল। তাজা রক্তের গন্ধ ছিল। এতিমখানার দেয়ালে এখনও সেই রক্তের দাগ রয়ে গেছে। তিনি বলেন, কফিন আনার পর থেকে দ্রুত দাফন করতে বাধ্য করা হয়। আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর তাগিদে ২০ মিনিটের মধ্যে সব কাজ সম্পন্ন করা হয়। ফজরের পর মোনাজাত হয়। সেকি দৃশ্য! কান্নার রোল। আবেগ-আপ্লুত মানুষের আহাজারী। সেটা বলে বুঝানো যাবে না।

মুহাম্মদ কামারুজ্জামানের ৯ দিনের ছোট একই গ্রামের আবদুস সালাম। তিনি জানান, তিনি খুব ভালো লোক ছিলেন, বাংলাদেশে তার মতো লোক খুঁজে পাওয়া যাবে না। ছোটকাল থেকে তাকে দেখেছি। তার দোষ একটাই তিনি ইসলামের জন্য কাজ করতেন। তিনি বলেন, আমি জানাযা পড়ার জন্য এসেছিলাম। কাছে আসতে দিলো না। ওরা বললো, কাছে আসলে গুলি করবে। একজন তো শার্ট খুলে দিয়েছিল গুলি করার জন্য। ও বললো, নেতা মরে গেছে আমরাও মরবো। কান্না জড়িত কণ্ঠে বলেন, বয়স হয়েছে। সময় পেলেই এখানে ছুটে আসি। বসে থাকি।

কুমড়ি-মুদিপাড়ায় কামারুজ্জামানের বাড়িতে

শহীদ মুহাম্মদ কামারুজ্জামান ছিলেন ভাইদের মধ্যে ৪র্থ। তার বড় ভাই আমজাদ আলী (৭০), এরপর আলমাছ আলী (৬৮), এরপর কফিল উদ্দিন (৬৫), এরপর ছিলেন শহীদ কামারুজ্জামান এবং সর্বশেষ নাজিরুজ্জামান (৬০)।

শহীদ কামারুজ্জামানের গ্রামের বাড়ি কুমড়ির মুদিপাড়ায়। সেখানে নেই কোনো ইটের বাড়ি। আছে দোচালা কয়েকটি ঘর। তারই একটিতে গ্রামে আসলে থাকতেন শহীদ কামারুজ্জামান। তার দ্বিতীয় ভাই আলমাছ আলী ঘরটি দেখিয়ে বলেন, এই ঘরে মাটিতে বিছানা পেতে ঘুমাতে পছন্দ করতো জামান। বাড়িতে আসলে সবার খোঁজ-খবর নিতো। সেই ঘরটিতেই এখন শয্যাশায়ী বড় ভাই আমজাদ আলী। দীর্ঘদিন যাবত তিনি অসুস্থ। কথাও বলতে পারেন না। সাংবাদিকদের দেখে হাত নেড়ে তিনি কী বলতে চেয়েছিলেন, তা বুঝা না গেলেও চোখের পানি দেখে বুঝতে বাকী নেই, ছোট ভাই কামারুজ্জামানকে নিয়ে তার হৃদয়ের কথাই বলতে চেয়েছিলেন।

সেখানে কথা হয় কামারুজ্জামানের ভাতিজা আমজাদ আলীর ছেলে হাবিল উদ্দিন (২৮) এর সাথে। তিনি বলেন, চাচা আমাকে অনেক আদর করতেন, তা বলে শেষ করা যাবে না। তাকে কেনোদিন রাগ করতে দেখিনি। তিনি সব সময় আমার পড়াশোনার খোঁজ-খবর নিতেন। আমাকে গাইড লাইন দিতেন।

www.pathagar.com

মানুষের ঢল

পাশের উপজেলা নকলা থেকে এসেছিলেন সোহরাব আলী (৬৫)। তিনি বলেন, আমি জামায়াতে ইসলামী করি না। কামারুজ্জামানের বক্তব্য আমার ভালো লাগতো। নামাযে জানাযায় অংশ নিতে না পেরে আক্ষেপ করে তিনি বলেন, ওই দিনও আমি এসেছিলাম; কিন্তু আমাকে কাছে আসতে দেয়া হয়নি। সময় পেলেই আমি কবর যিয়ারতের জন্য ছুটে আসি। বিশেষ করে প্রতি জুমার দিন এখানে নামায পড়ে কবর যিয়ারত করে বাড়ি যাই। তিনি বলেন, তাকে আমি ছোটবেলা থেকেই দেখেছি। তার ব্যাপারে যেসব অভিযোগ করা হয়, তা কখনই সত্য হতে পারে না। কোনো অন্যায় কাজের সাথে তিনি জড়িত হতে পারে আমি তা বিশ্বাস করি না।

শুক্রবারও দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে মানুষ এসেছিলেন শহীদের কবর যিয়ারত করার জন্য। জুমার নামাযের পর কবরের পাশে আনুষ্ঠানিকভাবে দোয়া করা হয়। এ সময় কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন শহীদ কামারুজ্জামানের ভক্তরা।

খোলা হয়েছে শোক বই। শোক বইতে শেরপুর শহরের সিদ্দিক উল্লাহ লিখেন, "শহীদ কামারুজ্জামান ইসলামী আন্দোলনের প্রথম শ্রেণির শহীদদের কাতারে শামিল হলেন। তার শাহাদাতের মধ্য দিয়ে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হবেই হবে।" সোহাগপুরের শাকিল মাহমুদ লিখেন, "কামারুজ্জামান ভাই-এর শহীদী মৃত্যু আমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছে যে, কাফের, মুশরিক এর কাছে মাথা নতো করা যাবে না। আল্লাহ তাকে জান্নাতে সর্বোচ্চ মর্যাদা দান করুন, আমিন।" ১২ বছর বয়সী নাজিফা আঞ্জুম রানী লিখেন, "শহীদ কামারুজ্জামান ভাইয়ের শাহাদাতকে যেন আল্লাহ তায়ালা কবুল করেন, আমিন।" মোছা: নাজমুন নাহার নাজু লিখেন, শহীদ কামারুজ্জামান ভাইয়ের রক্তের বিনিময়ে বাংলার জমিনে আল্লাহর আইন যেন প্রতিষ্ঠিত হয়।"

কেমন আছেন সাক্ষীরা

কামারুজ্জামানের কবর জিয়ারত করতে সোহাগপুর থেকে এসেছিলেন জনৈক মাহমুদ। তিনি জানান, যাদের মিথ্যা সাক্ষীতে কামারুজ্জামানের ফাঁসি হয়েছে, তারা কেউ ভালো নেই। মিথ্যা আতঙ্ক সবসময় তাদেরকে তাড়া করছে। হাছেনা বানু বৃদ্ধ বয়সেও অন্যের বাড়িতে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করেন। থাকেনও অন্যের বাড়িতে। তিনি একা একা পথ চলতে গেলে বা একা ঘরে ঘুমাতে গেলে মনের অজান্তে চিৎকার করে ওঠেন। সব সময় আতঙ্কে থাকেন। একটি মিথ্যা ভয় সব সময় থাকে তাড়া করে। তার সবসময় মনে হয় কে যেন তাকে মারতে তেড়ে আসছে।

www.pathagar.com

জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল কামারুজ্জামানের বিরুদ্ধে মামলায় রাষ্ট্রপক্ষের সাত নম্বর সাক্ষী ছিলেন জালাল উদ্দিন। তিনিও শেরপুর জেলার আলোচিত বিধবাপল্লী সোহাগপুরের বাসিন্দা। জালাল উদ্দিন সম্পর্কে স্থানীয় একজন সাংবাদিক জানান, জালাল তাকে বলেছেন, 'জীবিকা অর্জনের জন্য মাঠে কাজ করতে যাব, সেটাতেও ভয়। আবার খাবার কিনতে বাজারে যাব, সেখানেও শঙ্কা থাকে- ওরা সুযোগ পেলেই হামলা করবে। এখন আমাদের নিরাপত্তার জন্য পুলিশ ক্যাম্প থাকলেও ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কিত।' এমন অজানা ভয় সব সময় তাকে তাড়া করে ফিরছে। প্রকৃত ঘটনা জানতে চাইলে ঐ সাংবাদিক বলেন, 'কেউ তাদেরকে হুমকি দেয় না, বিরক্তও করে না, জামান সাহেবের সমর্থকরা বিচার আল্লাহর কাছে দিয়ে রেখেছে। হয় তো বিবেকের দংশনে অথবা মিথ্যে আতঙ্কে তারা আতঙ্কিত।

কবর জিয়ারত করতে আসা একাধিক ব্যক্তি জানান, কামারুজ্জামানের বিরুদ্ধে অন্যতম সাক্ষী মোহন মুন্সী। মোহন মুন্সি ডায়াবেটিস, হার্টের সমস্যা ও শ্বাসকষ্টসহ নানান জটিল রোগে আক্রান্ত হয়ে সব সময় মরণকে আহ্বান করছে। সে মাঝে মাঝেই চিৎকার করে বলে, 'আল্লাহ আমাকে নেয় না কেন?' মোহন মুন্সীর শরীরে পচন ধরেছে। মোহন মুন্সির আপন ভাগ্নে পরিচয় দিয়ে আজিজুর রহমান রন্‌জু নামের জনৈক ব্যক্তি বলেন, তার মামা কিছুদিন আগে প্রাকৃতিক কাজ সারতে গিয়ে পা পিছলে কাঁচা পায়খানায় পড়ে গিয়েছিলো। তার প্রায় গলা পর্যন্ত ডুবে গিয়েছিলো। সমস্ত শরীরে ইনফেকশন হয়েছে। সেখান থেকে পচা পুজ বের হচ্ছে। দুর্গন্ধে কাছে যাওয়া যায় না।

আন্তর্জাতিক মিডিয়া

মুহাম্মদ কামারুজ্জামানের বিচারের রায় ব্যাপকভাবে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ দমনে সরকার বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ইসলামী রাজনৈতিক দলের দ্বিতীয় আরেক নেতাকে ফাঁসি দিতে যাচ্ছে বলে আখ্যায়িত করেছে। অনেক মিডিয়ায় এই ইসলামিক স্কলারের হত্যার ষড়যন্ত্রকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বলে প্রতিবেদন ছেপেছে। বিশ্ববিখ্যাত সংবাদ সংস্থা বিবিসির হেডলাইনটি হলো 'ইসলামিস্ট লিডার কামারুজ্জামানস এপিল রিজেকটেড'। যুক্তরাজ্যের বিখ্যাত গার্ডিয়ান পত্রিকার অনলাইনেও গতকাল পরিবেশিত খবরে মুহাম্মদ কামারুজ্জামানকে একজন ইসলামিস্ট লিডার হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। আলজাজিরা পরিবেশিত খবরে কামারুজ্জামানকে জামায়াত নেতা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। বার্তা সংস্থা এএফপি'র অনলাইন ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস টাইমস, ওয়াশিংটন পোস্টও এ বিচার নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। রিভিউ আবেদন খারিজ করে রায় ঘোষণার সাথে সাথেই বিশ্বের বিভিন্ন টিভি, অনলাইন পোর্টাল এবং সংবাদপত্রের অনলাইন ভার্সনে বিশেষ গুরুত্বের সাথে খবরটি পরিবেশন করা হয়।

www.pathagar.com

তুরস্কের দুঃখ ও উদ্বেগ প্রকাশ

জামায়াত নেতা মুহাম্মদ কামারুজ্জামানের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করায় দুঃখ ও উদ্বেগ প্রকাশ করেছে তুরস্ক। দেশটির সরকারি বার্তা সংস্থা আনাডোলু এজেন্সি এ খবর দিয়েছে। এতে বলা হয়, তুরস্কের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে গত শনিবার এ ব্যাপারে একটি বিবৃতি দেয়া হয়। ওই বিবৃতিতে বলা হয়, ফাঁসি কার্যকর না করতে বাংলাদেশের কাছে আহ্বান জানিয়েছিল তুরস্ক। একই সঙ্গে সামাজিক সম্প্রীতি ও দেশে শান্তি ধরে রাখার জন্য একই রকম অন্য মৃত্যুদণ্ডগুলো স্থগিত রাখারও আহ্বান জানিয়েছে। মৃত্যুদণ্ড বাতিল করা হয়েছে এমন একটি দেশ হিসেবে এই শাস্তি কার্যকর করায় উদ্বেগ প্রকাশ করছে তুরস্ক। ফাঁসি কার্যকর করায় সমাজে নতুন করে উত্তেজনা সৃষ্টি হতে পারে। ওই বিবৃতিতে বলা হয়, ১৯৭১ সালের যুদ্ধের সময় যুদ্ধাপরাধের অভিযোগের বিচার করতে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত ২০১৩ সালের মে মাসে শাস্তি হিসেবে কামারুজ্জামানকে মৃত্যুদণ্ড দেয়। নভেম্বরে তার একটি আপিল খারিজ করে দেয় সুপ্রিম কোর্ট। যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে ফাঁসি কার্যকর হওয়া দ্বিতীয় ব্যক্তি কামারুজ্জামান।

ব্যারিষ্টার আবদুর রাজ্জাকের মূল্যায়ন

যুদ্ধাপরাধ বা মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার দুনিয়াতে নতুন কিছু নয়। আজ থেকে ৭০ বছর আগে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে সর্বপ্রথম নুরেমবার্গ ট্রায়াল অনুষ্ঠিত হয়। তার পরে টোকিও, সাবেক যুগোস্লাভিয়া, রুয়ান্ডা, সিয়েরালিয়ন, কম্বোডিয়া, পূর্ব তিমুর, লেবাননসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যুদ্ধাপরাধ বা মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার হয়েছে। এসব বিষয়ে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অভিযুক্ত ব্যক্তিরা ছিলেন সামরিক বিভাগের লোক। এর বাইরে যারা ছিলেন তারা ছিলেন রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের অধিকারী। স্মরণ করা যেতে পারে, যে সময়ে কামারুজ্জামান ভাইয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছিল তখন তার বয়স ছিল ১৮-১৯। তার বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ ছিল তা হচ্ছে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মতো সুশৃঙ্খল বাহিনীর ওপর তার কর্তৃত্ব ছিল। এটা যুগপৎভাবে অবিশ্বাস্য ও নজিরবিহীন। শহীদ কামারুজ্জামান ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। তাকে অন্যায়ভাবে ফাঁসির মঞ্চে দাঁড় করিয়ে প্রতিহিংসাবাদীরা হয়তো বিজয়ের হাসি হেসেছেন; কিন্তু তারা জানেন না দ্বীন-দুনিয়ার মালিক কী অভিভাষণে তাকে পরকালে স্বাগত জানাবেন। আল কুরআনের ভাষায়- 'তাকে বলা হলো, জান্নাতে প্রবেশ করো। সে বলল, হায়! আমার জাতি যদি কোনোক্রমে জানতে পারতো কিভাবে আমার পরোয়ারদিগার আমাকে ক্ষমা করেছেন এবং আমাকে সম্মানিতদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।' (৩৬ : ২৬-২৭)

www.pathagar.com

রাজনীতি একটি কঠিন ও জটিল বিষয়। রাজনীতিবিদদের দূরদর্শী হতে হয়। কামারুজ্জামান ভাইয়ের রাজনীতি বিশ্লেষণী ক্ষমতা যে কতটা পরিপক্ব ছিল এবং তিনি যে কতটা দূরদর্শী ছিলেন তার প্রমাণ মেলে কারাগার থেকে ২০১০ সালে প্রকাশ করা এক ভাবনায়। ফাঁসির মুখোমুখি হওয়া সত্ত্বেও তিনি নিজের জীবন রক্ষার উদ্বেগের পরিবর্তে দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ নিয়েই ছিলেন উদ্বিগ্ন। বাংলাদেশের জটিল রাজনৈতিক সমস্যার অত্যন্ত গভীরে তিনি পৌঁছতে পেরেছিলেন এবং এর সমাধানের জন্য জাতীয় রাজনীতিতে হানাহানি বন্ধ করে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি সৃষ্টির প্রস্তাবনা রেখেছিলেন। তিনি দৃঢ়ভাবে এই মত ব্যক্ত করেছিলেন যে, শুধু এভাবেই বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি সম্ভব। তিনি ১১টি পয়েন্টের মাধ্যমে ইসলামী আন্দোলনের বর্তমান সঙ্কটপূর্ণ অবস্থা বিশ্লেষণ করে যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন মাত্র চার বছর অতিবাহিত হওয়ার পর তা অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণিত হয়েছে। তিনি যে এতটা দূরদর্শী ছিলেন তার জীবদ্দশায় এ সত্যটা অনুধাবন করতে পারিনি বলে আজ খুবই আক্ষেপ করছি।

শহীদ কামারুজ্জামান চলে গেছেন না-ফেরার দেশে। ২০১৫ সালের ১১ এপ্রিল শনিবার বাংলাদেশ সময় রাত সাড়ে দশটায় দুনিয়াবাসী তাকে চিরবিদায় জানিয়েছে অশ্রুভারাক্রান্ত হৃদয়ে। এখন তিনি আছেন আসমানবাসীর তত্ত্বাবধানে। আল কুরআনের স্পষ্ট ঘোষণা : 'আর যারা আল্লাহর রাহে নিহত হয়, তাদেরকে কখনো মৃত মনে কোরো না; বরং তারা তাদের পালনকর্তার কাছে জীবিত ও জীবিকাপ্রাপ্ত।' (৩ : ১৬৯)

আজ এটা বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে, কামারুজ্জামান ভাই আর আমাদের মাঝে নেই। বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে, আমার ধানমন্ডির বাসভবনে তাকে আর কোনো দিন অভ্যর্থনা জানাতে পারব না। বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে, আমার নয়া পল্টন ল-চেম্বারসে তিনি আর কোনো দিন সাক্ষাৎ করতে আসবেন না। বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে, টেলিফোনে তার কণ্ঠস্বর আর কোনো দিন শুনতে পারব না। বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে, তার হাসিমাখা মুখ এই দুনিয়ায় আর কোনো দিন দেখতে পাবো না। কামারুজ্জামান ভাই ছিলেন বাংলাদেশে ইসলামি আন্দোলনের এক বিরল ব্যক্তিত্ব। ইসলামি আন্দোলনের আকাশে আরেকজন কামারুজ্জামানের আবির্ভাব কবে ঘটবে দূর প্রবাসে বসে জীবনের এই পড়ন্ত বেলায় (Autumn of life) তাই ভাবছি আর আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে আরজি জানাচ্ছি তিনি যেন ভাই কামারুজ্জামানের শাহাদত কবুল করে তাকে জান্নাতুল ফেরদৌসে স্থান দেন এবং ইসলামি আন্দোলনে তার অভাব পূরণ করে দেন।

www.pathagar.com

বাংলাদেশের ঘুরে দাঁড়ানোর স্বপ্ন

মুহাম্মদ কামারুজ্জামান এক ক্ষণজন্মা নেতা; বাংলাদেশের ঘুরে দাঁড়ানোর স্বপ্নের জন্য অপরিহার্য সততা, মেধা-যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, ক্লিন ইমেজ-জনপ্রিয়তায় সমৃদ্ধ অনন্য প্রতিভা। স্বাধীন-আত্মনির্ভশীল বাংলাদেশের অস্তিত্বের বিরোধী সাম্রাজ্যবাদী চক্রের তাই তিনি চক্ষুশূল। সাংবাদিক, লেখক, বুদ্ধিজীবী, সংগঠক, রাজনীতিবীদ পরিচয়ের বাইরেও শেরপুর জেলার বাজিতপুর গ্রামে ১৯৫২ সলের ৪ জুলাই জন্ম নেয়া মুহাম্মদ কামারুজ্জামান এ মাটির সন্তান। জামায়াতে ইসলামীর অন্যতম নীতিনির্ধারক হলেও পিতা-মাতার আদরের দুলাল, সন্তানদের পিতা, মিসেস নুরুন্নাহারের স্বামী। আর দশ জন নাগরিকের মত ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকার তাঁর রয়েছে-বেঁচে থাকার অধিকারতো বটেই।

হাজার বছরের বিরল ব্যক্তিত্ব আল্লামা দেলওয়ার হোসাইন সাঈদীকে যারা নারী ধর্ষক, খুনী, ডাকাত ঘোষণা করতে পারে; কসাই কাদের সাজিয়ে অসাধারণ প্রতিভাধর রাজনীতিবীদ আব্দুল কাদের মোল্লাকে ফাসী দিতে পারে তাদের কাছে কিছু চাওয়ার থাকতে পারে না। শুধু দেখার বিষয় কিয়ামত পর্যন্ত প্রতিটি বিবেকের যে তীব্র ঘৃণাবৃষ্টি এরা নিজেদের জন্য অপরিহার্য করে নিয়েছে তার ফিরিস্তি আর কত দীর্ঘতর করবে? যারা অনুভুতিকে তালাবদ্ব করে প্রকারান্তে সহযোগিতা করে যাচ্ছেন তাদের নীরবতা কবে ভাঙবে অথবা পরিণতি কি ঘটতে যাচ্ছে। আর বাংলাদেশের ঘুরে দাঁড়ানোর স্বপ্নের অভিযাত্রার গতিপথের কি হয়?

শেষ কথা

যে কথিত অভিযোগে কামারুজ্জামানকে ফাঁসি দেয়া হয়েছে সে অভিযোগের কোন রকম সত্যতা নেই। তিনি বাংলাদেশের রাজনীতিতে ইসলামী ও আদর্শিক চেতনার সমন্বয় ঘটিয়ে একটি উন্নত ও সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ গঠনে অনন্য অবদান রেখে ছিলেন। তিনি একজন জাতীয় রাজনীতিবিদ ও ইসলামী চিন্তাবিদ। রাজনৈতিক ময়দানে তাঁর অবদান দেশের ইসলাম বিরোধী শক্তির সহ্য হচ্ছে না। তাই তাঁকে আজ যুদ্ধাপরাধের কথিত অভিযোগে ফাঁসিতে ঝোলান হয়েছে।

এমন প্রতিভাসম্পন্ন একজন মানুষ আজ হত্যার গভীর ষড়যন্ত্রের শিকার। মানব সমাজে আজ মনে হচ্ছে সত্য পন্থীরাই যেন অপরাধী। প্রকৃত অপরাধীরা যেন সাধু!!! জালেমের বিষাক্ত হুংকার মানব সমাজকে কাঁপিয়ে তুলছে। খোদাদ্রোহী দুনিয়া আজ অত্যাচার, নিপীড়ন, প্রতারণা, হঠকারিতা, দুর্ধর্ষতা ও অপরাজনীতির সীমানা ছেড়ে গেছে। নির্যাতিতের করুণ ফরিয়াদে আকাশ-বাতাস দলিত-মথিত ও তিক্ত-বিষাক্ত। কিন্তু তারপরও কি সত্য পথের সৈনিকেরা কি ভিত? না, বরং প্রতিটি মুমিন এই বিপদসংকুল পথ পাড়ি দেয়াকে নিজের ঈমানী দায়িত্বের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেই এগিয়ে চলছে। এই রকম কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছে সকল নবী রাসূল আলাইহিস সালাম-কে। যুগে যুগে যারাই

www.pathagar.com

সেই পদাংক অনুসরণ করবে, তাদের প্রত্যেককেই একই পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে এটাই স্বাভাবিক।

আজ আমাদের প্রিয় নেতা জনাব কামারুজ্জামান ভাই সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। কোনো এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! কবরে সকল মুমিনের পরীক্ষা হবে, কিন্তু শহীদের হবে না, এর কারণ কী? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাবে বলেন, তার মাথার ওপর তলোয়ার চমকানোই তার পরীক্ষার জন্য যথেষ্ট।' আল্লাহর দ্বীনের দায়ী হিসেবে সারা বাংলাদেশে নয়, বরং ছুটে বেড়িয়েছেন আমেরিকা, ইউরোপ, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, জাপান, পাকিস্তান, সিঙ্গাপুরসহ পৃথিবীর অনেক প্রান্তে। মিথ্যা কালিমা আর ষড়যন্ত্রের কালো কাপড় কি সেই আলোকচ্ছটাকে আবৃত করতে পারে? যেই শির আজন্ম এক পরওয়ারদিগার ছাড়া কারো কাছে নত হয়নি, ফাঁসির আদেশে সেই শির দুনিয়ার কোন শক্তির কাছে কি নতি শিকার করতে পারে?

শহীদের রক্ত আর মজলুমের চোখের পানি কখনো বৃথা যায় না। সুতরাং জেল-জুলুম, নির্যাতন, হত্যা, ফাঁসি আমাদের জীবনে নতুন হলেও ইসলামী আন্দোলনে তা একেবারেই পুরাতন। তাই আসুন, শোককে শক্তিতে পরিণত করে শহীদের রেখে যাওয়া অসমাপ্ত কাজ বাস্তবায়ন করে গড়ে তুলি একটি সুখী সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ। হে! আরশের মালিক মহান পরওয়ারদেগার তোমার গোলামকে তুমি শাহাদাতের সর্বচ্ছ মর্যাদা দিয়ে জান্নাতের মেহমান হিসেবে কবুল কর। আমীন।

প্রথম শাহাদাত বার্ষিকীতে শহীদ মুহাম্মদ কামারুজ্জামানকে নিয়ে স্ত্রী নুরুন নাহার এর আবেগময় লেখা -

যারা শহীদ তারা অমর, শহীদরা মৃত নন। পবিত্র কুরআনে তাদের মৃত বলতে নিষেধ করা হয়েছে। তারা আল্লাহ থেকে রিজিকপ্রাপ্ত। তারা আল্লাহর মেহমান। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে কতক এমনও আছে যারা নবীও নন শহীদও নন তথাপি তারা আল্লাহর কাছে এত উচ্চ মর্যাদা লাভ করবে যা দেখে নবীগণ ও শহীদগণ পর্যন্ত তাদের প্রতি ঈর্ষাবোধ করবেন। লোকেরা জানতে চেয়েছেন তারা কারা? নবীজি বলেছেন, তারা পরস্পরের আত্মীয়ও ছিলেন না, পরস্পরের মধ্যে কোন আর্থিক লেনদেনও ছিল না। বরং শুধু আল্লাহর দ্বীনের ভিত্তিতে পরস্পরকে ভালোবাসতো। আল্লাহর কসম তাদের সুখবর জানার পর নবীজি সূরা ইউনুসের একটি আয়াতের অর্থ পড়লেন "মনে রেখো আল্লাহর বন্ধুদের কোন ভয় নেই, তারা কোন দুশ্চিন্তায়ও পড়বে না।" যত কঠিন পরীক্ষা তত বড় পুরস্কার।

আনাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত নবীজি বলেছেন, বালা মুসিবত অর্থাৎ পরীক্ষা যত কঠিন হবে, তত বড় পুরস্কার প্রদান করা হবে। (যদি বান্দা বিপদ মুসিবতে দিশেহারা হয়ে সত্যের পথ থেকে সরে না যায়।) আল্লাহ তায়ালা যখন কোন জনগোষ্ঠীকে ভালোবাসেন তখন তাদেরকে আরও পবিত্র ও কলুষমুক্ত করার

www.pathagar.com

লক্ষ্যে পরীক্ষায় ফেলেন। যারা আল্লাহর ফয়সালায় সন্তুষ্ট থাকে ও ধৈর্যধারণ করে আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকেন। নবীজি বলেছেন, যখনই কোন মুসলমান কোন রকমের মানসিক কষ্ট, শারীরিক আঘাত বা রোগ, দুঃখ বা বিষাদ ভোগ করে এবং তাতে ধৈর্যধারণ করে তখন তার ফলে আল্লাহ তার গুনাহগুলো মাফ করে দেন, এমন কি তার গায়ে একটা কাটাও যদি ফুটে তবে তাও তার পাপ মোচনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। (বুখারি, মুসলিম)

পৃথিবীতে যারা শহীদ হয়েছেন তারা চরম ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন। আমার প্রিয় মানুষটিকে দেখেছি প্রচণ্ড গরম প্রচণ্ড শীত কিভাবে তিনি সহ্য করেছেন। খাওয়ার কষ্ট, পানির কষ্ট। কষ্ট দেয়াকে জালিমরা আনন্দের কাজ মনে করতো। তারা মনে করেছে এ দুনিয়া থেকে তারা কখনও বিদায় নিবে না।

হজরত ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার একজন নবীর কথা (অবস্থা) বর্ণনা করছিলেন, সেই দৃশ্যটা আমার চোখের সামনে এখনো ভাসছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, দাওয়াত দেয়ার অপরাধে সেই নবীকে তার স্বজাতীয়রা মারতে মারতে রক্তাক্ত করে দিয়েছিল। তথাপি সেই নবী নিজের মুখমণ্ডলের রক্ত মুছতে মুছতে বলেছিলেন, হে আল্লাহ আমার জনগণকে মাপ করে দাও (তুমি তাদের উপর আজাব নাজিল করো না) কেননা তারা অজ্ঞ। (বুখারি, মুসলিম)

যখন কোন জাতি নবীর দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করে, তখন সে জাতি আল্লাহর আজাবের যোগ্য হয়ে যায়। কিন্তু নবী হতাশ হন না। বরং তার জাতির মধ্যে কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন এবং দোয়া করেন যে, এখনই আজাব দিও না, হয়তো কাল ঈমান আনবে। যখন আজাবের ফেরেশতা বলল, আপনি বললে মক্কার দুটি পাহাড় আবু কুরাইশাও জাবালে আহমারকে মিশিয়ে দিই এবং ওরা মাঝখানে পিষ্ট হয়ে মরে যাক, তখন তিনি বললেন, “আমাকে আমার জনগণের মাঝে আরও কিছু দাওয়াতের কাজ করতে দাও, হয়তো বা তারা অচিরেই ঈমান আনবে, অথবা ওদের বংশধরের মধ্যে তাওহিদপন্থী জন্ম নেবে। দ্বীনের কাজ যারা করে, তাদের জন্য এটি একটি উত্তম নমুনা ও আদর্শ। ধৈর্য ও মানবপ্রেম ছাড়া দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম ও চেষ্টা-সাধনা করা সম্ভব নয়। বাতিল শক্তি যখন বিজয়ী ও কর্তৃত্বশীল হয় এবং সত্য পরাজিত ও পরাধীন হয় তখন সত্য দ্বীন ইসলামের ধারক-বাহক ও অনুসারীদের কে কি পরিমাণ বা কি ধরনের দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ-মুসিবতের সম্মুখীন হতে হয় তার ভুক্তভোগীরা হাড়ে হাড়ে টের পান। এই পরিবারগুলোর মানুষ না শান্তি মতো ঘুমুতে পারেন, না শান্তি মতো কামকাজ করতে পারেন। পুলিশি হয়রানিতে অস্থির থাকতে হয়। পরিবারের একজনকে আটকিয়ে জুলুম তো করছেই আবার পরিবারকেও বিরাট জুলুমের মধ্যে রেখেছে।

www.pathagar.com

আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র পাঁচ বছর আগেই বলেছিল এই বিচারে না গিয়ে সবার বলা উচিত ছিল আমাদেরকে এমনিতেই গুলি করে মেরে ফেলো আমরা এই বিচারে যাব না, মাঝখানে পাঁচটি বছর কঠিন থেকে কঠিন জুলুম-যন্ত্রণা করে সেই মৃত্যুই হলো কঠিন মৃত্যু। অবশ্য এটাতো আল্লাহর পক্ষ থেকেই ফায়সালা। দুঃখ একটাই মিথ্যা অভিযোগ এবং অবিচার, এরপর বলবো প্রিয় মানুষটি বিজয়ী এবং অমর। আমরা হেরে যাইনি। হিন্দু মানুষও আমাদের সান্ত্বনা দিয়েছে আপনি কান্না করবেন না, উনি বিজয়ী উনি অমর।

যেদিনটিতে জালিমরা আমার প্রাণপ্রিয় মানুষটিকে সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে রাষ্ট্রীয় ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে হত্যা করা হয়েছিল সেদিন শেরপুরে প্রচণ্ড ঝড় ছিল আর মেঘের বজ্রকঠিন আওয়াজ যেন জালিমদেরকে বুকফাটা চিৎকার করে বলছিল এবং তাদের ধমকাচ্ছিল এই বলে যে, তোমরা যা করছো তা অন্যায়। কিন্তু সেই জ্ঞান কি জালিমদের আছে? যখন আমার প্রিয় মানুষটিকে নিয়ে যায়, এত ভয় ছিল ওদের রাস্তায় ঝড়ে গাছ পড়ছিল সেগুলো সরিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করে হলেও জালিমরা তাড়াহুড়ো করে চলে গেছে। কারণ থেমে থাকলে জনরোষ থেকে নিজেদের বাঁচাতে পারত না। ঝড় বৃষ্টির মধ্যেই কেন দাফন করতে হয়েছে রাতের আঁধারে, সবার প্রিয়, লক্ষ লক্ষ লোকের হৃদয়ের মাণিক অনাদরে অবহেলায় জালিমরা শুইয়ে দিলেও লক্ষ লক্ষ মানুষ দূরে দূরে অবস্থান নিয়েছিল আগ থেকেই। যখনি জালিমরা সরে এসেছে তখনি বাঁধভাঙা জোয়ারের মতো চতুরদিক থেকে লোকজন ছুটে এসেছে কবর জিয়ারত করার জন্য। সৎ লোকদের মেরে ফেলাই হলো জালিমদের উত্তম কাজ। আর আল্লাহর নাফরমানি করে বেঁচে থাকার চেয়ে আল্লাহর হুকুম পালনের মধ্য দিয়ে মরে যাওয়াই উত্তম। আমাদের সবার প্রিয় মানুষটি ইসলামী আন্দোলনে এসেছিলেন শহীদি তামান্না নিয়েই। কাজেই তিনি স্বার্থক, তিনি বিজয়ী, তিনি অমর, তার কোন পরাজয় নেই, আল্লাহ্ তাকে কবুল করে নিন।

নবীজি বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাউকে ভালোবেসেছে, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কারো সাথে শত্রুতা করেছে, আল্লাহর জন্যই কাউকে দান করেছে আবার আল্লাহর জন্য দান করা থেকে বিরত থেকেছে, সেই ব্যক্তি ঈমানকে কানায় কানায় ভরেছে। হে প্রিয় তুমি শহীদ, তুমি সফল। আল্লাহ্ কবুল করে নিন তোমার শাহাদাত। বাতিল শক্তির কাছে তিনি মাথা নত করেননি, বার বার আমাদের বলেছেন আমার জন্য কোন চিন্তা করবে না। কত মানুষ কতভাবে এক্সিডেন্টে মারা যায়, আর আমার মৃত্যু গৌরবের। আমি ভালো আছি, তোমরা ভালো থেকো ও সাহস হারাবে না। আল্লাহর উপর ভরসা রাখবে। দেশের মানুষকে আমার সালাম পৌঁছে দিও। আরো বলেছেন, এই সরকার যেন আমার জানাজায় যেতে লোকজনদের বাধা না দেয়। সরকার কেন বাধা দিয়েছে কে বলতে যাবে। কেন এত ভয় ছিল। তাকে নিয়ে যেতে এত এম্বুলেন্স কেন

লেগেছিল। মানুষ বলছে কোনটাতে শহীদ কামারুজ্জামান সাহেব আছেন তা যাতে জনগণ বুঝতে না পারে। কেন এত ভয়। কিসের এত ভয়, কে জবাব দিবে আমাকে। আমি নির্বাক হয়ে আকাশের দিকে তাকিয়েই থাকবো, মহান আল্লাহ আমাকে বলে দিবেন। আমার ছেলে বলে কেউ কান্না করো না। আব্বু এখন ভালো আছেন।

তিবরানীতে বর্ণিত একটি হাদীসে বলা হয়েছে যে, ইসলামের রাজনৈতিক অবস্থা যখন বিকৃত হয়ে যাবে, তখন বিপথগামী শাসকরা কর্তৃত্বশীল হবে এবং তারা সমাজকে ভ্রান্ত পথের দিকে নিয়ে যাবে। তাদের নির্দেশ মেনে চললে জনগণ গোমরাহ হয়ে যাবে। আর তাদের নির্দেশ অমান্য করলে তারা তাদের হত্যা করবে। এ কথা শোনার পর লোকেরা জিজ্ঞেস করলো তারপর তারা কি করবে, তিনি বললেন : সে সময়ে তোমাদেরকে হজরত ঈসার সহচরগণ যা করেছিল তাই করতে হবে। তাদেরকে করাত দিয়ে চিরে ফেলা হয়েছে। শূলে চড়ানো হয়েছে, তবুও তারা বাতিলের কাছে আত্মসমর্পণ করেননি। ওহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয়ের প্রেক্ষিতে আল্লাহপাক একটি সত্য মুসলমানদের জন্য তুলে ধরেছেন। "যদি তোমাদের আঘাত লেগে থাকে তবে অনুরূপ তাদেরও তো লেগেছে। মানুষের মধ্যে এই দিকগুলোর আমি পর্যায়ক্রমে আবর্তন ঘটাই যাতে আল্লাহ মুসলিমদেরকে জানতে পারেন এবং তোমাদের মধ্য থেকে কিছু লোককে শহীদ হিসেবে গ্রহণ করতে পারেন।" শহীদের রক্তরাঙ্গা পিচ্ছিল পথের পথিকরা ভীতু নয় কাপুরুষ নয়। যারা তাদেরকে রাতের আঁধারে মারে, পিছন থেকে বিনা বিচারে মারে, তারাই কাপুরুষ। এই সংগ্রামের পথে আসে বীর পুরুষেরা।

আল্লাহর রাহে জীবন দিতে বিন্দমাত্র বিচলিত নয় শতবাধা অতিক্রম করে বীর পুরুষেরা পথ এগোয়। সেই বাঁধা আনে দুঃখ যন্ত্রণা। এই দুঃখ যন্ত্রণা ব্যক্তি জীবনকে পরিশুদ্ধ করার আসল হাতিয়ার। সত্য প্রতিষ্ঠার বন্ধুর পথের পথিক ছিলেন আমার প্রিয় মানুষটি। শেষ বিদায়ে আমি বলেছি তুমি হাসতে হাসতে ফাঁসির মঞ্চের দিকে যাবে। সত্য প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে তাকে জীবন দিতে হয়েছে। আল্লাহ কবুল করে নিন তাকে।

যারা ক্ষমতার মোহে অন্ধ তারা হয়তো জানেন না "যে ক্ষমতার মঞ্চ এবং ফাঁসির রশির দূরত্ব খুব বেশি দূরে না।" ফরাসী লেখক ভলতেয়ার বলেছেন, "যারা করাতে পারবে, তারা তোমাকে দিয়ে নৃশংস কাজও করাতে পারবে।" আসুন আমরা সবাই মিলে তার জন্য দোয়া করি তার মতো শহীদী তামান্না নিয়ে কাজ করি। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। হে মালিক, মৃত্যুর পর যখন আমাদের অনন্ত জীবন শুরু হবে তখন যেন আমরা আমাদের প্রিয় মানুষটির সান্নিধ্যে থাকতে পারি। হে মালিক, তুমি আমাদের সেই তাওফিক দিও।[৯৬]

---

[৯৬] লেখক : শহীদ কামারুজ্জামানের স্ত্রী (সাপ্তাহিক সোনারবাংলা)

www.pathagar.com

শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লা (রহ.)

১২ই ডিসেম্বর ২০১৩ ইতিহাসের একটি কালো অধ্যায়। এই দিনটি ইতিহাসে একটি কালোদিন হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। এই দিনে বিশ্বের ইতিহাসে একজন নিরীহ, নিরাপরাধ মানুষকে রাষ্ট্রীয় আয়োজনের মধ্যে দিয়ে হত্যা করা হয়েছে। ইতিহাস হয়ত একদিন প্রমাণ করবে এটি ছিল একটি রাষ্ট্রীয় হত্যাকাণ্ড। দার্শনিক সক্রেটিসকে হ্যামলক বিষ প্রয়োগে হত্যার রায় দিয়েছিল আদালত। জ্যোতির্বিজ্ঞানী গ্যালিলিওকেও ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয় আদালতের নির্দেশেই। হাজার বছর পর এসে প্রমাণিত হয়েছে দুইটি রায়ই ভুল রায় ছিল। বিচার-ইতিহাসে এ ধরনের রায়ের অসংখ্য নজির রয়েছে- যার ভিত্তিতে কথিত অভিযুক্ত ব্যক্তি হত্যার পর প্রমাণিত হয়েছে, আদালতের দেয়া রায়টি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত ছিল না। জামায়াত নেতা জনাব আব্দুল কাদের মোল্লার বিষয়েও হয়তো ভবিষ্যতে এমনটি বলা হতে পারে- যে রায়ের ভিত্তিতে তাকে ফাঁসিতে ঝুলানো হয়েছে তা সঠিক ছিল না। এই জন্যই আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্বদ্যিালয়ের অধ্যাপক ম্যাকলোয়েন চার্লস মানুষের দুর্দশার চিত্র আঁকতে গিয়ে বলেছেন, "আমার মতে ইতিহাসের কোন যুগেই কোন ব্যক্তি রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে এত কঠিন বিপদের সম্মুখীন হয়নি, প্রশাসনের সামনে বিচার বিভাগ কখনো এতটা অসহায়ত্ব বোধ করেনি, এ বিপদ অনুভব করা এবং তার প্রতিকারের ব্যবস্থা সম্পর্কে পূর্বে কখনো চিন্তা করার এতটা তীব্র প্রয়োজন দেখা দেয়নি যতটা আজ দেখা দিয়েছে"

পৃথিবীর সকল নীতি-নৈতিকতা, মানবাধিকার, সব উপেক্ষা করে যাকে হত্যা করা হয়েছে তিনি একাধারে একজন রাজনীতিবিদ, প্রতিথযশা শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক, লেখক, ইসলামী ব্যক্তিত্ব ও সদালোপী প্রাণপুরুষ। বিশ্বের কোটি-কোটি মানুষের হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসা আর চোখের অশ্রু সিঞ্চ, হয়ে আমাদের প্রাণপ্রিয় নেতা এ ভুবন ত্যাগ করেছেন। এইদিন শুধু একজন আব্দুল কাদের মোল্লাকেই হত্যা করা হয়নি, হত্যা করা হয়েছে মানবাধিকার, সত্যপন্থা, কল্যাণ, সুন্দর আর ন্যায়ের প্রতিক আব্দুল কাদের মোল্লাকে। যিনি নিজেই তার দীর্ঘ সাফল্যমণ্ডিত কর্মের আবিষ্কারক। যিনি ২ ডিসেম্বর ১৯৪৮ সালে ফরিদপুর জেলার, সদরপুর উপজেলার, জরিপারডাঙ্গী, গ্রামে পিতা- মোঃ সানাউল্লাহ্ মোল্লা এবং মাতা বাহেরুন্নেসা বেগম-এর ঘরকে আলোকিত করে এই পৃথিবীতে আগমন করেন।

মেধাবী আব্দুল কাদের মোল্লা শিক্ষাজীবন শুরু করেন ১৯৫৯ সালে প্রাথমিক শিক্ষা বৃত্তি লাভ করার মধ্যে দিয়ে, আর প্রচ্যের অক্সফোর্ড ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে ১৯৭৭ সালে শিক্ষা প্রশাসন থেকে মাস্টার্স ডিগ্রীতে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম

www.pathagar.com

স্থান অধিকার করেন তিনি। সেই পথ ধরে কর্মজীবনেও পরতে পরতে রাখেন সাফল্যের স্বাক্ষর। জনাব আব্দুল কাদের মোল্লা ১৯৭৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত ঢাকার বিখ্যাত বিদ্যাপীঠ উদয়ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার মধ্যে দিয়ে মানুষ গড়ার কারিগর হিসেবে শিক্ষকতাকে বেছে নেন। পরবতীতে বাংলাদেশ রাইফেলস পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজের সিনিয়র শিক্ষক এবং একই প্রতিষ্ঠানের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের দায়িত্বও পালন করেন অত্যন্ত সুনাম ও দক্ষতার সাথে। এরপর তিনি ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর সংস্কৃতি কর্মকর্তা ১৯৭৮ সালে রিসার্স স্কলার হিসেবে বাংলাদেশ ইসলামী সেন্টার, ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত তিনি মানারাত ইন্টারন্যাশনাল স্কুল এন্ড কলেজের প্রতিষ্ঠাতা সেক্রেটারি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। লেখালেখি ও সাংবাদিকতায় পারদর্শী জনাব আব্দুল কাদের মোল্লা ১৯৮১ সালে দৈনিক সংগ্রাম পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদক হিসেবে সাংবাদিকতার পেশার সাথে নিজেকে যুক্ত করেন। সেখানেও যেন হারবার নয়। তিনি ১৯৮২ ও ১৯৮৩ সালে পরপর দুই বছর ঢাকা ইউনিয়ন অব জার্নালিস্ট (ডিইউজে)-এর সহসভাপতি নির্বাচিত হন। তিনিই তার কর্মময় জীবনের সাক্ষী। তার পরিচয় তিনি নিজেই। চলনে-বলনে, সহজ-সরল আর সাদাসিধে, বুদ্ধি-বাগ্মীতায় অসাধারণ, কর্মপ্রাণ চঞ্চলতায় যেন সর্বত্র বিরাজমান, ব্যাক্তিত্ব সম্পন্ন ও নিরহংকার, পরোপকারী এবং স্বজন ব্যক্তি হিসেবে সকলের নিকট পরিচিত। যিনি একবার তার সাহচর্য পেয়েছেন তিনি তাকে ভুলতে পারবেন না। কারাগারে অসংখ্য ভক্ত-অনুরক্ত থেকে তার আচারব্যবহারের প্রশংসা শুনেছি। দ্বীনের দায়ী হিসেবে সারা বাংলাদেশে নয়, বরং ছুটে বেড়িয়েছেন সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, জাপান, পাকিস্তান সিঙ্গাপুরসহ পৃথিবীর অনেক প্রান্তে। মিথ্যা কালিমা আর ষড়যন্ত্রের কালো কাপড় কি সেই আলোচ্ছটাকে আবৃত করতে পারে? যেই শির আজন্ম এক পরওয়ারদিগার ছাড়া কারো কাছে নত হয়নি, ফাঁসির আদেশে সেই শির দুনিয়ার কোন শক্তির কাছে নতি শিকার করতে পারে? শাহাদাতের পূর্বে আল্লাহর দ্বীনের মুজাহিদের জবানীতে এমন সাহসী উচ্চারণ উদ্দীপ্ত করেছে সারা বিশ্ববাসীকে। তিনি বললেন- "বাংলাদেশের মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে ইসলামী আন্দোলনের জন্য আমি আমার জীবন উৎসর্গ করেছি। আমি অন্যায়ের কাছে কখনও মাথা নত করিনি, করবো না। দুনিয়ার কোন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রাণ ভিক্ষা চাওয়ার প্রশ্নই আসে না। জীবনের মালিক আল্লাহ। কিভাবে আমার মৃত্যু হবে তা আল্লাহই নির্ধারণ করবেন। কোন ব্যক্তির সিদ্ধান্তে আমার মৃত্যু কার্যকর হবে না। আল্লাহর ফায়সালা অনুযায়ীই আমার মৃত্যুর সময় ও তা কার্যকর হবে। সুতরাং আমি আল্লাহর ফায়সালা সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নেবো।"

www.pathagar.com

কাজেই এ দুনিয়ায় কিভাবে প্রাণ বাঁচিয়ে চলতে হবে এটা চিন্তার নয়; বরং আসল চিন্তার বিষয় হলো ঈমানকে কিভাবে বাঁচানো যাবে, কিভাবে থাকা যাবে আল্লাহর আনুগত্যের গণ্ডির মধ্যে। যদি দুনিয়ায় প্রাণ বাঁচানোর জন্য ঈমান হারিয়ে ফেলে তাতো বিরাট এক ব্যর্থতা। তাহলে সে ঈমানের মূল্য কী? আর ঈমান বাঁচাতে যদি দুনিয়ায় প্রাণ বিসর্জিত হয় তাহলে এ এক মহা সফলতা। এমন মৃত্যু সত্যিই গৌরবের। এই মৃত্যুকে অভিনন্দন। শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লা সত্যিই অনেক সৌভাগ্যের অধিকারী। তার মর্যাদা আসলেই ঈর্ষণীয়।

সুতরাং প্রাণের জন্য উৎসর্গীত ঈমান আর ঈমানের জন্য উৎসর্গীত প্রাণ বড়ই ব্যবধান। হযরত রাশেদ বিন সা'দ জনৈক সাহাবী থেকে বর্ণনা করেছেন। কোনো এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! কবরে সকল মুমিনের পরীক্ষা হবে; কিন্তু শহীদের হবে না, এর কারণ কী? হুজুর ﷺ জবাবে বলেন, তার মাথার ওপর তলোয়ার চমকানোই তার পরীক্ষার জন্য যথেষ্ট।' জন্ম থেকে শাহাদাত পর্যন্ত জনাব আব্দুল কাদের মোল্লা একটা নাম, একটি প্রেরণা,একটা জীবন্ত ইতিহাস।

রাজনীতি সচেতন জনাব আব্দুল কাদেও মোল্লা অষ্টম শ্রেণিতে অধ্যয়নকালেই কম্যুনিজমের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ছাত্র ইউনিয়নে যোগ দেন। ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত তিনি এ সংগঠনের সাথে যুক্ত থাকার পর মাওলানা মওদূদী (রঃ) লিখিত তাফহীমুল কুরআন পড়ে আলোকিত জীবনের সন্ধান পেয়ে ছাত্র ইউনিয়ন ছেড়ে তিনি তৎকালীন সময়ে মেধাবী ছাত্রদের সংগঠন ইসলামী ছাত্রসংঘ পূর্ব পাকিস্তান শাখায় যোগদান করেন। চৌকস নেতৃত্বের অধিকারী জনাব মোল্লা ছাত্রসংঘের শহিদুলাহ্ হল সভাপতি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি, ঢাকা মহানগরীর সেক্রেটারী ও একই সাথে কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৭ সালে জামায়াতে যোগ দেন এবং সর্বশেষ তিনি জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের এসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি জেনারেলে হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন।

জনাব আব্দুল কাদের মোল্লা বিভিন্ন মেয়াদে চার চারবার কারাবরণ করেছেন। আইয়ুব সরকারের নির্যাতনের বিরুদ্ধে আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালনের দায়ে ১৯৬৪ সালে প্রথমবারের মত তিনি বাম রাজনীতিক হিসেবে গ্রেপ্তার হন। ১৯৭২ সালে তিনি আবার গ্রেপ্তার হন কিন্তু স্থানীয় জনতার বিক্ষোভের মুখে পুলিশ তাকে স্থানীয় পুলিশ স্টেশন কাস্টোডী থেকেই ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়! জেনারেল এরশাদের শাসনের বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের কারনে আব্দুল কাদের মোল্লাকে আবারও আটক করে রাখা হয়। পরে উচ্চ আদালত তার এ আটকাদেশকে আবৈধ ঘোষণা করলে চার মাস পরে তিনি মুক্ত হন। তত্ত্বাবধায়ক

www.pathagar.com

সরকারের আন্দোলন করায় তৎকালীন বিএনপি সরকার ১৯৯৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তাকে আটক করে।

যাকে তথাকথিত যুদ্ধাপরাধী বানিয়ে হত্যা করা হয়েছে তিনি যুদ্ধাপরাধ তো দূরের কথা স্বাধীনতার স্বপক্ষে একজন যোদ্ধার প্রস্তুতিই নিয়েছেন। এবার শুনুন জনাব আব্দুল কাদের মোল্লা সেইফ হোমে জিজ্ঞাসাবাদের ৭১ সালে তার ভূমিকা নিয়ে যা বললেন তিনি– "২৩ মার্চ, ১৯৭১ ওই দিন আমরা ১২টার সময় জেসিও সম্ভবত উনার নাম ছিল মফিজুর রহমানের ডাকে আমরা বেশকিছু বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজ পড়ুয়া ছাত্র এবং স্কুলের উচ্চ শ্রেণির কয়েকজন ছাত্র একত্রিত হই। মফিজুর রহমান সাহেব আমাদেরকে বললেন, তিনি বিকাল থেকেই আমাদেরকে মুক্তিযুদ্ধের ট্রেনিং দেবেন এবং সেই লক্ষ্যে তিনি কিছু কাঠের তৈরি ডামি রাইফেল জোগাড় করেছেন। তিনি আরো বললেন, রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান হবে বলে মনে হয় না। তাই আমাদেরকে এখন থেকেই প্রস্তুতি নিতে হবে। আমরা ওইদিন বিকালে তার পরামর্শ মতো ৩০/৪০ জন একত্রিত হই। তিনি প্রাথমিক পরীক্ষা নেয়ার পর ২/১ জন বাদে প্রায় সবাই প্রশিক্ষণ নেবার জন্য মনোনীত করেন এবং ঐদিন থেকেই আমরা পিটি, প্যারেড শুরু করি। তিনি প্রথম তিন দিন আমাদেরকে দামি রাইফেল দেননি। পরে ২০/২১টি দামি রাইফেল আমাদেরকে দেন এবং এই রাইফেলগুলো দিয়েই আমরা প্রশিক্ষণ চালিয়ে যেতে থাকি।"

শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লাকে হত্যা করে আওয়ামী লীগ তার রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করেছে। কিন্তু রাতের একান্তে নিভৃত্বে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিজের বিবেককে যদি প্রশ্ন করেন, আপনি কি কসাই কাদেরকে হত্যা করেছেন? আমার মনে হয়, উত্তর হবে না। আপনি জামায়াত নেতা কাদের মোল্লাকে হত্যা করেছেন। যিনি এখন আপনার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ। এক সময় তিনি আপনার রাজনৈতিক মিত্র ছিলেন। একসময় একান্ত নিভৃত্তে ডেকে রাজনৈতিক শলা-পরামর্শও করেছেন তার সাথে। আব্দুল কাদের মোল্লা সেইফহোমে জিজ্ঞাসাবাদের বলেছেন– "১৯৯৬ সালের জুন মাসের নির্বাচনে জামায়াত এবং বিএনপি আলাদাভাবে নির্বাচন করে। এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে সরকার গঠন করে। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একপর্যায়ে আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন এবং আমাকে বললেন আমরা তো সরকার গঠন করলাম, আমাদের কিছু পরামর্শ দেন। বর্তমান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহিউদ্দিন খান আলমগীর মুখ্যসচিব ছিলেন এবং তিনি আমাকে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে রিসিভ করেন। আমি তখন প্রধানমন্ত্রীকে কিছু গঠনমুলক পরামর্শ দেই যা শুনে তিনি আমাকে সাধুবাদ দেন। একইভাবে তিনি পরে আমাকে আরো দুবার

www.pathagar.com

ডেকেছিলেন। এখন আমি মনে করছি দীর্ঘদিন যাদের সঙ্গে রাজনৈতিক আন্দোলন করলাম, মিটিং-মিছিল করলাম, সুসম্পর্ক রাখলাম, সখ্যতা রেখে চলেছি তারা এখন শুধু রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য দীর্ঘ ৪০ বছর পর আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে।"

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে জাতির জিজ্ঞাসা যে কুখ্যাত, হত্যাকারী, কসাই কাদেরকে জাতি চিনত, তাহলে আপনি কি সেই কসাই কাদেরের সাথে সাক্ষাত করেছিলেন? আমরা রাজনৈতিক চোরাবালিতে এতটাই আটকে গেছি তা সত্যিই জাতির জন্য দুর্ভাগ্যজনক। শেখ হাসিনা আজ তার শত্রু কাদের মোল্লাকে হত্যা করেছেন শুধু রাজনৈতিক কারণে আর প্রভুদের খুশি করতে। আর বিরোধী দলীয় নেত্রী আজ তার রাজনৈতিক জোট মিত্র কাদের মোল্লার মৃত্যুতেও প্রকাশ্যে সমবেদনা জানাতে পারেননি, তাও রাজনৈতিক কারণেই। যদিও হয়ত তিনি ব্যাথিত। শেখ হাসিনার হয়ত এখন বিস্মিত!! কাদের মোল্লার বিরুদ্ধে এত কুৎসা রটনার পর তিনি যে আজ পৃথিবীবাসীর নিকট বিখ্যাত আর এত জনপ্রিয়।

ফরিদপুরের আজগ্রামের আব্দুল কাদের মোল্লার মৃত্যু এখন সারা পৃথিবীর মুসলিম উম্মাহর প্রেরণা। যিনি অর্থবৃত্তে ধনী অথবা দুনিয়ার ক্ষমতাশালী কোন ব্যক্তিও ছিলেন না। কিন্তু এমন সৌভাগ্য জীবনের অধিকারী তিনি হলেন সারা পৃথিবীর অসংখ্য মানুষ শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লার গায়েবানা জানাজায় অংশগ্রহণ করেছে। কেয়ামত পর্যন্ত কোটি মুসলমান তার জন্য দোয়া করতে থাকবে। তাহাজ্জুদে চোখের পানিতে জায়নামাজে ভাসাবে। এমন গৌরবের মৃত্যু কতজনের ভাগ্যে জোটে!! আর এদেশের মানুষ অনেক জাতীয় নেতার মৃত্যুও দেখেছে, ভালো করে জানাযা পড়ার লোকও আসেনি। আইন করে রাষ্ট্র ক্ষমতায় আকড়ে থাকা যায়, স্যালুট আদায় করা যায়; কিন্তু মানুষের ভালবাসা অর্জন করা যায় না। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আজ খোঁজ নিয়ে দেখবেন কি, যে কারাগারে আপনি আব্দুল কাদের মোল্লাকে বছরের পর বছর আটকে রেখেছিলেন, সেই কারাগারের কর্তৃপক্ষ যাদেরকে দায়িত্ব দিয়েছেন মোল্লা সাহেবের খেদমত কারার জন্যে তাদের অনুভূতির কথা। আবাক হয়ে যাবেন এই মানুষগুলোর কথা শুনলে! আপনি আবাক হবেন তাদের কান্না দেখলে! কাদের মোল্লার প্রতি তাদের শ্রদ্ধা আর ভালোবাসা দেখলে! আমি কারাগারে কিছু দেখে এসেছি। আব্দুল কাদের মোল্লাকে যেদিন কাশিমপুর থেকে ফাঁসির রায় কার্যকরের জন্য ঢাকা আনা হয়েছে, সেদিন পৃথিবীবাসীর সাথে অসংখ্য হাজতি-কয়েদী নির্বাক হয়ে চোখের পানি ঝরিয়েছে। এমন নিঃস্বার্থ ভালোবাসা কয়জনের ভাগ্যে জোটে? আব্দুল কাদের সাহেবের কারা-সঙ্গীরা তার মৃত্যুর বেদনায় এখন কাতরাচ্ছে! চাঁদা তুলে গোশত বিতরণ করে তার জন্য দোয়া করছে।

www.pathagar.com

কিন্তু বেদনার হচ্ছে আব্দুল কাদের মোল্লার সন্তানেরা আর আব্বা বলে কাউকে ডাকতে পারবে না। সহধর্মীনী আর স্বামী ফিরে পাবে না। কিন্তু চোখের পানি কি বৃথা যাবে? বায়তুল্লাহর পবিত্র গেলাফ ধরে রোনাজারি, আর সারা পৃথিবীব্যাপি আহাজারি ফরিয়াদ কথা বলবে। আমরা আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ জানাই, তার স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে যেভাবে ধৈর্যের পাহাড় রচনা করেছে তার বিনিময়ে আল্লাহ যেন তাদেরকে জান্নাতে একসাথে থাকার সুযোগ করে দেন। কারণ শহীদেরা ৭০ জন পর্যন্ত সুপারিশ করে জান্নাতে নিতে পারবে। শহীদ পরিবারের জন্য এটি মাবুদের পক্ষ থেকে সুসংবাদ।

"আন্তর্জাতিক সংস্থা ও পরিবারের দাবি : বিচার বিভাগের ঘাড়ে বন্দুক রেখে কাদের মোল্লাকে হত্যা করা হয়েছে-

এমনই মন্তব্য করেছেন কাদের মোল্লার আইনজীবী, পরিবারের সদস্য, আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক মহল ও বিভিন্ন সংস্থা। কথিত যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে গত বছর ৫ ফেব্রুয়ারি জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল আব্দুল কাদের মোল্লার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হলেও শাহবাগের গণজাগরণ মঞ্চের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে আইন সংশোধন করে আপিল করে সরকার। আপিল বিভাগের দ্বিধাবিভক্ত রায়ের ভিত্তিতে গত ১৪ ডিসেম্বর রাতে তড়িঘড়ি করে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে তার ফাঁসি কার্যকর করা হয়। কাদের মোল্লার ফাঁসির রায় হওয়ার পর থেকেই জাতিসংঘসহ বিশ্বের বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন ও সংস্থা রায়ের বিষয়ে প্রশ্ন তুলে তা কার্যকর করা থেকে সরকারকে বিরত থাকার আহ্বান জানায়। একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধের কথিত অভিযোগে আটক, বিচার প্রক্রিয়া, সরকার পক্ষের অনুসন্ধান ও তথ্য-প্রমাণ, তদন্ত কর্মকর্তা ও সরকারি আইনজীবীদের আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ততা, বারবার আইন সংশোধন করে ফাঁসির উপযোগী করা, অপরাধ নয় আওয়ামী লীগ ও শাহবাগীদের দাবিই বিচার্য বিষয় হিসেবে সাব্যস্ত করা, সাক্ষী নিয়ে সরকার পক্ষের লুকোচুরি খেলাসহ ফাঁসির রায় আদালতে সরকার পক্ষের জবরদস্তিমূলক আচরণে বিচারের মানদণ্ড নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থা।

ফরিদপুরের আব্দুল কাদের মোল্লাকে মিরপুরের কুখ্যাত কসাই কাদের রূপ দিয়ে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর পর আইনজীবীরা আদালত ও সরকার পক্ষের কাছে যেসব প্রশ্ন করেও কোনো উত্তর পাননি সেগুলো হলো- আদালতে মোমেনা পরিচয় দিয়ে যে মহিলা কাদের মোল্লার বিপক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছেন তিনি একাত্তরে নির্যাতিতা ও স্বজন হারানো মোমেনা নন। প্রকৃত মোমেনা আদালতে সাক্ষ্য দিতেই আসেননি। মিরপুরের 'কসাই কাদের' ও ফরিদপুরের মুক্তিযুদ্ধের কমান্ডারের বাসায় থাকা কাদের মোল্লা এক ব্যক্তি নন। কাদের মোল্লা যদি

www.pathagar.com

মিরপুরের বহুল আলোচিত 'কসাই কাদের' হন তাহলে তিনি কি করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এসএম হলে থেকে পড়া-লেখা করে ৭১ সালে পাস করে বের হন? মেধাবী ছাত্র হিসেবে স্বীকৃতির পর কি করে সরকার তাকে ওই বছরই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে উদয়ন স্কুলের শিক্ষক নিয়োগ দেন? মাত্র এক বছর পর প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তার মর্যাদায় তাকে কি করে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালক পদে চাকরি দেয়া হয়? কোনো সাক্ষীই নিজ চোখে আব্দুল কাদের মোল্লাকে একাত্তরে অপরাধ করা তো দূরের কথা, মিরপুর এলাকাতেই দেখেননি। শোনা কথার ভিত্তিতে ও ধারণামূলক বক্তব্যের ভিত্তিতে কাউকে ফাঁসি দেয়া যায় কি? এসব প্রশ্নের জবাব এখনও পাওয়া যায়নি।

বিচারকদের নিয়ে প্রশ্ন আপিল বিভাগের বিচারপতি এসকে সিনহা ও শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিকের বিরুদ্ধে বিচারের শুরুতেই আপত্তি পেশ করেন কাদের মোল্লার আইনজীবীরা। আলোচিত স্কাইপ কথপোকথন থেকে জানা যায় যে, বিচারপতি এসকে সিনহা বিচারবহির্ভূতভাবে জামায়াত নেতাদের ফাঁসি দেয়ার জন্য ট্রাইব্যুনালের বিচারকদের প্রভাবিত করেন। তিনি ট্রাইব্যুনালের সাবেক চেয়ারম্যান বিচারপতি নিজামুল হক নাসিমকে ফাঁসির রায় দেয়ার বিনিময়ে আপিল বিভাগের বিচারক হিসেবে নিয়োগ দেয়ারও আশ্বাস দেন। স্কাইপ কথোপকথনের মাধ্যমে প্রকাশিত বিচারপতি এসকে সিনহার এ ভূমিকার কথা স্বীকার করেছেন বিচারপতি নিজামুল হক নাসিম। সেই সঙ্গে এ কথোপকথন প্রভাবশালী ম্যাগাজিন দি ইকোনোমিস্ট-এ প্রকাশ করে। প্রসঙ্গত, সেনা সমর্থিত ওয়ান ইলেভেন সরকারের আমলে পদত্যাগের জন্য বঙ্গভবনে চায়ের দাওয়াত পেয়েছিলেন এ বিচারপতি। অপরদিকে বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক জামায়াত নেতাদের ফাঁসির দাবিতে সভা-সমাবেশও করেছেন। জামায়াত নেতাদের ফাঁসির দাবিতে লন্ডনে অনুষ্ঠিত একটি আলোচনা সভায় তিনি বক্তব্যও দিয়েছেন। যা বিভিন্ন মিডিয়াতে প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়েছে। এসব ঘটনা উল্লেখ করে আপিল বিভাগে আপত্তি দেয়ার পরও বিচার কাজে অংশ নেন আলোচিত এ দুই বিচারপতি। আইনজীবীরা বলেন, প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী একজন বিচারককের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট কারণ উল্লেখপূর্বক ন্যায়বিচার না পাওয়ার আশঙ্কা করে আবেদন করলে সেই বিচারক নিজ থেকেই সরে পড়েন। ওয়ান ইলেভেন সরকারের সময় সংসদ ভবনের বিশেষ কোর্টে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিচারের সময়ও আওয়ামী লীগের আইনজীবীরা সংশিষ্ট বিচারকের প্রতি ন্যায়বিচার না পাওয়ার আশঙ্কা ব্যক্ত করে অনাস্থা আবেদন করেছিলেন। বিচারক তাৎক্ষণিকভাবেই বিচারকাজ থেকে সরে দাঁড়ান। সুনির্দিষ্ট কারণ উল্লেখ করে অনাস্থা দেয়ার পরও বিচারপতি এসকে সিনহা ও বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরী

www.pathagar.com

মানিক আপিল বিভাগে কাদের মোল্লার আপিল শুনানিতে অংশ নেন। পরে আপিলের রায়ে দেখা যায় যে, এই দুজনই কাদের মোল্লার ফাঁসির রায়ের পক্ষে মত দেন। বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের ভাইস চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট খন্দকার মাহবুব হোসেন বলেন, কাদের মোল্লা শুধু ন্যায়বিচার থেকেই বঞ্চিত হননি, হত্যার শিকারে পরিণত হয়েছেন।

মিরপুরের কসাই কাদের আর ফরিদপুরের কাদের মোল্লা এক ব্যক্তি নন- ফদিরপুরের কাদের মোল্লা আর মিরপুরের কসাই কাদের এক ব্যক্তি নন। তথ্য প্রমাণসহ আইনজীবীরা এ দাবি করেন। হাসবে মিরপুরের কসাই কাদের- 'আমি ফরিদপুরের কাদের মোল্লা। সরকার আমাকে প্রহসনের বিচারের মাধ্যমে হত্যা করতে যাচ্ছে। আমার হত্যাকাণ্ডের পর আমি কিয়ামত পর্যন্ত কাঁদতে থাকব। আর হাসবে মিরপুরের কসাই কাদের'। কথাগুলো আব্দুল কাদের মোল্লার। আওয়ামী লীগ নেতা ও সংসদ সদস্য গোলাম মওলা রনির মাধ্যমে জাতির উদ্দেশে দেয়া একটি ছোট্ট চিঠিতে এমন অনুভূতিই প্রকাশ করেছিলেন কাদের মোল্লা। সরকার তাকে মিরপুরের কুখ্যাত কসাই কাদের সাজিয়ে হত্যা করতে যাচ্ছে এমন কথাই বলেছেন তিনি। গোলাম মওলা রনি তার এ চিঠিটি ফেসবুকে ছেড়ে দেয়ার পর বিশ্বের লাখ লাখ মানুষের হৃদয় ছুঁয়ে যায় তা। (সূত্র: দৈনিক আমার দেশ) কাদের মোল্লা আর কসাই কাদের এক ব্যক্তি নন। এমন বক্তব্য দিয়ে মিডিয়ায় ঝড় তুলেছেন আওয়ামী লীগের সাংসদ গোলাম মাওলা রনি। এমন সত্য উপলব্ধির জন্য তাকে সাধুবাদ জনাই।

শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লা ভাইয়ের সাথে অসংখ্য স্মৃতি আজ নাড়া দেয় প্রতিনিয়ত। ২০০৯ সালে আব্দুল কাদের মোল্লা ভাই সৌদির সরকারের রয়েল গেস্ট হিসেবে আর আমি ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি হিসেবে পবিত্র হজ্জ পালন করতে যাই। মোল্লা ভাইয়ের সাথে মদিনায় সাক্ষাৎ। তার সফর ছিল সংক্ষিপ্ত। তাই মদিনায় একটি কমিউনিটি সেন্টারে একটি মতবিনিময় অনুষ্ঠানে মোল্লা ভাই ছিলেন প্রধান অতিথি আর আমি ছিলাম বিশেষ অতিথি। অনুষ্ঠানে আমি যখন সারাদেশে আমাদের ভাইদের ওপর জুলুম-নির্যাতন এবং শহীদ ভাইদের ঘটনা বর্ণনা করছিলাম তখন উপস্থিত সবাই আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়ে। আমি মোল্লা ভাইকে অনেকবার চোখের পানি মুছতে দেখেছি। আলোচনায় তিনি বললেন- "বাংলাদেশে শিবিরের যুবক-তরুণেরা জীবন দিচ্ছে দ্বীনের জন্য। সুতরাং আপনারা শুধু দান-খয়রাত করলে মুক্তি পাবেন না। কারণ আপনারা এমন জায়গায় আছেন যেখানে রাসুল ﷺ শুয়ে আছেন। বদর, উহুদ সব এখানেই। সুতরাং দ্বীনের পথে ত্যাগ-কুরবানী ছাড়া আমাদের মুক্তি মিলবে না।" আজ তিনি নিজেই সারা পৃথিবীর মুসলিম উম্মাহর কাছে একটি প্রেরণা, একটি ইতিহাস, এই দুঃসাহসিক দুর্জয় পথে দূরন্ত সাহস।

www.pathagar.com

শাহাদতের জন্য মোল্লা ভাইয়ের মন কেমন পাগলপারা ছিল এই ঘটনা থেকে তা উপলব্ধি করা যায়। ২০০৬ সালের ২৮ অক্টোবর পল্টন ট্রাজেডি, প্রতি বছরই এই দিবসটি অত্যন্ত মর্যাদার সাথে পালন করা হয়। পৃথিবী যতদিন থাকবে ততদিনই সবাই কাঁদবে আওয়ামী লীগের বৈঠার আঘাতে যারা শহীদ আর গাজী মর্যাদায় ভূষিত হয়েছেন তাদের জন্য। আর খুনিরা কেয়ামত পর্যন্ত মানবতার অভিশাপ পেতে থাকবে। এটাই স্বাভাবিক। খুব সম্ভব ২০০৯ সালের ২৮ অক্টোবর ইঞ্জিনিয়ার ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে ইসলামী ছাত্রশিবির আয়োজন করে আলোচনা সভার। সকল অতিথি বৃন্দের উপস্থিতে আলোচনা সভা শুরু হয়ে গেছে। ঠিক মাঝখানে আমাদের প্রিয় মোল্লা ভাই প্রোগ্রামে এসে হাজির। আমি দাঁড়িয়ে রিসিভ করে বললাম সরি মোল্লা ভাই আপনি আসছেন এজন্য মোবারকবাদ। কারণ মোল্লা ভাই আমাদের দাওয়াতি মেহমানের মধ্যে ছিলেন না। তবু তিনি নিজ উদ্যোগে আলোচনা সভায় হাজির হয়েছেন। বলতে না বলতে তিনি বললেন, শুন ২৮ অক্টোবর ২০০৬ আমি ঐ প্রোগ্রামে অনুপস্থিতির বেদনা আমাকে সব সময় তাড়িয়ে বেড়ায়। পল্টনে আমি উপস্থিত থাকতে পারিনি। যেখানে আমাদের ভাইদের শহীদ আর গাজী হয়েছে। ঐ দিন আমি ঢাকায় ছিলাম; কিন্তু আমীরে জামায়াত আমাদের কেন্দ্রিয় অফিস থেকে সব খোঁজখবর রাখতে বললেন। এই জন্য আমি পল্টনে ছিলাম না। সেদিনের এই অনুপস্থিতির বেদনা থেকে তোমাদের দাওয়াত না পেয়েও বেদাওয়াতে এখানে উপস্থিত হয়েগেলাম। এই কথাগুলো মোল্লা ভাই স্টেইজে বসে বসে বললেন। তখন বুঝতে পারিনি কিন্তু আজ সারা পৃথিবী জানে তিনি কত গভীরভাবে শাহাদাতের চেতনাকে লালন করতেন। মোল্লা ভাইয়ের পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, মোল্লা ভাই আল্লাহর দরবারে তার মৃত্যু যেন বৃহস্পতিবারে হয় তার কামনা করতেন। আর তার নামাজে জানাজা যেন তাহাজ্জুতের সময় হয়। বলুন তো আবেদন শুনে আমার কাছে জটিলই মনে হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা এই প্রিয় বান্দার সেই ফরিয়াদও কবুল করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ। এই সরকার তার ফাঁসি প্রথম দিন ১১ ডিসেম্বর কার্যকর করতে চেয়েছিল; কিন্তু তা আদালতের নির্দেশের কারণেই হয়নি। কিন্তু তার ফাঁসি ১২ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবারই হয়েছে। আল্লাহ তার প্রিয় বান্দার ফরিয়াদ অনুসারে বৃহস্পতিবার রাত ১০.০১ মি: বান্দার ফরিয়াদ কবুল করে শাহাদাতের অমিয় সুধা পান করালেন।

দ্বিতীয়ত জানাজার নামাজ প্রশাসন ফরিদপুরে ৫.০০টার সময় ঠিক করেছে; কিন্তু শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লার কাফিন আগেই পৌছে যাওয়ায় তার নামাজের জানাজা ৪.০০টার সময় অনুষ্ঠিত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা তার প্রিয় বান্দার ফরিয়াদ অনুসারে তাহাজ্জুদের সময়েই তাকে মাবুদের সান্নিধ্যে তুলে নিলেন।

www.pathagar.com

এর মাধ্যমে প্রমাণিত হয় শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লার ভাই সত্যেই শাহাদাতের জন্যই তিনি নিজেকে গড়ে তুলেছেন।

এই জালেম সরকার তার পরিবারকে মোল্লা ভাইয়ের কফিন শেষবারের মত দেখতে সুযোগ দিল না। অংশগ্রহণ করতে দিল না তার জানাজায়। মোল্লা ভাইয়ের ফাঁসির পর পরই তার পরিবার আত্মীয়-স্বজন যখন মগবাজারের বাসা থেকে ফরিদপুরের উদ্দেশ্যে রওয়ানার জন্য বের হয়েছে ঠিক তখনি ছাত্রলীগ, যুবলীগ, পুলিশ একযোগে তাদের বাসার সামনে গাড়ির বহরে হামলা চালিয়ে আহত করে অনেককেই। শুধু তাই নয় পুলিশ আহতদের উল্টো গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে যায়। এভাবে চলতে থাকে গভীর রাত পর্যন্ত। এতে শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লা ভাইয়ের স্ত্রী, সন্তান, আত্মীয়-স্বজন কেউ-ই শেষ বারের মত আর তাকে দেখতে পেল না। মানুষ কত নিষ্ঠুর, কত পাষান, কতটুকু পশুর মত হলে এমন আচরণ করতে পারে? কিন্তু এমন অবস্থায়ও মোল্লা ভাইয়ের সহধর্মীনীর ধৈর্য্য আমাকে হতবাক বানিয়ে দিল! বাসায় হামলার ঐ মুহূর্তে আমি ফোন দিলাম ভাবীকে উনারা ফরিদপুরে যাবেন কি-না, কারণ গাড়ি তদারকির দায়িত্ব আমার ছিল। উত্তরে অবিচল স্বাভাবিক কণ্ঠে আমাকে বললেন, এই পরিস্থিতি আমি ছোট বাচ্চা, ছেলেমেয়েদের নিয়ে নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে যাবো কিভাবে? যরা আমাদের নিরাপত্তা দেয়ার কথা বলেছে তারা আমাদের ওপর হামলা করছে। যাকে আল্লাহ কবুল করার সেতো চলে গেছে এখন আর যেয়ে কি হবে? তিনি স্বাভাবিক কণ্ঠে এই কথাগুলো বলছেন আর আমি চোখের পানি মুছতেছি। আর ভাবছি আল্লাহ যাকে ধৈর্য দান করে শুধু তারাই ধৈর্য্যধারণ করতে পারে। নচেত এমতাবস্থায় সবর করা কঠিন নয় কি?

সত্যিই, জনাব আব্দূল কাদের মোল্লাসহ আল্লাহর দ্বীনের মুজাহিদদের ঈমানী দৃঢ়তা দ্বীনের পথিকদেরকে উৎসাহিত করছে। জনাব আব্দুল কাদের মোল্লা ভাইয়ের মৃত্যু পরওয়ানা জারি করার পরও কিন্তু দ্বীনের এই মুজাহিদকে এতটুকু হতাশাও আচ্ছন্ন করতে পারেনি, আলহামদুলিল্লাহ। এই জাতীয় সাহসী বীর মুজাহিদ এখন মাওলানা মওদুদী, সাইযেদ কুতুব, আর হাসান আল বান্নার কাতারে দণ্ডায়মান। দ্বীনের পথে সংগ্রামরত বিশ্বের অসংখ্য মুজাহিদের জন্য এগিয়ে যাবার প্রেরণা। শাহাদাতের রাতে ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারের জনাব আবদুল কাদের মোল্লা তার স্ত্রী পুত্র, মেয়ের কাছ থেকে এভাবেই শেষ বিদায় নিয়েছিলেন, ”আমি তোমাদের অভিভাবক ছিলাম। এ সরকার যদি আমাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে, তাহলে সেটা হবে আমার শাহাদাতের মৃত্যু। আমার শাহাদাতের পর মহান রাব্বুল আলামীন তোমাদের অভিভাবক হবেন। তিনিই উত্তম অভিভাবক। সুতরাং তোমাদের দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই। ইসলামী

www.pathagar.com

আন্দোলনকে বিজয়ী করার মাধ্যমে আমার হত্যার প্রতিশোধ নিও। শুধুমাত্র ইসলামী আন্দোলন করার অপরাধেই আমাকে হত্যা করা হচ্ছে। শাহাদাতের মৃত্যু সকলের নসিবে হয় না। আল্লাহতায়ালা যাকে শহীদী মৃত্যু দেন সে সৌভাগ্যবান। আমি শহীদী মৃত্যুর অধিকারী হলে তা হবে আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি। আমার প্রতিটি রক্তকণিকা ইসলামী আন্দোলনকে বেগবান করবে ও জালেমের ধ্বংস ডেকে আনবে। আমি নিজের জন্য চিন্তিত নই। আমি দেশের ভবিষ্যৎ ও ইসলামী আন্দোলন নিয়ে চিন্তিত। আমি আমার জানামতে কোন অন্যায় করিনি।

পরিবারের সদস্যদের তিনি আরও বলেন, তোমরা ধৈর্যের পরিচয় দেবে। একমাত্র ধৈর্য ও সহনশীলতার মাধ্যমেই আল্লাহ তায়ালার ঘোষিত পুরস্কার পাওয়া সম্ভব। দুনিয়া নয়, আখেরাতের মুক্তিই আমার কাম্য। আমি দেশবাসীর কাছে আমার শাহাদত কবুলিয়াতের জন্য দোয়া চাই। দেশবাসীর কাছে আমার সালাম পৌঁছে দিও। বিদায়বেলায় স্ত্রীর সঙ্গে শেষ কথা বলেন তিনি, 'ধৈর্য ধরো, আল্লাহর ওপর ভরসা রেখো। তোমার হক যথাযথভাবে আদায় করতে পারিনি বলে ক্ষমা করে দিও।' প্রতিউত্তরে স্ত্রী বলেছেন- 'দীর্ঘদিন কারাবন্দি থাকায় আপনার সেবা করতে পারিনি। বিদায় বেলায়ও পাশে থাকতে পারছি না। জীবন চলার পথে ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় কোন অন্যায় হয়ে থাকলে মাফ করে দিবেন।' এ সময় খানিকটা আবেগঘন পরিবেশের সৃষ্টি হলেও কাদের মোল্লা ছিলেন দৃঢ়, অবিচল" এই দৃঢ়চিত্ততা কেবল আল্লাহর ওপর ভরসাকারী ঈমানদারগণই দেখাতে পারেন। কারণ তারা জান্নাতের মিনিময়ে দুনিয়ার সব বিসর্জন দিতে পারে অত্যান্ত ঠাণ্ডা মাথায়। হযরত উম্মে হারেসা বিনতে সারাকা থেকে বর্ণিত, "তিনি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে এসে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি কি হারেসা সম্পর্কে কিছু বলবেন না? জঙ্গে বদরের পূর্বে একটি অজ্ঞাত তীর এসে তাঁর শরীরে বিধে যায় এবং তিনি শহীদ হন। যদি তিনি জান্নাতবাসী হয়ে থাকেন তাহলে আমি সবর করবো, অন্যথায় প্রাণ ভরে কাঁদব। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দিলেন, হারেসার মা, বেহেশতে তো অনেক বেহেশতবাসীই রয়েছেন, তোমার ছেলে তো সেরা ফেরদাউসে রয়েছেন।"

মামলার ধারাক্রম

দুটি মামলায় আগাম জামিন নিয়ে ফিরে আসার সময় আদালতের নির্দেশনা উপক্ষো করে ২০১০ সালের ১৩ জুলাই হাইকোর্টের প্রধান গেট থেকে শহীদ আবদুল কাদের মোল্লাকে পুলিশ গ্রেফতার করে। ট্রাইব্যুনালে তদন্তকারী সংস্থার এক আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ওই বছরের ২ আগস্ট কাদের মোল্লাকে মানবতাবিরোধী অপরাধ মামলায় আটক রাখার আদেশ দেয়া হয়।

www.pathagar.com

২০১২ সালের ৭ মার্চ আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১-এ কাদের মোল্লার বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের শুনানি শুরু হয়। এরপর ২০১২ সালের ২৫ মার্চ দ্বিতীয় ট্রাইব্যুনাল গঠনের পর এ মামলাটি সেখানে স্থানান্তর করা হয়।

২০১২ সালের গত ২৮ মে কাদের মোল্লার বিরুদ্ধে ছয়টি অভিযোগের ঘটনায় চার্জ গঠন করে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২। ৩ জুলাই কাদের মোল্লার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য গ্রহণ শুরু হয়। রাষ্ট্রপক্ষে ১২ জন এবং আসামী পক্ষে ছয় জন সাক্ষী সাক্ষ্য প্রদান করে।

২০১৩ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি আব্দুল কাদের মোল্লাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রদান করে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২।

২০১৩ সালের ৩১ মার্চ প্রধান বিচারপতি মোঃ মোজাম্মেল হোসেন-এর নেতৃত্বে ছয় সদস্যের আপিল বেঞ্চ গঠন করা হয় আপিল আবেদন শুনানীর জন্য। ১ এপ্রিল থেকে শুনানী শুরু হয়।

১৭ সেপ্টেম্বর সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগ যাবজ্জীবন সাজা বাড়িয়ে মৃত্যুদণ্ড দেয় কাদের মোল্লাকে। ৫ ডিসেম্বর আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশিত হয়। ৮ ডিসেম্বর ট্রাইব্যুনাল তার বিরুদ্ধে মৃত্যু পরোয়ানা জারি করে। এরপরই শুরু হয়ে যায় ফাঁসি কার্যকরের প্রস্তুতি।

শাহবাগী আন্দোলন ও আইনের পরিবর্তন

২০১৩ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি সরকার গঠিত ট্রাইব্যুনাল থেকে সাজানো অভিযোগে শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লার বিরুদ্ধে যাবজ্জীবন সাজার রায় দেয়া হয়। সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় এ রায়কে কেন্দ্র করে শাহবাগকেন্দ্রিক নাস্তিক ব্লগারদের আন্দোলন গড়ে ওঠে। আন্দোলনকারীদের দাবী আব্দুল কাদের মোল্লাকে ফাঁসি দিতে হবে। এ জন্য সরকারের সহযোগিতায় দিনের পর দিন শাহবাগের মতো গুরুত্বপূর্ণ সড়ক বন্ধ করে আন্দোলনের নামে চলে উম্মত্ততা। ইসলাম, ইসলামী প্রতিষ্ঠান ও ইসলামী ব্যক্তিত্ব ও গণমাধ্যমের বিরুদ্ধে চলে বিষোধগার। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী শাহবাগের সমাবেশের দাবি বিবেচনায় নিয়ে রায় দেয়ার জন্য বিচারপতিদের প্রতি আহ্বান জানান। তারই ধারাবাহিকতায় সরকার পক্ষের জন্য আপিলের বিধান রেখে ১৮ ফেব্রুয়ারি ট্রাইব্যুনাল আইন সংশোধন করা হয়। শুধুমাত্র আব্দুল কাদের মোল্লাকে হত্যার জন্যই এ আইন ভুতাপেক্ষা কার্যকর দেখানো হয়। আইন সংশোধনের পর সরকার আব্দুল কাদের মোল্লার সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড দাবি করে আপিল আবেদন করে।

ট্রাইব্যুনাল আইনে পূর্বের বিধান ছিল আসামী পক্ষ সাজার বিরুদ্ধে আপিল করতে পারবে। আসামীর সাজা হলে রাষ্ট্রপক্ষের জন্য আপিলের বিধান ছিল না। ১৮ ফেব্রুয়ারি আইন সংশোধন করে উভয় পক্ষকে আপিলের সমান সুযোগ দেয়া

www.pathagar.com

হয় এবং আইনের সংশোধনীকে ২০০৯ সাল থেকে কার্যকারিতা প্রদান করা হয়। তার মানে এই আইনের মূল উদ্দেশ্যই ছিল আব্দুল কাদের মোল্লাকে হত্যা করা?

ট্রাইব্যুনালে শহীদ আবদুল কাদের মোল্লা

অভিযোগ গঠনের সময় ট্রাইব্যুনালে কথা বলতে চেয়েছিলেন শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লা। তিনি একটি বক্তব্যও লিখে এনেছিলেন। যদিও ট্রাইব্যুনালে তাকে সেই বক্তব্য দেয়ার সুযোগ দেয়নি। পরবর্তীতে পরিবারের মাধ্যমে তার লিখিত বক্তব্যের কপি পাওয়া যায়।

তিনি বলেন, আমার ব্যাপারে রাষ্ট্রপক্ষ এই আদালতে যেসব অসত্য ও বানোয়াট অভিযোগ উত্থাপন কারেছেন- সে ব্যাপারে আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ এবং অনবহিত। কারণ ঐ সময়ে আমি ঢাকাতেই ছিলাম না। মরহুম শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণের মাধ্যমে চূড়ান্তভাবে অসহযোগ আন্দোলন ঘোষিত হওয়ার পর সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যায়। আমি তখন শহীদুল্লাহ হলের ছাত্র। আমাদের গ্রুপে প্রাকটিক্যাল পরীক্ষা চলছিল। কিন্তু পরীক্ষা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর তৎকালীন পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের শ্রদ্ধেয় চেয়ারম্যান আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক ডঃ মুহাম্মদ ইন্নাস আলীর পরামর্শে আমি আমার গ্রামের বাড়ী (গ্রাম আমিরাবাদ, থানা সদরপুর, জেলা– ফরিদপুরে) চলে যাই। পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যানের পরামর্শে ডাক ও টেলিগ্রামের ঠিকানা রেখে যাই।

খুব সম্ভব জুলাই মাসের মাঝামাঝি Physics Dept. থেকে একই সাথে ডাকবিভাগ ও টেলিগ্রাম বিভাগ থেকে প্রাকটিক্যাল পরীক্ষা দেওয়ার নির্দেশ পেয়ে জুলাই মাসের শেষের দিকে সদরপুর থেকে লঞ্চযোগে ঢাকায় এসে পরীক্ষা দিয়ে সম্ভবত আগস্ট মাসের শেষের দিকে আবার গ্রামের বাড়ীতে চলে যাই। আমি যেখানে আমার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগের সময় ঢাকায় ছিলাম না, সুতারাং ঐসব অভিযোগের সাথে জড়িত থাকার প্রশ্নই উঠে না।

ঐ সময়ে আমার গ্রামের এলাকার প্রবীণ ও বয়স্ক সকল মানুষ যেহেতু মৃত্যুবরণ করেননি, এখনও অন্তত কয়েকশত লোক জীবত আছেন। তাদের কাছে জানতে চাইলে এবং স্বাভাবিক ভাবে তদন্ত করলে আমার অবস্থান সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানতে কোন অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। এখন তৎকালীন শহিদুল্লাহ হলের প্রভোস্ট, সিনিয়র হাউস টিউটর ইসলামী ছাত্রসংঘ ছাড়া ছাত্রইউনিয়ন ও ছাত্রলীগের তৎকালীন কমপক্ষে ডজন খানেক ছাত্র নেতার নামও বলেছি- তারা আমার ঐ সময়ে অবস্থানের ব্যাপারে জানেন। তদন্ত কর্মকর্তাদের অনুরোধ করছি ঐ সমস্ত ব্যক্তিদের কাছে, আমার গ্রামের এলাকায় জাতি-ধর্ম ও দলমত নির্বিশেষে প্রবীণ ব্যক্তিদের নিকট খোঁজ খবর নিতে।

www.pathagar.com

আমার বিরুদ্ধে আন্দাজ-অনুমানে শুধুমাত্র রাজনৈতিক প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে মিথ্যা অভিযোগ এনে রাষ্ট্রপক্ষ সচেতন ভাবেই একটি বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে অসৎ এবং অন্যায় কাজ করেছেন। যা রাজনৈতিক হিংসা চরিতার্থ করার একটি জঘন্য অপকৌশল।

রায় শোনার পরে ট্রাইব্যুনালে শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লা 'আল্লাহু আকবার' বলে দাঁড়িয়ে পড়েন ও বলেন, আমি এই রায় মানি না। এ রায় অন্যায় হয়েছে। আমার বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ আনা হয়েছে সে সময় আমি ঢাকায় ছিলাম না। বিচারপতিরা জল্লাদের মতো আমার বিরুদ্ধে রায় দিয়েছেন। তারা আমার সঙ্গে জল্লাদের মতো আচরণ করেছেন। আমি মহান আল্লাহ তায়ালা ও বিশ্ব মানবতার কাছে বিচার দিচ্ছি।"

তিনি আরো বলেন, 'আমি পবিত্র কুরআন হাতে নিয়ে বলছি এ ঘটনার সাথে আমি যুক্ত নই। যে সমস্ত অভিযোগে আমাকে সাজা ও খালাস দেয়া হয়েছে তার কোনটার তার সাথে আমার দূরতম সম্পর্কও নেই। আমি কেয়ামতের দিন আল্লাহর দরবারে এই বিচারকদের বিরুদ্ধে মামলা করবো। তখন তাদের মুখে কথা বলার কোনো শক্তি থাকবে না। সেদিন এদের হাত পা কথা বলবে।"

সেইফ হোমে শহীদ আবদুল কাদের মোল্লা

সেইফ হোমে জিজ্ঞাসাবাদেও '৭১ সালে তার ভূমিকা নিয়ে যা বললেন তিনি- "২৩ মার্চ, ১৯৭১ ওই দিন আমরা ১২ টার সময় জেসিও সম্ভবত উনার নাম ছিল মফিজুর রহমানের ডাকে আমরা বেশ কিছু বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজ পড়ুয়া ছাত্র এবং স্কুলের উচ্চ শ্রেণির কয়েকজন ছাত্র একত্রিত হই। মফিজুর রহমান সাহেব আমাদেরকে বললেন, তিনি বিকাল থেকেই আমাদেরকে মুক্তিযুদ্ধের ট্রেনিং দেবেন এবং সেই লক্ষ্যে তিনি কিছু কাঠের তৈরি ডামি রাইফেল জোগাড় করেছেন। তিনি আরো বললেন, রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান হবে বলে মনে হয় না। তাই আমাদেরকে এখন থেকেই প্রস্তুতি নিতে হবে। আমরা ওইদিন বিকালে তার পরামর্শ মতো ৩০/৪০ জন একত্রিত হই। তিনি প্রাথমিক পরীক্ষা নেয়ার পর ২/১ জন বাদে প্রায় সবাই প্রশিক্ষণ নেবার জন্য মনোনীত করেন এবং ঐদিন থেকেই আমরা পিটি, প্যারেড শুরু করি। তিনি প্রথম তিন দিন আমাদেরকে দামি রাইফেল দেননি। পরে ২০/২১টি দামি রাইফেল আমাদেরকে দেন এবং এই রাইফেলগুলো দিয়েই আমরা প্রশিক্ষণ চালিয়ে যেতে থাকি।"

রিভিউ আবেদন নিয়ে বাদানুবাদ

রিভিউ আবেদনের বিষয়ে শুনানিতে রাষ্ট্রপক্ষে অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম বলেন, ট্রাইব্যুনাল আইনে রিভিউ আবেদন করার কোনো সুযোগ নেই। এটি একটি বিশেষ আইন এবং বিশেষ আদালত। সংবিধানের ৪৭ ক (২) অনুচ্ছেদে

www.pathagar.com

বলা হয়েছে 'এই সংবিধানে যাহা বলা হাইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও যে ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই সংবিধানের ৪৭ অনুচ্ছেদের (৩) দফায় বর্ণিত কোন আইন প্রযোজ্য হয়, এই সংবিধানের অধীন কোন প্রতিকারের জন্য সুপ্রীম কোর্টে আবেদন করিবার কোন অধিকার সেই ব্যক্তির থাকিবে না।' তাই রিভিউ আবেদন চলতে পারে না বলে তিনি যুক্তি তুলে ধরেন।

অপরদিকে আব্দুল কাদের মোল্লার প্রধান আইনজীবী ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাক বলেন, সংবিধানের ১০৫ ধারায় বলা হয়েছে 'সংসদের যেকোন আইনের বিধানাবলির-সাপেক্ষে এবং আপিল বিভাগ কর্তৃক যেকোন বিধি-সাপেক্ষে আপিল বিভাগের ঘোষিত কোন রায় বা প্রদত্ত আদেশ পুনর্বিবেচনা করার ক্ষমতা উক্ত বিভাগের থাকিবে।' তা ছাড়া কাদের মোল্লার ক্ষেত্রে জেল কোড প্রয়োগেরও আবেদন করে আসামিপক্ষ। এ বিষয়ে ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাক বলেন, কাদের মোল্লাকে জেলকোডের বিধান মেনেই এত দিন জেলে রাখা হয়েছে। দণ্ড কার্যকরের ক্ষেত্রে কেন প্রয়োগ করা হবে না?

১১ ডিসেম্বর সকালে প্রধান বিচারপতি মো: মোজাম্মেল হোসেনের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের আপিল বেঞ্চে শুরু হয় রিভিউ আবেদনের শুনানি। এ ছাড়া আসামিপক্ষ স্থগিতাদেশের মেয়াদ বাড়ানোরও আবেদন করে। রিভিউ আবেদন চলবে কি চলবে না এ বিষয়ে ১১ ডিসেম্বর শুনানি শেষে ১২ ডিসেম্বর পর্যন্ত মুলতবি করায় ফাঁসি স্থগিতাদেশও বহাল থাকে ১২ ডিসেম্বর পর্যন্ত। ১২ ডিসেম্বর সকালে আবার শুরু হয় রিভিউ আবেদনের ওপর শুনানি। শুনানি শেষে ১২টা ৭ মিনিটে প্রধান বিচারপতি ঘোষণা করেন আবেদন ডিসমিসড।

শহীদ আবদুল কাদের মোল্লার মেয়ের স্মৃতিচারণ

'নেই উদ্বেগ দু:খ আর হতাশার ছাপ'

শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লার মেয়ে আমাতুল্লাহ পারভীন ও আমাতুল্লাহ শারমিন কারাগারে শেষ সাক্ষাত নিয়ে স্মৃতিচারণ করে এক লেখায় বলেন, কনডেম সেলে কোন উদ্বেগ নেই, নেই প্রাণনাশের চিন্তা, চোখে-মুখে নেই কোন দুঃখ-হতাশার ছাপ। কি প্রশান্ত তিনি মহান রবের সান্নিধ্যের প্রত্যাশায়!! তার পরিবার-আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব ও শুভাকাঙ্ক্ষীরা যখন ফাঁসির আদেশে অস্থির হয়ে পড়লো, তখন তিনি সকলকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "মৃত্যুর ফয়সালা আসমানে হয়, জমিনে নয়।" কি দৃঢ় প্রত্যয়, কি অটুট মনোবল। সংগঠনের কর্মীদের উদ্দেশ্যে তিনি বললেন, "আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার মাধ্যম ইসলামী আন্দোলনের কর্মীরা যেন আমার রক্তের বদলা নেয়।"

www.pathagar.com

মহান রবের উদ্দেশ্যে যাত্রা; গভীর রাতে দাফন;
পরিবারকে লাশ পর্যন্ত দেখতে দেয়া হয়নি

১২ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ১০টা ১ মিনিটে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে ফাঁসির নামে হত্যা করা হয় শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লার। গত বছরের ১২ ডিসেম্বর সকালে রিভিউ আবেদন খারিজের পর রাতেই কার্যকর করা হলো তার ফাঁসি। জাতিসঙ্ঘসহ বিশ্ব সম্প্রদায়ের সব অনুরোধ এবং আপত্তি উপেক্ষা করে সরকার আব্দুল কাদের মোল্লার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করে। সবাইকে শোকের সাগরে ভাসিয়ে আল্লাহর দ্বীনের মর্দে মুজাহিদ পাড়ি জমান তার প্রিয় মাবুদের দরবারে। রাতেই তার লাশ নিয়ে যাওয়া হয় ফরিদপুর জেলার সদরপুর উপজেলায়। লাশ পৌঁছার আগেই আইনশৃঙ্খলা বাহিনী কবর খুড়ে রাখে। রাত তিনটায় আমিরাবাদ গ্রামে লাশ পৌঁছার পর গভীর রাতেই আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কঠোর নজরদারির মধ্যে এবং তাদের তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হয় জানাজা নামাজ। রাত ৩টা ৫৭ মিনিটে জানাজার পরপরই আইনশৃঙ্খলা বাহিনী লাশ দাফনের ব্যবস্থা করে। ফাঁসির পর লাশ নিয়ে রওয়ানার খবর পেয়েই রাতের শীত উপেক্ষা করে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে লোকজন ছুটতে থাকে আমিরাবাদের দিকে। কিন্তু সমস্ত রাস্তায় পুলিশ প্রহরা বসিয়ে তাদের আটকে দেয়া হয়।

লাশের সাথে ফরিদপুর যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছিল তার পরিবারের সদস্যরা। তার ছোট ছেলে হাসান মওদুদ আর্ন্তজাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় মালয়েশিয়ার ছাত্র শুধুমাত্র তার পিতাকে দেখার জন্য সেখান থেকে ছুটে এসেছিলেন। পরিবারের অন্যান্য সদস্যরাও মগবাজারস্থ বাসায় জড়ো হন ফরিদপুর যাওয়ার উদ্দেশ্যে।

সরকার তাকে ফাঁসি দিয়েই শেষ করেনি, তার পরিবারের সদস্যরা যেন নামাজে জানাযায় অংশ নিতে না পারে সে জন্য রাত সাড়ে ১০টার দিকে মগবাজারের বাসায় হামলা চালায় সরকার দলীয় সন্ত্রাসীরা। পুলিশের উপস্থিতিতেই সন্ত্রাসীরা হাসান মওদুদকে গুরুতর আহত করে। কিন্তু পুলিশ উল্টো কাদের মোল্লার পরিবারের ১৬ সদস্যকে ধরে থানায় নিয়ে যায়। গভীর রাতে তাদেরকে থানা থেকে ছেড়ে দেয়া হয়, তখন তাদের আর ফরিদপুর যাওয়ার সময় ছিল না। অংশ নিতে পারেনি জানাজা এবং দাফনের কাজে। ছেলে- মেয়েরা শেষ বারের মতও দেখতে পারেনি পিতার লাশ।

এর আগে শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লার স্ত্রী বেগম সানোয়ার জাহানকে মগবাজারস্থ বাসা থেকে গ্রেফতার করা হয়। ২০১০ সালে আব্দুল কাদের মোল্লাকে গ্রেফতারের পর আদালতে তার সাথে দেখা করতে গেলে তার সন্তান, জামাতাদের গ্রেফতার করে এই জালিম সরকার।

www.pathagar.com

'একদিন তোমার গলায়ও উঠতে পারে দড়ি'

রাজধানীসহ দেশের আনাচে কানাচে শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লার গায়েবানা জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া বিশ্বের ৪০টি দেশে শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লার গায়েবানা জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। শুধুমাত্র তুরস্কেই ৮০টিরও বেশি জায়গায় জানাজা অনুষ্ঠিত হয় যা বিশ্বের ইতিহাসে একটি ব্যতিক্রম ঘটনা।

আবদুল কাদের মোল্লার উদ্দেশ্যে অধ্যাপক গোলাম আযম– 'একদিন তোমার গলায়ও উঠতে পারে দড়ি'

তখন আমার ছাত্র জীবন। একিদন মিশরের ইখওয়ানুল মুসলিমিন বা মুসলিম ব্রাদারহুড নেতা সাইয়্যেদ মোহাম্মদ কুতুব শহীদের শাহাদাতের ঘটনা বর্ণনা করছিলেন অধ্যাপক গোলাম আযম। বর্ণনার সময় এক পর্যায়ে অধ্যাপক গোলাম আযম আমার গলায় হাত রেখে বলেছিলেন একদিন তোমার গলায়ও উঠতে পারে এ দড়ি। ২০১৩ সালের ১০ ডিসেম্বর মঙ্গলবার সকালে আব্দুল কাদের মোল্লার সাথে তার আইনজীবী দেখা করতে গেলে তাদেরকে তিনি এ ঘটনার কথা বলেন।

শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লার দেশ ও জাতির উদ্দেশ্যে শেষ বক্তব্য-'শাহাদাতের রক্ত পিচ্ছিল পথ ধরে অবশ্যই ইসলামের বিজয় আসবে'

১২ ডিসেম্বর সন্ধ্যার পর ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে পরিবারের সদস্যরা আব্দুল কাদের মোল্লার সাথে সর্বশেষ সাক্ষাৎ করেন। এ সময় তিনি বলেন, "আমার শাহাদাতের পর যেন ইসলামী আন্দোলনের কর্মীরা চরম ধৈর্য ও সহনশীলতার পরিচয় দিয়ে আমার রক্তকে ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য কাজে লাগায়। কোন ধরনের ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডে যেন জনশক্তি নিয়োজিত না হয়। যারা আমার জন্য আন্দোলন করতে গিয়ে জীবন দিয়েছে আমি তাদের শাহাদাত কবুলিয়াতের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করি এবং তাদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করি। আল্লাহ তাদেরকে সর্বত্তোম পুরুস্কার দান করুন।"

তিনি আরো বলেন, "আমি পূর্বেই বলেছি, সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে এ সরকার আমাকে হত্যা করতে চাচ্ছে। আমি মজলুম। আমার অপরাধ আমি ইসলামী আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছি। শুধুমাত্র এ কারণেই এ সরকার আমাকে হত্যা করছে। আমি আল্লাহ্, রাসূল ও কোরআন ও সুন্নাহ্তে বিশ্বাসী। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি আমার এ মৃত্যু হবে শহীদি মৃত্যু। আর শহীদের স্থান জান্নাত ছাড়া আর কিছু নয়। আল্লাহ আমাকে শাহাদাতের মৃত্যু দিলে এটা হবে আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ট পাওয়া। এর জন্য আমি গর্বিত।

আমি বিশ্বাস করি, জীবন-মৃত্যুর মালিক আল্লাহ। আমাকে ১০ তারিখ রাতেই সরকার হত্যা করতে চেয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ্ তায়ালা সেদিন আমার মৃত্যু

www.pathagar.com

নির্ধারণ করেননি। যেদিন আল্লাহর ফায়সালা হবে সেদিনই আমার মৃত্যু হবে। প্রত্যেক প্রাণীরই মৃত্যু আছে। আমাকেও মরতে হবে। শহীদি মৃত্যুর চাইতে বড় সৌভাগ্য আর কিছু নয়। আজীবন আমি সে মৃত্যু কামনা করেছি, আজও করছি।

আমার অনুরোধ, আমার শাহাদাতের পর ইসলামী আন্দোলনের কর্মীরা যেন ধৈর্য ও সহনশীলতার পরিচয় দেয়। তারা যেন কোন ধরনের ধ্বংসাত্মক বা প্রতিহিংসাপরায়ণ কর্মকাণ্ডে লিপ্ত না হয়। ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের কাছে এটাই আমার আহ্বান। আমি ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলছি, শাহাদাতের রক্তপিচ্ছিল পথ ধরে অবশ্যই ইসলামের বিজয় আসবে। আল্লাহ যাদেরকে সাহায্য করেন তাদেরকে কেউ দাবিয়ে রাখতে পারে না। ওরা আব্দুল কাদের মোল্লাকে হত্যা করে ইসলামী আন্দোলনের অগ্রযাত্রা ব্যাহত করতে চায়। আমি বিশ্বাস করি, আমার প্রতিফোঁটা রক্ত ইসলামী আন্দোলনের অগ্রযাত্রাকে তীব্র থেকে তীব্রতর করবে এবং জালেম সরকারের পতন ডেকে আনবে। আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে যেন ইসলামী আন্দোলনের কর্মীরা আমার রক্তের বদলা নেয়।"

তিনি তার স্ত্রীর উদ্দেশ্যে বলেন, "আমি পরিবারের অভিভাবক ছিলাম। আমার পরে আল্লাহ্ আমার পরিবারের অভিভাবক হবেন। তুমি পরিবারকে দেখাশোনা করবে মাত্র। আল্লাহর কাছে আমি দোয়া করি, তোমার এই দায়িত্ব পালন শেষ হওয়ার পরই যেন আল্লাহ্ তায়ালা তোমাকে আমার কাছে নিয়ে আসেন।"

আব্দুল কাদের মোল্লা ইসলামী আন্দোলনের কর্মী ও দেশবাসীর প্রতি সালাম জানান। তিনি আরো বলেন, "খবরে দেখেছি ১০ বছরের শিশুদেরকে হত্যা করা হয়েছে। ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের রক্তে ভাসছে দেশ। এই রক্তের বদলা অবশ্যই আল্লাহ দিবেন। আমি মোটেই বিচলিত নই। আমি দেশবাসীর দোয়া চাই। আমার জীবনের বিনিময়ে যেন ইসলামী আন্দোলন, দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্বকে আল্লাহ হেফাজত করেন। মহান আল্লাহর কাছে এটাই আমার কামনা।"

আব্দুল কাদের মোল্লা পরিবারের সদস্যদের বলেন, "আমি তোমাদের অভিভাবক ছিলাম। এ সরকার যদি আমাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে, তাহলে সেটা হবে আমার শাহাদাতের মৃত্যু। আমার শাহাদাতের পর মহান রাব্বুল আলামীন তোমাদের অভিভাবক হবেন। তিনিই উত্তম অভিভাবক। সুতরাং তোমাদের দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই।

www.pathagar.com

রিভিউর সুযোগ থেকেও বঞ্চিত শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লা : ন্যায়বিচার নিয়ে প্রশ্ন

আব্দুল কাদের মোল্লা সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের রায় পুনর্বিবেচনার (রিভিউর) সুযোগ পাননি। রিভিউর সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন শিক্ষা জীবনে মেধার স্বাক্ষর রাখা এই রাজনীতিবিদ। সংক্ষিপ্ত আদেশে তার করা রিভিউ আবেদন গ্রহণযোগ্য (মেইনটেনেবল) নয় বলা হলেও পূর্ণাঙ্গ রায়ে আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) ১৯৭৩ সালের আইনের মামলায় দণ্ডিতদের এই সুযোগ দিয়েছেন সর্বোচ্চ আদালত। ৫ ডিসেম্বর তার আপিলের প্রকাশিত পূর্ণাঙ্গ রায়ের প্রেক্ষিতে তিনি আরো ১৫ দিন পর রিভিউ দাখিলের সুযোগ পেতেন। তার আগেই ১২ ডিসেম্বর তরিঘরি করে তাকে হত্যা করা হয়। গত ২৪ নভেম্বর আব্দুল কাদের মোল্লার করা রিভিউর পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশ হয়। ফাঁসি কার্যকরের ৩৪৮ দিন পর রিভিউ আবেদনের পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশিত হয়। তার রিভিউর পূর্ণাঙ্গ রায়ে বলা হয়েছে, ১৯৭৩ সালের আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইনে দণ্ডিতদের ক্ষেত্রেও আপিলের রায়ের বিরুদ্ধে রিভিউ আবেদন গ্রহণযোগ্য (মেনটেইনেবল) হবে। সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের রুলস অনুযায়ী রিভিউয়ের জন্য ৩০ দিন সময় দেয়া হলেও এ আইনে আপিলের রিভিউয়ের সময় হবে ১৫ দিন; কিন্তু আব্দুল কাদের মোল্লাকে ১৫ দিন সময় না দিয়ে কেন তড়িঘড়ি করে ফাঁসি কার্যকর করা হলো? বাংলাদেশের জনগণ ও বিশ্ববাসীর নিকট এ এক বিশাল প্রশ্ন।

আব্দুল কাদের মোল্লার মামলায় আপিল বিভাগের রায়ের পর থেকেই রিভিউ করা যাবে না বা সুযোগ নেই বলে সরকারের সর্বোচ্চ আইন কর্মকর্তা এটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম মত দিয়েছিলেন। ডিফেন্সপক্ষ রিভিউকে সাংবিধানিক অধিকার উল্লেখ করে আসছিল।

২৪ নভেম্বর প্রকাশিত রিভিউর পূর্ণাঙ্গ রায়টি লিখেন আপিল বিভাগের জ্যেষ্ঠ বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহা (এস কে সিনহা)। তার সঙ্গে একমত পোষণ করেছেন প্রধান বিচারপতি মো. মোজাম্মেল হোসেন ও বেঞ্চের অপর তিন বিচারপতি মো. আবদুল ওয়াহহ্াব মিয়া, বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেন এবং বিচারপতি এএইচএম শামসুদ্দিন চৌধুরী।

বিশ্বজনমতের প্রতিক্রিয়া

আব্দুল কাদের মোল্লার বিচারিক প্রক্রিয়া, রায় এবং রায় পরবর্তী কার্যক্রমকে গোটা বিশ্ব অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে পর্যবেক্ষণ করে।

www.pathagar.com

জাতিসংঘ মহাসচিবের বিবৃতি

১৬ ডিসেম্বর ২০১৩ তারিখে দেয়া বিবৃতিতে জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি মুন শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লার শাহাদাতের ঘটনায় দু:খ প্রকাশ করেন। মহাসচিব অফিসের মুখপাত্র মার্টিন নেসিরকি তার সাপ্তাহিক ব্রিফিং-এ জানান, মহাসচিব এই কার্যকরের বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত আছেন এবং তিনি এই জন্য দুঃখিত। এই ধরনের ফাঁসি কার্যকরকে নিরুৎসাহিত করে জাতিসংঘ মহাসচিব সকল পক্ষকে ধৈর্য ও সংযম দেখানোর আহ্বান জানিয়েছেন। জাতিসংঘ সব ধরনের মৃত্যুদণ্ডাদেশের বিরোধী উল্লেখ করে বান কি মুন সহিংসতা পরিহার করার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী

২০১৩ সালের ১২ ডিসেম্বর প্রকাশিত ডেইলী স্টারের একটি প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জন কেরি শেখ হাসিনাকে টেলিফোন করে বাংলাদেশের বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে আলোচনা করেন। বিশেষ করে, মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এই সময় কাদের মোল্লার ফাঁসি কার্যকর নিয়ে আলোচনা করে। এই রায় বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশে সহিংসতা বাড়তে পারে এমন আশংকার কথাও জানান মার্কিন মন্ত্রী। আন্তর্জাতিক মান বজায় রেখে বিচার করা সম্ভব না হলে এই ধরনের কার্যক্রম এড়ানোরও পরামর্শ দেন জন কেরি।

স্টিফেন জে র‍্যাপ

আপিল বিভাগের রায়ের পর মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের যুদ্ধাপরাধ ও বৈশ্বিক অপরাধের বিচারবিষয়ক বিভাগের বিশেষ দূত স্টিফেন জে র‍্যাপ বলেন, শুরু থেকেই আমি ন্যায়বিচারের যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণের মাধ্যমে বিচার সম্পন্ন করার বিষয়টিতে গুরুত্ব দিয়ে আসছি। বিবাদীর অধিকার সুনিশ্চিত না হলে আর এ ধরনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মামলায় আন্তর্জাতিক মানের বাইরে গিয়ে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হলে বাংলাদেশের বন্ধুরা হতাশ হয়ে পড়বে। আন্তর্জাতিক মান নিশ্চিত করা না হলে তা হবে অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক।

ইউরোপীয় ইউনিয়ন

কাদের মোল্লার ফাঁসির রায়ের কার্যকারিতা স্থগিত করার আহ্বান জানিয়ে বিবৃতি দেয় ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও বৃটেন। ঢাকার ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও বৃটিশ হাইকমিশন থেকে এই বিবৃতি ইস্যু করা হয়। ইউরোপীয় ইউনিয়নের বিবৃতিতে বলা হয়, ইইউ সব পরিস্থিতিতে মৃত্যুদণ্ডের বিরোধিতা করে। বিবৃতিতে আরো বলা হয়, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এ বিচারের শুরু থেকেই বার বার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং মৃত্যুদণ্ডের বিষয়ে উদ্বেগ জানিয়ে আসছে।

www.pathagar.com

বৃটেনের পররাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রী

জামায়াত নেতা কাদের মোল্লার ফাঁসি কার্যকারিতা স্থগিতের আহ্বান জানিয়ে বৃটেনের তৎকালীন পররাষ্ট্র ও কমনওয়েলথ বিষয়ক সিনিয়র প্রতিমন্ত্রী ব্যারোনেস সাঈদা ওয়ার্সি এক বিবৃতিতে বলেন, কাদের মোল্লার মৃত্যুদণ্ডে আমি উদ্বিগ্ন। বৃটেন সব পরিস্থিতিতে মৃতুদণ্ড বিরোধী। এটা মানুষের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করে। ওয়ার্সি বলেন, কাদের মোল্লার বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের দেয়া রায় পর্যালোচনা করতে অনুমতি দেয়া হয়নি বলে আমরা জেনেছি।

জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিশন

আব্দুল কাদের মোল্লার মৃত্যুদণ্ড স্থগিত রাখার আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি পাঠিয়েছিলেন জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিশনার নাভি পিল্লাই। কাদের মোল্লার জন্য শেখ হাসিনাকে চিঠি পাঠানোর তথ্য বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জাতিসংঘের ওয়েবসাইটে তুলে ধরা হয়েছে। নাভি পিল্লাই কাদের মোল্লাকে একজন রাজনীতিক হিসেবে উল্লেখ করে তাকে এখনি ফাঁসিতে না ঝোলানোর অনুরোধ করেন।

রিসেপ তাইয়্যেপ এরদোগানের বিবৃতি

তুরস্কের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ও বর্তমান রাষ্ট্রপতি রিসেপ তাইয়েপ এরদোগানও এক প্রতিক্রিয়ায় এই বিচারিক হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান। তিনি তার বিবৃতিতে বলেন, আব্দুল কাদের মোল্লার ফাঁসি ইতিহাসের এক ন্যাক্কারজনক ঘটনা যার কারণে ইতিহাস আজকের ক্ষমতাসীনদেরকে কোনদিন ক্ষমা করবে না। এরদোগান এই রায় কার্যকর করার কয়েক ঘণ্টা আগে টেলিফোন করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ফাঁসি স্থগিত রাখার আহ্বান জানান। তুরস্কের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লার ফাঁসি রহিত করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়। রায়পরবর্তী এক বিবৃতিতে আংকারা জানায়, এটা আমাদের জন্য গভীর দুঃখ ও অনুতাপের বিষয় যে, আন্তর্জাতিক সব মহলের অনুরোধকে উপেক্ষা করে বাংলাদেশের সরকার এই অন্যায় ফাঁসির দণ্ডাদেশ কার্যকর করলো। আমরা শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লার বিদেহী আত্মার জন্য দোয়া করি। বিবৃতি থেকে আরও জানা যায়, এই ফাঁসির রায় রহিত করার জন্য তুরস্কের তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও বর্তমান প্রধানমন্ত্রী আহমদ দাভোতাগলু ব্যপক ভুমিকা পালন করেন। তিনি সৌদি আরবের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সৌদ আল ফয়সাল, মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জন কেরি এবং তৎকালীন বৃটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী উইলিয়াম হেগের সাথে ফোনে কথা বলেন এবং এই রায় কার্যকর না করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়ার আহ্বান জানান।

www.pathagar.com

কাতার : রায় বাস্তবায়নের পরপরই কাতার সরকার একটি আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে এই অন্যায়ভাবে ফাঁসি দেয়ার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানায়। কাতার নিউজ এজেন্সি কিউএনএ পরিবেশিত খবরে বলা হয়, এ দণ্ড কার্যকরের সময় যে তীব্র উত্তেজনাকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়, কাতার এর জন্যও উদ্বেগ প্রকাশ করে।

বৃটিশ রাজনীতিবিদ ও আইন বিশেষজ্ঞদের প্রতিবাদ

বৃটেনের অল পার্টি পার্লামেন্টারী গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান লর্ড কার্লাইল, মিলাসোভিচের আইনজীবী স্যার জিওফ্রি নাইস কিউসি এবং বার হিউম্যান রাইটস কমিটির সভাপতি ক্রিসটি ব্রাইমলো এক যৌথ বিবৃতিতে অবিলম্বে আব্দুল কাদের মোল্লার ফাঁসির রায় কার্যকর করার প্রক্রিয়া স্থগিত করার আহ্বান জানান। সরকার গোপনে কাদের মোল্লার ফাঁসি কার্যকর করতে পারে এমন তথ্য থাকায় তারা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রীসভার সদস্যদের বৃটেনে ভিসা না দেয়ার আহ্বান জানান। তারা আপীল ও জেল কোডের সব বিধান প্রয়োগ করার জন্য বাংলাদেশের সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তারা মনে করেন, মূলত রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে ভিন্ন খাতে নেয়ার জন্য এবং নির্বাচনের পূর্বে দেশে জরুরী অবস্থা জারি করার অভিপ্রায়ে সরকার এই দণ্ড কার্যকর করতে চায়। বৃটেন সব ধরনের মৃত্যুদণ্ডের বিরোধী উল্লেখ করে তারা বলেন, এই ট্রাইবুনালে মোটেও আন্তর্জাতিক মান বজায় রাখা হয়নি। কোর্ট চত্বর থেকে স্বাক্ষী অপহরণের ঘটনা ঘটেছে। স্বাক্ষীদের জালিয়াতির অভিযোগ রয়েছে। আর সর্বোপরি বিচারকদের সাথে প্রসিকিউটরদের যোগাযোগ এবং সরকারের ইংগিতে বিচার পরিচালনার অভিযোগ রয়েছে।

বার হিউম্যান রাইটস কমিটি

ইংল্যান্ড ও ওয়েলসের বার হিউম্যান রাইটস কমিটির চেয়ারম্যান ক্রিস্টি ব্রাইমলো বলেন, আন্তর্জাতিক মহল এখন এই বিষয়ে একমত যে, এই বিচারটি মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়।

এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল

আব্দুল কাদের মোল্লার শাহাদাতকে একটি দুঃখজনক ঘটনা হিসেবে আখ্যায়িত করেছে মানবাধিকার সংগঠন এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল। এই রায় কার্যকর করা কোন ভাবেই ঠিক হয়নি বলেও জানায় তারা। মৃত্যুদণ্ড একটি মানবাধিকার হরণকারী শাস্তি। এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের বাংলাদেশ বিষয়ক গবেষক আব্বাস ফায়েজ এসব কথা জানান।

হিউম্যান রাইটস ওয়াচ

আব্দুল কাদের মোল্লার ফাঁসির রায় স্থগিত রাখা উচিত বলে জানায় আর্ন্তজাতিক মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ। সংস্থাটির নিজস্ব ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা এক প্রতিবেদনে এ আহ্বান জানানো হয়েছে। প্রতিবেদনে স্বচ্ছ

www.pathagar.com

বিচারের জন্য কাদের মোল্লাকে আপিলের সুযোগ দেওয়া উচিত বলেও মন্তব্য করা হয়েছে। প্রতিবেদনে সংস্থাটির এশিয়া অঞ্চলের প্রধান ব্র্যাড অ্যাডামসের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে, 'যেকোনো অবস্থায়ই মৃত্যুদণ্ডকে নিষ্ঠুর শাস্তি হিসেবে গণ্য করে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ।' আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের দেওয়া এই রায়ের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড মানা হয়নি বলে অভিযোগ করে ব্র্যাড অ্যাডামস বলেন, 'আইনের অপব্যবহার ঘটিয়ে দেওয়া এই মৃত্যুদণ্ডের রায়টি তিরস্কারযোগ্য এবং এখানে সর্বশেষ রায়ের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপতির নিকট আপিল করার অধিকারটুকুও দেওয়া হচ্ছে না।'

ইউসুফ আল কারজাভী

বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ ইউসুফ আল কারজাভি রাজনৈতিক প্রতিপক্ষদের টার্গেট বন্ধ করার জন্য বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে আব্দুল কাদের মোল্লার মৃত্যুদণ্ডাদেশকে 'বিচারের নামে খুন' হিসেবে অভিহিত করেছেন। ১২ ডিসেম্বর এক বিবৃতিতে ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন অব মুসলিম স্কলার্স (আইইউএমএস) প্রধান ইউসুফ আল কারজাভি বিতর্কিত অপরাধ ট্রাইব্যুনালে আব্দুল কাদের মোল্লাকে ফাঁসি দেয়ার তীব্র সমালোচনা করে বলেন, বাংলাদেশ সরকার তাদের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষদের ওপর নিপীড়ন চালিয়ে যাচ্ছে। তিনি বলেন, শুধুমাত্র ইসলামী আন্দোলন করার কারণে বাংলাদেশের ইসলামী নেতৃবৃন্দের উপর জুলুম চালানো হচ্ছে। তবে আল্লাহ এই জুলুমের বদলা একদিন নিশ্চিত করবেন ইনশাল্লাহ।

রাশীদ ঘানুচির শোক

তিউনিশিয়ার আন্নেহাদা পার্টির প্রধান রাশীদ ঘানুচি শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লার নির্মম হত্যাকাণ্ডে তীব্র শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন। আব্দুল কাদের মোল্লার বিচার ও হত্যাকাণ্ডকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত উল্লেখ করেন প্রবীণ এই নেতা। তিনি জামায়াতকে স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ দেয়ার জন্য বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। একই সংগে আন্নেহাদা পার্টি বাংলাদেশের এই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বিচার এবং ইসলামী নেতাদের হত্যার ষড়যন্ত্র বন্ধ করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টির জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানান।

পাকিস্তান সংসদে নিন্দা প্রস্তাব

পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে আব্দুল কাদের মোল্লার মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের নিন্দা জানিয়ে একটি প্রস্তাব পাস করা হয়। পাকিস্তান জামায়াতের সংসদ সদস্য শের আকবর খান এই প্রস্তাব উত্থাপন করলে তাতে সমর্থন জানায় সরকারি দল মুসলিম লিগ। এছাড়া ইমরান খানের তেহরিক-ই-ইনসাফ, আওয়ামী মুসলিম

www.pathagar.com

লিগ, পাকিস্তান মুসলিম লিগ (কায়েদে আজম) ও জমিয়তে উলামা ইসলাম এই প্রস্তাবে সমর্থন জানায়। প্রস্তাবটিতে বলা হয়, বাংলাদেশের উচিত হবে না ৪২ বছর আগের পুরনো ক্ষতকে নতুন করে জাগিয়ে তোলা। এতে বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধ-সংক্রান্ত সব ধরনের মামলা 'পারস্পরিক সমঝোতা'র ভিত্তিতে প্রত্যাহার করে নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়। প্রস্তাবের ওপর আলোচনা করতে গিয়ে পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চৌধুরী নিসার আলী খান বলেন, শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লাকে শুধু রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে বিচারিকভাবে হত্যা করা হয়েছে।

ইমরান খানের নিন্দা

অন্যদিকে জামায়াত নেতা কাদের মোল্লার বিরুদ্ধে অন্যায় করা হয়েছে বলে মত দিয়েছেন পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ দলের প্রধান ও সাবেক ক্রিকেট তারকা ইমরান খান।

রেডিও পাকিস্তানের বরাত দিয়ে দ্য এক্সপ্রেস ট্রিবিউন মঙ্গলবার জানায়, পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদে দেওয়া এক ভাষণে ইমরান খান দাবি করেন, 'কাদের মোল্লা নির্দোষ। যে অভিযোগের ভিত্তিতে বাংলাদেশ তাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে, সেগুলোও "ভুয়া" ।'

আইসিএনএ'র প্রতিবাদ

দ্য ইসলামিক সার্কেল অব নর্থ আমেরিকা (আইসিএনএ) এক বিবৃতিতে শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লার ফাঁসির রায় কার্যকর করার ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে। এক বিবৃতিতে আইসিএনএ'র প্রেসিডেন্ট নাইম বেগ জানান, এটি একটি রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড এবং বিচার বিভাগের ইতিহাসে আজ একটি কালো দিন। ক্রটিপূর্ণ বিচারিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রাজনৈতিক নেতাদের হত্যার ঘটনা দেশকে আরও গভীর সংকট ও সংঘাতের দিকে ঠেলে দিবে। জাতিসংঘ, মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জন কেরি এবং এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের মত মানবাধিকার সংগঠনগুলো এই হত্যাকাণ্ড রহিত করার জন্য আহ্বান জানালেও বাংলাদেশ সরকার তাতে কর্ণপাত করেনি। এই মামলার বিচার কাজে অভিযুক্ত পক্ষকে পর্যাপ্ত সুযোগসুবিধা দেয়া হয়নি এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মহল বার বারই বলেছে যে, এই বিচার আন্তর্জাতিক মান বজায় রাখতে সম্পূর্ণ রূপে ব্যর্থ হয়েছে।

সিটিজেন ইন্টারন্যাশনাল মালয়েশিয়া

সিটিজেন ইন্টারন্যাশনাল মালয়েশিয়া ঠাণ্ডা মাথায় পরিকল্পিতভাবে আব্দুল কাদের মোল্লাকে হত্যার ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ও মানবাধিকার সংগঠনের আবেদনকে অগ্রাহ্য করে বাংলাদেশ সরকার এই মৃত্যুদণ্ড

www.pathagar.com

কার্যকর করেছে। মোল্লাকে কতগুলো ভিত্তিহীন সাক্ষ্যের ওপর ভিত্তি করে এমন সব বিচারকেরা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেছে যারা দলীয় আজ্ঞাবহ কর্মীর মত আচরণ করতে অভ্যস্ত।

মুসলিম ইয়ুথ মুভমেন্ট অব মালয়েশিয়া (আবিম)

মুসলিম ইয়ুথ মুভমেন্ট অব মালয়েশিয়া (আবিম) ট্রাইবুনাল ও বাংলাদেশে চলমান মানবতা বিরোধী অপরাধের বিচারকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত উল্লেখ করে আব্দুল কাদের মোল্লাকে হত্যার ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে। আন্ত র্জাতিক মহলের দাবি ও সুপারিশ উপেক্ষা করে বাংলাদেশ সরকার এই দণ্ড কার্যকর করায় আবিম দুঃখ ও ক্ষোভ প্রকাশ করে।

ডিফেন্স টিমের যৌথ বিবৃতি

এক বিবৃতিতে বৃটিশ আইনজীবী ও শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লার আইনজীবী স্টিভেন কে কিউসি, জন ক্যামেগ এবং টবি ক্যাডম্যান বলেন, সারা বিশ্ব এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এ্ই দণ্ড কার্যকর না করার জন্য বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। তারা বলেন, এই অন্যায় রায় কার্যকর করলে বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশ সরকারের গ্রহণযোগ্যতা হ্রাস পাবে। বিশ্বের চোখে শেখ হাসিনা এবং তার সরকার খুনী হিসেবে চিহ্নিত হবে। বিরোধী কোন নেতাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করার ঘটনা রাজনৈতিক নিপীড়নের নগ্ন উদাহরণ। কোন ধরনের তত্ত্বাবধান বা বিদেশী মনিটরিং এই বিচারে ছিল না। ত্রুটিপূর্ণ এই বিচারিক প্রক্রিয়াটি সরকারের ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখার একটি কৌশল। এই অন্যায় বিচার দেশে সহিংসতা ও বিভাজনকে আরও বৃদ্ধি করবে। যদিও ১৯৭১-এর ক্ষত সারানোর জন্য এই বিচার শুরু হয়েছে মর্মে সরকার দাবি করছে; কিন্তু আসলে এর মাধ্যমে সরকার বিরোধী পক্ষকে দমিয়ে রাখতে চায়। এই বিচারে আসামীপক্ষকে নানা সুবিধা ও অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে।

দ্য ইকোনোমিস্ট

বিশ্ববিখ্যাত পত্রিকা 'দ্য ইকোনোমিস্ট' এক রিপোর্টে বলে, বাংলাদেশের বিচার বিভাগ বর্তমান সরকারের শাসনামলে নির্বাহী বিভাগের হাতের পুতুলে পরিণত হয়েছে। পত্রিকাটি আরও বলে, একই পরিবারের ৬ জন সদস্য হত্যার দায়ে মোল্লাকে ফাঁসি দেয়া হলেও প্রসিকিউশন এই অভিযোগের স্বপক্ষে মাত্র একজন স্বাক্ষী এনেছিল যার বয়স ঐ ঘটনার সময় ছিল মাত্র ১৩ বছর।

www.pathagar.com

দেশের বিশিষ্টজনদের নিন্দা

বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী ও কাজী ফিরোজ রশিদ

মহাজোট সরকারের শরিক জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় প্রেসিডিয়াম সদস্য কাজী ফিরোজ রশিদ এক টকশোতে বলেন, সাক্ষীর মাঝে যদি দূর্বলতা থাকে তাহলে ৪২ বছরের আগের একটা মামলাকে সামনে এনে শুধু আপনি গায়ের জোরে কি কাউকে ফাঁসি দিতে পারেবন? আব্দুল কাদের মোল্লার রায়-পরবর্তী দিগন্ত টেলিভিশনে বঙ্গবীর আব্দুল কাদের সিদ্দিকীর উপস্থাপনায় টকশো 'সবার উপর দেশ'-এ তিনি এ কথা বলেন। বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী বলেন, এখন যে মামলাটা সুপ্রীম কোর্টে আসছে, যেটা লেখালেখি হয়ে গেছে কারো বাবার সাধ্য আছে, যে এই মামলায় কাদের মোল্লাকে ফাঁসি দেয়? ফিরোজ রশিদ বলেন, আর কাদের মোল্লা যদি আপিল না করেন, তাহলে এই মামলা তো সুপ্রীম কোর্টে যাবেই না। কাদের সিদ্দিকী বলেন, আর আপীল করলেও তার এই মামলায় বাড়িয়ে দেয়ার কোন উপায় নাই। রশিদ বলেন, জাজ সাহেব লিখে দিয়েছেন এই মামলায় তার বিরুদ্ধে কিছুই পেলাম না। সুপ্রীম কোর্ট নতুন করে এই মামলায় তার সম্পর্কে নতুন করে কিছু পাবে এটা আমি আশা করি না। কাদের সিদ্দিকী বলেন, সুপ্রীম কোর্ট তো গ্রহণই করবেন না।

এডভোকেট খন্দকার মাহবুব হোসেন

সুপ্রীমকোর্ট বার এসোসিয়েশনের সভাপতি এডভোকেট খন্দকার মাহবুব হোসেন ২০১৩ সালের ১২ ডিসেম্বর দুপুরে সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, আমরা আশা করি এবং বিশ্বাস করি, আব্দুল কাদের মোল্লার ওপর ন্যায়বিচার করা হয়নি। তিনি ন্যায়বিচার পাননি। সর্বোচ্চ আদালত রায় দিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে আমাদের আর কিছু বলার নেই। যতক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ রায় না পাব এবং রায় না পেয়ে কারা কর্তৃপক্ষ কোনো পদক্ষেপ নেবে না, এটাই সাধারণ নিয়ম, সাধারণ আইন। আমরা এটা বিশ্বাস করি, যেহেতু এটি মৃত্যুদণ্ড, কাজেই এ ক্ষেত্রে কারা কর্তৃপক্ষ পূর্ণাঙ্গ রায় না পেয়ে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করবে না।

ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদ

জাতীয় আইনজীবী ফোরামের সাংবাদিক সম্মেলনে ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদ বলেন, আমরা মনে করি, সরকার তাদের হীন রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্যই এই মামলা (আব্দুল কাদের মোল্লার বিরুদ্ধে) দায়ের করেছে। আমরা এর তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাই এবং তার সাথে সাথে দাবি করছি যে, সংবিধানের ১০৫ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী জনাব আব্দুল কাদের মোল্লার পক্ষে রিভিউ পিটিশন নিস্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত তার ফাঁসির আদেশ যেন কার্যকর করা না হয়।

www.pathagar.com

ব্যারিস্টার আবদুর রাজ্জাক

শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লার প্রধান আইনজীবী ব্যারিস্টার আবদুর রাজ্জাক ২০১৩ সালের ১২ ডিসেম্বর দুপুরে সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, কাদের মোল্লা ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। একজন সাক্ষীর ওপর নির্ভর করে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে। যে সাক্ষী তিন জায়গায় তিন ধরনের কথা বলেছেন। এ ধরনের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে মৃত্যুদণ্ড প্রদান আইনের শাসনের পরিপন্থী। আমরা মনে করি, রায়ের পূর্ণাঙ্গ কপি পাওয়ার আগ পর্যন্ত কোন পদক্ষেপ নেয়া ঠিক হবে না। কারা কর্তৃপক্ষকে আইন ও কারাবিধি মেনেই চলতে হবে। জেলকোড মানতে হবে।

ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী

কাদের মোল্লার ব্যাপারটা- কাদের মোল্লা সে যেটা বলছে যে, ১৯৭২-১৯৭৪ যখন আপনাদের যৌবন সে সময় সে শহীদুল্লাহ হলের আবাসিক ছাত্র। শেখ সাহেবের আমলে একটা কসাই কাদের মোল্লা কি করে আবাসিক ছাত্র হয়। কি করে ভাইস প্রিন্সিপাল হয়? প্রথমে সে (কাদের মোল্লা) বলেছে ছাত্র ইউনিয়ন করতো। প্রসিকিউশনের মিনিমাম দায়িত্ব ছিল নাহিদ এবং মতিয়াকে এনে জিজ্ঞেস করা তার সম্পর্কে। চ্যানেল আই'র তৃতীয় মাত্রা অনুষ্ঠানে জিল্লুর রহমানের উপস্থাপনায় গণস্বাস্থ্যকেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা ও ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী এ কথা বলেন।

মেজর (অব.) আখতারুজ্জামান

চ্যানেল আই'র তৃতীয় মাত্রা অনুষ্ঠানে জিল্লুর রহমানের উপস্থাপনায় টকশোতে মেজর (অব.) আখতারুজ্জামান বলেন, আমি মনে করছি, জামায়াতের বিরুদ্ধে অন্যায় করা হয়েছে। যেই ক্ষমা ১৯৭৩ সালে বঙ্গবন্ধু করে দিয়ে গেছেন, সেই বিচার আপনারা অন্যায়ভাবে করেছেন এবং একটি মানুষকে (আব্দুল কাদের মোল্লা) রাষ্ট্রীয়ভাবে আপনারা হত্যা করেছেন।

গোলাম মাওনা রনি

আওয়ামী লীগের তৎকালীন এমপি গোলাম মাওনা রনি শহীদ আবদুল কাদের মোল্লা সম্পর্কে গত বছরের ১৩ ডিসেম্বর দুপুর দুইটা ১০ মিনিটের দিকে ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়েছিলেন। এতে গোলাম মাওলা রনি লিখেছেন, যেসব তরুণ বন্ধুরা ফাঁসি চাই ফাঁসি চাই বলে দাবি তুলছেন তাদেরকে বলবো চলে যান ফরিদপুর জেলার সদরপুর থানার আমিরাবাদ গ্রামে। গ্রামের দীন দরিদ্র ঘনা মোল্লার ঘরে কাদের মোল্লা কতসালে জন্ম গ্রহণ করেছিলো সেই তথ্য নিয়ে কাজ শুরু করুন। তারপর যান- বাইশ রশি শিব সুন্দরী একাডেমিতে সেখানে কাদের মোল্লা প্রথমে ম্যাট্রিক পর্যন্ত পড়েন এবং পরে একই প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করেন।

www.pathagar.com

নিজের দরিদ্রতার জন্য তিনি এলাকার সম্ভ্রান্ত মুসলিম পীর ধলামিয়া সাহেবের বাড়ীতে লজিং থাকতেন। এই লজিং থাকার সময়কাল সম্পর্কে এলাকাবাসীর সাক্ষ্য নিন।

ধলামীয়া পীর সাহেবের পরিবার- বৃটিশ আমল থেকে এলাকার অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত এবং সম্মানিত পরিবার হিসেবে পরিচিত। পীর সাহেবের বড় ভাই আবুল হাসানাত ১৯৫৩ সালে পাকিস্তানের আইজি ছিলেন। বঙ্গবন্ধু আইজি সাহেবকে পিতার মতো শ্রদ্ধা করতেন। পীর সাহেবের পরিবার মহান মুক্তিযুদ্ধের সমর্থক ছিলেন এবং তার মেয়ের জামাই গাফফার ইঞ্জিনিয়ার ফরিদপুর জেলার মুক্তিযোদ্ধাদের কমাণ্ডো বাহিনীর প্রধান ছিলেন। এই গাফ্ফার ইঞ্জিনিয়ারের স্ত্রী ছিলেন কাদের মোল্লার ছাত্রী।

ঢাকা প্রেসক্লাবে এসেও তার সর্ম্পকে খোঁজ নিতে পারেন। নির্মল সেন ও সন্তোষ গুপ্তের মতো সাংবাদিকগণ যখন দেশের সংবাদিক সমাজকে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন তখন কাদের মোল্লা ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সহ-সভাপতি হিসেবে কিভাবে দুইবার নির্বাচিত হলেন? তার চাকরি জীবনে উদয়ন স্কুল কিংবা বিডিআর পাবলিক স্কুল এণ্ড কলেজে গিয়েও খোঁজ নিতে পারেন।

আমি যে তথ্যগুলো দিলাম- তা কিন্তু আমার নয়। প্রসিকিউসনে আসামী পক্ষ উত্থাপন করেছিল। সরকার নিয়োজিত প্রসিকিউসনগণ একটু চেষ্টা করলেই ঐগুলোর সত্য-মিথ্যা যাচাই-বাছাই করতে পারতো। কিন্তু তা না করে কেবল ঘটনাস্থল মিরপুরকে কেন্দ্র করে- তথ্য উপাত্ত এবং সাক্ষী প্রমাণ হাজির করায় সংক্ষুব্ধ পক্ষ তাদের আপত্তি উত্থাপন করার সুযোগ পাচ্ছে।

সার্বিক পরিস্থিতিতে এটা আপনার জন্য বিবেকের দায় হয়ে দাঁড়িয়েছে যে- আপনি সবকিছু শুনবেন না, কি কিছু কিছু শুনবেন এবং বাকীগুলো শুনবেনই না।

শহীদ আবদুল কাদের মোল্লাকে নিয়ে এলাকাবাসীর মূল্যায়ন

মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণ দেয়া অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ সদস্য **নান্নু বেপারি** আব্দুল কাদের মোল্লা সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করতে দিয়ে বলেন, "১৯৭১ সালে আমরা যেই স্কুলের মাঠে আমি কাদের মোল্লার ট্রেনিং করাইছি, আমি খালেক মৃধা আর মঞ্জু। তখন কাদের মোল্লা ধনা মিয়া পীর সাহেবের বাড়ি লজিং থাকতেন আর বাইশ রশি শিব সুন্দরী স্কুলে মাস্টারী করতেন।"

মোসলেম উদ্দিন আহমেদ, কাদের মোল্লার সহপাঠী ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু বাইশ রশি স্কুলের প্রাক্তন এই প্রধান শিক্ষক কাদের মোল্লার সাথে দীর্ঘদিন সহকর্মী হিসেবেও কাজ করেছেন। ৭১ এর দিনগুলোতে কাদের মোল্লার সাথে গ্রামেই কাটিয়েছেন পুরো সময়। "১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধুর ভাষণের কিছুদিন পরে উনার

www.pathagar.com

সাথে দেখা হয়। তখন বলেছিল আমি ঢাকা থেকে চলে আসছি, জিজ্ঞাসা করেছিলাম তুমি কোথায় থাক? তখন বললো, আমি শীতলা মেহের হুজুরের বাড়িতে থাকি। ত ঐখানে থাইকা ১৪ রশি বাজারের ধলা মিয়া হুজুরের মেঝো ছেলে রইস উদ্দিন আহমদের সাথে উনি ১৪ রশি বাজারে ভূষি মালের ব্যবসা করতো। সেই সুবাদে উনাকে আমরা দেখছি।

৫নং ভাষাণচর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান কাদের মোল্লার সহোদর ভাই মোল্লা মঈনুদ্দিন আহমদ নিজেও যুদ্ধকালীন সময়ে ভাইয়ের সাথে মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণ নেন। কিশোর বয়সে বড় ভাইকে দেখে অনেকটা অনুপ্রাণিত হয়েই প্রশিক্ষণে অংশনিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু কাল্পনিক তথ্য-উপাত্তে মীরপুরের কুখ্যাত কাদের কসাই-এর নোংরা অভিযোগ নিজের ভাইয়ের ওপর চাপিয়ে দিয়ে ফাঁসি কার্যকর করায় শোকে বাকরুদ্ধ এই মানুষটিও। উনি কোনদিন কোন মিথ্যা কথাও বলছেন এরকম অভিযোগ কারো তোলার সুযোগ নেই। একটাই ব্যথা একজন নিরপরাধ মানুষকে এভাবে অন্যায়ভাবে রাজনৈতিক কারণে ফাঁসি দেয়া হলো এটাই আমাদের মনের ব্যথা আর কোন ব্যথা নেই।

ট্রাইব্যুনালে সুশীল চন্দ্র মণ্ডল

ফরিদপুরে শহীদ আবদুল কাদের মোল্লার গ্রাম আমিরাবাদের বাসিন্দা ৮২ বছর বয়সি সুশীল চন্দ্র মণ্ডল ২০১২ সালের ২১ নভেম্বর ট্রাইব্যুনালে সাক্ষী দিয়েছিলেন। আদালতে দাঁড়িয়ে তিনি বলেন, "আমি এই মামলার আসামী আব্দুল কাদের মোল্লাকে চিনি। আব্দুল কাদের মোল্লা প্রাইমারী স্কুল পাশ করে আমার বাড়ীর পাশে হাইস্কুল ঐ স্কুলে পড়তে আসে। ঐ স্কুলের নাম ফজলুল হক ইন্সটিটিউশন। আমার বাড়ীতে সন্তোষ বাবু নামে একজন বিএসসি শিক্ষক লজিং থাকতেন। কাদের মোল্লাসহ আরো বেশকিছু ছাত্র আমার বাড়ীতে ঐ শিক্ষকের নিকট পড়তে আসতো। কাদের মেহের মৃধার বাড়ীতে থেকে আমিরাবাদ স্কুলে পড়াশুনা করতো। মেহের মৃধা কাদেরকে তার ছেলের মতোই ভালবাসতো। কাদের মোল্লার ব্যবহার ও আচার-আচরণে সন্তুষ্ট হয়ে মেহের মৃধা নিজের ছেলের সংগে কাদের মোল্লার এক বোনের বিয়ে দেয়। তারপরেই কাদের মোল্লার বাবা আমাদের আমিরাবাদে বাড়ী করে। সে সাধারণত বাড়ীতে আসতো না পীর সাহেবের বাড়ীতে থাকতো, আমরা বাজারে গেলে দেখতাম কাদের পীর সাহেবের ঘরে বসে ব্যবসা করছে। এইভাবে ব্যবসা করতে করতে দেশ স্বাধীন হয়ে গেলে তার ৯/১০ মাস পরে সে আবার ঢাকায় চলে যায় পড়াশুনা করার জন্য, সে বাড়ীতে খুব কম আসতো। কাদের খুব ভাল মানুষ।"

www.pathagar.com

শহীদ আবদুল কাদের মোল্লাকে ৫ অভিযোগেই খালাস দিলেন এক বিচারপতি

বিচারপতি আব্দুল ওয়াহ্হাব মিঞা আপিল বিভাগের অপর চার বিচারপতির সাথে ভিন্নমত পোষণ করে আব্দুল কাদের মোল্লাকে ছয়টি অভিযোগের মধ্য থেকে ৫ টিতেই খালাস দিয়েছেন। একটি অভিযোগে ট্রাইব্যুনালের প্রদত্ত যাবজ্জীবন সাজা বহাল রেখেছেন এবং এ ক্ষেত্রেও তিনি আপিল বেঞ্চের অপর বিচারপতিদের সাথে ভিন্নমত পোষণ করে ভিন্ন রায় দিয়েছেন।

ট্রাইব্যুনালে আব্দুল কাদের মোল্লার বিরুদ্ধে মোট ছয়টি অভিযোগ এনেছিল রাষ্ট্রপক্ষ। ট্রাইব্যুনালের রায়ে একটি অভিযোগ থেকে খালাস দিয়েছিল আব্দুল কাদের মোল্লাকে। এছাড়া ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক সাজা প্রদান করা চারটি অভিযোগ থেকেও তিনি আব্দুল কাদের মোল্লাকে খালাস দিয়েছেন। সব মিলিয়ে ছয়টি অভিযোগের মধ্য থেকে তিনি পাঁচটি অভিযোগ থেকে খালাস দিলেন আব্দুল কাদের মোল্লাকে। ছয়টি অভিযোগের মধ্যে যাবজ্জীবন সাজা প্রদান করা ট্রাইব্যুনালের একটি রায় তিনি বহাল রাখলেন।

ট্রাইব্যুনালের রায়ে আব্দুল কাদের মোল্লাকে ১ নং অভিযোগ যথা মিরপুরে পল্লব হত্যার দায়ে ১৫ বছর জেল দেয়া হয়েছে। আপিল বিভাগ এ রায় বহাল রেখেছেন। অপরদিকে বিচারপতি আব্দুল ওয়াহ্হাব মিঞা এ অভিযোগ থেকে আব্দুল কাদের মোল্লাকে খালাস দিয়েছেন তার রায়ে তিনি বলেছেন, রাষ্ট্রপক্ষ এ অভিযোগ প্রমাণে ব্যর্থ হয়েছে এবং ট্রাইব্যুনাল অন্যায়ভাবে তাকে দোষী সাব্যস্ত করেছে।

আব্দুল কাদের মোল্লার বিরুদ্ধে ২ নং অভিযোগ তথা কবি মেহেরুন্নেসা হত্যার অভিযোগে ১৫ বছর দণ্ড দেয়া হয়েছে ট্রাইব্যুনালের রায়ে। আপিল বিভাগের রায়ে ট্রাইব্যুনালের এ দণ্ড বহাল রাখা হয়েছে। বিচারপতি আব্দুল ওয়াহ্হব মিঞা এ অভিযোগেও আপিল বেঞ্চের অপর চার বিচারপতির সাথে ভিন্নমত পোষণ করে আব্দুল কাদের মোল্লাকে খালাস দিয়েছেন এবং মন্তব্য করেছেন রাষ্ট্রপক্ষ সন্দেহাতীতভাবে অভিযোগ প্রমাণ করতে পারেনি।

আব্দুল কাদের মোল্লাকে ৩ নং অভিযোগ যথা সাংবাদিক খন্দকার আবু তালেব হত্যার অভিযোগে ১৫ বছর সাজা দেয়া হয়েছে। আপিল বিভাগের রায়ে এ দণ্ড বহাল রাখা হয়েছে। বিচারপতি আব্দুল ওয়াহ্হাব মিঞা এ অভিযোগেও আপিল বিভাগের চার বিচারপতির সাথে ভিন্নমত পোষণ করে আসামীকে খালাস দিয়েছেন অভিযোগ থেকে।

৪ নং অভিযোগ যথা কেরানীগঞ্জের ঘাটারচর হত্যাকাণ্ডের অভিযোগ থেকে আব্দুল কাদের মোল্লাকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে ট্রাইব্যুনালের রায়ে। আপিল বিভাগ এ অভিযোগে যাবজ্জীবন সাজা দিয়েছেন আব্দুল কাদের মোল্লাকে; কিন্তু বিচারপতি আব্দুল ওয়াহ্হাব মিঞা ট্রাইব্যুনালের দেয়া খালাস রায় বহাল রেখেছেন।

www.pathagar.com

৫ নং অভিযোগ যথা মিরপুর আলুবদি হত্যাকাণ্ডের অভিযোগে ট্রাইব্যুনালের রায়ে আব্দুল কাদের মোল্লাকে যাবজ্জীবন সাজা দেয়া হয়েছে। আপিল বিভাগ এ রায় বহাল রেখেছেন। কিন্তু বিচারপতি আব্দুল ওয়াহ্হাব মিঞা এ অভিযোগ থেকেও আব্দুল কাদের মোল্লাকে খালাস দিয়ে লিখেছেন– আব্দুল কাদের মোল্লা সেখানে উপস্থিত ছিল এবং এ গণহত্যায় কোন সহযোগিতা করেছে এ মর্মে রাষ্ট্রপক্ষ অভিযোগ প্রমাণ করতে পারেনি। ট্রাইব্যুনাল ভুল করেছে এ সাজা দিয়ে।

মিরপুরে হযরত আলী পরিবারের হত্যাকাণ্ডে ট্রাইব্যুনাল যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয় আব্দুল কাদের মোল্লাকে। আপিল বিভাগের রায়ে এ সাজা বাড়িয়ে সর্বোচ্চ সাজা মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন। কিন্তু বিচারপতি আব্দুল ওয়াহ্হাব মিঞা ট্রাইব্যুনালের এ রায় বহাল রাখেন।

শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লা যথেষ্ট আইনী সুযোগ পাননি

শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লা যথেষ্ট আইনী সুযোগ পায়নি বলে উল্লেখ করেছে তার বড় ছেলে হাসান জামিল। পরিবারের পক্ষ থেকে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন, আমার পিতাকে অত্যন্ত নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে। আমরা আমার বাবাকেই শুধু হারাইনি, আমরা হারিয়েছি বাংলাদেশের ইসলামী আন্দোলনের একজন নেতাকে, একজন শিক্ষাবিদ ও সমাজসেবক সর্বোপরি একজন সাংবাদিক নেতাকে। আমার পিতাকে হত্যার ৩৪৮ দিন পর আপিল বিভাগ থেকে আমার বাবার দায়ের করা রিভিউ আবেদনের পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশিত হয়। এই রায়ে রিভিউ 'মেনটেনেবল' বলে সুপ্রিম কোর্ট ঘোষণা করেন এবং বলেন যে, পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশিত হওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে রিভিউ আবেদন দায়ের করতে হবে। অথচ শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লার পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশের সাত দিনের মাথায় তার ফাঁসি কার্যকর করা হলো। আমার বাবা দুনিয়া থেকে বিদায়ের আগে জানতেই পারলেন না সংবিধান অনুযায়ী তার রিভিউ করার অধিকার আছে কি-না। যখন আইনের পূর্ণাঙ্গ আশ্রয় নেয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয় তখন সেটা হত্যাকাণ্ড ছাড়া আর কিছু নয়।

২০১৪ সালের ১১ ডিসেম্বর সুপ্রিম কোর্ট বার এসোসিয়েশন মিলনায়তনে পরিবারের পক্ষ থেকে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন। শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লার ছেলে ছাড়াও সাংবাদিক সম্মেলনে তার স্ত্রী বেগম সানোয়ার জাহান ও আইনজীবীরা উপস্থিত ছিলেন।

সারা পৃথিবীতে আজ মুসলমানরা নির্যাতিত। বিশেষ করে আজ জামায়াত ও ইখওয়ান এই দুটি আন্দোলন সবচেয়ে বেশি মজলুম। উভয় সংগঠনই কঠোর পরীক্ষা ও প্রতিকূলতার বিভিন্ন মনজিল অতিক্রম করেছে। প্রকৃত সত্য হচ্ছে,

www.pathagar.com

দুনিয়াতে হকের বিজয়ের জন্য যখনই কোন ব্যক্তি বা দল সাহসিকতার সাথে মাথা উঁচু করেছে তখনই তাদেরকে এসব মঞ্জিল অতিক্রম করতে হয়েছে। ইখওয়ানের প্রথম মুর্শিদে আমকে তার পূর্ণ যৌবনে মাত্র ৪৩ বছর বয়সে যেরূপ নির্দয় ও হৃদয়বিদারক ভাবে হত্যা করা হয়। আবদুল কাদের আওদা শহীদ ও তার সংগীদেরকে ১৯৪৫ সালে ফাঁসিতে ঝুলানো হয়েছে। এসব অমূল্য জীবনের অকাল পরিসমাপ্তি শুধুমাত্র নীল উপত্যকারই ক্ষতি হয়নি সমগ্র মুসলিম উম্মাহ্ অদ্যাবধি এ ক্ষতির জন্য তড়পাচ্ছে। বাংলাদেশেও হয়ত একদিন শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লার মৃত্যু নিয়ে অনেক অনুশোচনা করবে।

বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলন একটি কঠিন সময় অতিক্রম করছে। এতে কোন সন্দেহ নেই; কিন্তু বর্তমান প্রবাহ আমাদের জীবনে নতুন হলেও আন্দোলনে তা অনেক পুরাতন। কুরআন, হাদীস, রাসূলের সিরাত, সাহাবীদের জীবনী অধ্যয়ন করলে আমাদের সামনে সেই ইতিহাস প্রস্ফুটিত হয়; কিন্তু খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে ১৯৮২ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে আওয়ামী বামদের হামলায় নবীন বরণে ছাত্রশিবিরের ৩ জন শাহাদাত আর অসংখ্য আহত হওয়ার ঘটনা উল্লেখ করে ১৫ই মার্চ সাপ্তাহিক সোনার বাংলা পত্রিকায় শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লা "শোক করিয়া লাভ নাই, শহীদি খুনের নজরানা চাই" এই শিরোনামে লিখেছিলেন -"আমি কিন্তু এত হিংস্রতা, এত নিষ্ঠুরতা, এতটা অমানবিক আচরণে মোটেই বিস্মিত হইনি। তিনজন শহীদের জন্য শোক করারও তেমন কিছু দেখি না; বরং অত্যন্ত প্রশান্ত চিত্তে ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি, আমার মনে হইয়াছে ঘটনা অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই অগ্রসর হইতেছে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের, পশুত্বের বিরুদ্ধে মানবতার, অমানুষদের বিরুদ্ধে মানুষের সর্বোপরি কুফুরীর বিরুদ্ধে ইসলামের সংগ্রামের ইতিহাসের এই ভাবেই রক্তের অক্ষরে লেখা। কোন নবীই এই পথ এড়াইতে পারেন নাই, কোন মুজাদ্দিদের জন্যই ভিন্ন পথ ছিল না। কোন ইমামও অন্য প্রকার পুস্প আচ্ছাদিত পথের কথা চিন্তাও করেন নাই। সুতরাং এই যুগেও যাহারা ঐ একই পথের যাত্রী বলিয়া দাবি করেন তাহাদের পথ ভিন্নতর কিছু হইবে কেমন করিয়া। ইসলামের গোটা ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে যেন আমার মনে হয় ইসলাম নামক শ্যামল সতেজ গাছের রং সারের অভাবে যখনই ফিকাভ পিঙ্গল হইয়া গিয়াছে তখনই শহীদের তাজা রক্তের সার দিয়া গাছটিকে আরো তরতাজা করিয়া ফুলে ফলে সুশোভিত করা হইয়াছে। সুতরাং ভয়ের কিছু নাই। শঙ্কার কিছু নাই। আক্ষেপের কিছু দেখতেছি না; বরং দিব্যদৃষ্টিতে যেন দেখতেছি এই দেশেই ইসলামের কালেমা খচিত বিজয়ী মিনারের চূড়ায় পতপত করিয়া উড়িতেছে।" যিনি এমন ঐতিহাসিক কথাগুলো লিখেছেন তিনি নিজেই আজ বিশ্বের খবরের পাতায় শিরোনাম। তিনি নিজেই তার জীবন উৎসর্গ করে সত্যের সাক্ষী হয়ে গেলেন আজ।

www.pathagar.com

শহীদেরা তাদের মাবুদের সাথে তামাম জিনিসের বিনিময় করে শুধু একটি বাক্যের ভিত্তিতে "রাদিয়া আলাহু আনহুম অরাদু আন্‌হ"। যারা এই মহৎ কাজে নিজেদের জান-মাল, পিতা, পুত্র, ভাই বেরাদর, স্ত্রী ও আত্মীয়স্বজনের মায়া এবং ঘরের আরাম-আয়েশ, বিলাস ব্যসন সবকিছুই বিসর্জন দিতে পারে, তাদের চেয়ে বেশি আল্লাহর ভালোবাসা ও সন্তুষ্টি লাভের অধিকারী আর কে? সাফল্য ও বিজয়ের সিংহদ্বার তাদের জন্য ছাড়া আর কার জন্য উন্মুক্ত হতে পারে? তাদের শক্তির উৎস অনেক গভীর থেকে প্রথিত । ১৮৮২ সালে শহীদ দিবস উপলক্ষে লিখেছেন– মানুষকে যদি মানুষের মত বাঁচিতে হয় তাহা হইলে এই মানুষ খেকো আদর্শকে দুনিয়ার প্রতিটি প্রান্ত হইতে চিরতরে উৎখাত করিতে হইবে, নির্মূল করিতে হইবে। এই রক্তপিপাসু অনুসারিদের বিরুদ্ধে দুনিয়ার প্রতিটি প্রান্তে গড়িয়া তুলিতে হইবে প্রতিরোধ। বাংলার প্রতিটি জনতাকে এই বন্য আদর্শের আসল চেহারা আর অনুসারীদের আসল চরিত্র বুঝাইতে হইবে। দেশকে বাঁচাইতে হইলে সর্বোপরি ঈমান-আকিদা লইয়া বাঁচিতে চাহিলে বলিষ্ঠ প্রত্যয়ের সাথে সিদ্ধান্ত লইতে হইবে। ঈমানদার প্রতিটি মানুষকে আজ অগ্রণী ভূমিকা পালনের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। অন্যথায় শুধু বুক চাপড়াইয়া শহীদদের জন্য শোক করিয়া কোন লাভ নাই। আজ গজলের কলিগুলি বড় আবেগে-আপ্লুত কণ্ঠে গাহিতে ইচ্ছা করিতেছে–

"তোরি দেশের বাকে বাকে
লক্ষ্য শহীদ আজো ডাকে
তবুও কি তুই রইবি বেহুঁশ
আজি একথার জবাব যে চাই"

জবাব দিতে হইলে মুখের কথায় অথবা মিটিং-মিছিল আর প্রতিবাদ সভায় কাজ হইবে না। ঈমানের আলোতে প্রজ্বলিত বক্ষের তাজা শহীদি খুনের নজরানা চাই।" আজ জীবিত আব্দুল কাদেও মোল্লার চাইতে শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লা অনেক বেশি শক্তিশালী। জেল-জুলুম-নির্যাতন, হত্যা, গুম, খুন চালিয়ে ইসলামী আন্দোলনকে স্তব্ধ করা যায়না, বরং দ্বীনের বিজয় অনিবার্য হয়ে উঠে। যারা আব্দুল কাদের মোল্লাকে হত্যা কওে এদেশকে, কলোনীভুক্ত করার স্বপ্ন দেখছে, শহীদদের রক্তের শপথ নিয়ে বাংলার তৌওহীদি জনতা তা রুখে দাঁড়াবে ইনশাল্লাহ। হে আরশের মালিক তুমি শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লাসহ সকল শহীদদের শাহাদাতের সবোচ্চ মর্যাদা দাও। তাদের ত্যাগের মিনিময়ে এই জমিনকে দ্বীনের জন্য কবুল করো, আমাদেরকে তাদের দেখানো পথে কবুল করো। ইহকালের একই কাফেলায় আমরা যেমনি ছিলাম, জান্নাতেও তেমনি থাকার তাওফিক দিও। আমীন

www.pathagar.com

স্ত্রীকে লেখা শহীদ আবদুল কাদের মোল্লার শেষ চিঠি

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম।

প্রিয়তমা জীবন সাথী পেয়ারী,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

আজ পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশিত হওয়ার পর খুবসম্ভব আগামী রাত বা আগামীকাল জেলগেটে আদেশ পৌঁছানোর পরই ফাঁসির সেলে আমাকে নিয়ে যেতে পারে। এটাই নিয়ম।

সরকারের সম্ভবত শেষ সময়। তাই শেষ সময়ে তারা এই জঘন্য কাজটি দ্রুত করে ফেলার উদ্যোগ নিতে পারে। আমার মনে হচ্ছে তারা রিভিউ পিটিশন গ্রহণ করবে না। যদি করেও তাহলে তাদের রায়ের কোনো পরিবর্তন হওয়ার দুনিয়ার দৃষ্টিতে কোনো সম্ভাবনা নেই। মহান আল্লাহ যদি নিজেই এই সিদ্ধান্ত বাস্ত বায়নের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার সিদ্ধান্ত কার্যকর করেন, তাহলে ভিন্ন কথা। অথচ আল্লাহর চিরন্তন নিয়মানুযায়ী সব সময় এমনটা করেন না। অনেক নবীকেও তো অন্যায়ভাবে কাফেররা হত্যা করেছে। রাসূলে করীম ﷺ-এর সাহাবায়ে কেরাম এমনকি মহিলা সাহাবীকেও অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছে। আল্লাহ অবশ্য ঐ সমস্ত শাহাদাতের বিনিময়ে সত্য বা ইসলামকে বিজয়ী করার কাজে ব্যবহার করেছেন। আমার ব্যাপারে আল্লাহ কি করবেন তা তো জানার উপায় নেই।

গতকাল ভারতের পররাষ্ট্র সচিব সুজাতা সিং এসে আওয়ামী লীগকে শুধু সাহসই দেন নাই, হুসেইন মুহাম্মাদ এরশাদকে চাপও দিয়েছেন। এবং সতর্ক করার জন্য জামায়াত-শিবিরের ক্ষমতায় আসার ভয়ও দেখিয়েছেন। এতে বুঝা যায় যে, জামায়াত এবং শিবির-ভীতি এবং বিদ্বেষ ভারতের প্রতি রক্তকণায় কিভাবে সঞ্চারিত। আমি তো গোড়া থেকেই বলে আসছি, আমাদের বিরুদ্ধে সরকার যেসব পদক্ষেপ নিচ্ছে এটার সবটা ছকই ভারতের অঙ্কন করা। আওয়ামী লীগ চাইলে এখান থেকে পেছাতে পারবে না। কারণ তারা ভারতের কাছে আত্মসমর্পণের বিনিময়েই এবার ক্ষমতা পেয়েছে।

অনেকেই নীতি-নৈতিকতার প্রশ্নে কথা বলেন, আমাকেসহ জামায়াতের সকলকে সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে যে কায়দায় জড়ানো হয়েছে এবং আমাদের দেশের প্রেসের প্রায় সবগুলোই সরকারকে অন্যায় কাজে সহযোগিতা করছে, তাতে সরকারের পক্ষে নীতি-নৈতিকতার আর দরকার কি? বিচারব্যবস্থাই যেখানে নিরপরাধ মানুষকে হত্যায় ব্যবস্থা করছে, তাতে স্বাভাবিক ন্যায়বিচারের আশা করা কোনক্রমেই সমীচীন নয়। তবে একটি আফসোস যে, আমাদেরকে বিশেষ করে আমাকে যে সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেয়া হয়েছে, তা জাতির সামনে বলে যেতে পারলাম না। গণমাধ্যম বৈরী থাকায় এটা পুরাপুরি সম্ভবও নয়। তবে

www.pathagar.com

জাতি পৃথিবীর ন্যায়পন্থী মানুষ অবশ্যই জানবে এবং আমার মৃত্যু এই জালেম সরকারের পতনের কারণ হয়ে ইসলামী আন্দোলন অনেক দূর এগিয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

কালই সূরা আত-তাওবার ১৭ থেকে ২৪ আয়াত আবার পড়লাম। ১৯ নং আয়াতে পবিত্র কাবা ঘরের খেদমত এবং হাজীদের পানি পান করানোর চাইতে মাল ও জান দিয়ে জেহাদকারীদের মর্যাদা অনেক বেশি বলা হয়েছে। অর্থাৎ স্বাভাবিক মৃত্যুর চাইতে অন্যায়ের বিরুদ্ধে আল্লাহর দেয়া ন্যায়ভিত্তিক ব্যবস্থা অর্থাৎ ইসলাম প্রতিষ্ঠার জেহাদে মৃত্যুবরণকারীদের আল্লাহর কাছে অতি উচ্চ মর্যাদার কথা আল্লাহ স্বয়ং উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ নিজেই যদি আমাকে জান্নাতের মর্যাদার আসনে বসাতে চান তাহলে আমার এমন মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত। কারণ জালেমের হাতে অন্যায়ভাবে মৃত্যু জান্নাতের কনফার্ম টিকেট।

সম্ভবতঃ ১৯৬৬ সালে মিসরের জালেম শাসক কর্নেল নাসের সাইয়্যেদ কুতুব, আব্দুল কাদের আওদাসহ অনেককে ফাঁসি দিয়েছিলেন। "ইসলামী আন্দোলনের অগ্নি পরীক্ষা" নামক বিষয়ে বিভিন্ন শিক্ষা শিবিরে বক্তব্য শুনেছি। একাধিক বক্তব্যে অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেব বাম হাতটা গলার কাছে নিয়ে প্রায়ই বলতেন, 'ঐ রশি তো এই গলায়ও পড়তে পারে'। আমারও হাত কয়েকবার গলার কাছে গিয়েছে। এবার আল্লাহ যদি তার সিদ্ধান্ত আমার এবং ইসলামের অগ্রগতির সাথে সাথে জালেমের পতনের জন্য কার্যকর করেন, তাহলে ক্ষতি কি? শহীদের মর্যাদার কথা বলতে গিয়ে রাসূলে করিম ﷺ বারবার জীবিত হয়ে বারবার শহীদ হওয়ার কামনা ব্যক্ত করেছেন। যারা শহীদ হবেন, জান্নাতে গিয়ে তারাও আবার জীবন এবং শাহাদাত কামনা করবেন। আল্লাহর কথা সত্য, মুহাম্মদ ﷺ-এর কথা সত্য। এ ব্যাপারে সন্দেহ করলে ঈমান থাকে না।

এরা যদি সিদ্ধান্ত কার্যকর করে ফেলে তাহলে ঢাকায় আমার জানাজার কোনো সুযোগ নাও দিতে পারে। যদি সম্ভব হয় তাহলে মহল্লার মসজিদে এবং বাড়িতে জানাজার ব্যবস্থা করবে। পদ্মার ওপারের জেলাগুলোর লোকেরা যদি জানাজায় শরীক হতে চায়, তাহলে আমাদের বাড়ির এলাকায়ই যেন আসে। তাদেরকে অবশ্যই খবর দেয়া দরকার।

কবরের ব্যাপারে তো আগেই বলেছি আমার মায়ের পায়ের কাছে। কোন জৌলুষপূর্ণ অনুষ্ঠান বা কবর বাঁধানোর মতো বেদআত যেন না করা হয়। সাধ্যানুযায়ী ইয়াতিমখানায় কিছু দান-খয়রাত করবে। ইসলামী আন্দোলনে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে সাহায্য-সহযোগিতা করবে। বিশেষ করে আমার গ্রেফতার এবং রায়ের কারণে যারা শহীদ হয়েছে, অভাবগ্রস্ত হলে ঐসব পরিবারকে সাহায্য-সহযোগিতার ব্যাপারে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

www.pathagar.com

হাসান মওদূদের পড়াশুনা এবং তা শেষ হলে অতি দ্রুত বিবাহ্ শাদীর ব্যবস্থা করবে। নাজনীনের ব্যাপারেও একই কথা।

পেয়ারী, হে পেয়ারী,

তোমাদের এবং ছেলেমেয়ের অনেক হকই আদায় করতে পারিনি। আল্লাহর কাছে পুরস্কারের আশায় আমাকে মাফ করে দিও। তোমার জন্য বিশেষভাবে দোয়া করেছি যদি সন্তান-সন্ততি এবং আল্লাহর দ্বীনের জন্য প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে আল্লাহ যেন আমার সাথে তোমার মিলিত হওয়ার ব্যবস্থা করেন। এখন তুমি দোয়া করো, যাতে আমাকে দুনিয়ার সমস্ত মায়া-মহব্বত আল্লাহ আমার মন থেকে নিয়ে শুধু আল্লাহ এবং রাসূলে করীম ﷺ-এর মহব্বত দিয়ে আমার সমস্ত বুকটা ভরে দেন।

ইনশাআল্লাহ, জান্নাতের সিঁড়িতে দেখা হবে।

সন্তানদেরকে সবসময় হালাল খাওয়ার পরামর্শ দিবে। ফরজ, ওয়াজিব, বিশেষ করে নামাজের ব্যাপারে বিশেষভাবে সকলেই যত্নবান হবে। আত্মীয়-স্বজনদেরকেও অনুরূপ পরামর্শ দিবে। আব্বা যদি ততদিন জীবিত থাকেন তাকে সান্ত্বনা দিবে।

তোমাদেরই প্রিয়

আবদুল কাদের মোল্লা

শহীদ আবদুল কাদের মোল্লার লেখা থেকে

"যে মরণের জন্য আমার লোভ হয়"

১৯৯৯ সালের ৮ অক্টোবর দৈনিক সংগ্রাম-এ মরহুম আব্বাস আলী খান-এর স্মরণ সংখ্যায় "যে মরণের জন্য আমার লোভ হয়" শিরোনামে শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লা লিখেছেন, "আমার মনিব ও রবের কাছে বলতে ইচ্ছা করে "হে আমার রব, বিশ্ব জাহানের মালিক তোমার কুদরতী কলমে যদি আমার জন্য শাহাদাতের মউত লিখে থাক, তাহলে আমার জন্য খোশ নসিব। এটাই আমার আন্তরিক কামনা। যদি তা আমার মত গুনাহগারের জন্য নাই লিখে থাক, তাহলে কমপক্ষে আল মুকাররামার কাবাতে সিজদার তথা তাওয়াফরত অবস্থায় অথবা মানবতার পরম বন্ধু রাসূলে পাককে ﷺ যেখানে চির নিদ্রায় শুইয়ে রেখেছো, সেই সোনার মদীনায় আমার মৃত্যু দান কর। আর যদি এই গুনাহগারের জন্য তাও তুমি না দাও তাহলে কমপক্ষে আমার রুহানী পিতৃতুল্য মরহুম আব্বাস আলী খানের মত একটি সার্থক মরণ দাও, যেখানে জানাযায় গিয়ে এবং পরেও অগণিত মানুষ আমার গুণাহ মাফের জন্য শিশুর মত কাঁদবে আর দোয়া করবে গুণাহগারের জন্য জান্নাতের।"

www.pathagar.com

'শোক করিয়া লাভ নেই- শহীদি খুনের নজরানা চাই'

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের জাসদ ছাত্রলীগের হামলায় নিহত ৩ শিবির নেতার ঘটনায় শহীদ দিবসে ১৯৮২ সালে ১৫ মার্চ সাপ্তাহিক সোনার বাংলায় শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লার 'শোক করিয়া লাভ নেই- শহীদি খুনের নজরানা চাই' শীর্ষক নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। এতে তিনি লিখেন, "আমি কিন্তু এত হিংস্রতা, এত নিষ্ঠুরতা, এতটা অমানবিক আচরণে মোটেই বিস্মিত হই নাই। তিনজন শহীদের জন্য শোক করারও তেমন কিছু দেখি না। বরং অত্যন্ত প্রাণান্ত চিত্তে ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি, আমার মনে হইয়াছে ঘটনা অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই অগ্রসর হইতেছে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের, পশুত্বের বিরুদ্ধে মানবতার, অমানুষের বিরুদ্ধে মানুষের, সর্বোপরি কুফরীর বিরুদ্ধে ইসলামের সংগ্রামের ইতিহাস এইভাবেই রক্তের অক্ষরে লেখা। কোন নবীই এই পথ এড়াইতে পারেন নাই, কোন মুজাদ্দিদের জন্যই ভিন্ন পথ ছিল না, কোন ইমামও অন্যপ্রকার পুষ্প আচ্ছাদিত পথের কথা চিন্তাও করেন নাই। সুতরাং এ যুগেও যাহারা ঐ একই পথের যাত্রী বলিয়া দাবি করে, তাহাদের পথ ভিন্নতর কিছু হইবে কেমন করিয়া। ইসলামের গোটা ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে যেন আমার মনে হয়, ইসলাম নামক শ্যামল সতেজ গাছের রং সারের অভাবে যখনই ফিঁকা রং পিঙ্গল হইয়া গিয়াছে, তখনই শহীদের তাজা রক্তের সার দিয়া গাছটিকে আবার তরতাজা করিয়া ফুলে-ফলে সুশোভিত করা হইয়াছে। সুতরাং ভয়ের কিছু নাই। শঙ্কার কিছু নাই, আক্ষেপেরও কিছু দেখতেছি না; বরং দিবাদৃষ্টিতে যেন দেখিতেছি এই দেশেই ইসলামের কালেমা খচিত বিজয়ী পতাকা শহীদদের রক্তের মিনারের চূড়ায় পতপত করিয়া উড়িতেছে। শহীদ সাব্বিরের পিতার অসমান্য ধৈর্য দেখিয়া আমার ঈমান ইয়াকীনে পরিণত হইয়াছে।"

"দেশের মানুষকে বাঁচাইতে হইলে, সর্বোপরি ঈমান আকিদা লইয়া বাঁচিতে চাহিলে বলিষ্ঠ প্রত্যয়ের সাথে সিদ্ধান্ত লইতে হইবে। ঈমানদার প্রতিটি মানুষকে আজ অগ্রণী ভূমিকা পালনের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। অন্যথায় শুধু বুক চাপড়াইয়া শহীদদের জন্য শোক করিয়া কোন লাভ নাই। আজ একটি কলিগুলো বড় আবেগ-আপ্লুত কণ্ঠে গাহিতে ইচ্ছা করিতেছে–

"তোরি দেশের বাঁকে বাঁকে
লক্ষ শহীদ আজও ডাকে
তবুও কি তুই রইবি বেহুঁশ
আমি এ কথার জবাব চাই।"

জবাব দিতে হইলে মুখের কথায় অথবা মিটিং মিছিল আর প্রতিবাদ সভায় কাজ হইবে না। ঈমানের আলোতে প্রজ্জ্বলিত বক্ষের তাজা শহীদী খুনের নজরানা চাই।"

www.pathagar.com

শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লার পরিবারের ৯ প্রশ্ন উত্তর দিবে কে?

আব্দুল কাদের মোল্লার আপিলের রায়ের পর পরিবারের পক্ষ থেকে জাতির সামনে ৯টি প্রশ্ন তোলা হয়েছিল।

(এক) চলতি বছরের ৫ই ফেব্রুয়ারী ট্রাইব্যুনালের দেয়া যাবজ্জীবন কারাদণ্ড সাজার পরে তথাকথিত গণজাগরণ মঞ্চের চাপের মুখে ১৮ই ফেব্রুয়ারী আইন সংশোধন করে সংশোধিত আইনে সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ কর্তৃক মৃত্যুদণ্ডের যে রায় প্রদান করা হয়েছে তা আর্ন্তজাতিক ও দেশীয় আইনের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

(দুই) ৬ নং অভিযোগে হযরত আলী লস্কর পরিবার হত্যাকাণ্ডে মাত্র একজন সাক্ষী মোমেনা বেগমের সাক্ষ্যর ভিত্তিতে ফাঁসির রায় দেয়া হল যা বাংলাদেশের বিচার বিভাগের ইতিহাসে নজিরবিহীন। অবাক করা ব্যপার হল সাক্ষীর বয়স ঘটনার সময় ছিল মাত্র ১৩ বছর। এমন রায় কি আদৌ গ্রহণযোগ্য?

(তিন) হযরত আলী লস্করের মেয়ে সরকারের সাক্ষী মোমেনা বেগম ২৮.০৯.২০০৭ তারিখে মিরপুরের জল্লাদখানায় মুক্তিযোদ্ধা যাদুঘরের জাহেদা খাতুন তামান্নার কাছে দেয়া সাক্ষাতকারের কোথাও তার পরিবারের হত্যাকাণ্ডের ব্যপারে আব্দুল কাদের মোল্লার নাম বলেননি। সাক্ষাতকার থেকে আরো জানা যায় যে, তিনি ঘটনার সময় তার কেরানীগঞ্জের শ্বশুরবাড়ীতে ছিলেন এবং ঘটনার পরে মানসিক ভাবে ভারসাম্যহীন হয়ে পড়েন। জল্লাদখানার কাগজপত্র আপীল বিভাগে উপস্থাপন করার পরেও এমন একজন সাক্ষীর সাক্ষ্য বিবেচনায় এনে কিভাবে এই ফাঁসির রায় দেয়া হল?

(চার) আরো বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, এই মোমেনা বেগম মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তার কাছে ১৩.০৮.২০১১ তারিখে দেয়া জবানবন্দীতে কোথাও তার পরিবারের সদস্যদের হত্যাকারী হিসেবে আব্দুল কাদের মোল্লার নাম বলেননি। স্বাধীনতার ৪২ বছর পরে দ্বিতীয় বারের মত নিজ পরিবারের হত্যাকাণ্ডের কথা বলতে এসে মোমেনা বেগম কেন একটি বারের জন্য আব্দুল কাদের মোল্লার নাম বললেন না, এটা চরম অবাক করার ব্যাপার। আরো হতবাক করা ব্যাপার এই যে, এই সাক্ষীর সাক্ষ্যর ভিত্তিতে কিভাবে আপীল বিভাগ ফাঁসির সাজা দিলেন?

(পাচ) অথচ ১৭.০৭.২০১২ তারিখে মোমেনা বেগম ট্রাইবুনাল-২ এ এসে আব্দুল কাদের মোল্লার নাম হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িয়ে সাক্ষ্য দিলেন। সাক্ষ্য দেওয়ার পর মোমেনা বেগমকে ডিফেন্স পক্ষের জেরায় আব্দুল কাদের মোল্লাকে তার পরিবারের হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকতে স্বচক্ষে দেখেছেন- এই কথা অস্বীকার করেছেন ও পরস্পরবিরোধী বক্তব্য দিয়েছেন। এই সাক্ষ্যর ভিত্তিতে বিচারকরা কিভাবে ফাঁসির আদেশ দিলেন?

www.pathagar.com

(ছয়) আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, তদন্তকারী কর্মকর্তা মনোয়ারা বেগমের জবানবন্দী ও জেরা থেকে জানা যায় মোমেনা বেগমকে ৩ নং অভিযোগ সাংবাদিক খন্দকার আবু তালেব হত্যাকাণ্ডের সাক্ষী হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল। অথচ মোমেনা বেগম এসে সাক্ষী দিলেন ৬ নং অভিযোগে। এ অদ্ভুত ব্যাপারগুলো আমলে না নিয়ে এই অভিযোগ ও সাক্ষীর ভিত্তিতে কি ভাবে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হল?

(সাত) কেন এমন একজন অপরাধীর(?) বিরুদ্ধে একজন চাক্ষুষ স্বাক্ষীও পাওয়া গেল না? বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় উল্লেখিত সমাজের চিহ্নিত সন্ত্রাসী, বিচারকের জমি দখলকারী, চাঁদাবাজ লোকদেরকে সরকারের সাক্ষী বানানো হলো কেন?

(আট) অপরদিকে আব্দুল কাদের মোল্লার পক্ষে অবসর প্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক, চল্লিশ বছর ধরে চাকরি করা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমাম, হিন্দু ধর্মালম্বী প্রমূখ ব্যক্তিগণের দেয়া সাক্ষ্য বিবেচনায় নেয়া হলো না কেন?

(নয়) আব্দুল কাদের মোল্লা ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদুল্লাহ হলের আবাসিক ছাত্র হিসেবে অধ্যয়ন করেছেন, ১৯৭৪-৭৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত উদয়ন উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন, ১৯৭৭ সালে বাংলাদেশ রাইফেলস কলেজের সিনিয়র শিক্ষক ও পরবর্তীতে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন, জাতীয় প্রেসক্লাবের সদস্য ও পরপর দুইবার ১৯৮২ ও ১৯৮৩ সালে ঢাকা ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সহ-সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন, স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন, স্বৈরাচার বিরোধী ও কেয়ারটেকার সরকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টির বিভিন্ন জাতীয় নেতাদের সাথে লিয়াজো কমিটিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। এগুলো কোন কিছু বিবেচনায় না এনে শুধু রাজনৈতিক কারণে যে ফাঁসির রায় দেয়া হল তা কি মেনে নেয়া যায়?

শহীদ আবদুল কাদের মোল্লার স্মৃতি নিয়ে তার স্ত্রী সানোয়ার জাহানের লেখা

"ছোটবেলা থেকে সবাই আমাকে পিয়ারি বলে ডাকতো। আমাদের অরিজিনাল বাড়ি ছিল মুর্শিদাবাদে। আমার দাদারা জমিদার ছিলেন। আমার আব্বা উচ্চশিক্ষিত ছিলেন। পাকিস্তান হওয়ার পরে কলকাতার চাকরি ছেড়ে পূর্ব পাকিস্তানে চলে আসেন। ঢাকায় এসে সরকারি চাকরিতে যোগ দেন। এই সরকারি চাকরির সুবাদে বিভিন্ন জেলায় ঘুরেছেন। তিনি শেষ বয়সে দিনাজপুরে ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে অবসর নেন ও স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। আমার ভালো নাম সানোয়ার জাহান, আমার পিতার নাম মীর নাতেক আলী ও মাতা নূরজাহান বেগম।"

www.pathagar.com

আমি ইডেন মহিলা কলেজে ইন্টারমিডিয়েট পড়ার সময়ে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়। ঐতিহাসিক ৭ মার্চের জনসভায় আমি প্রথম সারিতে অবস্থান নিয়েছিলাম। আমি তখন ছাত্র ইউনিয়নের কর্মী। আমি ২৩ মার্চ রাতে ঢাকা ত্যাগ করি ও কুষ্টিয়ার কুমারখালী চলে যাই। তখন আব্বা সেখানকার সার্কেল অফিসার ছিলেন। সেখানকার আওয়ামী লীগ নেতা কিবরিয়া সাহেব (পরবর্তীতে এমপি)-সহ অন্যান্য নেতাদের সাথে আমাদের পরিবারের সুসম্পর্ক ছিল। তারা আমাদের বাসায় আসতেন। যুদ্ধ শুরু হলে আমরা কুমারখালী ছেড়ে খোকশা নামক গ্রামের দিকে চলে যাই। মাসখানেক পরে আমরা আবার কুমারখালীতে ফেরত আসি। ওখানে আমরা নানা উপায়ে মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করি ও সাহায্য-সহযোগিতা করি। আমার মা মুক্তিযোদ্ধাদের খাবার সরবরাহ করতেন। স্বাধীনতার যুদ্ধে বিজয় অর্জিত হওয়ার পরে মুক্তিযোদ্ধারা বাসায় এসে উল্লাস করে ও মিষ্টি বিতরণ করে। এর কিছুদিন পরে আমরা দিনাজপুরে চলে যাই। এরও কিছু দিন পরে আমি ইডেন মহিলা ছাত্রী ইউনিয়নের জিএস ছিলাম। পরে আমি ছাত্রী ইউনিয়নের নেত্রীদের নিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি শেখ মুজিবরের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছি।

১৯৭৭ সালে পারিবারিকভাবে আবদুল কাদের মোল্লার সাথে আমার বিয়ে হয়। তখন আবদুল কাদের মোল্লা একজন মেধাবী ছাত্র ও লেখক হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন। আমার আব্বা দৈনিক ইত্তেফাকে পবিত্র শবে মেরাজের উপরে একটা লেখা পড়ে আব্দুল কাদের মোল্লাকে পছন্দ করেন। তখন তাঁর নামে কোনো যুদ্ধ অপরাধ তো দূরের কথা, সাধারণ যে কোনো অপরাধের জন্যও কোনো মামলা এমন কি জিডি পর্যন্ত হয়নি। তাঁর যদি কোনো মামলা অথবা কোনো গুজবও থাকতো, তবে আমাদের মতো সম্ভ্রান্ত পরিবার উনার সাথে আমার বিয়ে দিতেন না, আমিও সম্মত হতাম না।

পর্দার ব্যাপারে উনি অত্যন্ত কঠোর ছিলেন। বিয়ের দিনে সুটকেসের ভিতরে আমার জন্য হাত ও পায়ের মোজা দিয়েছিলেন। আমার এক মামা মোজাগুলো দেখে বলেছিলেন 'এখনই এত কঠোরতা অবলম্বন করছো বাবা'। উত্তরে উনি বলেছিলেন 'বিড়াল মারলে প্রথম রাতে মারাই ভালো'।

আমি প্রথম যখন শ্বশুর বাড়িতে গেলাম, সারা গ্রামের লোকজন ভেঙ্গে পড়েছিলো আমাকে দেখার জন্য। কিন্তু উনি আমার পর্দা রক্ষার জন্য কঠোর ছিলেন। এতে আত্মীয়-স্বজনরা মনঃক্ষুণ্ন হলেও উনি তার পরোয়া করেননি।

আমার স্বামী আব্দুল কাদের মোল্লা ১৯৭৭ সালে জামায়াতে ইসলামীতে যোগ দেন। এরপর তিনি দৈনিক সংগ্রামে সাংবাদিকতা শুরু করেন। তিনি ১৯৮২/৮৩ সালে পরপর দুইবার ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের নির্বাচিত সহ-সভাপতি ছিলেন। ঐ সময় ইকবাল সোবহান চৌধুরীসহ প্রথিতযশা সাংবাদিকদের সাথে তিনি আড্ডা দিতেন প্রেস ক্লাবে। এই সময় সাংবাদিক ইউয়নিয়ন ও কল্যাণ

www.pathagar.com

ফাণ্ডের টাকা তিনি বিশ্বস্ততার সাথে সংক্ষরণ করেছেন। অসহায়, বেকার, দুঃস্থ, অসুস্থ সাংবাদিকদের কল্যাণে অন্যান্য সাংবাদিক নেতাদের সাথে নিয়ে কাজ করেছেন। তার আমানতদারীতা নিয়ে কেউ কোনোদিন কোন প্রশ্ন করেননি। কারণ তিনি ছিলেন সবার বিশ্বস্ত ও প্রিয় 'মোল্লা ভাই'।

তিনি ১৯৮৬ সালে এরশাদের শাসনামলে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে ভূমিকা রাখার কারণে গ্রেফতার হন। পরে গণ-আন্দোলনের মুখে সরকার তাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। ১৯৯১ সালে তিনি জামায়াতের ঢাকা মহানগরীর আমীর হন। এরপর ১৯৯৬ সালে তিনি কেয়ারটেকার সরকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে আওয়ামী লীগ নেতা তোফায়েল আহমেদ-এর সাথে গ্রেফতার হন। ঐ সময় তিনি আওয়ামী লীগ নেতা মোহাম্মদ নাসিম, আব্দুস সামাদ আজাদ, জাতীয় পার্টির নেতা আনোয়ার হোসেন মঞ্জুসহ প্রমুখদের সাথে লিয়াজোঁ কমিটির অন্যতম সদস্য ছিলেন। কিছুদিন পরেই তিনি জেল থেকে ছাড়া পান। পরে তিনি জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল হন। এই সুদীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে তিনি কখনোই যুদ্ধ অপরাধী অথবা অন্য কোনো মামলার অপরাধী এই কথা কেউ বলতে পারেনি। খুন-ধর্ষণ, লুটতরাজ ইত্যাদি জঘন্য সব অভিযোগ বা অভিযোগের গুজব কখনোই উনার নামে ছিল না।

আমার স্বামী আবদুল কাদের মোল্লা সব সময় সৎ ছিলেন। হালাল রুজি-রোজগারের ব্যাপারে উনি অত্যন্ত কঠোর ছিলেন। উনার চাওয়া-পাওয়া অত্যন্ত সীমিত ছিল, অল্পেই তুষ্ট থাকতেন। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে উনার কোনো চাহিদা ছিল না। সারাদিন উনি নানা কাজে ব্যস্ত থাকলেও রাতে এসে ছেলে-মেয়েদের খোঁজ-খবর নিতেন।

আমার প্রথম সন্তান হওয়ার পর উনি প্রোগ্রাম করে বাসায় এসে বাচ্চাকে ধরে রাখতেন। এমনকি পায়খানা-প্রস্রাবও করিয়ে দিতেন। বাচ্চাদেরকে ঘাড়ে করে উনি ঘুরে বেড়াতেন।

উনি নিজের কাজ নিজে করতে পছন্দ করতেন। সেলাই করা থেকে শুরু করে কাপড় ধোয়া, উনি নিজে করতে চাইতেন বা করতেন। উনার যত কাজই থাক, কুরআন তিলাওয়াত ও হাদীস না পড়ে সাধারণত ঘুমাতেন না। স্ত্রী হিসেবে তিনি কখনো আমার অমর্যাদা করেননি। ছেলে-মেয়েসহ আমাদের প্রায়ই কুরআন-হাদীসের আলোকে শিক্ষাদান করতেন। সব সময় সত্যের ওপর থাকার জন্য তিনি জোর করতেন।

আমার স্বামী সারাজীবন একনিষ্ঠতার সাথে কাজ করে গেছেন। বিয়ের পর থেকে আমি দেখেছি উনি নিরলসভাবে সংগঠনের জন্য কিভাবে কাজ করেছেন। যখনই কেউ কোনো মিটিং বা প্রোগ্রামের জন্য ডেকেছে, উনি ছুটে গেছেন। ইসলামী আন্দোলনের প্রয়োজনে যখন যেখানে প্রয়োজন তিনি গিয়েছেন। আমার ছোট ছেলে মওদূদ হওয়ার দিন উনার কিশোরগঞ্জে প্রোগ্রাম ছিলো। উনি আমাকে

www.pathagar.com

বললেন যে, আমার তো জরুরি প্রোগ্রাম আছে। আমি চলে গেলে তুমি ম্যানেজ করে নিতে পারবে কি-না, আমি বললাম পারবো। উনি চলে গেলেন কিশোরগঞ্জ। পরের দিন এসে তিনি মওদূদ এর মুখ দেখলেন।

ব্যবসায়ী, কূটনীতিক, শিক্ষক, সাংবাদিক, সরকারি কর্মকর্তাসহ সব মহলে উনার গ্রহণযোগ্যতা ও অবাধ যাতায়াত ছিলো। উনার বুকভরা সাহস ছিলো।

সত্য কথা বলতে তিনি দ্বিধা করতেন না। তিনি অত্যন্ত রসিক লোক ছিলেন। নানা গল্পে-কৌতুকে রসময় কথায় আসর মাত করে রাখতেন। এই জন্য সকল মহলে উনার ব্যাপক জনপ্রিয়তা ছিলো।

সম্ভব হলে উনি আমাকে ও বাচ্চাদেরকে বেড়াতে নিয়ে যেতেন। উনার বিভিন্ন জেলায় নানা কর্মসূচি থাকতো। উনি সম্ভব হলে আমাকে নিয়ে যেতেন। বাসার কাজের মানুষের ব্যাপারে তিনি সহৃদয় ছিলেন। তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করার জন্য বলতেন। আত্মীয়-স্বজন আসলে তাদের আদর-যত্ন করার জন্য বলতেন। তিনি নানা সামাজিক সংস্থার সাথে যুক্ত ছিলেন। মাদরাসা, এতিমখানা, স্কুল, কলেজ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত ছিলেন।

জেলখানায় শেষ দুটি দেখায় উনি আমাকে বলেছেন, আমি ইসলামী আন্দোলন করার কারণে তোমাকে যতটুকু সময় প্রয়োজন ছিল দিতে পারিনি। ছেলে-মেয়েদের সব ইচ্ছে পূরণ করতে পারিনি। আমাকে ক্ষমা করো। আমি উত্তরে বলেছি, প্রশ্নই আসে না ক্ষমা করার। ইসলামী আন্দোলনের জন্য যা করা দরকার তুমি তাই করেছ। আমি বরং সাংসারিক প্রয়োজনে তোমাকে বিরক্ত করেছি। কারণে-অকারণে নানা প্রয়োজনের কথা বলেছি। উত্তরে তিনি বলেন, তোমরা সর্বঅবস্থায় আল্লাহর ওপর বিশ্বাস রাখবে ও ধৈর্য ধরবে।

যেদিন উনার ফাঁসি হয় সেদিন সাক্ষাতে উনি আমাকে বলেন– বাকি ছেলে-মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিবে। পারিবারিক সকল দায়িত্ব পালন শেষে আল্লাহ যেন তোমাকে দ্রুত আমার কাছে নিয়ে আসেন।

তিনি আরো বলেন তোমরা ব্যক্তিগতভবে কোনো প্রতিশোধ নেয়ার চেষ্টা করবে না। ইসলামী আন্দোলন এদেশে প্রতিষ্ঠা ও বিজয়ী হওয়ার মাধ্যমে আমার প্রতি যে অন্যায় করা হয়েছে, তার বদলা হবে। একমাত্র ইসলামকে এদেশে জয়ী করেই ইসলামী আন্দোলনের কর্মীরা আমার প্রতি ফোঁটা রক্তের প্রতিশোধ নিবে। এটা সবাইকে বলে দিবা। তিনি আরও বলেন– হালাল রোজগারের মাধ্যমে জীবন ধারণ করবা। হালাল রোজগারে কেউ কখনও না খেয়ে মরে না। আর কারও হারাম রোজগারের গাড়ি-বাড়ি দেখে আফসোস করবা না। এটা আল্লাহতায়ালার খুবই অপছন্দ। ইনশাআল্লাহ তোমাদের সাথে আমার জান্নাতের সিঁড়িতে দেখা হবে।

www.pathagar.com

পঞ্চম অধ্যায়

ঈমানের অগ্নিপরীক্ষা ও আল্লাহর সাহায্য

ঈমানের অগ্নিপরীক্ষা

সত্যের পথ সকল যুগেই ছিল কণ্টকাকীর্ণ। যুগে-যুগে সকল নবী-রাসূলগণই কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি হয়েছেন। কখনো কখনো তাদের জীবন ও আল্লাহর রাহে বিপন্ন হয়েছে। তবুও তাঁরা দমে যাননি। আল্লাহ বলেন,

كَاَيِّنْ مِّنْ نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّوْنَ كَثِيْرٌ فَمَا وَهَنُوْا لِمَا اَصَابَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَمَا ضَعُفُوْا وَمَا اسْتَكَانُوْا ۗ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الصّٰبِرِيْنَ.

"এর আগে এমন অনেক নবী চলে গেছে যাদের সাথে মিলে বহু আল্লাহ ওয়ালা লড়াই করেছে। আল্লাহর পথে তাদের ওপর যেসব বিপদ এসেছে তাতে তারা মনমরা ও হতাশ হয়নি, তারা দুর্বলতা দেখায়নি এবং তারা বাতিলের সামনে মাথা নত করে দেয়নি। এ ধরনের সবরকারীদেরকে আল্লাহ ভালবাসেন।"[৯৭]

সেই পথ ধরে খোলাফায়ে রাশেদীন, সাহাবায়ে আজমাঈনসহ সকল যুগেই সত্যপন্থীরা এই পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছেন। এই পরীক্ষা কোন কারণে আসেনি বরং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তা নির্ধারিত। এটি চিরন্তন।

ইসলামী আন্দোলনের ওপর জুলুমনির্যাতন যত বেশি আসবে আন্দোলন তত মজবুত ও শক্তিশালী হবে। সেই বিচারে বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলন সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার চূড়ান্ত আলামত এখন লক্ষণীয়। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর থেকে জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্রশিবিরের উপর হামলা, মামলা, খুন, গুম, অপহরণ, হত্যা, সন্ত্রাস, লুটপাটসহ তারা সকল প্রকার জুলুম-নির্যাতন চালিয়ে আসছে। আর প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মদদে এদেশ থেকে ইসলামী আন্দোলনকে নিমূল করতে তথাকথিত যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের নামে নেতৃবৃন্দকে হত্যা করছে।

কিন্তু শহীদের রক্তসিড়ি বেয়ে সকল বাধা অতিক্রম করে এদেশে ইসলামী আন্দোলন অনেক জনপ্রিয় ও গণমানুষের আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। এই কাফেলার কর্মীদের ত্যাগ, কুরবানী, ভ্রাতৃত্ব, পরকাল ভীতি এবং নিজেদের পরিশুদ্ধ করার অনেক উপাদানের সন্ধান পেয়েছে এই প্রতিকূল পরিস্থিতির

---

[৯৭] আল-ইমরান, ১৪৬

www.pathagar.com

মাঝে। মিডিয়ার অপপ্রচার, হিংসা-বিদ্বেষ ও উস্কানীমূলক বক্তব্যের কারণে এদেশের জনগণের মনে ইসলামী আন্দোলনকে জানার এক প্রচন্ড আগ্রহ তৈরি হয়েছে। বেড়েছে মানুষের সহানুভূতি ও ভালোবাসা। হাজার-হাজার মানুষ এ আন্দোলনে শরীক হচ্ছে প্রতিনিয়ত। আলহামদুলিল্লাহ।

আজ আমাদের অনেকের জীবনে জেল-জুলুম, নির্যাতন, হত্যা, ফাঁসি এগুলো নতুন হলেও ইসলামী আন্দোলনে তা একেবারেই পুরাতন। আজো পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে মুসলমানদের সাথে চলছে একই অচরণ। আজ মিশর, ফিলিস্তিন, মায়ানমার, আফগান্তিান, কাশ্মীর, দক্ষিণ আফ্রিকাসহ পৃথিবীর অনেক স্থানে চলছে মুসলমানদের ওপর অমানবিক নির্যার্তন। মূলত মানুষের ঈমানের পরীক্ষা হয় দুঃখ-কষ্ট ও মুসিবতের সময়। তখন সে আন্দাজ করতে পারে যে, এই পথে সে কতোখানি অবিচল থাকতে সক্ষম। কারণ জান ও মালের ক্ষতির আশঙ্কা হচ্ছে মানুষের মধ্যে সবচাইতে বড় দুর্বলতা মূল উৎস।

দ্বীনের পথে পরীক্ষা অবসম্ভাবী। সত্য ও মিথ্যার দ্বন্দ্ব চিরকালীন। সত্য প্রতিষ্ঠায় যুগে যুগে দ্বীনের দা'ঈদেরকে সহ্য করতে হয়েছে নানা অথ্যাচার, নির্যাতন, কারাবরণ এমনকি দিতে হয়ে জীবন। আজও বিশ্বব্যাপী দ্বীনের দা'ঈদের ওপর চলছে জেল-যুলুম, নির্যাতন, অত্যাচার, নিষ্পাপ-নিরাপরাধ মানুষদেরকে ঝুলানো হচ্ছে ফাঁসির দড়িতে। আজকের ইসলাম বিদ্বেষী শক্তি ইসলামী আন্দোলনের অগ্রযাত্রা রুখতে চারটি কৌশল নিয়েছে, তা হলো :

১. Stage one is the crisis সঙ্কট সৃষ্টি করা।
২. Stage two is the demoniation of the enemy leader-নেতাকে দানব হিসেবে তুলে ধরা,
৩. Stage three is the dehumaniting of the enemy as individual-ব্যক্তিগতভাবেও শত্রু মনুষ্যত্বহীন বলে প্রচার করা,
৪. Stage four is the atrocity stage- শত্রুর অত্যাচার ও নৃশংসতা ও নাশকতার গল্প তৈরি করা।

যে গল্পের ডিজাইন পৃথিবীর সকল মুসলমানের জন্য অভিন্ন। স্থান-কালভেদে এর মুখোশ আলাদা আলাদা। অবশ্য বর্তমানে পশ্চিমাদের পরিকল্পনা অর্থবিত্তে পরিচালিত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কতিপয় বেতনভুক্ত তথাকথিত সুশীল নামধারী ব্যক্তি, সংস্থা ও মিডিয়া বাংলাদেশের ইসলাম ও ইসলামী আন্দোলনের বিরোধিতায় যথেষ্ট পারঙ্গম। ইসলামী দল ও নেতৃত্বের চরিত্র হননে যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিচ্ছে প্রতিনিয়ত। এর উদ্দেশ্য শুধু ব্যক্তিকে কষ্ট দেয়াই না, বরং ঐ আন্দোলনকে হেয় করা ও তার ভাবমর্যাদা ক্ষুণ্ন করা। ঐ আন্দোলনের

www.pathagar.com

ক্রমবর্ধমান প্রসারে সবাইকে আতংকিত করা এবং ঐ দলের জনপ্রিয়তা নষ্ট করা। কিন্তু প্রচণ্ড বেগবান একটা স্রোতধারাকে বালির বাঁধ দিয়ে ঠেকানো যেমনি অসম্ভব।

কিন্তু কখনো কখনো আমাদের মতো দুর্বল ঈমানদারদেরও একথা মনে আসাটা অস্বাভাবিক নয়, এতো পরীক্ষা কেন? মনে রাখতে হবে ঈমানের পরীক্ষা হয় দুঃখ-কষ্ট ও মুসিবতের সময়। তখন সে নিজে যেমন নিজের অবস্থাটা উপলব্ধি করতে পারে, তেমনি আন্দাজ করতে পারে যে, এ পথে সে কতোখানি অবিচল থাকতে সক্ষম। উদ্দেশ্যের প্রতি স্বাভাবিক ভালোবাসা এ জীবন পণ করার সংকল্পে তারা বাস্তবিকই কতোটা প্রস্তুত। এর মধ্যে দিয়ে আসল ও মেকীর পার্থক্যটা অত্যন্ত সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। জীবনে জান ও মালের ক্ষতির আশঙ্কা হচ্ছে মানুষের সবচাইতে বড়ো দুর্বলতার মূল উৎস। আবার এমনি প্রত্যয় এবং ঈমানই হচ্ছে শক্তির মূল ভিত্তি।

এটি পরিবর্তনের ক্ষমতা কারো নেই। সা'আদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! মানুষের মধ্যে সর্বাধিক কঠিন পরীক্ষার সম্মুখিন হবে কারা? জবাবে তিনি বলেন- "নবীগণ অত:পর তাদের অনুরূপগণ। অত:পর তাদের অনুরূপগণ (অর্থাৎ সম্মানিতগণ, অত:পর সম্মানিতগণ এবং পর্যায়ক্রমে উচ্চ পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিতগণ), বান্দা তার দ্বীনের পরিধি অনুযায়ী পরীক্ষিত হবে। অতএব যদি তারা দ্বীনের ব্যাপারে কঠিন মজবুত হয় তাহলে তার পরীক্ষাও কঠিন হবে, আর যদি সে দ্বীনের ব্যাপারে নরম হয় তাহলে তার দ্বীনের পরিধি অনুযায়ী তাকে পরীক্ষা করা হবে, এভাবে বান্দার নিকট বালা-মুছিবত আসতেই থাকবে (এবং ক্ষমা হতেও থাকবে) যেন সে পাপমুক্ত হয়ে পৃথিবীতে চলতে থাকে। শায়েখ সা'আদী (রহ) বলেন, "আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই স্বীয় বান্দাদের বিপদাপদ দিয়ে পরীক্ষা করবেন এ জন্য যে, যেন সত্যবাদী, মিথ্যাবাদী এবং ধৈর্যশীল ও ধৈর্যহারা ব্যক্তির মধ্যে সুস্পষ্ট প্রমাণ পরিলক্ষিত হয়।[৯৮]

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উম্মতেরা আজ পর্যন্ত পৃথিবীর প্রান্তে-প্রান্তে সেই একই পরিস্থিতির সম্মুখীন। যুগে-যুগে সত্যপন্থীদেরকেই আল্লাহ বিজয় দান করেছেন। আল্লাহ তা'আলা ইসলামী আন্দোলনের বিজয় সংখ্যার ভিত্তিতে নির্ধারিত করেননি; কারণ বিজয় এবং তাঁর সাহায্য পাওয়ার জন্য কতগুলো গুণাবলী অর্জনকে বান্দার জন্য বাধ্যতামূলক করে দিয়েছেন। যদি বান্দাহ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে এই শর্তগুলো পূরণে সফল হয়, তাহলে আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দাহকে সাহায্য করার ওয়াদা আল্লাহ তা'য়ালা নিজেই

---

[৯৮] ইমাম তিরমিযী ও ইমাম ইবনু মাজাহ।

www.pathagar.com

করেছেন। সুতরাং বাতিলের ষড়যন্ত্র আর চক্রান্ত দেখে হতাশ না হয়ে মুমিন বান্দার উচিৎ আল্লাহর সাহায্য পাওয়ার উপযুক্ততা অর্জনে সচেষ্ট হওয়া। নিজেদের দূর্বলতার প্রতি নজর দেয়া। আল্লাহ বলেন -

وَلَا تَهِنُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ۔

"আর তোমরা নিরাশ হয়ো না এবং দুঃখ করো না। যদি তোমরা মুমিন হও তবে, তোমরাই জয়ী হবে।"[৯৯]

এমনই একটি প্রেক্ষাপটে মহাগ্রন্থ আল কুরআনের সূরা আনকাবুত সূরায় ফুটে উঠেছে। মক্কায় তখন এমন এক পরিস্থিতি বিরাজ করছিল। ইসলাম গ্রহণ করলেই তার ওপর বিপদ-আপদ ও জুলুম-নিপীড়নের পাহাড় ভেঙ্গে পড়তো। কোন গোলাম বা গরীব মানুষ ইসলাম গ্রহণ করলে তাকে ভীষণভাবে মারপিট এবং কঠোর নির্যাতন-নিপীড়নের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত করা হতো। সে যদি কোন দোকানদার বা কারিগর হতো তাহলে তার রুজি-রোজগারের পথ বন্ধ করে দেয়া হতো। সে যদি কোন প্রভাবশালী পরিবারের কোন ব্যক্তি হতো তাহলে তার নিজের পরিবারের লোকেরা তাকে নানাভাবে বিরক্ত করতো ও কষ্ট দিতো এবং এভাবে তার জীবনকে দুর্বিসহ করে তুলতো। এ অবস্থায় মক্কায় এক মারাত্মক ভীতি ও আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি করে দিয়েছিল। এ পরিস্থিতি যদিও দৃঢ় ঈমানের অধিকারী সাহাবীগণের অবিচল নিষ্ঠার মধ্যে কোন প্রকার দোদুল্যমানতা সৃষ্টি করেনি তবুও মানবিক প্রকৃতির তাগিদে অধিকাংশ সময় তাদের মধ্যেও একটা মারাত্মক ধরনের চিত্তচাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়ে যেতো। এ ধরনের অবস্থার একটা চিত্র পেশ করেন হযরত খাব্বাব ইবনে আরাত বর্ণিত একটি হাদীসে। তিনি বলেন, "যে সময় মুশরিকদের কঠোর নির্যাতনে আমরা ভীষণ দুরবস্থার সম্মুখীন হয়ে পড়েছিলাম, সে সময় একদিন আমি দেখলাম নবী ﷺ কা'বাঘরের দেয়ালের ছায়ায় বসে রয়েছেন। আমি সেখানে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি আমাদের জন্য দোয়া করেন না? একথা শুনে তার চেহারা আবেগে-উত্তেজনায় রক্তিম বর্ণ ধারণ করলো এবং তিনি বললেন, "তোমাদের পূর্বে যেসব মু'মিনদল অতিক্রান্ত হয়েছে তারা এর চাইতেও বেশি নিগৃহীত হয়েছে। তাদের কাউকে মাটিতে গর্ত করে তার মধ্যে বসিয়ে দেয়া হতো এবং তারপর তার মাথার উপর করাত চালিয়ে দুই টুকরা করে দেয়া হতো। কারো অঙ্গ-প্রতঙ্গের সন্ধিস্থলে লোহার চিরুনী দিয়ে আঁচড়ানো হতো, যাতে তারা ঈমান প্রত্যাহার করে। আল্লাহর কসম, এ কাজ সম্পন্ন হবেই, এমনকি এক ব্যক্তি সান'আ থেকে হাদ্বারামাউত পর্যন্ত নিশঙ্ক চিত্তে সফর করবে এবং আল্লাহ ছাড়া আর কারো ভয় তার মনে থাকবে না।"[১০০]

---

[৯৯] সূরা আলে ইমরান, ১৩৯

[১০০] বুখারী , আবু দাউদ ও নাসাঈ

www.pathagar.com

সুতরাং ঈমানের প্রত্যেক দাবীদারকে অনিবার্যভাবে পরীক্ষার চুল্লী অতিক্রম করতে হবেই। বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন-নিপীড়ন সহ্য করতে হবে, বিপদ-মুসিবত ও সংকটের মোকাবিলা করতে হবে। এর ব্যতিক্রম অতীতেও হয়নি এখনো হবে না। ব্যক্তির পরীক্ষার ধরন, প্রেক্ষাপট, সময় আলাদা হলেও পরীক্ষার কারণ এক ও অভিন্ন। মহান আল্লাহ বলেন–

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتّٰى نَعْلَمَ الْمُجٰهِدِيْنَ مِنْكُمْ وَالصّٰبِرِيْنَ وَنَبْلُوَا اَخْبَارَكُمْ ـ

আমি তোমাদেরকে অবশ্যই পরীক্ষা করবো যাতে আমি তোমাদের অবস্থা যাঁচাই করে দেখে নিতে পারি তোমাদের মধ্যে কে জিহাদকারী এবং কে ধৈর্যশীল।"[১০১]

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ যদি সত্যের কালেমা উচ্চারণ এবং মিথ্যা প্রতিরোধের জন্যে যুক্তি প্রদর্শন করে এবং নিজের প্রচেষ্টায় হক-এর সাহায্যের জন্যে কাজ করে সেই ব্যক্তির এই কাজ আমার সঙ্গে হিজরত করার চেয়ে বেশি উত্তম বিবেচিত হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো বলেন, ইসলামের পথে কারো এক ঘণ্টার কষ্ট সহ্য করা এবং দৃঢ়পদ থাকা তার ৪০ বছর এবাদতের চেয়ে উত্তম।

হযরত কাতাদা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, হযরত আনাস ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আমাকে বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কেয়ামতের দিন দাঁড়িপালা লাগানো হবে, সদকা-খয়রাত যারা করবে তাদের দানের বিনিময়ে পুরস্কার দেয়া হবে। নামায, রোযা, হজ্জ্ব ইত্যাদি নেক কাজের বিনিময় দেয়া হবে। এরপর আল্লাহর পথে বিপদ সহ্যকারীদের পালা আসবে। তাদের জন্যে দাঁড়িপালা লাগানোর আগেই তাদের নেক আমল ওজন হয়ে যাবে। তাদেরকে বে-হিসাব বিনিময় দেয়া হবে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

اِنَّمَا يُوَفَّى الصّٰبِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ـ

"ধৈর্যশীলদেরকে তাদের পারিশ্রমিক বিনা হিসাবে দেয়া হবে।"[১০২]

দুনিয়ার জীবনে বিপদে-মুসিবতে বিপন্ন অসহায় বান্দারা কেয়ামতের দিন বে-হিসাব পুরস্কার পেতে থাকবেন। এই দৃশ্য দেখে দুনিয়ার জীবনে আরাম-আয়েশে বসবাসকারীরা আক্ষেপ করে বলতে থাকবে, আহা দুনিয়ার জীবনে আমার দেহ যদি কাঁচি দিয়ে কেটে টুকরো টুকরো করা হতো তবে আজ আমি অনেক বেশি পুরস্কার লাভ করতাম। অনেক বেশি মর্যাদা স্থায়ীভাবে লাভ করতাম।

---

[১০১] সূরা মুহাম্মদ, ৩১
[১০২] সূরা ঝুমার, ১০

www.pathagar.com

মহান আল্লাহ্ বলেন-

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرٰتِ ۗ وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ۔

আর নিশ্চয়ই আমরা ভীতি, অনাহার, প্রাণ ও সম্পদের ক্ষতির মাধ্যমে এবং উপার্জন ও আমদানী হ্রাস করে তোমাদের পরীক্ষা করবো। এ অবস্থায় যারা সবর করে।[১০৩]

তাই এ দুর্বলতাকে দূর করার জন্যে সুস্পষ্টভবে জানিয়ে দেয়া হলো। এ জন্য আল্লাহ্ বলেন-

قُلْ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَعْصِمُكُمْ مِّنَ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَ بِكُمْ سُوْٓءًا اَوْ اَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً ۗ وَلَا يَجِدُوْنَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا۔

'হে নবী! তাদেরকে বলে দিন যে, তোমরা যদি মৃত্যু বা হত্যার ভয়ে পালাতে চাও তো পালিয়ে দেখ; এরূপ পলায়নে তোমাদের কোনোই ফায়দা হবে না। তাদেরকে আরো বলে দিন যে, (তারা চিন্তা করে দেখুক) আল্লাহ্ যদি তাদের কোনো ক্ষতি করার সিদ্ধান্ত নেন, তাহলে তাদেরকে আর কে বাঁচাতে পারে? আর যদি আল্লাহ্ সিদ্ধান্ত নেন তাদের কোনো উপকার করার, তাহলে তাঁকে আর কে প্রতিরোধ করতে পারে? (তাদের স্মরণ রাখা উচিত যে,) আল্লাহ্ ছাড়া আর কাউকে না পাবে পৃষ্ঠপোষক আর না পাবে মদদগার।'[১০৪]

ইমাম আহমদ আলী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে উদ্ধৃত করেন, তিনি বলেন, "বদর যুদ্ধের রাতে একদা দেখি যে, শুধু রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ব্যতিত আমাদের মধ্যে সবাই ঘুমিয়ে রয়েছে, তিনি একটি গাছের নিকটে সালাত আদায় করছিলেন এবং সকাল হওয়া পর্যন্ত দু'আ করেন।"

যখন অতি প্রতাপশালী দুষ্ট নেতা (নমরুদ) অশুভ উদ্দেশ্যে ইবরাহীম (আ)-এর সাথে থাকা স্ত্রীকে বন্দি করে তখন ইবরাহীম (আ) সালাতের মাধ্যমে আশ্রয় নেন। ফলে আল্লাহ্ তাঁর বিপদ মুক্ত করেন আর ঐ কাফেরের চক্রান্তকে তার প্রতিই নিক্ষেপ করেন। সেই কাফির ইবরাহীম (আ) ও তাঁর পরিবারের খেদমতের জন্য হাজেরাকে পেশ করে। মহান আল্লাহ্ বলেন–

اِنَّ نَاشِئَةَ الَّيْلِ هِيَ اَشَدُّ وَطْاً وَّاَقْوَمُ قِيْلًا۔

"নিশ্চয়ই এবাদতের জন্য রাতে উঠা প্রবৃত্তি দলনে সহায়ক এবং স্পষ্ট উচ্চারণের অনুকূল।"[১০৫]

---

[১০৩] সুরা বাকারা, ১৫৫
[১০৪] আহযাব, ১৭
[১০৫] সুরা মুজাম্মিল, ৬

www.pathagar.com

সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী লিখেছেন- দ্বন্দ্বের তীব্রতা যতই বৃদ্ধি পায় আদর্শবাদী দল বিরুদ্ধবাদীদের মোকাবেলায় ততই উন্নত চরিত্র ও মহান মানবিক গুণ মাহাত্ম্যের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতে থাকে। কঠিন ও কঠোরতম পরীক্ষার সময়ও এই দল কোনরূপ মিথ্যা, প্রতারণা ও শঠতার আশ্রয় নেবে না। কূটিলতা ষড়যন্ত্রের প্রত্যুত্তরে তারা সহজ-সরল কর্মনীতিই অনুসরণ করবে। প্রতিশোধ গ্রহণের তীব্র উত্তেজনার সময়ও অত্যাচার-অবিচার, উৎপীড়নের নির্মমতায় মেতে উঠবে না। যুদ্ধের প্রবল সংঘর্ষের কঠিন মুহূর্তেও তারা নিজেদের নীতি ও আদর্শ পরিত্যাগ করবে না। কারণ সেই আদর্শের প্রচার প্রতিষ্ঠার জন্যই তো তার জন্ম। এ জন্য সততা, সত্যবাদিতা, প্রতিশ্রুতি পূরণ, নির্মল আচার-ব্যবহার ও নিঃস্বার্থ কর্মনীতির ওপর তারা দৃঢ়তার সাথে দাঁড়িয়ে থাকে। মহান আল্লাহ্ বলেন-

وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ اِلَّاۤ اَنْ قَالُوْا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَ اِسْرَافَنَا فِيْۤ اَمْرِنَا وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ۔

যারা আর কিছুই বলেনি শুধু বলেছে, হে আমাদের পালনকর্তা! মোচন করে দাও আমাদের পাপ এবং যা কিছু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে আমাদের কাজে। আর আমাদিগকে দৃঢ় রাখ এবং কাফেরদে পর আমাদেরকে সাহায্য কর।[১০৬]

হে ঈমানদারগণ! ধৈর্য ধারণ কর এবং মোকাবেলায় দৃঢ়তা অবলম্বন কর। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক যাতে তোমরা তোমাদের উদ্দেশ্য লাভে সমর্থ হতে পারো । কুরআনে বলা হয়েছে-

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۔

কাফেররা তাদের কুফরির ব্যাপারে যে দৃঢ়তা-অবিচলতা দেখাচ্ছে এবং কুফরির ঝাণ্ডা সমুন্নত রাখার জন্য যে ধরনের কষ্ট স্বীকার করছে তোমরা তাদের মোকাবেলায় তাদের চাইতেও বেশ দৃঢ়তা, অবিচলতা ও মজবুতি দেখাও। আর তাদের মোকাবেলায় তোমরা দৃঢ়তা, অবিচলতা ও মজবুতি দেখাবার ব্যাপারে পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতা করো।[১০৭]

اِنْ يَّنْصُرْكُمُ اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۚ وَاِنْ يَّخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِيْ يَنْصُرُكُمْ مِّنْۢ بَعْدِهٖ ؕ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ۔

---

[১০৬] সূরা আলে ইমরান, ১৪৭
[১০৭] সূরা আলে ইমরান, ২০০

www.pathagar.com

"(সে মুহূর্তের কথাও স্মরণ করো) যখন তুমি মোমেনদের বলছিলে, (যুদ্ধে বিজয় লাভ করার জন্য) তোমাদের মালিক যদি আসমান থেকে তিন হাজার ফেরেশতা পাঠিয়ে তোমাদের সাহায্য করেন, তাহলে তোমাদের (বিজয়ের জন্য তা কি) যথেষ্ট হবে না।" আল্লাহ বলেন– যদি আল্লাহ তোমাদের সহায়তা করেন, তাহলে কেউ তোমাদের ওপর পরাক্রান্ত হতে পারবে না। আর যদি তিনি তোমাদের সাহায্য না করেন, তবে এমন কে আছে, যে তোমাদের সাহায্য করতে পারে? আর আল্লাহর ওপরই মুসলমানগণের ভরসা করা উচিত।"[১০৮]

বাতিলের সকল চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র আল্লাহ তা'য়ালা রুখে দিবেন। মহান আল্লাহ বলেন-

وَقَدْ مَكَرَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلّٰهِ الْمَكْرُ جَمِيْعًا ؕ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ ؕ وَسَيَعْلَمُ الْكُفّٰرُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ ۔

"তাদের পূর্বে যারা ছিল, তারা চক্রান্ত করেছে। আর সকল চক্রান্ত তো আল্লাহর হাতেই আছে। তিনি জানেন প্রত্যেক ব্যক্তি যা কিছু করে। কাফেররা জেনে নেবে যে, পর জীবনের আবাসস্থল কাদের জন্য রয়েছে।"[১০৯]

وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ ؕ بَلْ اَحْيَآءٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ ۔

"আর যারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় নিহত হয়, তাদের মৃত বলো না। বরং তারা জীবিত, কিন্তু তোমরা তা বুঝ না।"[১১০]

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا ؕ بَلْ اَحْيَآءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ ۔

"আর যারা আল্লাহ্‌র রাহে নিহত হয়, তাদেরকে তুমি কখনো মৃত মনে করো না। বরং তারা নিজেদের পালনকর্তার নিকট জীবিত ও জীবিকাপ্রাপ্ত।"[১১১]

وَالَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَلَنْ يُّضِلَّ اَعْمَالَهُمْ ۔ سَيَهْدِيْهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ۔ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ۔

"যারা আল্লাহ্‌র পথে শহীদ হয়, আল্লাহ্ কখনই তাদের কর্ম বিনষ্ট করবেন না। তিনি তাদেরকে পথ প্রদর্শন করবেন এবং তাদের অবস্থা ভালো করবেন।

---

[১০৮] সূরা আলে ইমরান, ১৬০
[১০৯] সূরা রাদ, ৪২
[১১০] সূরা আল-বাকারা, ১৫৪
[১১১] সূরা আলে ইমরান, ১৬৯

www.pathagar.com

অতঃপর তিনি তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করবেন, যা তাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন।"[১১২]

فَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَاُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاُوْذُوْا فِيْ سَبِيْلِيْ وَقٰتَلُوْا وَقُتِلُوْا لَاُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَاُدْخِلَنَّهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ج ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ ط عِنْدَهٗ حُسْنُ الثَّوَابِ.

"যারা হিজরত করেছে, তাদেরকে নিজেদের দেশ থেকে বের করে দেয়া হয়েছে এবং তাদের প্রতি উৎপীড়ন করা হয়েছে আমার পথে এবং যারা লড়াই করেছে ও মৃত্যুবরণ করেছে, অবশ্যই আমি তাদের ওপর থেকে অকল্যাণকে অপসারিত করব। এবং তাদেরকে প্রবিষ্ট করব জান্নাতে যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত। এ হলো বিনিময় আল্লাহ্র পক্ষ থেকে। আর আল্লাহ্র নিকট রয়েছে উত্তম বিনিময়।"[১১৩]

وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ.

"আর তোমরা যদি আল্লাহ্র পথে নিহত হও কিংবা মৃত্যুবরণ করো, তোমরা যা কিছু সংগ্রহ করে থাকো আল্লাহ্ তা'আলার ক্ষমা ও করুণা সে সবকিছুর চেয়ে উত্তম।"[১১৪]

ঈমানের অগ্নিপরীক্ষা যুগে যুগে অব্যাহত ছিলো। এ পরীক্ষা হয় কখনো জীবন দিয়ে, কখনো বা সম্পদ দিয়ে, কখনো বা এ দু'টির। এমনি একটি ঈমানী পরীক্ষার কুরআনী দৃষ্টান্ত হলো খন্দক যুদ্ধের পূর্বকালীন মুহূর্ত। এটা ছিলো বাস্তবিকই অত্যন্ত কঠিন পরীক্ষার সময়। একদিকে প্রচণ্ড শীতকাল, খাদ্য-দ্রব্যের অভাব, উপর্যুপরি কয়েক বেলা অনশন, রাতের নিদ্রা আর দিনের বিশ্রাম উধাও, প্রতিটি মুহূর্ত জীবনের ভয়, মালমাত্তা ও সন্তানাদি দুশমনের আঘাতের মুখে আর অন্যদিকে বেশুমার শত্রু সৈন্য। এমনিতরো সংকটাবস্থায় যাদের ঈমান ছিলো সাচ্চা ও সুদৃঢ়, কেবল তারাই সত্যের পথে অবিচল থাকতে পারছিলো। দুর্বল ঈমানদার ও মুনাফিকগণ এ পরিস্থিতির আদৌ মুকাবিলা করতে পারছিলো না; বরং মুসলমানদের সমাজ-সংগঠনে যেসব মুনাফিক অনুপ্রবেশ করেছিলো, তারা এ সময় খোলাখুলিভাবে আত্মপ্রকাশ করলো। তারা বলতে শুরু করলো–

مَّا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗۤ اِلَّا غُرُوْرًا.

---

[১১২] সূরা মুহাম্মদ, ৪-৬
[১১৩] সূরা আলে-ইমরান, ১৯৫
[১১৪] সূরা আলে-ইমরান, ১৫৭

www.pathagar.com

"আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল আমাদের কাছে বিজয় ও সাহায্যের যে ওয়াদা করেছিলেন, তা সম্পূর্ণ ধোঁকা।"[১১৫]

এর পাশাপাশি তারা নিজেদের জান বাঁচানোর জন্যে নানারূপ বাহানা তালাশ করতে লাগলো এবং–

يَاَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوْا ۚ وَيَسْتَاْذِنُ فَرِيْقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُوْلُوْنَ اِنَّ بُيُوْتَنَا عَوْرَةٌ۔

"হে মদীনাবাসী! ফিরে চলো, আজ আর তোমাদের রক্ষা নেই। তারা নবীর সামনে এসে বলতে শুরু করলো– "আমাদেরকে ঘর-বাড়িতে থেকে আত্মরক্ষা করার অনুমতি দিন; আমাদের বাড়ি-ঘর সম্পূর্ণ অরক্ষিত।"[১১৬]

কিন্তু যাদের ভেতর যথার্থ ঈমান ছিলো এবং যারা ঈমানের দাবিতে ছিলো সত্যবাদী, এ সময় তাদের অবস্থা ছিলো সম্পূর্ণ ভিন্ন। তারা কাফিরদের সৈন্য-সামন্ত দেখে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে উঠলো :

وَلَمَّا رَاَ الْمُؤْمِنُوْنَ الْاَحْزَابَ ۙ قَالُوْا هٰذَا مَا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَصَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ ۚ وَمَا زَادَهُمْ اِلَّا اِيْمَانًا وَّتَسْلِيْمًا۔ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضٰى نَحْبَهٗ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّنْتَظِرُ ۚ وَمَا بَدَّلُوْا تَبْدِيْلًا۔

"আল্লাহ এবং রাসূল তো আমাদের সাথে এরই (অবস্থার) ওয়াদা করেছিলেন। পরন্তু এ অবস্থা দেখে তাদের ভেতর ঈমানের ভাবধারা আরো সতেজ হয়ে উঠলো এবং অধিকতর আনুগত্য ও আজ্ঞানুবর্তিতার জন্যে তারা প্রস্তুত হলো। এ কঠিন অবস্থা তাদের ভেতরে অণু পরিমাণও পরিবর্তন ঘটাতে পারলো না।"[১১৭]

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُوْدٌ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا وَّجُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا ۚ وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا۔

"হে মু'মিনগণ! আল্লাহর সেই অনুগ্রহের কথা স্মরণ করো, যখন তোমাদের ওপর সম্মিলিত বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো আর আমি তাদের ওপর প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা বইয়ে দিলাম এবং এমন সৈন্য (ফেরেশতা) পাঠালাম, যা তোমরা দেখতে পাওনি।"[১১৮]

---

[১১৫] সূরা আল-আহযাব, ১২

[১১৬] সূরা আল-আহযাব, ১৪

[১১৭] সূরা আল-আহযাব, ২২-২৩

[১১৮] সূরা আল-আহযাব, ৯

www.pathagar.com

قُلْ مَنْ ذَا الَّذِىْ يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَ بِكُمْ سُوْٓءًا اَوْ اَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً ؕ وَلَا يَجِدُوْنَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا۔

"হে নবী! তাদেরকে বলে দিন যে, তোমরা যদি মৃত্যু বা হত্যার ভয়ে পালাতে চাও তো পালিয়ে দেখ; এরূপ পলায়নে তোমাদের কোনোই ফায়দা হবে না। তাদেরকে আরো বলে দিন যে, (তারা চিন্তা করে দেখুক) আল্লাহ্ যদি তাদের কোনো ক্ষতি করার সিদ্ধান্ত নেন, তাহলে তাদেরকে আর কে বাঁচাতে পারে? আর যদি আল্লাহ্ সিদ্ধান্ত নেন তাদের কোনো উপকার করার, তাহলে তাঁকে আর কে প্রতিরোধ করতে পারে? (তাদের স্মরণ রাখা উচিত যে,) আল্লাহ্ ছাড়া আর কাউকে না পাবে পৃষ্ঠপোষক আর না পাবে মদদগার।"[১১৯]

اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْٓا اَنْ يَّقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ ۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِيْنَ۔

"মানুষ কি মনে করে যে, 'আমরা ঈমান এনেছি' বললেই তাদের ছেড়ে দেয়া হবে, আর তাদের পরীক্ষা করা হবে না? আর আমি তো তাদের পূর্ববর্তীদের পরীক্ষা করেছি। ফলে আল্লাহ্ অবশ্যই জেনে নেবেন, কারা সত্য বলে এবং অবশ্যই তিনি জেনে নেবেন, কারা মিথ্যাবাদী।"[১২০]

لَتُبْلَوُنَّ فِىْٓ اَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ قف وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْٓا اَذًى كَثِيْرًا ؕ وَاِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ۔

"অবশ্য ধন-সম্পদে এবং জনসম্পদে তোমাদের পরীক্ষা হবে এবং অবশ্য তোমরা শুনবে পূর্ববর্তী আহলে কিতাবদের কাছে এবং মুশরেকদের কাছে বহু অশোভন উক্তি। আর যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ করো এবং পরহেজগারি অবলম্বন করো, তবে তা হবে একান্ত সৎসাহসের ব্যাপার।"[১২১]

তাদের গালিগালাজ, মিথ্যা দোষারোপ, বেহুদা কথাবার্তা ও অপপ্রচারের মোকাবেলায় অধৈর্য হয়ে তোমরা এমন কোনো কথা বলতে শুরু করো না যা সত্য, সততা, ন্যায়, ইনসাফ, শিষ্টাচার, শালীনতা ও নৈতিকতাবিরোধী।

اِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ ز وَاِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَّفْرَحُوْا بِهَا ؕ وَاِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ۔

---

[১১৯] সূরা আল-আহযাব, ১৭
[১২০] সূরা আল-আনকাবূত, ২-৩
[১২১] সূরা আল ইমরান, ১৮৬

www.pathagar.com

"তোমাদের যদি কোনো মঙ্গল হয়; তাহলে তাদের খারাপ লাগে। আর তোমাদের যদি অমঙ্গল হয় তাহলে আনন্দিত হয় আর তাতে যদি তোমরা ধৈর্যধারণ করো এবং তাকওয়া অবলম্বন করো, তবে তাদের প্রতারণায় তোমাদের কোনোই ক্ষতি হবে না। নিশ্চয়ই তারা যা কিছু করে সে সমস্তই আল্লাহ্‌র আয়ত্তে রয়েছে।"[১২২]

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصّٰبِرِيْنَ۔

"তোমাদের কি ধারণা, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ আল্লাহ্ এখনও দেখেননি তোমাদের মধ্যে কারা জিহাদ করেছে এবং কারা ধৈর্যশীল।"[১২৩]

وَلَا تَهِنُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ۔

"আর তোমরা নিরাশ হয়ো না এবং দুঃখ করো না। যদি তোমরা মু'মিন হও তবে, তোমরাই জয়ী হবে।"[১২৪]

বাতিলের বিরুদ্ধে অটল ও অবিচল থাকা–

وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ اِلَّآ اَنْ قَالُوْا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَاِسْرَافَنَا فِيْٓ اَمْرِنَا وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ۔

"তারা আর কিছুই বলেনি– শুধু বলেছে, হে আমাদের পালনকর্তা! মোচন করে দাও আমাদের পাপ এবং যা কিছু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে আমাদের কাজে। আর আমাদিগকে দৃঢ় রাখ এবং কাফেরদের ওপর আমাদিগকে সাহায্য কর।[১২৫]

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا قف وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ۔

"হে ঈমানদানগণ! ধৈর্য ধারণ করো এবং মোকাবেলায় দৃঢ়তা অবলম্বন করো। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাকো যাতে তোমরা তোমাদের উদ্দেশ্য লাভে সমর্থ হতে পারো।"[১২৬]

لَتُبْلَوُنَّ فِيْٓ اَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ قف وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْٓا اَذًى كَثِيْرًا ط وَاِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ۔

---

[১২২] সূরা আল ইমরান, ১২০
[১২৩] সূরা আল ইমরান, ১৪২
[১২৪] সূরা আলে-ইমরান, ৩ : ১৩৯
[১২৫] সূরা আল ইমরান, ১৪৭
[১২৬] সূরা আল ইমরান, ২০০

www.pathagar.com

"অবশ্য ধন-সম্পদে এবং জনসম্পদে তোমাদের পরীক্ষা হবে এবং অবশ্য তোমরা শুনবে পূর্ববর্তী আহলে কিতাবদের কাছে এবং মুশরিকদের কাছে বহু অশোভন উক্তি। আর যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ করো এবং পরহেজগারি অবলম্বন করো, তবে তা হবে একান্ত সৎসাহসের ব্যাপার।[১২৭]

إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً وَأَقْوَمُ قِيلًا ـ

"নিশ্চয়ই এবাদতের জন্য রাত্রিতে উঠা প্রবৃত্তি দলনে সহায়ক এবং স্পষ্ট উচ্চারণের অনুকূল।"[১২৮]

وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ـ

"রাত্রির কিছু অংশে তাঁর উদ্দেশে সিজদা করুন এবং রাত্রির দীর্ঘ সময় তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করুন।"[১২৯]

وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا ج وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ـ

"ধৈর্যশীল ছাড়া এ গুণ আর কারো ভাগ্যে জোটে না। এবং অতি ভাগ্যবান ছাড়া এ মর্যাদা আর কেউ লাভ করতে পারে না।"[১৩০]

তাই নবী করীম ﷺ বলেছেন : "দুনিয়া মু'মিনের জেলখানা ও কাফেরের জান্নাত।" তিনি আরো বলেন : আল্লাহ যার কল্যাণ চান তাকে তিনি নানান সংকট দ্বারা জর্জরিত করেন।

যুগে যুগে ঈমানের পরীক্ষায় মুত্তাকী ও সিদ্দীকদের ওপর যুলুম-নির্যাতন আর কারাবন্দী হওয়ার অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে। চার খলিফা, চার ইমাম কেউ রেহাই পাননি। কিন্তু প্রতিটি অধ্যায়ে তারা ছিলেন আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুলকারী এবং তাঁরই সাহায্যের মুখাপেক্ষী। আজকের দিনে সত্যের পথের পথিকদেরও একই পথ অনুসরণ করেই সামনে বাড়তে হবে। আল্লাহ বলেন-

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ـ

"যারা ঘোষণা করেছে, আল্লাহ আমাদের রব, অতঃপর তার উপরে দৃঢ় ও স্থির থেকেছে নিশ্চিত তাদের কাছে ফেরেশতারা আসে এবং তাদের বলে, ভীত হয়ো না, দুঃখ করো না এবং সেই জান্নাতের সুসংবাদ শুনে খুশি হও তোমাদেরকে যার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে।"[১৩১]

---

[১২৭] সূরা আল ইমরান, ১৮৬
[১২৮] সূরা মুজাম্মিল, ৬
[১২৯] সূরা দাহর, ২৬
[১৩০] সূরা হা-মীম আস-সাজদা, ৩৫
[১৩১] সূরা হা-মীম আস-সাজদা, ৩০

www.pathagar.com

তাওয়াক্কুল আরবী শব্দ। এর অর্থ হলো, ভরসা, নির্ভর। তাওয়াক্কুল আলাল্লাহ অর্থ হলো, আল্লাহ তা'আলার ওপর ভরসা করা। ইসলামেও আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল একটি অতিব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এটি একটি ইবাদত। তাই আল্লাহ তায়ালা ব্যতিত অন্য কারো ওপর তাওয়াক্কুল করা যায় না এবং যাবে না। ইসলামী শরী'অতে আল্লাহ ছাড়া কারো ওপর ভরসা করা জায়েয নাই। এটি ঈমানের সাথে সম্পর্কিত। একজন ঈমানদার কল্যাণকর সাফল্যের জন্য সাধ্যমত নিজের মেধা, শ্রম, সময় দিয়ে চেষ্টা করবে; কিন্তু ফলাফলের জন্য আল্লাহর ওপর ভরসা করবে। আর পূর্ণ একিনের সাথে আস্থা রাখবে আল্লাহ যা লিখে রেখেছেন তাই হবে। এটি পরিবর্তনের সাধ্য কারো নেই। এটিই হচ্ছে তাওয়াক্কুলের মূলকথা।

তাওয়াক্কুলের নীতি অবলম্বনকারী কখনো হতাশ হয় না। আশা ভঙ্গে কখনও মুষড়ে পড়ে না। বিপদ-মুসীবত, যুদ্ধ-সংকটে ঘাবড়ে যায় না। যে কোনো দুর্নিপাক, দুর্যোগ, সংকট, আর পরীক্ষায় আল্লাহ তা'আলার উপর দৃঢ় আস্থা রাখে। ঘোর অন্ধকারে আশা করে উজ্জ্বল সুবহে সাদিকের। আল্লাহ বলেন :

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔

"প্রকৃত কথা এই যে, সংকীর্ণতার সাথে প্রশস্ততাও রয়েছে।"[১৩২]

যতো যুলুম-নির্যাতন অত্যাচার, নির্যাতন-নিপিড়নের ঝড়-তুফান আসুক কোনো অবস্থাতেই আল্লাহ ব্যতিত কাউকে ভয় করে না। আল-কুরআনে তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে :

رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ۚ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهٗ۔

"আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। এসব সে ব্যক্তির জন্য যে তার রবকে ভয় করে।"[১৩৩]

কিন্তু নিজের দায়িত্বের কোনো ত্রুটি কেবলমাত্র নিজের উপরই বার্তাবে। কারণ পৃথিবীতে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে কর্মের স্বাধীনতা দিয়ে পাঠিয়েছেন। এজন্য সাফল্য এবং ব্যর্থতা তারই কর্মের ফল। এক্ষেত্রে এ হাদিসটি প্রনিধান যোগ্য– আনাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমি কি উট বেঁধে রেখে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করব, না বন্ধনমুক্ত রেখে? তিনি বললেন, উট বেঁধে নাও, অত:পর আল্লাহর উপর ভরসা করো। (তিরমিযি)

---

১৩২ সূরা আলাম-নাশরাহ, ৫

১৩৩ সূরা আল-বাইয়্যিনাহ, ৮

www.pathagar.com

الَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ
اِيْمَانًا ۚ وَقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ ـ فَانْقَلَبُوْا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ
وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوْٓءٌ وَّاتَّبَعُوْا رِضْوَانَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ عَظِيْمٍ ـ

"যাদেরকে মানুষেরা বলেছিল যে, 'নিশ্চয় লোকেরা তোমাদের বিরুদ্ধে একত্র হয়েছে। সুতরাং তাদেরকে ভয় করো'। কিন্তু তা তাদের ঈমান বাড়িয়ে দিয়েছিল এবং তারা বলেছিল,'আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি কতোই না উত্তম কর্মবিধায়ক'! অতঃপর তারা ফিরে এসেছে আল্লাহর পক্ষ থেকে নিআমত ও অনুগ্রহসহ। কোনো মন্দ তাদেরকে স্পর্শ করেনি এবং তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির অনুসরণ করেছিল। আর আল্লাহ মহাঅনুগ্রহশীল।"[১৩৪]

وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ـ

"আর আল্লাহর উপরই মু'মিনদের ভরসা করা উচিত।"[১৩৫]

فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ـ

"অতঃপর তুমি যখন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে তখন আল্লাহর উপর ভরসা করো।"[১৩৬]

وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ ـ

"আর যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে, তিনিই তার জন্যে যথেষ্ট।"[১৩৭]

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ
زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ـ

"মু'মিন তো তারা, যাদের অন্তরসমূহ কেঁপে উঠে যখন আল্লাহকে স্মরণ করা হয়। আর যখন তাদের ওপর তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় তখন তা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে এবং যারা তাদের প্রতিপালকের ওপরই ভরসা করে।"[১৩৮]

খন্দকের যুদ্ধকালে যখন মদিনার আশপাশের ও মক্কার কাফিররা মদিনা ঘেরাও করে ফেলল মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করার উদ্দেশ্যে, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নেতত্বে মুসলমানরা সাধ্যমত প্রতিরোধ গড়ে তুলল। তখন অস্তিত্বের এ সীমাহীন সংকটকালেও তারা সামান্যতম হীনমন্য হয়নি; বরং ইসলাম ও মুসলিম বিরোধী

[১৩৪] সূরা আলে-ইমরান, ১৭৩-১৭৪
[১৩৫] সূরা ইবরাহীম, ১১
[১৩৬] সূরা আলে-ইমরান, ১৫৯
[১৩৭] সূরা আত-তালাক, ৩
[১৩৮] সূরা আল-আনফাল, ২

www.pathagar.com

শক্তির এ প্রবল ও সর্বব্যাপী আগ্রাসন দেখে তারা ভীত-বিহ্বল না হয়ে আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। কাফিরদের এ ব্যাপক আগ্রাসন দেখে তাদের ঈমান বৃদ্ধি পেয়েছিল। হয়েছিল আরো দৃঢ়, আরো মজবুত।

উহুদ যুদ্ধে মুসলমানদের বিপর্যয় ঘটেছিল মারাত্মকভাবে। আল্লাহর রাসূল ﷺ এ যুদ্ধে নিজে আহত হয়েছিলেন। তার অনেক প্রিয় সাহাবিকে শাহাদাত বরণ করতে হয়েছিল। এক হাজার মুজাহিদের মধ্যে সত্তর জন্য শহীদ হয়ে গেলেন। আহত হলেন আরো অনেক। যুদ্ধের পর মদিনার ঘরে ঘরে শোকের মাতম। আর আহত মুজাহিদদের কাতরানি। এমতাবস্থায় খবর এলো, কাফির বাহিনী আবার মদিনা পানে ধেয়ে আসছে। অবশিষ্ট জীবিত মুসলমানদের সকলকে নির্মূল করার ঘোষণা দিয়েছে। এ খবর শুনে মুসলমানগণ পলায়ন বা আত্মসমর্পণের চিন্তা না করে উঠে দাঁড়ালেন। ভীত বা শংকিত হওয়ার বদলে পুনরায় রওয়ানা দিলেন কাফের বাহিনীর মোকাবেলা করতে। আল্লাহর প্রতি দৃঢ় ঈমান ও মজবুত তাওয়াক্কুল নিয়ে অভিযানে বের হলেন। আহত মুজাহিদদের অনেকে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে অভিযানে শরিক হলেন। পরিণতিতে তারা বিজয়ী হলেন। আর কাফিররা গেল পালিয়ে। ইসলামের ইতিহাসে এ অভিযানের নাম হামরাউল আসাদ অভিযান। এ ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে আল্লাহ তা'আলা বললেন, যখন তাদের ভয় দেখানো হলো, কাফিররা আবার ফিরে আসছে তোমাদের শেষ করতে, তখন তাদের ঈমান বৃদ্ধি পেলো। তারা বললো, আল্লাহ আমাদের জন্য যথেষ্ট।

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন ইবরাহিম (আ.)-কে যখন আগুনে নিক্ষেপ করা হলো, তখন তিনি বললেন হাসবুনাল্লাহ ওয়া-নিমাল ওয়াক্কীল (আল্লাহ আমাদের জন্য যথেষ্ট, তিনি উত্তম অভিভাবক)। তখন জিবরাইল (আ.) এসে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, “আমার কাছ থেকে আপনি কি কিছু চান?” ইবরাহিম (আ.) আত্মবিশ্বাসের সাথে উত্তর দিয়েছেন, “আপনার কাছ থেকে নয় বরং আল্লাহর কাছ থেকে চাই।” আর লেকেরা যখন মুহাম্মাদ ﷺ ও তাঁর সাথীদের বললো, (শত্রু বাহিনীর) লোকেরা তোমাদের বিরুদ্ধে সমবেত হচ্ছে, তাই তোমরা তাদের ভয় করো, তখন তাদের ঈমান বেড়ে গেল এবং তারা বললো, “হাসবুনাল্লাহু ওয়া-নিমাল ওয়াকীল” (আল্লাহ আমাদের জন্য যথেষ্ট তিনি উত্তম অভিভাবক)।[১৩৯]

মূসা (আ.)-এর পিছন থেকে শত্রুরা ধাওয়া করছে আর তার সামনে সাগর, এমন অবস্থায় তিনি বললেন : (আমি ধ্বংস হবো!) কখনো নয়, নিশ্চয় আমার সাথে আমার প্রভু আছেন, তিনি আমাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করবেন।

---

[১৩৯] বুখারি

www.pathagar.com

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার সম্মুখে সকল উম্মতকে পেশ করা হলো। (এভাবে যে,) আমি একজন নবীকে ছোট একটি দলসহ দেখলাম। কয়েকজন নবীকে একজন বা দু'জন অনুসারীসহ দেখলাম। আরেকজন নবীকে দেখলাম তার সাথে কেউ নেই। ইতিমধ্যে আমাকে একটি বড় দল দেখানো হলো। আমি মনে করলাম এরা হয়ত আমার উম্মত হবে। কিন্তু আমাকে বলা হলো, এরা হলো মূসা (আ.) ও তার উম্মত। আমাকে বলা হলো, আপনি অন্য প্রান্তে তাকান। আমি তাকিয়ে দেখলাম, সেখানে বিরাট একটি দল। আবার আমাকে বলা হলো, আপনি অন্য প্রান্তে তাকান। তাকিয়ে দেখলাম, সেখানেও বিশাল এক দল। এরপর আমাকে বলা হলো, এসব হলো আপনার উম্মত। তাদের সাথে সত্তর হাজার মানুষ আছে যারা বিনা হিসাবে ও কোনো শাস্তি ছাড়া জান্নাতে প্রবেশ করবে। এ পর্যন্ত বলার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ঘরে চলে গেলেন। এরপর লোকেরা সেসব মানুষ– যারা বিনা হিসাবে ও বিনা শাস্তিতে জান্নাতে প্রবেশ করবে– তারা কারা হবে, সে সম্পর্কে আলোচনা শুরু করে দিলো। কেউ বললো, এরা হচ্ছে, যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহচর্য লাভ করেছে। আবার কেউ বললো, এরা হবে যারা ইসলাম অবস্থায় জন্মগ্রহণ করেছে আর আল্লাহর সাথে কখনো শরীক করেনি, তারা। এভাবে সাহাবায়ে কেরাম বিভিন্ন মতামত প্রকাশ করে যাচ্ছিলেন। এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হয়ে এসে বললেন, তোমরা কী বিষয়ে আলোচনা করছো? সাহাবিগণ আলোচনার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে তাকে জানালেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তারা হচ্ছে এমনসব লোক যারা ঝাড়-ফুঁক করে না। ঝাড়-ফুঁক চায় না। কোনো কুলক্ষণে-শুভাশুভে বিশ্বাস করে না এবং শুধুমাত্র নিজ প্রতিপালকের ওপর তাওয়াক্কুল করে।"[১৪০]

জাবের রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি নজদ অঞ্চলের কাছে এক স্থানে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নেতৃত্বে জিহাদ করেছেন। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ফিরে আসলেন, তিনিও তাঁর সাথে ফিরে আসলেন। দুপুরে তারা সকলে একটি ময়দানে উপস্থিত হলেন, যেখানে প্রচুর কাটাবিশিষ্ট গাছপালা ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে অবস্থান করলেন। লোকেরা গাছের ছায়া লাভের জন্য এদিক সেদিক ছড়িয়ে পড়লো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি বাবলা গাছের ছায়ায় অবস্থান গ্রহণ করে নিজ তরবারীটি গাছে ঝুলিয়ে রাখলেন। আমরা সকলে কিছুটা ঘুমিয়ে পড়লাম। হঠাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের ডাকলেন। সে সময় তার কাছে ছিল এক বেদুইন। তিনি বললেন, আমি ঘুমিয়ে আছি আর এ লোকটি আমার উপর তরবারি উত্তোলন করেছে। আমি জেগে দেখি তার হাতে খোলা তরবারি। সে

---

[১৪০] বুখারি ও মুসলিম

www.pathagar.com

আমাকে বললো, আমার হাত থেকে কে তোমাকে বাঁচাবে? আমি তিন বার এর উত্তরে বললাম, "আল্লাহ"। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে কোনো শাস্তি দিলেন না। তিনি বসে পড়লেন।[১৪১]

উমর رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন : "তোমরা যদি আল্লাহর ওপর যথাযথ তাওয়াক্কুল (ভরসা) করো তাহলে তিনি তোমাদেরকে এমনভাবে রিযক দেবেন যেমন তিনি রিযক দেন পাখিদের। তারা সকালে খালি পেটে বের হয়ে যায় আর সন্ধ্যায় ভরা পেটে ফিরে আসে।"[১৪২]

আবু বকর সিদ্দীক رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমরা (হিজরতের সময়) গুহায় অবস্থানকালে আমি মুশরিকদের পা দেখতে পেলাম, যখন তারা আমাদের মাথার উপর ছিল। আমি তখন বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তাদের কেউ যদি এখন নিজের পায়ের নীচে তাকায় তাহলে আমাদের দেখে ফেলবে। তিনি বললেন, "হে আবু বকর! এমন দু' ব্যক্তি সম্পর্কে তোমার কি ধারণা, যাদের তৃতীয় জন হচ্ছেন আল্লাহ?" (বুখারি ও মুসলিম)

কবি আহমদ শাওক্বী বলেছেন : যখন আল্লাহর সাহায্যের দৃষ্টি তোমার ওপর পড়ে তখন তুমি নিশ্চিন্তে ঘুমাও, কেননা তখন যা কিছু ঘটবে সবই নিরাপদ।" আল্লাহ বলেন : কেননা তুমি আমার নজরে আছ।" (সূরা আত তুর : ৪৮)

তাই পরিস্থিতি যতই প্রতিকুল আর বিপদসংকুল হোক না কেন, আল্লাহর ওপরই ভরসা করতে হবে। তাওরাত শরীফে বর্ণিত হয়েছে : "যা ঘটবে বলে ভয় করা হয় তার অধিকাংশই কখনো ঘটে না।"

وَلَمَّا رَاَ الْمُؤْمِنُوْنَ الْاَحْزَابَ قَالُوْا هٰذَا مَا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَصَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ ز وَمَا زَادَهُمْ اِلَّآ اِيْمَانًا وَّتَسْلِيْمًا۔

"আর মু'মিনগণ যখন সম্মিলিত বাহিনীকে দেখল তখন তারা বললো, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমাদের যে ওয়াদা দিয়েছেন এটি তো তাই। আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সত্যই বলেছেন। এতে তাদের ঈমান ও ইসলামই বৃদ্ধি পেলো।"[১৪৩]

আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম সেই বিপ্লবী আহ্বান জানিয়েছেন এভাবে– "আবু বকর উসমান উমর আলী হায়দর দাঁড়ি যে এ তরণীর, নাই ওরে নাই ডর। কাণ্ডারী এ তরীর পাকা মাঝি মাল্লা, দাড়ি-মুখে সারি গান---লা শরীক আল্লাহ।

---

[১৪১] বুখারি ও মুসলিম
[১৪২] তিরমিজি
[১৪৩] সূরা আল-আযহার, ৩৩ : ২২।

www.pathagar.com

দুনিয়ার বৃহত্তম শক্তির পরোয়া করো না এবং মহাপরাক্রমশালী ও দয়াময় সত্তার ওপর নির্ভর করে কাজ করে যাও। যার পেছনে তার সমর্থন আছে তাকে দুনিয়ার কেউ হেয় প্রতিপন্ন করতে পারে না।

তার জন্য যে ব্যক্তির সত্যের ঝাণ্ডা বুলন্দ করার কাজে জীবন উৎসর্গ করবে তার প্রচেষ্টা তিনি কখনো নিষ্ফল হতে দেবেন না।

الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ۔

(নেক্কার মানুষ হচ্ছে তারা,) যারা ধৈর্য ধারণ করে (এবং সর্বাবস্থায়) নিজেদের মালিকের ওপরই নির্ভর করেছ।"[১৪৪]

অর্থাৎ, এমন সবার যার মধ্যে অভিযোগ ফরিয়াদ ভয়ভীতি ও কারো ক্ষতি নেই একজন উচ্চ ও প্রশস্ত হৃদয়বত্তার অধিকারী মানুষের ওপর যে বিপদ আসে তাকে ধীরস্থিরভাবে বরদাস্ত করে একমাত্র মালিকের সন্তুষ্টির জন্য আপাদমস্তক ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার প্রতিচ্ছবি। মু'মিন ব্যক্তির দু'টি বিশ্বাস ছিল যে, এ সত্য বলার অপরাধে যে ফিরাউনের গোটা রাজ্য শাস্তিময় রোষানলে পড়বে এবং তাকে শুধু তার সম্মান, মর্যাদা ও স্বার্থ হারাতে হবে তাই নয়; জীবনের আশাও ছেড়ে দিতে হবে। কিন্তু এতো কিছু বুঝতে পারা সত্ত্বেও তা তিনি শুধু আল্লাহর ওপর ভরসা করে এ নাজুক সময়ে তার বিবেক যেটিকে তার কর্তব্য বলে মনে করেছে সে দায়িত্ব পালন করেছেন।[১৪৫]

সত্যের বিজয় ও আল্লাহর সাহায্য অবস্যম্ভাবী

وَاِذْ قُلْتُمْ يٰمُوْسٰى لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى نَرَى اللّٰهَ جَهْرَةً فَاَخَذَتْكُمُ الصّٰعِقَةُ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ۔

"তোমরা যখন বলেছিলে হে মূসা, আমরা আল্লাহকে প্রত্যক্ষভাবে না দেখলে কখনো তার ওপর ঈমান আনবো না, তখন (এ ধৃষ্টতার শাস্তি হিসেবে) মুহূর্তের মধ্যেই বজ্র (এক গযব) তোমাদের ওপর নিপতিত হলো, আর তোমরা তার দিকে চেয়েই থাকলে (কিছুই করতে পারলে না।"[১৪৬]

যদি সৎকর্মশীলতার পথে চলা কঠিন মনে করে থাকো তাহলে সবর ও নামায এ কাঠিন্য দূর করতে পারে। এদের সাহায্যেই কঠিন পথ পাড়ি দেয়া সম্ভব। সবর-এর শাব্দিক অর্থ বাধা দেয়া, বিরত থাকা বেঁধে রাখা। এ ক্ষেত্রে মজবুত ইচ্ছা, অবিচল সঙ্কল্পই মূল হাতিয়ার।

---

[১৪৪] সূরা আল-আনকাবুত, ২৯ : ৫৯
[১৪৫] সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী, তাফহীমুল কুরআন, টীকা।
[১৪৬] সূরা আল-বাকারা, ২ : ৫৫

www.pathagar.com

الصّٰبِرِيْنَ وَالصّٰدِقِيْنَ وَالْقٰنِتِيْنَ وَالْمُنْفِقِيْنَ وَالْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِالْاَسْحَارِ

"এরা হচ্ছে ধৈর্যশীল এবং সত্যাশ্রয়ী, (এরা) অনুগত এবং দানশীল, (সর্বোপরি) এরা হচ্ছে শেষরাতে কিংবা ঊষালগ্নের পূর্বে ক্ষমা প্রার্থনাকারী।"[১৪৭]

সত্যপথে পূর্ণ অবিচলতার সাথে প্রতিষ্ঠিত থাকে কোনো ক্ষতি বা বিপদের মুখে কখনো সাহস ও হিম্মত হারা হয় না। ব্যর্থতা এদের মনে কোনো চিড় ধরায় না। লোভ-লালসায় পা পিছলে যায় না। যখন আপাতদৃষ্টিতে সাফল্যের কোনো সম্ভাবনাই দেখা যায় না, তখনো এরা মজবুতভাবে সত্যকে আঁকড়ে ধরে থাকে।

وَكَاَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قٰتَلَ مَعَهٗ رِبِّيُّوْنَ كَثِيْرٌ ۚ فَمَا وَهَنُوْا لِمَآ اَصَابَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَمَا ضَعُفُوْا وَمَا اسْتَكَانُوْا ؕ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الصّٰبِرِيْنَ۔

"(আল্লাহর) আরো অনেক নবীই (এখানে এসে) ছিল, সে নবী (আল্লাহর পথে) যুদ্ধ করেছে, তার সাথে (আরো যুদ্ধ করেছে) অনেক সাধক (ও জ্ঞানবান) ব্যক্তি, আল্লাহর পথে তাদের ওপর যতো বিপদ-মসিবতই এসেছে তাতে (কোনোদিনই) তারা হতাশ হয়ে পড়েনি, তারা দুর্বলও হয়নি, (বাতিলের সামনে তারা) মাথাও নত করেনি, (এ ধরনের) ধৈর্যশীল ব্যক্তিদেরই আল্লাহ তা'আলা ভালোবাসেন।"[১৪৮]

নিজেদের আবেগ-অনুভূতি, কামনা-বাসনাকে সংযত রাখে। তাড়াহুড়া করে না। ভীত-আতঙ্কিত হওয়া লোভ-লালসা পোষণ করা এবং অসঙ্গত উৎসাহ-উদ্দীপনা প্রকাশ থেকে দূরে থাকে।

স্থির মস্তিষ্কে এবং ভারসাম্যপূর্ণ ও যথার্থ পরিমিত বিচক্ষতা ও ফায়সালা করার শক্তিসহকারে কাজ করে। বিপদ-আপদ ও সঙ্কট-সমস্যার সম্মুখীন হলেও যেন তোমাদের পা না টলে, উত্তেজনাকর পরিস্থিতি দেখা দিলে ক্রোধ ও ক্ষোভের তরঙ্গে ভেসে গিয়ে তোমরা যেন কোনো অর্থহীন কাজ করে না বসো। বিপদের আক্রমণ চলতে থাকলে অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে মোড় নিয়েছে দেখতে পেলে মানসিক অস্থিরতার কারণে তোমাদের চেতনাশক্তি বিক্ষিপ্ত ও বিশৃঙ্খল না হয়ে পড়ে। এর মধ্যেই প্রকৃত সবর নিহিত রয়েছে।

اِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ كَبِيْرٌ۔

"কিন্তু যারা পরম ধৈর্য ধারণ করে এবং নেক আমল করে, এরাই হচ্ছে সেসব লোক, যাদের জন্যে রয়েছে (আল্লাহর) ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।"[১৪৯]

---

[১৪৭] সূরা আলে-ইমরান, ৩ : ১৭
[১৪৮] সূরা আলে-ইমরান, ৩ : ১৪৬
[১৪৯] সূরা হুদ, ১১ : ১১

www.pathagar.com

প্রকৃত সবরকারী কালের পরিবর্তনে মানসিক ভারসাম্য অটুট রাখে। সর্বাবস্থায় একটি যুক্তিসঙ্গত ও সঠিক মনোভাব নিয়ে এগিয়ে চলে।

অনুকুল পরিবেশের ধনাঢ্যতা, কর্তৃত্ব ও খ্যাতির উচ্চাসনে চড়ে শ্রেষ্ঠত্ব ও অহঙ্কারের নেশায় মত্ত হয়ে বিপথগামী হয় না, আবার বিপদ-আপদ ও সমস্যা-সঙ্কটের করাল আঘাত তাকে ক্ষত-বিক্ষত করতে থাকে তাহলে এহেন অবস্থায়ও নিজের মানবিক চরিত্র বিনষ্ট করে না। এ উভয় অবস্থায়ই ধৈর্য ও সাহসিকতা অপরিবর্তিত ও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকে।

وَالَّذِيْنَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً وَّيَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ اُولٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ۔

"যারা তাদের মালিকের সন্তুষ্টি লাভের জন্য (বিপদ-মসিবতে) ধৈর্য ধারণ করে, যথারীতি নামায কায়েম করে, আমি তাদের যে রেযেক দিয়েছি তা থেকে তারা (আমারই পথে) খরচ করে- গোপনে কিংবা প্রকাশ্যে, যারা (নিজেদের) ভালো (কাজ) দ্বারা মন্দ (কাজ) দূরীভূত করে, তাদের জন্যই রয়েছে আখিরাতের শুভ পরিণাম।"[১৫০]

যারা সকল প্রকার লোভ-লালসা, কামনা-বাসনার মোকাবেলায় সত্য ও সততার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে।

এ দুনিয়ায় সত্য ও ন্যায়ের পথ অবলম্বন করলে যেসব ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয় তা সবই যারা বরদাশত করে। দুনিয়ার অবৈধ পন্থা অবলম্বন করলে যেসব লাভ পাওয়া যেতে পারে তা সবই যারা দূরে নিক্ষেপ করে, যারা ভালো কাজের সুফল লাভ করার জন্য সে সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে প্রস্তুত থাকে। সে সময়টি পার্থিব জীবনের অবসান ঘটার পর অন্য জগতে আসবে এতোটুকু আত্মবিশ্বাসে সবরকারীগণ বলীয়ান।

মুসলমানদের মন কখনো কখনো কাফিরদের যুলুম-নিপীড়ন, কুটতর্ক এবং লাগাতার মিথ্যাচার ও মিথ্যা দোষারোপের ফলে বিরক্তিতে ভরে ওঠে। এ অবস্থায় ধৈর্য ও নিশ্চিন্ততার সাথে অবস্থার মোকাবেলা এবং আত্মসংশোধন ও আত্মসংযমের জন্য তাদের নামায ব্যবস্থাপত্র দেয়া হয়েছে।

আল্লাহর পক্ষ থেকে মোট সবর একটি শব্দের মধ্যে দ্বীন এবং দ্বীনি মনোভাব, কর্মনীতি ও নৈতিকতার একটি বিশাল জগৎ আবদ্ধ করে রাখা হয়েছে।

اُولٰئِكَ يُؤْتَوْنَ اَجْرَهُمْ مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوْا وَيَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ۔

[১৫০] সূরা আর-রাদ, ১৩ : ২২

www.pathagar.com

"এরাই হচ্ছে সেসব লোক যাদের তাদের (দ্বীনের পথে) ধৈর্য ধারণের জন্য দু'বার পুরস্কৃত করা হবে, তারা তাদের ভালো (আমল) দ্বারা মন্দ (আমল) দূর করে, আমি তাদের যে রেযেক দান করেছি তারা তা থেকে (আল্লাহর পথে) ব্যয় করে।"[১৫১]

فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّاسْتَغْفِرْ لِذَنْۢبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْاِبْكَارِ۔

"অতঃপর তুমি ধৈর্য ধারণ করো, আল্লাহ তা'আলার প্রতিশ্রুতি অবশ্যই সত্য, তুমি (বরং) তোমরা গুনাহখাতার জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং সকাল-সন্ধ্যায় তোমার মালিকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো।"[১৫২]

وَمَا يُلَقّٰهَا اِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَمَا يُلَقّٰهَا اِلَّا ذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ۔

"আর এ (বিষয়)-টি শুধু তাদের (ভাগ্যেই লেখা) থাকে যারা ধৈর্য ধারণ করে এবং এ (সকল) লোক শুধু তারাই হয় যারা সৌভাগ্যের অধিকারী।"[১৫৩]

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ۔ اِذْ تَقُوْلُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ اَلَنْ يَّكْفِيَكُمْ اَنْ يُّمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلٰثَةِ اٰلٰفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُنْزَلِيْنَ۔

"বস্তুত আল্লাহ্ বদরের যুদ্ধে তোমাদের সাহায্য করেছেন, অথচ তোমরা ছিলে দুর্বল। কাজেই আল্লাহ্কে ভয় করতে থাকো, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হতে পারো। আপনি যখন বলতে লাগলেন মু'মিনগণকে– তোমাদের জন্য কি যথেষ্ট নয় যে, তোমাদের সাহায্যার্থে তোমাদের পালনকর্তা আসমান থেকে অবতীর্ণ তিন হাজার ফেরেশতা পাঠাবেন।"[১৫৪]

ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো

وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ؕ وَاِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخٰشِعِيْنَ۔

"ধৈর্যের সাথে সাহায্য প্রার্থনা করো নামাযের মাধ্যমে। অবশ্য তা যথেষ্ট কঠিন। কিন্তু সে সমস্ত বিনয়ী লোকদের পক্ষেই তা সম্ভব।"[১৫৫]

---

[১৫১] সূরা আল-কাসাস, ২৮ : ৫৪
[১৫২] সূরা আল-মুমিন, ৪০ : ৫৫
[১৫৩] সূরা হা-মীম আস-সিজদা, ৪১ : ৩৫
[১৫৪] সূরা আলে-ইমরান, ৩ : ১২৩-১২৪
[১৫৫] সূরা আল-বাকারা, ২ : ৪৫

www.pathagar.com

تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ ۖ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَٰذَا ۖ فَاصْبِرْ ۖ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ.

"এটি গায়বের খবর, আমি আপনার প্রতি অহি প্রেরণ করছি। ইতোপূর্বে এটা আপনার এবং আপনার জাতির জানা ছিল না। আপনি ধৈর্য ধারণ করুন। যারা ভয় করে চলে, তাদের পরিণাম ভালো, সন্দেহ নেই।"[১৫৬]

যেভাবে নূহ এবং তাঁর সঙ্গী-সাথীরা সাফল্য লাভ করেছিলেন এবং তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছিল ঠিক তেমনি তুমি ও তোমার সাথীরাও সাফল্য লাভ করবে এবং তোমাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। এটিই আল্লাহর চিরাচরিত রীতি। শুরুতে সত্যের দুশমনরা যতই সফলতার অধিকারী হোক না কেন সবশেষে একমাত্র তারাই সফলকাম হবে। তোমাদের দাওয়াতকে দাবিয়ে দেয়ার জন্য তোমাদের বিরোধীদের আপাতদৃষ্টে যে সাফল্য দেখা যাচ্ছে, তাতে তোমাদের মন খারাপ করার কোনোই প্রয়োজন নেই। তোমরা সবর ও হিকমতসহকারে কাজকে অব্যাহত রাখো।

وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا.

"এবং তাদের সবরের প্রতিদানে তাদেরকে দেবেন জান্নাত ও রেশমি পোশাক।"[১৫৭]

নবীগণকে দাওয়াতে হকের পথে আপতিত বিপদ মসিবত সবর দ্বারা সহ্য করার–

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ.

"আপনি আপনার পালনকর্তার আদেশের অপেক্ষায় সবর করুন এবং মাছওয়ালা ইউনুসের মতো হবেন না, যখন সে দুঃখিত মনে প্রার্থনা করেছিল।"[১৫৮]

وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ.

"এবং আপনার পালনকর্তার উদ্দেশে সবর করুন।"[১৫৯]

قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ ۚ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۗ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ ۗ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ.

---

[১৫৬] সূরা হুদ, ১১ : ৪৯
[১৫৭] সূরা আদ-দাহর, ৭৬ : ১২
[১৫৮] সূরা আল-কলম, ৬৮ : ৪৮
[১৫৯] সূরা আল-মুদ্দাসির, ৭৪ : ৭

www.pathagar.com

“বলুন, হে আমার বিশ্বাসী বান্দাহগণ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় করো। যারা এ দুনিয়াতে সৎকাজ করে, তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ। আল্লাহর পৃথিবী প্রশস্ত। যারা সবরকারী, তারাই তাদের পুরস্কার পায় অগণিত।”[১৬০]

যারা আল্লাহভীরুতা ও নেকির পথে চলার ক্ষেত্রে সব রকমের দুঃখ-কষ্ট বরদাশত করেছে। কিন্তু ন্যায়ের পথ থেকে সরেনি তার মধ্যে সেসব লোক অন্ত র্ভুক্ত যারা দীন ও ঈমানের কারণে হিজরত করে দেশান্তরিত হওয়ার দুঃখ-কষ্ট সহ্য করবে এবং সেসব লোকও অন্তর্ভুক্ত যারা যুলুম-নির্যাতনে ভরা দেশে থেকে সাহসিকতার সাথে সব বিপদের মোকাবেলা করবে।

এ জন্য সাহসী লোকের দরকার। দরকার দৃঢ়সঙ্কল্প, সাহস, অপরিসীম সহনশীলতা এবং চরম আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা। কিন্তু যে ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তিকে এমন সব বাতিলপন্থী দুষ্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে ন্যায় ও সত্যের জন্য লড়াই করতে হয়, যারা নৈতিকতার যে কোনো সীমা লঙ্ঘন করতে দ্বিধা করে না এবং শক্তি ও ক্ষমতার নেশায় চুর হয়ে আছে সেখানে দুষ্কর্মের মোকাবেলা সৎকর্ম দিয়ে করে যাওয়া তাও আবার উচ্চমাত্রার সৎকর্ম দিয়ে কোনো সাধারণ মানুষের কাজ নয়। কেবল সে ব্যক্তিই এ কাজ করতে পারে যে বুঝে-শুনে ন্যায় ও সত্যকে সমুন্নত করার জন্য কাজ করার দৃঢ়সঙ্কল্প গ্রহণ করেছে। যে তার প্রবৃত্তিকে সম্পূর্ণরূপে জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিচারশক্তির অনুগত করে নিয়েছে এবং যার মধ্যে নেকি ও সততা এমন গভীরভাবে গেড়ে বসেছে যে বিরোধীদের কোনো অপকর্ম ও নোংরামি তাকে তার উচ্চাসন থেকে নিচে নামিয়ে আনতে সফল হতে পারে না।

لَتُبْلَوُنَّ فِيْٓ اَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ قف وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْٓا اَذًى كَثِيْرًا ط وَاِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ۔

“(হে ঈমানদার ব্যক্তিরা,) নিশ্চয়ই জানো মালের (ক্ষতি সাধনের) মাধ্যমে তোমাদের পরীক্ষা নেয়া হবে। (এ পরীক্ষা দিতে গিয়ে) তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তী সম্প্রদায়– যাদের কাছে আল্লাহর কিতাব নাযিল হয়েছিলো এবং যারা আল্লাহর সাথে অন্যদের শরিক করেছে, তাদের (উভয়ের) কাছ থেকে অনেক (কষ্টদায়ক) কথাবার্তা শুনবে; এ অবস্থায় তোমরা যদি ধৈর্য ধারণ করো এবং আল্লাহকে ভয় করে চলো, তাহলে তা হবে অত্যন্ত বড় ধরনের এক সাহসিকতার ব্যাপার।”[১৬১]

---

[১৬০] সূরা আয-যুমার, ৩৯ : ১০।
[১৬১] সূরা আলে ইমরান, ১৮৬

www.pathagar.com

তাদের গালিগালাজ, মিথ্যা দোষারোপ, বেহুদা কথাবার্তা ও অপপ্রচারের মোকাবেলায় অধৈর্য হয়ে তোমরা এমন কোনো কথা বলতে শুরু করো না যা সত্য, সততা, ন্যায়, ইনসাফ, শিষ্টাচার, শালীনতা ও নৈতিকতাবিরোধী।

إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ ز وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا ط وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا ط إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔

"(তাদের অবস্থা হচ্ছে,) তোমাদের কোনো কল্যাণ হলে (তার কারণে) তাদের খারাপ লাগে, আবার তোমাদের কোনো অকল্যাণ দেখলে তারা আনন্দে ফেটে পড়ে; (এ প্রতিকূল অবস্থায়) যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ করতে পারো এবং নিজেরা সাবধান হয়ে চলতে পারো, তাহলে তাদের চক্রান্ত (ও ষড়যন্ত্র) তোমাদের কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না; নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তাদের যাবতীয় কর্মকাণ্ড পরিবেষ্টন করে আছেন।"[১৬২]

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جٰهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصّٰبِرِينَ۔

"তোমরা কি মনে করো তোমরা (এমনি এমনি) জান্নাতে প্রবেশ করে যাবে, অথচ আল্লাহ তা'আলা (পরীক্ষার মাধ্যমে) একথা জেনে নেবেন না যে, কে (তাঁর পথে) জিহাদ করতে প্রস্তুত হয়েছে এবং কে (বিপদে) কঠোর ধৈর্য ধারণ করতে পেরেছে!"[১৬৩]

এ ভরসা করার কারণেই বদরে (যুদ্ধে) আল্লাহ তায়ালা তোমাদের বিজয় ও সাহায্য দান করেছিলেন, অথচ (তোমরা জানো) তোমরা কতো দুর্বল ছিলে; অতএব আল্লাহকে ভয় করো, আশা করা যায় তোমরা (আল্লাহর) কৃতজ্ঞতা আদায় করতে সক্ষম হবে।"

وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلٰى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتّٰى أَتٰهُمْ نَصْرُنَا ج وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِ اللَّهِ ج وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ۔

"তোমার আগেও (এভাবে) বহু রাসূলকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা হয়েছিলো; কিন্তু তাদের মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা ও (নানা রকম) নির্যাতন চালানোর পরও তারা (কঠোর) ধৈর্য ধারণ করেছে, শেষ পর্যন্ত তাদের কাছে আমার (পক্ষ থেকে) সাহায্য এসে হাযির হয়েছে। আসলে আল্লাহর কথার রদবদলকারী কেউ নেই, তদুপরি নবীদের (এসব) সংবাদ তো তোমার কাছে (আগেই) এসে পৌছেছে।"[১৬৪]

---

[১৬২] সূরা আলে ইমরান, ১২০
[১৬৩] সূরা আলে ইমরান, ১৪২
[১৬৪] সূরা আল-আনআম, ৬ : ৩৪

www.pathagar.com

মু'মিনের জন্য আল্লাহর সাহায্য অবধারিত

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَاْتِكُمْ مَّثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ؕ مَسَّتْهُمُ الْبَاْسَآءُ وَالضَّرَّآءُ وَزُلْزِلُوْا حَتّٰى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ مَتٰى نَصْرُ اللّٰهِ ؕ اَلَآ اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ۔

"তোমাদের কি এই ধারণা যে, তোমরা জান্নাতে চলে যাবে, অথচ সে লোকদের অবস্থা অতিক্রম করনি যারা তোমাদের পূর্বে অতীত হয়েছে। তাদের ওপর এসেছে বিপদ ও কষ্ট। আর এমনিভাবে শিহরিত হতে হয়েছে যাতে নবী ও তাঁর প্রতি যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে পর্যন্ত একথা বলতে হয়েছে যে, কখন আসবে আল্লাহ্‌র সাহায্য! তোমরা শোনে নাও, আল্লাহ্‌র সাহায্য একান্তই নিকটবর্তী।"[১৬৫]

وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوْا عَلٰى مَا كُذِّبُوْا وَاُوْذُوْا حَتّٰٓى اَتٰىهُمْ نَصْرُنَا ۚ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ ۚ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِنْ نَّبَاِى الْمُرْسَلِيْنَ۔

"আপনার পূর্ববর্তী অনেক পয়গম্বরকে মিথ্যা বলা হয়েছে। তাঁরা এতে সবর করেছেন। তাদের কাছে আমার সাহায্য পৌঁছা পর্যন্ত তারা নির্যাতিত হয়েছেন। আল্লাহ্‌র বাণী কেউ পরিবর্তন করতে পারে না। আপনার কাছে পয়গম্বরদের কিছু কাহিনী পৌঁছেছে।"[১৬৬]

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوْتُ بِالْجُنُوْدِ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ مُبْتَلِيْكُمْ بِنَهَرٍ ۚ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّىْ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَطْعَمْهُ فَاِنَّهٗ مِنِّىْٓ اِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةًۢ بِيَدِهٖ ۚ فَشَرِبُوْا مِنْهُ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ ؕ فَلَمَّا جَاوَزَهٗ هُوَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ قَالُوْا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهٖ ۚ قَالَ الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلٰقُوا اللّٰهِ كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةًۢ بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ۔

"অতঃপর তালুত যখন সৈন্য-সামন্ত নিয়ে বের হলো, তখন বললো, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদেরকে পরীক্ষা করবেন একটি নদীর মাধ্যমে। সুতরাং যে লোক সেই নদীর পানি পান করবে সে আমার নয়। আর যে, লোক তার স্বাদ গ্রহণ করলো না, নিশ্চয়ই সে আমার লোক; কিন্তু যে লোক হাতের আঁজলা ভরে

---

[১৬৫] সূরা আল-বাকারা, ২ : ২১৪
[১৬৬] সূরা আল-আনআম, ৬ : ৩৪

www.pathagar.com

সামান্য খেয়ে নেবে তার দোষ অবশ্য তেমন গুরুতর হবে না। অতঃপর সবাই পান করল সে পানি, সামান্য কয়েকজন ছাড়া। পরে তালুত যখন তা পার হলো এবং তার সাথে ছিল মাত্র কয়েকজন ঈমানদার, তখন তারা বলতে লাগলো, আজকের দিনে জালুত এবং তার সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধ করার শক্তি আমাদের নেই, যাদের ধারণা ছিল যে, আল্লাহ্‌র সামনে তাদের একদিন উপস্থিত হতে হবে, তারা বারবার বলতে লাগলো, সামান্য দলই বিরাট দলের মোকাবেলায় জয়ী হয়েছে আল্লাহ্‌র হুকুমে। আর যারা ধৈর্যশীল আল্লাহ্ তাদের সাথে রয়েছেন।"[১৬৭]

قَدْ كَانَ لَكُمْ اٰيَةٌ فِىْ فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا ۖ فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاُخْرٰى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِّثْلَيْهِمْ رَاْىَ الْعَيْنِ ۖ وَاللّٰهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهٖ مَنْ يَّشَاۗءُ ۖ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّاُولِى الْاَبْصَارِ ـ

"নিশ্চয়ই দু'টি দলের মোকাবেলার মধ্যে তোমাদের জন্য নিদর্শন ছিল। একটি দল আল্লাহ্‌র রাহে যুদ্ধ করে। আর অপর দল ছিল কাফিরদের, এরা স্বচক্ষে তাদেরকে দ্বিগুণ দেখছিল। আর আল্লাহ্ যাকে নিজের সাহায্যের মাধ্যমে শক্তি দান করেন। এরই মধ্যে শিক্ষণীয় রয়েছে দৃষ্টিসম্পন্নদের জন্য।"[১৬৮]

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوْتَ مَلِكًا ۖ قَالُوْٓا اَنّٰى يَكُوْنُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ اَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ ۖ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهٗ بَسْطَةً فِى الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ ۖ وَاللّٰهُ يُؤْتِىْ مُلْكَهٗ مَنْ يَّشَاۗءُ ۖ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ـ

"আর তাদেরকে তাদের নবী বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তালুতকে তোমাদের জন্য বাদশাহ সাব্যস্ত করেছেন। তারা বলতে লাগলো তা কেমন করে হয় যে, তার শাসন চলবে আমাদের ওপর। অথচ রাষ্ট্রক্ষমতা পাওয়ার ক্ষেত্রে তার চেয়ে আমাদেরই অধিকার বেশি। আর সে সম্পদের দিক দিয়েও সচ্ছল নয়। নবী বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের ওপর তাকে পছন্দ করেছেন এবং স্বাস্থ্য ও জ্ঞানের দিক দিয়ে প্রাচুর্য দান করেছেন। বস্তুত আল্লাহ্ তাকেই রাজ্য দান করেন, যাকে ইচ্ছা। আর আল্লাহ্ হলেন অনুগ্রহ দানকারী এবং সব বিষয়ে অবগত।"[১৬৯]

---

[১৬৭] সূরা আল-বাকারা, ২ : ২৪৯
[১৬৮] সূরা আলে-ইমরান, ৩ : ১৩
[১৬৯] সূরা আল-বাকারা, ২ : ২৪৭

www.pathagar.com

إِذْ هَمَّتْ طَّآئِفَتٰنِ مِنْكُمْ اَنْ تَفْشَلَا وَاللّٰهُ وَلِيُّهُمَا ط وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ـ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ ج فَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ـ اِذْ تَقُوْلُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ اَلَنْ يَّكْفِيَكُمْ اَنْ يُّمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلٰثَةِ اٰلَافٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُنْزَلِيْنَ ـ بَلٰٓى اِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا وَيَاْتُوْكُمْ مِّنْ فَوْرِهِمْ هٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ اٰلَافٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُسَوِّمِيْنَ ـ

"যখন তোমাদের দু'টি দল সাহস হারাবার উপক্রম হলো, অথচ আল্লাহ্ তাদের সাহায্যকারী ছিলেন, আর আল্লাহ্র ওপরই ভরসা করা মু'মিনদের উচিত। বস্তুত আল্লাহ্ বদরের যুদ্ধে তোমাদের সাহায্য করেছেন, অথচ তোমরা ছিলে দুর্বল। কাজেই আল্লাহ্কে ভয় করতে থাকো, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হতে পারো। আপনি যখন বলতে লাগলেন মু'মিনদেরকে তোমাদের জন্য কি যথেষ্ট নয় যে, তোমাদের সাহায্যার্থে তোমাদের পালনকর্তা আসমান থেকে অবতীর্ণ তিন হাজার ফেরেশ্তা পাঠাবেন। অবশ্য তোমরা যদি সবর করো এবং বিরত থাকো আর তারা যদি তখনই তোমাদের ওপর চড়াও হয়, তাহলে তোমাদের পালনকর্তা চিহ্নিত ঘোড়ার উপর পাঁচ হাজার ফেরেশতা তোমাদের সাহায্যে পাঠাতে পারেন।"[১৭০]

بَلِ اللّٰهُ مَوْلٰكُمْ ج وَهُوَ خَيْرُ النّٰصِرِيْنَ ـ

"বরং আল্লাহ তোমাদের সাহায্যকারী, আর তাঁর সাহায্যই হচ্ছে উত্তম সাহায্য।"[১৭১]

চক্রান্তকারীদের চক্রান্ত সফল হবে না

وَقَدْ مَكَرَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلّٰهِ الْمَكْرُ جَمِيْعًا ط يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ ط وَسَيَعْلَمُ الْكُفّٰرُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ ـ

"তাদের পূর্বে যারা ছিল, তারা চক্রান্ত করেছে। আর সকল চক্রান্ত তো আল্লাহ্র হাতেই আছে। তিনি জানেন প্রত্যেক ব্যক্তি যা কিছু করে। কাফিররা জেনে নেবে যে, পর জীবনের আবাসস্থল কাদের জন্য রয়েছে।"[১৭২]

সত্যের কণ্ঠ রুদ্ধ করার জন্য মিথ্যা প্রতারণা ও যুলুমের অস্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছে। এটা আজ কোনো নতুন ঘটনা নয়। অতীতেও বারবার এমনি কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে সত্যের দাওয়াতকে পরাস্ত করার জন্য।

---

[১৭০] সূরা আলে ইমরান, ১২২-১২৫
[১৭১] সূরা আলে ইমরান, ১৫০
[১৭২] সূরা আর-রাদ, ১৩ : ৪২

www.pathagar.com

قَدْ مَكَرَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاَتَى اللّٰهُ بُنْيَانَهُمْ مِّنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَاَتٰهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُوْنَ۔

"নিশ্চয় চক্রান্ত করেছে তাদের পূর্ববর্তীরা, অতঃপর আল্লাহ্ তাদের চক্রান্তের ইমারতের ভিত্তিমূলে আঘাত করেছিলেন। এরপর উপর থেকে তাদের মাথায় ছাদ ধসে পড়ে গেছে এবং তাদের ওপর আযাব এসেছে যেখান থেকে তাদের ধারণা ছিল না।"[১৭৩]

সত্যের পথিকেরা যা দ্বারা শক্তি অর্জন করে :

وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّكَ يَضِيْقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُوْلُوْنَ ۙ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِّنَ السّٰجِدِيْنَ ۙ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَاْتِيَكَ الْيَقِيْنُ۔

"আমি অবশ্যই জানি, ওরা যা বলে তাতে আপনার মনটা ছোট হয়ে যায়। অতএব আপনি নিরঙ্কুশ প্রশংসা সহকারে আপনার প্রভুর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন এবং সিজদাকারীদের অন্তরভুক্ত হোন। আর আপনি আপনার প্রভুর ইবাদত করুন আপনার মৃত্যু উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত।"

আল্লাহ্ বলেন–

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ؕ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ ۫ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرٰةِ وَالْاِنْجِيْلِ وَالْقُرْاٰنِ ؕ وَمَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ مِنَ اللّٰهِ فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمُ الَّذِيْ بَايَعْتُمْ بِهٖ ؕ وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ۔

"আল্লাহ্ ক্রয় করে নিয়েছেন মুসলমানদের থেকে তাদের জান ও মাল এই মূল্যে যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা যুদ্ধ করে আল্লাহ্র রাহে: অতঃপর মারে ও মরে। তওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআনে তিনি এ সত্য প্রতিশ্রুতিতে অবিচল। আর আল্লাহ্র চেয়ে প্রতিশ্রুতি রক্ষায় কে অধিক? সুতরাং তোমরা আনন্দিত হও সে লেনদেনের ওপর, যা তোমরা করছো তাঁর সাথে। আর এ হলো মহান সাফল্য।[১৭৪]

যারা সব রকমের সমস্যা, সঙ্কট বিপদ-আপদ, ক্ষতি ও কষ্টের মোকাবেলায় ঈমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে, যারা স্বেচ্ছায় ঈমান আনায় বিপদ নিজের কাঁধে

---

[১৭৩] সূরা আন-নাহল, ১৬ : ২৬
[১৭৪] সূরা আত-তওবা, ৯ : ১১১

www.pathagar.com

তুলে নিয়েছে আর কাফের ফাসিকদেরকে নিজেদের সামনে ফুলে ফেঁপে উঠতে দেখেছে এবং তাদের ধন-দৌলত ও ক্ষমতা-প্রতিপত্তির দিকে ভুলেও নজর দেয়নি। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে আল্লাহর সন্তুষ্টিই তাদের উদ্দেশ্য।

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا ۚ وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖٓ اِخْوَانًا ۚ وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ۔ وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ؕ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۔

“আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে সুদৃঢ় হস্তে ধারণ করো; পরস্পর বিচিছন্ন হয়ো না। আর তোমরা সে নেয়ামতের কথা স্মরণ করো, যা আল্লাহ্ তোমাদিগকে দান করেছেন। তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে। অতঃপর আল্লাহ্ তোমাদের মনে সম্প্রীতি দান করেছেন। ফলে, এখন তোমরা তাঁর অনুগ্রহের কারণে পরস্পর ভাই ভাই হয়েছো। তোমরা এক অগ্নিকুণ্ডের পাড়ে অবস্থান করছিলে। অতঃপর তা থেকে তিনি তোমাদেরকে মুক্তি দিয়েছেন। এভাবেই আল্লাহ নিজের নিদর্শনসমূহ প্রকাশ করেন, যাতে তোমরা হেদায়েতপ্রাপ্ত হতে পারো। আর তোমাদের মধ্যে এমন একটা দল থাকা উচিত যারা আহ্বান জানাবে সৎকর্মের প্রতি, নির্দেশ দেবে ভালো কাজের এবং বারণ করবে অন্যায় কাজ থেকে, আর তারাই হলো সফলকাম।[১৭৫]

উপসংহার

তাই যুগে-যুগে মর্দে মুজাহিদদের সাহসিকতা দুনিয়াবাসীকে প্রেরণা যোগাতে থাকবে শতাব্দীর পর শতাব্দী। আমরা দৃঢ়তার সাথে বিশ্বাস করি শহীদের রক্ত আর মযলুমের চোখের পানি বৃথা যাবে না। সকল ত্যাগের বিনিময়ে বিজয় অর্জিত হবেই ইনশাল্লাহ। মু'মিনদের জন্য আল্লাহর সাহায্য খুবই নিকটবর্তী।

সমাপ্ত

[১৭৫] সূরা আলে-ইমরান, ৩ : ১০৩-১০৪।

www.pathagar.com

তথ্যসূত্র

১. আল-কুরআনুল কারীম
২. সিহাহ্ সিত্তাহ
৩. তাফসীর ইবনু কাছীর
৪. তাফসীর মা'আরেফুল কুরআন
৫. তাফহীমুল কুরআন
৬. আর রাহীকুল মাখতুম- সফিউর রহমান মোবারকপুরী
৭. সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ ﷺ- ডক্টর মাজেদ আলী খান
৮. নবীদের কাহিনী- মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
৯. মানবতার বন্ধু মুহাম্মদ ﷺ- নঈম সিদ্দিকী
১০. বিশ্বনবী- গোলাম মোস্তফা
১১. সাহাবীদের বিপ্লবী জীবন- ড. আব্দুর রহমান রাফাত পাশা
১২. আসহাবে রাসুলের জীবন কথা- ড. মুহাম্মাদ আব্দুল মা'বুদ
১৩. জীবন সায়াহ্নে মানবতার রূপ- মাওলানা আবুল কালাম আজাদ
১৪. কারাগারে রাতদিন- জয়নব আল গাজালী
১৫. যুগে যুগে ইসলামী জাগরণ- এ. কে. এ. নাজির আহমদ
১৬. ইবনে জওযী, তারীখে ওমর বিন খাত্তাব
১৭. আল্লামা শিবলী নুমানী, "সীরাতুন্নবী আযমগড় (ভারত) ১৯৬২, ১ম খন্ড
১৮. ইবনে খালদূন, "তারীখ", বৈরুত ১৯৬৬, ১ম খন্ড
১৯. ইবনে সা'দ, "আল-তাবাকাতু'ল-কুবরা", বৈরুত ১৯৬০, ১৩৮০ হি:, ১ম খন্ড
২০. মুহাম্মদ ইবনে জারীর আত্-তাবারী, "তারীকুর-রুসূল ওয়াল মুলূক", কায়রো ১৯৬০
২১. আবদুর রহমান সুহাইলি, *আল-রওযাতুন-উননুফ* (মিশর : ১৩৩৩হি.), খ. ৮
২২. আব্দুল মালিক ইবনে হিশাম, *আস-সীরাতুন্নববিয়্যা* (কায়রো : ১৩৭৫হি.), খ. ৪
২৩. মুহাম্মদ হুসাইন হাইকল, হায়াতু মুহাম্মাদ (লাহোর : ১৯৫৫)
২৪. ইযদুদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবনুল আছীর, *আল-কামিল ফিত-তারীখ* (বৈরুত : ১৩৮৫ হি), খ. ১২
২৫. অধ্যাপক কে. আলী, A Study of Islamic History.
২৬. শামস উদ্দিন মুহাম্মাদ ইবন আবদূল মালিক ইবন কায়্যিম জাওযী, যা'দুল মায়াদ, (মিশর, তা.বি), খ. ২
২৭. আল্লামা সফিউর রহমান মুবারকপুরী, *আর-রাহীকুল মাখতূম*
২৮. মাওলানা আকবর শাহ খান নাজীবাবাদী, তারীখে ইসলাম, (করাচী, ১৯৭০ হি.), খ. ১
২৯. মুহাম্মাদ ইবন আবদাল বাকী আল-যুরকানী, *শারহুল মাওয়াহিবুল লাদুননিয়া* (মিশর, ১৩২৭ হি), খ. ১

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

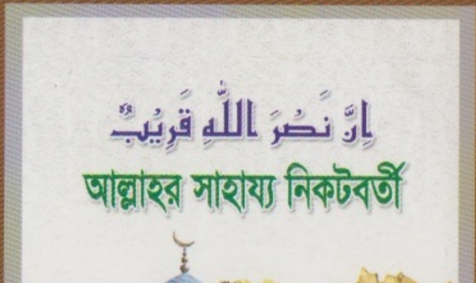

ISBN 978-984-91097-4-7